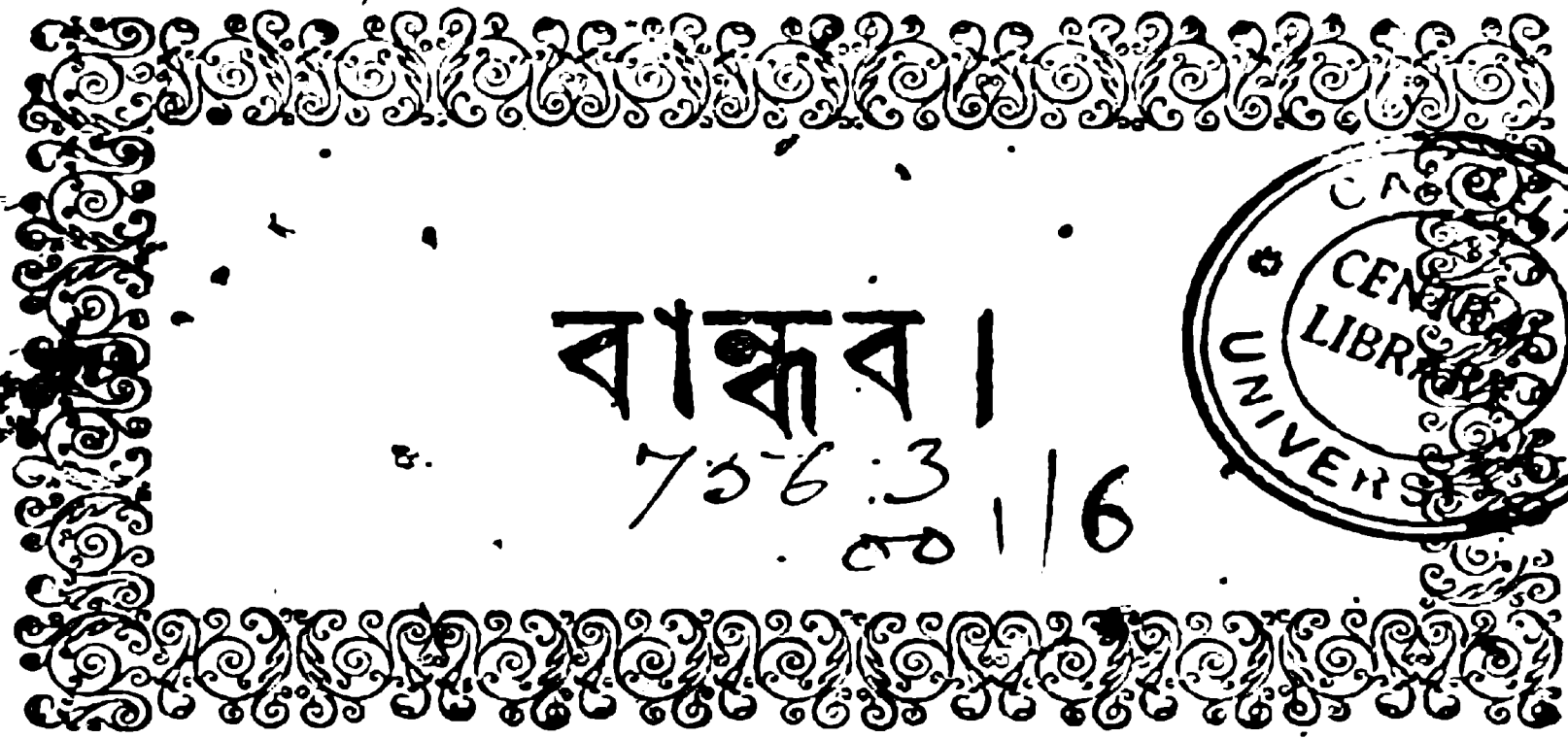




বান্ধব।

756.3.1/6



মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

[১ম ও ২য় সংখ্যা।]

বৈশাখ। ১২৮৩। জ্যৈষ্ঠ।

[১ম ও ২য় সংখ্যা।]

বৃটিশ ইণ্ডিয়া।

“ পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সুরিতাং
বিপর্যাসং বাতো ঘনবিরলভাবঃ ক্ষিতিকহাম্ ।
বহোদৃষ্টং কালাদপরমিব মন্যে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বুদ্ধিং স্রজয়তি ॥

যখন দুর্কারপরাক্রম জুলিয়ন সিঙ্গর, সেক্টর ৫৫ বৎসর পূর্বে, কতিপয় অর্ণব-পোত এবং কএক সহস্র দৈনিক লইয়া রটেনিয়ার উপকূলে প্রথম উপনীত হইলেন, তখন ইহা দেখিয়াই তাঁহার নিরতিশয় ক্ষোভ ও দুঃখ হইল যে, তিনি যাহা-দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তাহারা অর্ধ মনুষ্য, অর্ধ পশু। অপর মাংস তাহাদিগের আহার; ভূগর্ভ কিংবা ভূগর্ভের তায় মৃগয় কুটির তাহাদিগের আবাস-

গৃহ; তরুশাখা তাহাদিগের বিনোদ-ক্ষেত্র; তাহাদিগের শরীর নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণে চিত্রিত; মুখচ্ছবি অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব এবং হাস্যরসের উদ্দীপক; এবং ভাষা মুখচ্ছবি হইতেও অধিকতর অদ্ভুত, অংগ-কঠোর এবং শাখা-মৃগের ভাষার ম্যায় সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের অনৈখ্য। আর, যখন বীরচূড়ামণি সেকন্দর সাহু, জুলিয়ন সিঙ্গরেরও প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে, পারস্যাদি যবনরাজ্য পদতলে দলন

করিয়া, দিগ্ভ্রজয়-বাসনার চরিতার্থতা হেতু ভারতের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ইহা দেখিয়াই তিনি এবং তাঁহার সহচরবর্গ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন যে, তাঁহারা দেশে থাকিয়া যাহাদিগকে এক প্রকার অসভ্য মনে করিতেন, তাহারা সভ্যতা বিষয়ে গ্রীকদিগের শিক্ষাণ্ডক । তাহারা রূপে অতুল, মৃত্যু-গীত-বাদ্যাদি সুকুমারগুণে গন্ধর্ব্বসদৃশ, তাহাদিগের মৌখ-সমাকীর্ণ নগররাজী ইন্দ্রের অমরাবতী, আচার ব্যবহার সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত, পরিচ্ছদ ও বেশবিন্যাস সুরলোকের উপযুক্ত, প্রকৃতি কাঠিন্য ও কোমলতা এবং দম্বাদাক্ষিণ্য ও অভিমানাদি সমস্ত পৌকব-গুণে বিভূষিত, এবং তাহাদিগের ভাষা মন্দাকিনীর তরঙ্গ-ভঙ্গি-জন্য কলনাদের ন্যায় যার পর নাই স্রুতিমধুর ও মনোমদ্য বস্তুতঃ, ঋক্টের আবির্ভাবসময়ে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় ছিল, যদি তাহার সহিত ব্রিটিশ দ্বীপের তদানীন্তন অবস্থার তুলনা করা যায়, তবে এই উভয় স্থলের অধিবাসীরা যে একজাতীর জীব, একই উপকরণে গঠিত, এবং একরূপ স্বভাববিশিষ্ট এই বিষয়েই মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে । যখন ভারতবাসী, শান্তির প্রিয়-নিকেতন স্বরূপ রমণীয় তপোবনে অথবা কোন প্রশান্তহৃদয়া তটিনীর মনোহর পুলিনে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, শক্তির প্রাণরূপিনী পরমাশক্তির স্বরূপচিন্তায় নিমগ্ন হইতেন, অথবা তদীয় আরাধনার জন্য

স্বর্গস্থ দেবতাদিগের ন্যায় জলদগঙ্ধীর মধুরস্বরে সামগান করিতেন, তখন ব্রিটেনিয়ার অধিবাসীরা ড্রুইডদিগের ভূত-ভয়েই সতত অধীর থাকিত, এবং আপনাদিগের মনোরত্তির অনুরূপ নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস মূর্তির নিকটে জীবিত মনুষ্যকেও অধিকৃত ফেলিয়া দিত । যখন ভারতীয় আর্ষাসম্মান, ব্যাসবাল্মীকির হৃদয়কন্দর-নিঃসৃত নিরূপম কাব্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া, অভিজ্ঞানশকুন্তলের মত কবিদের অনৌকিক-মহিমাময় লোকমোহন নাটকাদির অভিনয়দর্শনের জন্য হীরক-হার-শোভিত সুসজ্জিত সভাস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হইতেন, এবং সংগীতের তত্ত্বোপে অঙ্গ চালিয়া দিয়া উচ্ছ্বাসে সঙ্গীত আনন্দা-র্গবে ভাসিয়া যাইতেন, তখন সীরা বানরের ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ ক-রিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতান্ত মনে করিত, এবং বিকটস্বরে চীৎকার ক-রিতে পারিলেই সংগীতের পরাকাষ্ঠা হ-ইল-এইরূপ ভাবিয়া পরিতৃপ্ত রহিত । যখন বীরবিনোদিনী ভারত মলনা মণিমুক্তা প্র-বালাদি অমূল্য বস্তুনিচয়কেও অনুপযুক্ত আভরণ বিবেচনায় অঙ্গে ধারণ করিতে লজ্জিত হইতেন, এবং প্রীতি ও কণিতায় বিলম্বিত হইয়া আপনারাই সর্ব্বত্র মূর্ত্তিমতী প্রীতি এবং মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় শোভা পাইতেন, তখন ব্রিটিশ-কামিনীরা পশুচর্যে অন্ধ আকৃত হইয়া যার তার স-হিত ভোগ্যাভাবে যথেষ্ট বিচরণ করিত,

এবং স্নেহ আসিয়া কোনরূপ ভয় প্রদর্শন
কি নিঃশব্দ করিতে পারিত, তাহাকেই
তৎকালে পতিজ্ঞান করিয়া তাহার স-
হিত চলিয়া যাইত। সংক্ষেপতঃ ইহা
বলিলেই হয়, যখন ভারতে, দর্শন, ধ-
র্মতত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান এবং রাজনীতি প্র-
ভৃতি শাস্ত্র চরমোৎকর্ষ পাইয়াছে, জ্যো-
তিষের আবিষ্কার হইয়াছে, শিল্প-নি-
দা শত শাখায় সৌন্দর্য বিস্তার ক-
রিয়াছে, চন্দ্রসূর্য্যবংশীর শূরশ্রেষ্ঠ মহাযো-
ধদিগের অসাধারণ বীর-কীর্তিতে দশদিগ্
বাজিয়া উঠিয়াছে, শাকাসিংহ ও শঙ্ক-
রাচার্য্য প্রভৃতি সাধুপুরুষদিগের দেব-
বাণী-সদৃশী ঐশ্বদেব-কথা সর্বত্র ছাঁ-
ইয়া পড়িয়াছে, পানিনি ও পতঞ্জলি
মুণিগণ ভাষাবিজ্ঞান পৃথিবীতে ভারতীর
বুদ্ধি-সম্পন্নতার চরিত্র দিয়াছে, জন্ম, মৃত্যু এবং
স্মিরাহাদি সম্পর্কিত অনুষ্ঠানসমূহ শোধনের
পর পুনঃশোধনে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধকাস্তি ও
উন্নতি দেখাইয়াছে, এবং জগতে অদ্যাপি
যে সকল সামাজিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়
নাই, আর্য্যসমাজ তত্ত্বাবৎ কুট সমস্যার
মীমাংসা করিয়া ন্যায় ও বৈষম্যের মিশ্রণ-
জনিত সূদৃঢ় ভিত্তিতে স্থির হইয়া দাঁড়াই-
য়াছে, ব্রটিশ দ্বীপ তখনও অনক্ষর ও অ-
জ্ঞানতিমিরারত, এবং তথাকার অধিবাসীরা
তখন পর্য্যন্তও সর্বতোভাবে মনুষ্যগণনার
বহিঃস্থিত।

কিন্তু কালের কি অপক্লপ লীলা !
সংসারের কি বিচিত্র গতি ! আজি সেই

স্টেটেনিয়া ‘রাজরাজেশ্বরী’ এবং আজি
সেই ভারতভূমি ‘ব্রটিশ ইণ্ডিয়া’।

“কোথায় ভারতবর্ষ,—কোথায় বৃটন,
অলঙ্ঘ্য পার্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,
অর্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর ;
ইংলণ্ডের চন্দ্রসূর্য্য দেখে না ভারত,
ভারতের চন্দ্রসূর্য্য দেখে না বৃটন ;
পবনের গতি কিম্বা কম্পনার রথ
কোন কালে এত দূর করে নি গমন
আকাশ কুমুম কিম্বা মন্দার যেমন,
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।

* * *

সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদর
ভারত-অদৃকোকাশে স্বপনের মত,
এই রবি শীত্রে অস্ত হইবার নয়,
কখনও হইবে কি না জানে ভবিষ্যত।”

পৃথিবীর অন্তস্তলে যে সকল ভৌতি-
কশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার পরম্পর
সংঘর্ষে কখনও বহুজনাকীর্ণ গ্রাম জনপদ
অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং কখনও
জলময়ী নিম্নভূমি উল্কে উন্নত হইয়া কা-
লসহকারে অপূর্ব্ব এক নগরে পরিণত
হইয়াছে ;—নদ নদী মনুষ্যের বাসযোগ্য
হইয়া উঠিয়াছে, এবং মনুষ্যের আবাসস্থল
মকর কুন্তীরের বিহারস্থল হইয়া পড়ি-
য়াছে ;—এমন কি, যেখানে মেঘমণ্ডিত
পার্বতমালা তাপসবেশে দণ্ডায়মান থাকিত,
সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া সেখানে ক্রীড়া
করিতেছে, এবং যেখানে এক সময়ে সমু-

স্বের অনন্তপ্রসারিত নিবিড় নীলিমা সেই এক ভয়ঙ্কর শোভার শোভিত রহিত, সেই স্থান ইদানীং পার্শ্বতা-পশুপক্ষীর কৃণাদে অহোরাত্র নিনাদিত হইতেছে । সময়ের আবর্তনে, ভারত আর রুটেনিয়ায় যেরূপ অবস্থাগত বিপ্লব ঘটয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা কোন অংশেই উল্লিখিত-প্রকার পার্থিব বিপ্লব অপেক্ষা হীনতর বা অল্প বিস্ময়কর নহে । ভারত কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে, আর রুটিশ দ্বীপই বা কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে ! আজি যদি রুটিশ দ্বীপের ভূতপূর্ব ভূপতি কেমি-ভিলনাম স্বকীয় সমাধিমন্দির হইতে পুন-কন্ঠিত হইয়া ইংলণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাদচারণা করেন, তাহা হইলে এই ইংলণ্ডই যে সেই ইংলণ্ড ইহা কি কোন প্রকারেই তাঁহার প্রতীতি হইবে ? আর, আজি যদি বীরকুলের চিরকীর্তি মহারথী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের শর-শয্যা হইতে গাত্ৰো-স্থান করিয়া একবার এই ভারত সাম্রাজ্যের চতুঃসীমায় পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে এই দেশই যে সেই পুরাতন আৰ্য্যাবর্ত, পুণাভূমি ভারতবর্ষ, কেহ সহস্রবার শপথ করিয়া কহিলেও কি একথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে ?

আজি এজগতে ইংলণ্ডের তুলনা কো-থায় ? স্বপ্ন যাহা দূর হইতে দর্শন করিতে পারা নাই, দূরাশাও যেখানে পৌঁছিতে ন-
র্থ হয় নাই, আজি ইংলণ্ডের মৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাহারও উর্দ্ধদেশে বিরাজ করিতে

ছেন । যে ইংলণ্ডের কুণীর-পংক্তি দেখিয়া রোমান ও ডেন নরমানেরা পরিহাস ক-
রিত, আজি সেই ইংলণ্ডের প্রাসাদ-পংক্তি স্বর্গ-শোভাকেও পরিহাস করিয়া দিগ্দি-
গন্তরবাসী পরিত্রাজকদিগের বিস্ময় জন্মা-
ইতেছে ;—এবং যে ইংলণ্ডের বিকট বুলি-
এক সময়ে যার পর নাই অশ্রাব্য ছিল, আজি তাহা সকল ভাবার রসাকর্ষণ ক-
রিয়, সকল জাতীয় কাব্য এবং কাব্যের সকল প্রকার মধু ও মদিরায় পরিপুষ্ট হইয়া, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও চরিতাখ্যান প্রভৃতি অনন্তশাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার হ-
ইতে বল ও বেগবত্তা পাইয়া, ওয়াসিংটন ন-
গর হইতে চায়না ও জাপানের শেষ সীমা পর্যন্ত শত কোটি মনুষ্যের জিহ্বায় জি-
হ্বায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে । ইংল-
ণ্ডের ধন-বৈভব এত বাড়িয়াছে যে, তত্রত্য সমৃদ্ধ ব্যক্তির স্বর্ণ কি রক্তত বস্ত্র স্পর্শ করিতেও ভালবাসেন না ; ইংলণ্ডের বিক্রম, ক্ষুধা ও জনবৈভবও এত বাড়িয়াছে যে, সমগ্র মেদিনী করায়ত্ত হইলেও ইংলণ্ডের এইক্ষণ আর পরিতৃপ্তি হয় না । ভূত যে-
মন প্রভুর পদাঙ্করাজি দর্শন করিলেই পু-
লকে পূর্ণ হইয়া কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান হয়, আজি সপ্তসাগরের উর্মিমাল্যও রু-
টিশ বৈজয়ন্তী দর্শনে সেইরূপ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমোচ্ছ্বাস প্রদর্শন করি-
তেছে, এবং গিরিশঙ্করের অতি দুর্গম স্থা-
নেও সেই বৈজয়ন্তীই দর্পভরে দোলারিত হইতেছে । পৃথিবীর যেখানে যাও সেখা-

নেই ব্রিটিশ স্বর্ষা, ব্রিটিশ সভ্যতা, ব্রিটিশ কৃষ্ণার, ব্রিটিশ চাতুরী, ব্রিটনের প্রতাপ ও শক্তি এবং ব্রিটেনিয়ার নাম-যুদ্ধ।

“নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,
কিন্মা আফ্রিকার মৃগ-ভূমিকায়,
ঐশ্বর্য-শালিনী পূর্ব প্রদেশে,
ইংলণ্ডের কীর্তি না আছে কোথায়?
পূর্ব পশ্চিম গায় সমুদয়।

জয় জয় জয় ব্রিটিশের জয়।

এদিকে ভারত? ভারত ভূমির প্রতিও একবার ফিরিয়া চাও। যে রাজ্য কোন দিন অবনীৰ মলাটমণি ছিল—যাহার কমনীয়জ্যোতিঃ প্রাতঃসূর্যের কিরণমালার ন্যায় জগৎকে আশ্রয় ও আলোকিত করিয়াছিল, আজি তাহার কি দশা ঘটিয়াছে, তাহাও একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। ভারতভূমি কোথায়?—সমীরণ যে গভীর নিশীথে এই দিগন্ত-বিস্তারিত মহাশ্মশানের উপর দিয়া, হাঁ হাঁ শব্দে প্রবাহিত হয়, উহাও বিলাপিয়া বিলাপিয়া ইহাই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে,—ভারত! তুমি কোথায়? পৃথিবীর মানচিত্রে কোন দেশকে এইক্ষণ ভারতবর্ষ বলে? ভারতে যুগান্তর ঘটিয়াছে। উত্তরে হিমাদ্রি, পশ্চিমে বিষ্ণাচল এবং পূর্বে চন্দ্রনাথ প্রভৃতি পর্বতপংক্তি ভিন্ন ভারতের সমস্তই প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে ধৌত হইয়া গিয়াছে। ভারতের নাম পর্যন্তও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা দেখিতেছ, অথবা শ্রুপত্রে যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ,

তাহার নাম ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া’। বৃত্তন সৃষ্টি, বৃত্তন রাজ্য, এবং সর্বত্রই বৃত্তন শক্তির সঞ্চার-চিহ্ন!

এই বৃত্তন ভারতের অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস সমস্তই এইক্ষণ ব্রিটেনিয়ার। এখানে ভারতবাসী নিজবাসগৃহে, নিজ বাসভূমিতেও পরপ্রত্যাশী, প্রবাসী; এবং ব্রিটেন প্রবাসী হইয়াও সর্বসর্ব্বা ও গৃহ-স্বামী। ব্রিটিশ জাতীরের মধ্যে যাহাদিগের মস্তিষ্কে বুদ্ধি, বাহ্যতে বল, এবং সমাজে আধিপত্য আছে, যাহারা পুরুষমণ্ডলে পরিগণ্য ব্যক্তি, তাহাদিগের কথা আর অনর্থক কেন উল্লেখ করিব? যে ব্রিটেন স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দিনান্তে মুষ্টিমিত উচ্ছিষ্টের সংগ্রহ করিতে পারে না, স্বদেশীয় আচা লোকদিগের পদাঘাতেও যাহার অপমান বোধ হয় না, আপনার উদরার সংস্থানের জন্য ভাৰ্ষা বিক্রয়েও যাহার লজ্জা কি স্নগা জন্মে না, সেও একলক্ষ সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় মুক্তিকায় পনক্ষেপ করিতে পারিলেই রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী। তখন তাহার মুখ-চ্ছবি হইতে অগ্নিরষ্টি হয়, দৃষ্টি সকলকেই যেন ‘দূরে রহ’ বলিয়া আদেশ করে, বাক্যে রাজা এবং রাজসিংহাসনও বিনষ্ট কি বিচূর্ণিত হইয়া যায়—এবং মেদিনী যেন প্রতিপদ-নিষ্ক্ষেপেই ধর ধর কাঁপিয়া উঠে। সে যত কেন নিঃস্বল হউক না, এখানে পল্লী ছিলেই ব্রহ্মাণ্ড তাহার; কারণ লক্ষ্মী এখানে দাসীর ন্যায় তাহার পরিচর্যা ক-

রেন,সৌভাগ্য আপনি গিয়া তাহার শোভা সম্পাদনে রত হন,এবং মান ও সম্পদ এখানে বিনা আস্থানেও তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়েন । আর, সে যত কেন দুঃখ,দুঃচরিত্র ও কলঙ্কিত হউক না, এখানে সমাগমমাত্রই সে 'শুদ্ধ-ক্ষটিক-সঙ্কাশ' নিখূল পুরুষ; কারণ চন্দ্রেও কলঙ্করেখা সম্ভবে, তথাপি এই ভারতরাজ্যে ব্রটিশ-চরিত্রে কখনও কলঙ্ক সম্ভবে না । যদি সে প্রমত্ত ব্যাঘ্র ভয়ঙ্কর যত নরযুগ্ম লইয়া খেলা করে, এখানে তাহার নাম বাকণী-মদ-মত্ততা, যদি সে পরম্প্র লুণ্ঠন করে, এখানে তাহা প্রমোদ-ক্রীড়া এবং যদি সে ক্রাইবের মাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কপটলেখ্য প্রস্তুত করে, এখানে তাহার পরিচয় অকম্পিত-পূর্ব প্রতিভা । নিয়ম তাহারই অধীন, সে নিয়মের অধীন নহে । যে তাহার প্রহার সহিতে না পারে,সে অশিষ্ট, সে উদ্ধত ; যে তাহাকে ভোগ্য বস্তু সংগ্রহণ করিয়া দিতে না পারে, সে শঠ, সে মূর্ত ; এবং যে পক্ষযুখে তাহার স্থিতিগীত গাইতে না পারে, সে অজ্ঞ, সে মিথ্যাবাদী । তাহার ইচ্ছায় বিধি, তাহার অভিসম্পাতে বিপদ, এবং তাহার সম্মুখে কি চিত্তবিকার জন্মিলে, নিতান্ত অসম্ভব স্বলেও সর্বনাশ কি ঘোরতর বিপ্লব । ভারতগত ব্রটেনদিগের সকলই যে এইরূপ, এমন বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে । আমরা শুধুকে জানেন মেকলে নহি । সুতরাং একজন কি একশত জনের চরিত্র দেখি-

য়াও একটি সমগ্রজাতির চরিত্র সম্বন্ধে কোন রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতে আমাদিগের সাহস হয় না । আমরা জানি যে, ব্রটিশ দ্বীপ হইতে এদেশে যাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেও লোকের প্ররতি হইতে পারে, তাঁহাদিগের সংস্পর্শেও মনুষ্য রুতর্থে হয় । কিন্তু ব্রটিশ বংশীয় অপদেবতাও যে এখানে আসিয়া উপরোক্তরূপে দেবতা এবং অনাহুত অধিপতি হইয়া বসে, কে এ কথার অপসাপ করিবে ?

এদেশে ব্রটেনের বাহ্যপ্রতাপ যদি এইরূপ বিস্ময়জনক, ব্রটেনের অভ্যন্তরীণ প্রতাপ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক । জাতিবিশেষের উপর জাতিবিশেষের বাহ্য প্রভুতায় শরীর ও সম্পত্তিমাত্র স্পৃষ্ট হইয়া থাকে ; কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রভুতায় সমাজের আত্মা এবং প্রাণ পর্য্যন্ত আহত হয় । জর্মণ এবং ফরাসি এই দুই জাতিতে বহুকাল ব্যাপিয়া বিরোধ-যাইতেছে । কখনও ফরাসি বীর বর্লিন নগরে জয় ভেরী বাজাইয়াছে এবং কখনও জর্মণ পক্ষপাল পারিশ নগরে প্রবিষ্ট হইয়া টৈতুক শ্লগ পরিশোধ করিয়াছে । আলশে আর লোরেন, তত্ত্ববারের করম্বত তুরি-যন্ত্রের ন্যায়, একবার ফ্রান্সে গিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে এবং একবার জর্মণীর করতলস্থ হইতেছে । কিন্তু আজি পর্য্যন্তও ফ্রান্স জর্মণী হয় নাই, কিংবা জর্মণী ফ্রান্স হইয়া যায় নাই । ব্রটেনের সংস্পর্শে

ভারতসমাজে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব
গঠিয়াছে,—ব্রটনের পরাক্রম কেবল বা-
হিরেই পর্যাবসিত না হইয়া একবারে সমা-
জের মূল পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।
ভারতে যেখানে বেদ ও উপনিষদাদির
পঠন পাঠন হইত, সেখানে এইক্ষণ বা-
ইবল; যেখানে মন্ত্রত্রি যাজুর্বল্কাদি শা-
স্ত্রপ্রবর্তকদিগের পূজা হইত, সেখানে এই-
ক্ষণ ব্রাক্ষ্মোন, বেহ্মাম এবং ফিফেন;
ভারতের বধু এইক্ষণ বিবি, ভারতের বৈ-
কুঠ এইক্ষণ বিলাত। এবং ভারতবাসীর
কৈবল্যলাভ এইক্ষণ ব্রিটিশ-রূষের প্রসন্ন
দৃষ্টি। তন্ত্র যেমন ভববন্ধন মোচনের জন্ত
বরদার আরাধনা করে, বর্তমান ভারতও
সেইরূপ ভবভয় হইতে অব্যাহতি লাভের
জন্ত ব্রটেনিয়ার আরাধনা করিতেছে;—
কখনও উর্দ্ধনেত্র, কখনও অব্যগুখ, কখনও
উত্তানশায় এবং কখনও বা একপদে দণ্ডা-
য়মান হইয়া ঐ একই মূর্তির ধ্যান ধারণায়
নিমগ্ন রহিয়াছে। এদেশে কবি কাব্য লি-
খিবেন, তাহার বিষয় এলবার্ট কি এডও-
য়ার্ড, এবং আদর্শ মিন্টন কি বাইরন;—
সমাজ-সংস্কারক নিজ্জীব হিন্দুসমাজে তা-
ড়িত-বল প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উদ্ধাকে
সজীব করিবেন, তাঁহার অশ্রুপাত ব্রিস্টল
নগরে কি বার্মিংহামে; এদেশে বিবাহ
পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহার ব্যবস্থা-
দাতা মোক্ষমূলর; বেদান্ত ও ব্যাকরণাদি
শাস্ত্রের ভাষ্যকার গোল্ডস্টুক; অভি-
ধানকর্তা উইলিয়ম কি উইলসন; পরিধেয়

বস্ত্র মানচেস্টরে লবণ লিভারপুলে; এবং
এদেশের জীবন, মৃত্যু, উত্থান ও পতন
এবং শুভাশুভ যত কিছু কম্পিত হইতে
পারে, তাহার বিধিলিপি ব্রিটিশ পার্লিমা-
মেণ্টে।

ভারতে পাপ পুণ্য এবং ধর্মাদ্বয়ের
মূল্য পার্থক্যও এইক্ষণ প্রফালিত হইয়া
গিয়াছে, নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি-
য়াছে, এবং ভজনা ও আরাধনা রূপান্তর
লাভ করিয়াছে। ধর্ম কি আর পুণ্য কিসে
এই কথা লইয়া পুরাতন দার্শনিকগণ কতই
শাস্ত্র মন্থন ও বিচার বিতর্ক করিয়াছেন।
ভারতবাসীর ধর্ম এবং পুণ্য, ইহকাল এবং
পরকাল সমস্তই এইক্ষণ ব্রটনের সেবক-
জন-বাঞ্ছিত পদপঙ্কজে! গোপনে কি স্ব-
জাতীয় সমাজের জ্ঞান-গোচরে কোন
সংকার্যের অনুষ্ঠান করিলে এইক্ষণ আর
ভারতবাসীর আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। যে
অনুষ্ঠান ব্রিটিশ চক্রার বিঘোষিত না হইল,
তাহা অনুষ্ঠান নহে, এবং যে কার্যের য-
শোধনি পর্ষত ও সাগর লঙ্ঘন করিয়া ব্র-
টেনিয়ার উপকূলে গিয়া না ঠেকিল, তাহাও
কোনরূপ কার্য মনো গণনীয় নহে। যাহা
ব্রিটিশ চক্ষে প্রীতিপ্রদ তাহাই পবিত্র এবং
মঙ্গলকর; এবং যাহা ব্রিটিশ চক্ষে অপ্রিয়,
সহস্র অনুশাষণ থাকিলেও তাহা অপবিত্র
এবং অমঙ্গলের নিদান। ভাবগদগদ ধর্মো-
পদেশকগণ ব্রটিনিয়াকে অতিক্রম করিয়া
ইফ্টনাম জপ করিতেও এইক্ষণ ভালবাসেন
না, অথবা মনে উৎসাহ পান না। স্মৃতরাং

এদেশে প্রার্থনা এবং দুষ্কৃতির জন্য অনু-
তাপাদিও ইনানীং বিজেত-ভাষাতেই অহ-
রহঃ পরিবাক্ত হইয়া থাকে । যেন রুটন আগে
না শুনিতে বিধাতাও শুনিতে পান না,
এবং রুটিশ হৃদয় বিগলিত না হইলে দয়ার
সেই অনন্ত প্রস্রবণও বিগলিত হয় না ।
অহো লজ্জা ! অহো লাঞ্ছনা ! অহো বিড়-
ম্বনা ! পৃথিবীতে জেতা এবং পরাজিত,
অথবা আশ্রয় এবং আশ্রিতের মধ্যে কোন
দেশেও কি কস্মিন্কালে এইরূপ উপাস্য
উপাসকের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে ? আজি সেই
জয়মালাভূষিত জগদাকৃ অর্ধজাতির ক্রী-
ড়াকাননকপিণী ভারত ভূমি আহারে ব্যব-
হারে, শিকারে ও দীক্ষায়, ভাসায় ও বেশ
বিন্যাস-ভদ্দিমায়, আমোদে উৎসবে, এবং
লৌকিক ও অলৌকিক সর্ববিধ ব্যাপারে
যে রূপ ‘রুটিশ ইণ্ডিয়া’ হইয়াছে, ভেক-
ভুজঙ্গভাবাপন্ন অথ কোন দুই জাতিতেই
কি কখনও এইরূপ দেখা গিয়াছে ?

এই অচিস্তিত-পূর্ব অবস্থান্তর পর্যা-
লোচনা করিয়া, সকলেই ইহা জিজ্ঞাসা
করিবেন ;—এইরূপ কেন হইল ? আমা-
দিগেরও ইহাই প্রধান জিজ্ঞাসা,—এইরূপ
কেন হইল ? আজি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর
রুটিশ দ্বীপের ইতিহাস জগতে কেন এইরূপ
গৌরবের ছটার শোভা পাইল, এবং আজি
ভারতবর্ষের ইতিহাসও কেন অতল কমল-
সাগরে ডুবিয়া গেল ? এ প্রশ্ন পরিহাসের
নহে । যদিও পণ্ডিতেরা উপদেশ করিয়া

নাশ্তি সূচনা”, অর্থাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে
তাহা আর ফিরিবার নহে এবং গত বিষ-
য়ের অনুসূচনা রূপা, কিন্তু একথার আমা-
দিগের মন প্রবোধ মানেন না । আমাদি-
গের এইরূপ বিশ্বাস যে, যাহা অতীত তা-
হাই ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা । অত-
এব অতীত কথার মর্মোদ্ধার করিয়াই ভবি-
ষ্যতের অর্থগ্রহ করিতে হইবে । বালক পদ-
শ্লমন-বেদনা হইতেই ভবিষ্যতে পাদচা-
রণা করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, এবং
যেসকল জাতি অধঃপাতে গিয়াছে তা-
হারও ঐ অধঃপাতের দুর্ভোগ হইতেই পু-
নরুত্থানের উপায় দর্শন করে । ভারতবর্ষ
একবারে অধঃপাতে গিয়াছে । যদি উহার
পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার
অবলম্বনযুক্তি ঐ অধঃপাতে । রূপা চীৎ-
কার করিলে হইবে না, রূপা আশ্রয় ক-
রিলেও হইবে না । কিন্তু অতি স্থিরভাবে,
অতি প্রশান্তবুদ্ধিতে, অতীব গাম্ভীর্যসহ-
কারে রুটন আর ভারতীয়-আর্য্য এই উ-
ভয় জাতির অভ্যুদয় এবং অধোগমনের
মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে ।

ভারতে কি বীরত্বের অভাব ? যিনি
ভারত-সম্রাটকে নির্য্যাস কাপুকব বলেন,
তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি বিষয়ে অদ্যাপি অন-
ভিজ্ঞ । রামায়ণ যে দেশের আদি কাব্য,
মহাভারতের বীররসবিন্যাসিনী প্রমাদিনী
বর্ণনা যে দেশের স্বাভাবিক চিত্র, এবং
ভারবি ও মাঘ যে দেশের শেষ সময়ের

কারের মোহন-মাপুরি বিষয়ে অন্ধ ছিল, এমন কথা মনে করাও নিষ্ঠুরতা। এই যে সে দিনও রাজপুত জাতি ভারতীয় রক্ষণ-মিতে ক্রীড়া করিয়াছে, ইহাদিগের ক্রিয়া-কলাপও কি পুরাতনশাস্ত্র নিম্মত হইবে? স্বদেশীয়েরাই বরং স্বদেশবাসীসমো মোহিত হইয়া একে আর কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বিদেশীয়ের আর তাহা হয় না। বিদেশীয় কর্নেল টড রাজপুতচরিত্রের গ-রিমা ও বীরাবতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কাহার চক্ষু না অশ্রুজলে পরিপ্লুত হয়? কোন্ নিকট-সাহ হৃদয় না অভিমানে ক্ষীত ও ক্ষীত হইয়া উঠে? তিনি বলিয়াছেন,—“রাজস্থানের যেখানে যাও, সেখানেই থর্মপোলী, যে রাজ্যে প্রবিষ্ট হও, সেই রাজ্যেই লিয়নিডাস”। মনে রাখিও,—থর্মপোলী আর লিয়নিডাস সামান্য নাম নহে। ইতিহাসের আদরের ধন পুরাতন গ্রীসদেশে যদি কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ থাকে, সেই তীর্থ থর্মপোলী;—আর, স্বর্গস্থ নীরেন্দ্রসমাজে যদি কোন প্রাতঃস্মরণীয় বীর দেশানুরাগ এবং অদীনপরাক্রমের জন্ত সকলের প্রাণ-গত শ্রদ্ধা এবং প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতে অধিকারী হইয়া থাকেন, সেই বীর লিয়নিডাস। ঐতিহাসিকের পক্ষপাতশূন্য কঠোর মেথনী যে দেশের অধিকাংশ যোদ্ধৃপুরুষকেই লিয়নিডাস এবং অধিকাংশ যুদ্ধস্থলকেই থর্মপোলী বলিয়া অভিবাদন করিয়াছে, সেই দেশও কি বীরত-

শূন্য? পণ্ডিতবর ডক এবং অন্যান্য পুরা-বৃত্তলিখকগণ মহারাষ্ট্রদিগের যে বিবরণী দিয়াছেন, তাহাও ভারতের অশঙ্কর নহে। ফলতঃ রাজপুত যদি মদগর্জ সিংহ, মহারাষ্ট্রী তবে শার্দূল, এবং নেপালী ও পঞ্জাবী প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয়েরাও অনেক গুণেই ইহাদিগেরই অনুরূপ। মুসলমান সম্রাটগণ ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছেন; ভারতে বুটিন পলাকাও ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাদিগের আকস্মিক ক্রোধস্বরূপ যে ভয়ানক ভূকম্পে বুটিন-সিংহাসন টসমল হইয়াছিল, তাহাও পুনরায় ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির প্রভুপরায়ণতায় রক্ষা পাইয়াছে; এবং চীন, তাতার, আফগান ও বর্মী প্রভৃতি বিদ্রোহপর প্রতিবেশীরাও ইহাদিগেরই গর্জনধ্বনিতে বুটিনের নিকট নিশ্চক হইয়া রহিয়াছে। ভারত, চিরকালই এইরূপ বীরতার বিহারক্ষেত্র। কিন্তু তথাপি উহা পরের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য কিংবা প্ররোচিত হইল কেন?

ডগল্ডক বৃদ্ধ বলিবেন, ‘ইহা মলাটের লেখা’। মলাটে যাহা লিখিত থাকে, কিছুতেই তাহার খণ্ডন হয় না; স্বর্ষ্য চন্দ্র কক্ষভ্রম্ভ হইলেও মলাট-লিপির অন্যথা ঘটে না। আবার, পাশ্চাত্য-প্রবাদভক্ত ধর্ম্মানুরত নব্যযুবা বলিবেন, ইহা বিধাতার ‘বিশেষ বিধান’। কিন্তু এই নিয়মতন্ত্র লৌহযুগে এই উভয় সিদ্ধান্তই

অযৌক্তিক ও অবলাজনযোগ্য বলিয়া উপেক্ষণীয়, এবং আশাশূন্য ও সর্বপ্রকার উদ্যমের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধমানের পরিত্যজ্য । যাহা পাপ, যাহা প্রভারণা, যাহাতে ছলনা, বঞ্চনা, এবং নিৰ্ম্মম নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিসীমা নাই, রাজনীতির সেই কুটনীলাও কি ললাটলিপি এবং বিধাতারই ‘বিশেষবিধি’ ? আর, আঙ্গি এই ললাটলিপি এবং দৈবনির্দিষ্ট ‘বিশেষ বিধির’ অনুশাসনেই কি ভারত পৃথিবীর জাতীয়-সভার আসনচ্যুত, অস্তিত্বহীন, নিস্পন্দ ও নীরব ? যাহারা, পার্থিব পক্ষের অম্পূর্ণতা, অচিন্ত্য-প্রকৃতি বিধাতৃপুরুষে, এইরূপ লোকাচারের কলঙ্কারোপণ করেন, তাঁহারা যার পর নাই সরলমতি হইতে পারেন, কিন্তু কখনও মনুষ্যমণ্ডলীর অনিন্দিততার উপযুক্ত নহেন । তাঁহাদিগের দ্বারা লুপ্তাত্তনুসদৃশ দর্শনশাস্ত্রের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, কিন্তু কখনও স্বজাতির কোন উপকার দর্শে না ।

পক্ষান্তরে, যাহারা সংসারের নিয়মাবলী এবং সংসারের ঘটনানিচয় পাঠ করিয়াই সাংসারিক ব্যাপারের কার্যকারণ নিরূপণ এবং নীতিমূলক নির্বাচন করেন,—ঐহিক কথার মীমাংসার ঐহিক শাস্ত্রেরই সাহায্য লন, উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহাদিগের ধারণা অন্যরূপ । তাঁহারা বলেন যে, বৃটেন আর ভারতবাসীর প্রকৃতিগত প্রভেদ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে সেই প্রভেদের ক্রমিক

প্রভেদের একমাত্র কারণ । বৃটিশ জাতি যে মস্তুর সাধনা করিয়াছে, তাহার সেই মস্তুর সিদ্ধি হইয়াছে ; আর ভারতবাসীও যে মস্তুর জপনা দ্বারা ইহলোকেই লোকান্তরীয় অনন্ত নিদ্রার কামনা করিয়াছে, তাহারও সেই মস্তুর ঠিক সেই ফলই ফলিয়াছে ।

বৃটিশের মূলমন্ত্র অতৃপ্তি, অসন্তোষ ; ভারতবাসীর মূলমন্ত্র তৃপ্তি আর মগ্ন । বৃটিশ নিতাক্রিয়ামিত, নিরালস্য এবং নিদ্রাহীন ;—ভারতবাসী ক্রিয়াশূন্য, আলস্যমগ্ন এবং স্বভাবতঃ চিরনিদ্রাভিভূত । বৃটিশের সকল কার্যই সংযোগে ;—অভ্যন্তরে শত সহস্র বিরোধ থাকিলেও তাহার সংযুক্ত হইবার ক্ষমতা আছে । সুতরাং একতাতেই তাহার বল, একতাতেই তাহার বৃদ্ধি ও বৈভব, এবং একতাতেই তাহার মুখ । ভারতবাসীর সকল কার্যই বিরোগে ;—কেহ সংযোজন করিয়া দিলেও সে আপনা হইতে পুনরায় বিযুক্ত হইয়া পড়ে । সুতরাং অনৈকোই তাহার দুর্বলতা, অনৈকোই তাহার ক্ষয় ও পরাভব এবং অনৈকোই তাহার দুঃখ । বৃটিশের চক্ষু, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস ; ভারতের চক্ষু, দর্শন এবং কাব্য । ইহাও উভয়ের প্রকৃতিগত বিরোধেরই ফল । বৃটিশের ধর্ম্মনীতি ‘লাভ’ ; ভারতবাসীর ধর্ম্মনীতি ‘দান’ । বৃটিশের রাজনীতি ‘অবিশ্বাস’ ; ভারতবাসীর রাজনীতি

দ্বারা সপ্রমাণ না হইলেও শত সহস্র কার্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। বৃটিশের সকল ভিত্তির সারতত্ত্ব ‘স্বত্ব’; স্বত্বরক্ষা এবং স্বত্ববিস্তারের জন্য সে সকল মুখে জলাঞ্জলি দিয়া সকল কার্যই সম্পাদন করিতে পারে। তখন অগ্নি তাহার ভয় জগায় না, সাগর তাহাকে অবকল্ল করিয়া রাখে না, এবং স্নেহ মমতা প্রভৃতি কোন বন্ধনীই তাহাকে বন্ধন করিতে অথবা অনাহার, অনিদ্রা, অনাশ্রয় পর্যটন, কারাবাস, অপমান, ও মৃত্যুযন্ত্রণা প্রভৃতি কোন বি-ভীষিকাও প্রতিবন্ধকরূপে তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। ভারতবাসীর সকল ভিত্তির সারতত্ত্ব শান্তুরসা-ধিত নিরুপদ্রব ‘সুখ’। সে এই অকণ্টক মুখের তুলনায় কোন স্বত্বকেই স্বত্ব বলিয়া মানে না, কোন নিগ্রহকেই নিগ্রহ বলিয়া গণনায় আনে না, এবং যদি সৃষ্টি মস্তকের উপর দিয়া বিপর্যাস্ত হইয়া যায়, তথাপি সে আপনি তাহার সেই ‘সুখ’ লইয়া অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রহিলে তৎপ্রতি ফিরিয়া চায় না। এই জন্যই ব্রিটেনিয়ার মেগনাচার্টার দুর্ভেদ্য বর্ষ, এবং এই জন্যই ভারতে দণ্ডশাস্ত্রের দৃঢ় নিগড়। সার্থকক্রম্য ব্রটন এই সমস্ত হেতুতেই দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় ভূতলে স্বর্গ নির্মাণ করিয়াছে, আর ভারতবাসীও এই সমস্ত হেতুতেই ভূতলস্থ ব্যা-

পারে বীতম্পৃহ ও ক্ষমতাহীন হইয়া শা-বীরে স্বর্গবাসী হইতেছে!

ভারতের এইক্ষণ যদি কিছু আশা থাকে, সেই আশাও, বোধ হয়, এই বৃটনে! ইচ্ছার হউক, আর অনিচ্ছার হউক, মুখে হউক, আর দুঃখে হউক, বৃটনের স্বার্থেই ভারতের পুনর্জীবন-সম্ভাবনা। বৃটন দরার অনুরোধে যাহা না করিয়াছে, কর্তব্য-বুদ্ধি ও কৃতজ্ঞতার শাসনেও যাহা না করিতে পারিয়াছে, সম্ভবতঃ এইক্ষণ স্বার্থের অনুরোধে তাহা করিবে, এবং ইউরোপে আপনার শক্তি, সম্পদ, ও সম্মান বৃদ্ধির জন্যই ভারতের মৃতকম্প দেহে ধীরে ধীরে বৈদ্যুত-বল চা-লনা করিতে যত্নপর হইবে। অতএব ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়, অন্ততঃ প্রয়োজনের জন্যও বাঞ্ছনীয়, যে, এই দুইয়ের বর্তমান সম্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর জড়িত হউক, এবং উহা বিদ্বেষশূন্য ও খ-লতাবর্জিত হইয়া অতঃপর দুইয়েরই মঙ্গল সাধন করুক। আমেরিকা যেমন ইংলণ্ডের এক অক্ষয় কীর্তি, হইতে পারে এই বৃটিশ ইণ্ডিয়াও কালে বৃটনজাতির তেমন কি ততোধিক উজ্জ্বল আর এক কীর্তিস্তম্ব স্ব-রূপ দণ্ডায়মান হইবে, এবং কালে যে স-কলই সংঘটিত হইতে পারে প্রমাণের উপর পুনরায় ইহার প্রমাণ দিয়া ভবি-ষ্যবংশীয়গণকে আনন্দিত করিবে।

রামায়ণ ।

বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের মত ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—o—o—o—

আমি পূর্বে রামায়ণ হইতে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, রাম-চন্দ্র ও বাল্মীকি একসময়ে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং রামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এপর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা ঠিক বাল্মীকিতে-ও প্রযোজিত হইতে পারে । এইক্ষণে সূক্ষ্ম-রূপে বাল্মীকি ও রাম এই দুইয়ের অনাতরের সময় নিকপণ করিতে পারিলেই রামায়ণের প্রাচীনত্ব কতদূরে সীমাবদ্ধ তাহা অনায়াসে পরিষ্কৃত হইয়া উঠে । কিন্তু এইরূপ সূক্ষ্মতা সহকারে ঐদৃশ বিষয়ের সময়নিকপণ নিরতিশয় দুর্লভ ব্যাপার । এই দুর্লভ কেবল বাল্মীকির রামায়ণেই পর্য্যবসিত হয় নাই, হোমরের মহাকাব্যে-ও ইহা আবদ্ধ হইয়া সাধারণকে দিশাহারা করিয়া তুলিতেছে ।

যাহা হউক, আমি সমুদয় পৌরাণিক যুগ অতিক্রম করিয়া রামায়ণের প্রাচীনত্ব নিকপণে প্রবৃত্ত হইতেছি । সুপ্রসিদ্ধ পুরাণতত্ত্বজ্ঞ উইলসন ও বগু'কের মতে পুরাণ-সমূহ রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক সময়ে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক যুগ বিষয়ক অবা-

স্তর তর্কের অবতারণার কোনও আবশ্য-কতা দৃষ্ট হইতেছে না । এতদ্বিবন্ধন ঐক্য সময় পরিগণনা-বহির্ভূত করিয়া আমি খ্রীষ্টীয় অঙ্গের সপ্তাধিক পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ববর্তী সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সময়ে উপনীত হইতেছি । এই সময়ে রামায়ণ-বর্ণিত অতি বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষিপ্ত ভাব অনলম্বন পূর্বক একখানি মহাকাব্য প্রণীত হয় ; এই মহাকাব্যকারের নাম কালিদাস, মহাকাব্যের নাম রঘুবংশ । যদি ইহার সংক্ষিপ্ততা রামায়ণের পূর্ববর্তিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ না হয়, যদি ইহার লিপ্যকুশলতা কল্পনার ত্রীড়াময়ী কবিতা দ্বারা রামায়ণের সারসাময়ী ও স্ভাবনোভিনী কবিতার পূর্ববর্তিতা প্রমিত না হয়, তাহা হইলেও কেবল একমাত্র কালিদাসের উক্তি দ্বারা ই রামায়ণকে তৎপ্রণীত রঘুবংশের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে । কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে পূর্বতনপণ্ডিত-দিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় মহাকাব্য নিবন্ধনের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“ অথবা কৃত বাগ্‌দ্বারে বংশেহস্মিন্
পূর্বস্মৃতিভিঃ ।

মনো বজ্রসমুৎকীর্ণে স্বরসোবাস্তি
নে গতিঃ ॥ ,,

পূর্বতন পণ্ডিতগণ এই রঘুবংশীয় ই-
তিবৃত্তের কবীর্ট উদ্ঘাটন করিয়াছেন, সু-
তরাং হীরকচ্ছিন্ন মণির অভ্যন্তরে স্বত্রের
নায় ইহাতেও আমার প্রবেশ পথ লক্ষিত
হইতেছে। যে সমস্ত ভারতীয় কাব্যে রা-
মচরিত বিনৃত হইয়াছে, বাল্মীকিই তৎস-
মুদয়ের আদি ও অধিতীয় প্রত্নবন, সুতরাং
আমার বিবেচনায় কালিদাসলিখিত পূর্ব-
তন পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বাল্মীকির
নাম সহজেই নিবেশিত হইয়া উঠিতেছে।

কালিদাসের সময় পরিভাগ করিয়া
আরও উর্দ্ধে অগ্রসর হইলে আমার সমক্ষে
হিমালয়-ভূধরমালার ন্যায় অনন্তউচ্চতা-
শোভি গম্ভীর-দৃশ্য মহাকাব্য-সুস্থ পরি-
দৃষ্ট হয়। ভারতীয় কিসদন্তী ইহাকে অতি
প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ পূর্বক বেদবিভাগ-
কর্তা ব্যাসের কৃতিত্বে নিবেশিত করিয়া
পাকে। এই উত্তম কাব্যাস্ত্র মহাভারত
নামে আখ্যাত। আমি এই মহাকাব্যরূপ
বিরীট মূর্তির নিকট মস্তক অবনত করি-
তেছি। প্রাচীনই সম্বন্ধে এই মহাকাব্য
আমার মতে নিঃসন্দেহ রামায়ণ অপেক্ষা
আধুনিক। কোন সাহিত্যগ্রন্থের বিশে-
ষতঃ মহাকাব্যের প্রাচীনই নির্দ্ধারণ করিতে
হইলে তাহার প্রত্যেক ক্ষমাংশের তার-
তম্য করা বিধেয়। কাব্যের এই সমস্ত স্ব-
ক্ষমাংশ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন
হইতে পারে, কিন্তু কাব্য মধ্যে এই গুলির

সমস্ত ও শৃঙ্খলা নিধানেন স্থলবিশেষে প্রা-
চীনত্বের উত্তর বিশেষ পরিদৃষ্ট হয়।
এই জন্যই আমি মহাভারতে উদূর্ণ অংশ
সমূহের শৃঙ্খলা বিধান রামায়ণ অপেক্ষা
আধুনিক বলিতেছি। রামায়ণ যে মহা-
ভারত অপেক্ষা প্রাচীন তাহা মহাভারতের
লিখনভঙ্গীতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।
মহাভারতের একস্থানে উল্লিখিত আছে,
বাল্মীকি একসময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ কর্তৃক
অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র রাম-চরিত গান
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্বার্তীত মহা-
ভারতে বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের সং-
ক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।
রামায়ণের প্রাচীনই পরিপোষক এই প্র-
মাণবর বাতীত শ্রীকৃষ্ণ চরিতের উল্লেখ
করা যাইতে পারে। মহাভারতের কৃষ্ণ-
চরিত্র (যদিও গীত গোবিন্দ বর্ণিত কৃষ্ণ
চরিতের সহিত ইহার কোনও সামঞ্জস্য
নাই) রামায়ণ পরিদৃষ্ট হয় না, রামায়ণ
মহাভারতের পরবর্তী হইলে বাল্মীকি ক-
খনও শ্রীকৃষ্ণের দেবভাবের বিষয় উল্লেখ
করিতে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেন না।
এতদ্বারা রামায়ণের প্রাচীনই সম্যক প-
রিদৃষ্ট হইতেছে।

আমি রামায়ণের প্রাচীনই সম্বন্ধে যে
যে যুক্তির উল্লেখ করিলাম, তদ্বিকল্পে এ-
কটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে।
আমি স্বীয় মত অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশয়ে
ঐখ্যাসাধ্য উক্ত আপত্তির খণ্ডনে প্রবৃত্ত
হইতেছি। ভারতীয় কিসদন্তী মহাভার-

তকে ব্যাসের রূতি বলিয়া নির্দেশ করে । যদি এই ব্যাস বেদবিভাগকর্তা ব্যাসের সহিত অভিন্ন হইল তাহা হইলে ইহার আবির্ভাব সময় বৈদিক সময়ের মধ্যে নিবেশিত হইয়া উঠে । কোলুককের মতে বেদ খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল । সুতরাং এই সময় রামায়ণের সময় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় তদ্বাসুসন্ধারী পণ্ডিতগণ ভারতীয় ব্যাসকে একজন অনিশ্চিত পুরুষের মধ্যে পরিগণনা করিতে পরম্পর ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন । বস্তুতঃ আমার মতে ব্যাস ভারতীয় কল্পনার পোষ্যপুত্র ও বেদবিভাগের আ-রোপিতমূর্তী ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে । সুতরাং ঐদৃশ ব্যক্তি যে কোন সময়েই হউক না কেন, বেদ, মহাভারত ও পুরাণের সংগ্রহকর্তা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ।

রামায়ণের অবতারণিকার শ্লোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা রামায়ণের প্রাচীনত্ব অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হইতেছে । এই কিম্বদন্তী নির্দেশ করিয়া থাকে যে, একদা কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরকে নিদাঘশরে বিদ্ধ দেখাতে বাল্মীকির রসনা হইতে অতর্কিত ভাবে এই অনুকূভঙ্ঘনের শ্লোক বিনির্গত হয় :—

“ যা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ভ্রমগমঃ শা
শ্বতীঃ সমাঃ ।

যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কাম-
মোহিতং” ॥

রে নিষাদ তুমি যখন কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে হত্যা করিলে, তখন জগতে কখনও তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না ।

রঘুনাথ বাচস্পতি নামক জটনৈক উত্তরাঞ্চলীয় টীকাকার এই শ্লোকটি রূপকালঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত করিয়া অনারূপ অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । তদীয় মতে শ্লোকোক্ত নিষাদ শব্দ রাবণের প্রতি এবং ক্রৌঞ্চমিথুন রাম ও সীতার প্রতি আরোপিত হইয়াছে । অর্থাৎ রাবণ নির্দয় নিষাদের ন্যায় ক্রৌঞ্চমিথুন-সদৃশ সরল-দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধ রাম ও সীতার মুখ বিনষ্ট করিয়াছিল । রঘুনাথ বাচস্পতিকৃত এই ব্যাখ্যা নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃসার শূন্য ; এতদ্বিবন্ধন আমি ইহাতে কিছুমাত্র আস্থা বান্ধি না হইয়া শ্লোকের উৎপত্তি বিষয়ক কিম্বদন্তীর সম্বন্ধেই আর দুই একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । ঋগ্বেদে শ্লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা ।

“মিনীহি শ্লোকমাসো পর্জন্য ইবততনঃ ।*”
উক্ত বেদের কবিতা এই শ্লোকের অনুরূপ ছন্দেও গ্রথিত হইয়াছে :—

“ ইল্যহি সোম ইমদে ব্রহ্মা চকার বর্জিনং ।
শবিষ্ঠ বজ্রিরোজন। পৃথিব্যা নিশা
অহিং ॥ ” †

* ঋগ্বেদ সংহিতা । ৩৮ ।

† ঋগ্বেদসংহিতা । ৮ ।

এক্ষণে বাস্তবিকিই যদি সর্বাদো অনুষ্ঠত
 ক্ষুদ্রাক্ষক শ্লোক রামায়ণে নিবেশিত ক-
 রিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদে কিরূপে
 তাহা প্রবেশিত হইতে পারে? বেদ অব-
 শ্যই রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণে
 যখন বেদের বিশেষ উল্লেখ আছে, তখন
 এবিধে আর কোনও সন্দেহ জাগিতে
 পারে না। যাহা হউক এইরূপ পরম্পর
 বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ কোনও কূট
 তর্কের আশ্রয়গ্রাহী হইবার আবশ্যকতা
 নাই। বোধ হয় ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে
 যে, বেদের সগুদয় অংশ সমান প্রাচীন নয়।
 কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন এবং
 কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক
 সময়ে বিরচিত হইয়া বৈদিক গ্রন্থে স্থান
 পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং বাস্তবিক
 উদ্ভাবিত হইলে যে সমস্ত কবিতা গ্রথিত
 হইয়া বেদে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়
 রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক হওয়া অসম্ভা-
 বিত নহে। উপরে স্বগোচর হইতে অনুষ্ঠত
 ক্ষুদ্রাক্ষক যে কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা
 এই সম্ভাবনা অনুসারে রামায়ণ অপেক্ষা
 অপ্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে;
 কিন্তু আমি কেবল ঐদৃশ অনুমানমূলক স-
 ম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া অন্ধকার-
 ময় ইতিহাসপট আলোকিত করিতে অন্য-
 বিধ আলোকবর্তিকার সাহায্য প্রার্থী হ-
 ইতে বাধ্য হইতেছি।

• সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীর ইতিহাস রাজতর-
 জিনীতে রামায়ণের উল্লেখ আছে। কতি-

পন্ন বেদ-নিক্ষাত ব্রাহ্মণ কোন কারণ বি-
 শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় দা-
 মোদরকে অভিশাপ প্রদান করেন, পরি-
 শেষে প্রনাদিত হইয়া শাপ বিমোচনার্থ
 এই আদেশ করেন যে, যদি রাজা এক-
 দিনে সমগ্র রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাহা
 হইলে তাঁহার এই অভিশাপের শাস্তি
 হইবে :—

“ অশেষ মোকনৈবাহা অহা রামায়ণং
 তব।

শাপস্য শান্তির্ভবিতেতূচিরে তে প্রসা-
 দিতাঃ ॥ ” *

এক্ষণে কাশ্মীরের বংশাবলী অনুসারে
 এই দ্বিতীয় দামোদরের পরবর্তী পাঁচজন
 রাজার রাজত্বের পর তৃতীয় গোনর্দ কাশ্মী-
 রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ-
 তরঙ্গিনীর মহাপ্রজ্ঞা অনুবাদক টায়ার সা-
 হেবের গণনা অনুসারে তৃতীয় গোনর্দ
 খ্রীঃ পূঃ ১১৮২ অব্দে বর্তমান ছিলেন†।
 এক্ষণে যদি দ্বিতীয় দামোদর ও তৃতীয় গো-
 নর্দের মধ্যবর্তী পূর্বোক্ত পাঁচজন রাজার
 রাজত্বকাল গড়ে ২৪ বৎসর ঃ ধরিয়া দ্বি-
 তীয় দামোদরের আবির্ভাব সময়ে উপস্থিত
 হই, তাহা হইলে আমাদিগকে খ্রীঃ পূঃ চ-
 তুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপনীত হই-
 তে হয়। আমি এই সমস্ত সময় নিকপণ

* রাজতরঙ্গিনী। ১। ১৬১।

† টায়ার প্রকাশিত রাজতরঙ্গিনী।
 ২য় খণ্ড। ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

ঃ ঐ।

সহস্রীয় গণনা বিশিষ্ট ক্ষম ও অবশ্য বি-
 শ্বাসি বলিতে প্রস্তুত নহি, কিম্বা আমি
 গৌরব প্রয়োগী হইয়া রামায়ণের ঠিক স-
 ময় নির্দ্ধারণ করিতে প্রস্তুত হই নাই । কিন্তু
 আমি বিশ্বাস করি, উপরে রাজতরঙ্গিনী
 হইতে যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্বারা
 রামায়ণের অতি প্রাচীনত্ব বিশিষ্ট রূপে
 প্রতিপন্ন হইবে । যে সমস্ত কিসদন্তী ভা-
 রতবর্ষের ইতিহাস বিক্ষিপ্ত হইয়া রহি-
 য়াছে তৎসমুদয়ও এই প্রাচীনত্বের দৃ-
 টতা সম্পাদন করিতেছে । যেমন প্রকাণ্ড
 তরঙ্গশেখের ক্ষুদ্রদেশ হইতে বিবিধ ক্ষুদ্র
 গুলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ রামা-
 য়ণ হইতে বিবিধ কিসদন্তী উদ্ভূত হইয়া ভা-
 রতবর্ষ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে । অতি
 প্রাচীন কাল হইতেই এই রামায়ণোক্ত
 কিসদন্তীতে ভারতবর্ষের ওতপ্রোত । উদ্ভূত
 বিষয়গুলি যখন এত প্রাচীন সময় হইতে
 আপনাদের গতি প্রসারিত করিয়াছে, ত-
 খন উদ্ভব-ক্ষেত্র যে তাহা অপেক্ষা প্রা-
 চীন হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে
 পারে । যদিও রামায়ণের প্রাচীনত্ব ক্ষম-
 রূপে নিকপিত না হউক, তথাপি এই স-
 মস্ত বৃত্তি অনুসারে উহা অতি প্রাচীন কা-
 লীন অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর
 প্রায় বলিয়া নির্দেশ করিলে বোধ হয়
 আমি ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না ।
 তাত্রপর্নী ও পালীনিমন্ত সিংহল দ্বীপের
 দুটি প্রাচীন নাম । এই সংজ্ঞায় খ্রীষ্টীয়
 কতিপয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচারিত হই-

য়াছে । কিন্তু রামায়ণে এই সংজ্ঞাভয়ের
 একটিরও উল্লেখ নাই । সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-
 পতি অশোকের কএক শতাব্দী পূর্ববর্তী
 মহাবাজ বিজয়ের উপনিবেশ স্থাপন উ-
 পলক্ষে যে সিংহল* নামের উৎপত্তি হই-
 য়াছে, রামায়ণে তাহারও কোন উল্লেখ
 দৃষ্ট হয় না । সিংহল দ্বীপ রামায়ণে প্রা-
 চীন লঙ্কা নামেই উক্ত হইয়াছে । এরূপ
 পুরাতন নামের সমাবেশও রামায়ণের
 প্রাচীনত্বের একটি বলবৎ প্রমাণ ।

রামায়ণের সাধারণ ধর্ম ।

অযোধ্যাধিপতি মূর্খাবংশপ্রভব রাম-
 চন্দ্র সিংহলের দুর্কৃত ও অসভ্য অধিবাসি-
 দিগের সহিত সময়ে প্রস্তুত হইয়া তাহা-
 দিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করেন, এই বিষয়ই
 রামায়ণের সর্ব প্রধান ঘটনা । এই সাম-

* । এরূপ প্রবাদ আছে, বিজয় স্বয়ং
 সিংহের সম্ভ্রাম ছিলেন বলিয়া লঙ্কা অধি-
 কারের পর তিনি উহার ‘সিংহল’ নাম
 রাখিয়াছিলেন । এই কিসদন্তী ‘পেহ-
 লুইসি’ নামক চীন দেশীয় গ্রন্থে ও রা-
 জাবলীতে সর্বিস্তর বিস্তৃত হইয়াছে ।

অধ্যাপক লাসেনের মতে বিজয় লঙ্কা
 জয়ের পর উক্ত স্থান ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যো-
 দ্ধজাতির আবাসভূমি হইল বলিয়া ‘সিং-
 হল’ নাম অর্পণ করিয়াছিলেন । যাহা
 হউক ; এই বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার
 যে খ্রীষ্টীয় কএক শতাব্দীর পূর্বে সম্ভ-
 টিত হইয়াছিল, তদ্বিসয়ে মতবৈধ নাই ।

রিক ঘটনাই বাল্মীকির রসময়ী কবিতায়
 বিরত হইয়া রামায়ণে উপগীত হইয়াছে।
 রামচন্দ্র যে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে
 এই লোকপ্রসিদ্ধ অভিযানে প্ররত্ত হইলেন,
 তৎসমুদয় বিক্রাপর্কতশোভী প্রদেশ হ-
 ইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রামা-
 য়ণে এই সৈন্যবাহ বানর জাতিতে পরিগ-
 ণিত হইয়া বানরীকৃষ্ণিতে পরিণত হইয়াছে।
 বোধ হয়, তাহার অসভ্যপ্রকৃতি ও সংস্কৃ-
 তভাষী আর্য্যজাতির সহিত সংস্রবশূন্য
 ছিল বলিয়া বাল্মীকি তাহাদিগকে এইরূপ
 পাশবভাবে পরিকীর্তিত করিয়াছেন।
 রামচন্দ্র যে জাতির বিরুদ্ধে সমরাজ্ঞনে
 অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারাত্ত উৎপত্তি,
 সভ্যতা ও ধর্ম্মভাব বিষয়ে আর্য্যজাতি
 হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নসংস্কৃতি। কিন্তু
 হোমার যেমন ত্রোজান ভূমিতে গ্রীসদে-
 শের সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম-
 পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, রামায়ণের
 কবিও সেইরূপ বিদ্যম্যীর অধ্যুষিত লঙ্কার
 সংস্কৃতভাষী আর্য্যজাতির ব্যবহার ও ধ-
 র্ম্মানুশাসিত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত করিতে
 ক্রটি করেন নাই। এইজন্যই তদানীন্তন
 সময়ে উপগীতমান বেদের পবিত্র ধ্বনি ও
 আর্য্যজাতির অনুষ্ঠিত পবিত্র আচার পদ্ধ-
 তিতে লঙ্কা পরিপূত হইয়াছিল। রামের
 এই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ রামায়ণে রাক্ষস নামে
 অভিহিত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যসম্প্র-
 দায়ের মতে রাক্ষসগণ নিরতিশয় হিংস্র,
 ভয়ানক ও বেদানুশাসিত ক্রিয়াকলাপের

সম্পূর্ণ বিরোধী। এই জন্যই বোধ হয়,
 রামায়ণ-কবি স্বভাবসিদ্ধ যুগের বশবর্তী
 হইয়া এই আচার-ব্যবহৃত জাতিকে রাক্ষসিক
 ভাবে চিত্রিত করিয়া সাধারণের স-
 মক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ‘রাক্ষস’
 এটি ঐতিহাসিক মতোদ্রুত কোন নি-
 র্দিষ্ট সংজ্ঞা নহে। যতদূর রাক্ষস নামে
 কোন বিশেষ প্রাকৃতিক জাতির অস্তিত্ব
 স্বীকার না করিয়া পুরোক্ত কল্পনার আ-
 শ্রয়গ্রাহী হওয়াই সর্ব্বথা সম্ভব। রাজা-
 বলি নামক সিংহলদ্বীপস্থ রাজবংশের
 সময়নিরূপণ গ্রন্থে লিখিত আছে, খ্রীঃ
 পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সংস্কৃতভাষী আ-
 র্য্যসম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া কলিঙ্গপতন
 হইতে সিংহলে আগমন পূর্ব্বক তথায় উপ-
 নিবেশ ও স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করেন।
 এই উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে সিং-
 হল দ্বীপে বিগত ১৮৪৫ বৎসর হইতে
 দৈত্যাদিগের অধিবাস ছিল। এই দৈত্যগণই
 সম্ভবতঃ লঙ্কার আদিম অসভ্যজাতি, এবং
 এই আদিম অসভ্যজাতিই রামায়ণে রাক্ষস
 রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে রামায়ণের
 মহাসমর দুটি বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন প্রকৃ-
 তির ও বিভিন্নধর্ম্মপদ্ধতির সম্প্রদায়ের বিরো-
 দ্ধিশ্রমে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঐদৃশ বিপরীত
 ধর্ম্মাক্রান্ত বিষয়দ্বয়ের সমাবেশে উত্তম ও
 অধমতার চিত্র সম্যক পরিষ্কৃত হইয়াছে।
 এরূপ বিভিন্ন বর্ণের চিত্র প্রদর্শন করিয়া
 অপরের হৃদয়ে তাহার স্বভাব প্রতিফলিত
 করা প্রাচ্যপ্রতিভার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমি পূর্বে রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বীয় মত সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছি । এই প্রাচীনত্বনুক বিচারে রামায়ণ আমার নিকট খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । কিন্তু রামায়ণকে এইরূপ প্রাচীন বলিলেও উহা বর্তমান সময়ে আমাদিগের নিকট তথা-বিদ্য পুরাতন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয় নাই । কালান্তরাগত বিপ্লব পরম্পরায় ইহার অংশবিশেষও বিপ্লাবিত, প্রক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হইয়াছে । আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছি যে, রামায়ণের গৌরবদেশ উত্তর ভারতবর্ষপ্রচলিত পাঠের সহিত পরম্পর একতা দৃষ্ট হয় না । ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনের সহিত রামায়ণের পাঠও পরিবর্তিত হইয়াছে ।

ভারতীয় রামায়ণের সহিত হোমার-রচিত গ্রীক মহাকাব্যের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । উভয়ই ভুবন-মোহিনী কম্পনার কোমল করে সমান বিকশিত, উভয়ই প্রকৃতি-মূলভ কোমলতা, নবীকৃততা, জাতীর কিস্বদন্তী প্রিয়তা, সংক্ষেপতঃ আদিম অবস্থার সমুদয় কবিত্ব সম্প্রতিতে সমান পরিষ্কৃট । গ্রীক ও ভারতীয় কবিতা একরূপ সমান গুণশালিনী হইলেও জাতিগত স্বভাব ও প্রতিভার বৈপরীত্য নিবন্ধন পরম্পর বিভিন্ন ধর্মাক্রান্ত । গ্রীসের স্বভাব ও প্রতিভার ফল—মানবের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য, ভারতের স্বভাব ও

প্রতিভার ফল—মানবের সহিত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বীতা । একদিকে এই সামঞ্জস্য আদিম গ্রীক মহাকাব্যে, অন্যদিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা আদিম ভারতীয় মহাকাব্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ।

রামায়ণের কবিতা সাধারণতঃ অতি গভীর, অতি মর্ম্মস্পর্শিনী ও অতি গৌরবে বিভূষিত হইলেও বর্ণনাবহুল ও অতি বিস্তৃত । ইহা অসীমতায় বিলীন হইয়াছে । হোমারের কবিতা অতি উদগ্র ও অতি সজীব হইলেও গাভীর্বা ও কমণীয়তায় সংযত । হোমারে প্রত্যেক মানবচরিত্র বিশিষ্ট স্বক্ষ্মরূপে চিত্রিত হইয়াছে—তাহার ক্ষমতা ও শক্তি অতি সজীবতা সহকারে প্রতিফলিত হইয়াছে । বাল্লীকিতে এই মানব চরিত্র প্রকৃতির বিরুদ্ধে নীলমান হইয়া সমুদয় বিষয়ে যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । তাহার কার্য, শক্তি কিছুতেই পরিষ্কৃট হইয়া অপরের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে না । অধিক কি, রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র যদিও গাভীর্বা ও উদার্য্যে অটল, তথাপি তাহার চরিত্র যেন স্থল-বিশেষে প্রকৃতির বিরুদ্ধে অভ্রাঙ্খিত হইয়া মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে ।

রামায়ণের কবিতা অনন্ত সময়ের অনন্ত কার্যের অনন্ত কিস্বদন্তী অনন্ত ভাব ও অনন্ত কথাতে পরিপূর্ণা, হোমারের কবিতা সঙ্কীর্ণ বিষয়ের সঙ্কীর্ণ সীমায় সংযত । যদিও ইলিয়াদ অপেক্ষা ওদিসির দৃশ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করা হইয়াছে,

তথাপি ভারতীয় মহাকাব্যের তুলনায় উহা সঙ্গীর্ণতার সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভাষা বিষয়ে গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্য উভয়ই সরল, স্বাভাবিক ও কষ্টকল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু বাল্মীকির ভাষাসঙ্গীর্ণতা রীতি হোমার অপেক্ষা অটল ও সুব্যবস্থিত। বাহা হটক সংক্ষেপতঃ রামায়ণ ও হোমারের মহাকাব্য দুটি বিভিন্ন জাতির প্রতিভাশালী কবির দুটি

অতি মহৎ কীর্তিস্তম্ভ। শেষটি প্রকৃতির সহিত অতি সমঞ্জসীভূত ও শিল্পকুশল। কল্পনার তুলিকায় অতিচিত্রিত; প্রথমটি প্রতিভার উচ্চভাবে অতি বিস্তৃত ও অতি গৌরবান্বিত। শেষটি রণস্থলবর্ত্তিনী সংহার মূর্ত্তির ন্যায় বিরাট ভাবে অবস্থান করিতেছে, প্রথমটি নিদ্রীহন্যভাবে সংযত-মনা তপস্বীশ্রেষ্ঠের ন্যায় পবিত্র ভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

ক্রমশঃ। র—

রণরঘুর প্রলাপ।

২

শেষ শব্দা ;—জ্ঞান ও মোহ।

বসন্তকুমারের এমন অবস্থা! এই তিন দিন মাত্র হইল, তাহাকে দেখিয়া আসি-
রাছি, তাহার সঙ্গে সুরাসুর, সুর-সুরা,
বিদ্যা-অবিদ্যা, ক্ষোভ-আশা, প্ররক্তি-ন-
রক্তি, আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি, বিলাস-ভিক্ষা প্র-
ভৃতি নানা প্রসঙ্গের আলাপ করিয়া আ-
সিরাছি;—আর আজি তাহার এই দশা! সে দিন আমোদ প্রমোদে কালকে ফাঁকি
দিয়াছিলাম, অদ্য কাল আমাকে ফাঁকি
দিয়াছে। বুঝি আর বসন্তকুমারের নিকট
বিদায় লওয়াও হয় না, বুঝি বসন্ত এজন্মের
মত 'আসি' বলিয়াও আমার প্রণয়ের প-
রিশোধ দিতে, প্রাণের এ নিদাক্ষণ স্থালা

নিবারণ করিতে পারিবে না, পারিবে না!
বিধাতঃ তোমার মনে কি ইহাই আছে?

বিধাতঃ! আমি জ্ঞানি না, লোকে বলে
তুমি নিষ্কর; তাই বলিয়া কি তুমি আমার
সুখ দুঃখ বুঝিবে না? এই বিভীষিকা-
ময় সংসারে আমাকে একক করিতে তুমি
বাধিত হইবে না? বিষম সংসারাবর্ত্তে
এই ভূণকণাকে বিঘূর্ণ্যমান দেখিয়া পরি-
তৃপ্ত হইবে? অলক্ষ্যযোগ্য এই রণরঘুকে
তোমার ক্রীড়াকন্দুক করিয়া বালকতা
করিলে? তাহা হইলে তোমার যে তট-
হাই বিকার? নিগুণে যে গুণাশ্রয় হইকে!
গুণধাম, তোমার দয়াময় নাম যে লোপ

পাইবে ! প্রভো ! আত্মবিস্মৃত হইও না ;
বিকার প্রাপ্ত হইও না, মারাগুণকে আ-
শ্রয় দিও না, আমাকে পর করিও না ।
পরাম্পর ! আমি আপন বলিতে পারি,
এমন আমার একমাত্র আছে, সেই—বসন্ত-
কুমারকে আশ্রয় করিও না ! যে বীজ
তোমারই রোপিত, তুমিই তাহাকে উৎ-
পাটিত করিও না । হায় ! বিধাতা অতী-
ন্দ্রিয়, আমার কথা তিনি বুঝিবেন না,
আমি তাঁহাকে বুঝাইতে পারিব না । ন-
হিলে, বসন্তকুমারের আজি এমন দশা
হয় ?

বসন্ত ! কেন তুমি কুটীরবাসী হও
নাই ? তোমার ত্রিতল হর্ম্যের সোপান-
শ্রেণী আমাকে যুগপরিমের পথের ব্যব-
ধানে রাখিতেছে ; এখন মূর্ত্তে যুগ, এ
বিলম্বের বিড়ম্বনা কি সহ্য যায় ? তুমি
দাস দাসী পরিহৃত কেন ? এখন কি দৃষ্টি-
পথে অবরোধ সহ্য করিতে পারি ? আর
এমন সময়েও এ উৎকৃষ্ট প্রাণকে অধিক-
তর উদ্ভ্রান্ত করিয়া বসন্তকুমারকে দেখিতে
দিবে না, তুমি কে ?

তুমি কে ? সুরসুন্দরী বিনিমিত রূপ ;
কিন্তু রূপে আভা নাই, তুমি কে ? বিদ্বাৎ-
খণিলোচন, কিন্তু লোচনে জ্যোতিঃ নাই,
কটাক্ষ নাই ; আনন্দধাম ওষ্ঠাধর, কিন্তু
যন্ত্রণা বিকৃষিত, তুমি কে ? পাষণমূর্ত্তী,
কিন্তু অবিরল নীরব অশ্রুপ্লাবিতা, তুমি
কে ? চপলা, কিন্তু স্পন্দন রহিতা, তুমি
কে ? মৌনব্রতধারিণী বাগ্‌দেবী, তুমি

কে ? কণ্ঠশয্যা হইতে অন্তরে কিন্তু
শয্যাশায়ীকে হৃদয়ের হৃদয়ে রাখিয়া অ-
নিমেষে নিরীক্ষণ করিতেছ, তুমি কে ?
কুসুম কুমারী ! অবোধ বালিকে ! ক-
রতলে এমন করিয়া ললাটগণ্ড স্থাপন
করিয়া বসিতে হয় না, উহা যে অশুভ ল-
ক্ষণ । ছি ছি ! এ সুন্দর অলঙ্কার-নিম্য-
ন্দন করতল ভূমিতে পাতিয়া থাকিতে হয়
না । ইহা যে অমঙ্গল চিহ্ন । তুমি যাও,
গৃহান্তরে যাও, কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাক
গিয়া । তুমি আদরের সামগ্রী, মাথার
মণি, সুরের সঙ্গিনী, এ তোমার স্থান নয়,
আজি তোমার দিন নয় । তুমি বিলাসের
বস্তু, এই দীপ-নির্ব্বাণ সময়ে এখানে কেন ?
বাছ্যভাণ্ডের ছলছলি করিয়া গৃহলক্ষ্মী
বলিয়া সজ্জা সমারোহে তুমি আনীত,
এখন তুমি এখানে কেন ?

এসকল কথা আমার মনে উদ্ভিত হ-
ইলে কি হইবে ? কুসুম কুমারী এস্থান হ-
ইতে সরিবে না । বজ্রের সর্ব্বস্বান্ত হইবে,
সতী থাকিবেই ; বজ্রের শ্মশানের নদ্রে
এই সুষমা চিরজড়িতা । আমার বসন্ত,
বসন্তের কুসুম—এবিচিত্র মিলন, সকলে
ইহার গূঢ়তা অনুভব করিতে পারিবে না ।

বসন্ত আমার কেহ নয় ; এই সংসারে
কেহইত কাহারও নয় । তথাপি বসন্ত
আমার সর্ব্বশ্ব, কারণ বসন্তকে আমি
ভাল বাসি । দাদা একদিন জিজ্ঞাসা ক-
রিয়াছিলেন—বসন্তকুমারের সহিত আ-
মার প্রণয় কেন ?—বধূকে জিজ্ঞাসা ক-

রিয়াছিলেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া
শুনিয়াছিলাম, তখন কিছু বলি নাই;
কিন্তু বলিতে হইলে বলিতাম—কল-
বাহিনী গঙ্গা সাগরে মিশার কেন?
এই সংসাররূপ স্বার্থমকভূমে প্রেমশল্প
সমাচ্ছাদিত একটু নিরামস্থান থাকিলে
হানি কি? আমি বসন্তকুমারকে ভাল বা-
সিলে ক্ষতি কি? বধু ভাবেন, বলেনও যে
ক্ষতি আছে। তবে আমি করিব কি?
দাদা বলেন, আমার বিবাহ করা উচিত।
এ সকল কথাই অন্তরাল হইতে শুনি-
য়াছি।

অন্তরালে পরের মন্ত্রণা শুনিতে আ-
মার ন্যায়গুরু একদা নিষেধ করিয়া
ছিলেন। কিন্তু আমি এ নিষেধের তাৎ-
পর্য্য বুঝি না। স্বার্থ, আর কপটতা,
আর লোকলজ্জা বাহ্যজগতের নির্মাণো-
পাদান—কয় জনে মুখ ফুটিয়া মনের
কথা বলে? তবে কি অন্তর্জগতের পরি-
চয় লইতে হইবে না? তবে কি সংসার-
বিষয়ে পাদপরিমাণ জানেই সমুচ্চ হ-
ইতে হইবে? যেখানে বিশ্বাস, সেই খা-
নেই সর্বনাশ; যেখানে প্রণয়, সেই খা-
নেই মিত্রদ্রোহ; যেখানে শান্তি সেই খা-
নেই বিপ্লব; যেখানে দেবতা, সেই খা-
নেই অমুর; এই সকল তত্ত্ব কালক্রমে
ভাসিয়া যাইবে, আর আমি তীরে বসিয়া
থাকিব, অথচ দেখিব না? আমি তাহা
পারিব না; অন্তরালে থাকিয়া শুণ্ড কথা
শুনিয়াছি, ষত দিন বাঁচিব, স্রযোগ পাই-

লেই আমার শনিব। সংসারকে চিন্তিতেই
হইবে, কাব্য পাঠ করিতেই হইবে।

আমি বসন্তকুমারকে ভাল বাসি, বধু
বলেন ইহাতে ক্ষতি আছে, দাদা বলেন,
আমার বিবাহ করা উচিত। কি প্রকারে
এই উপপত্তি হয়, তাহা আমি বুঝিতে
পারি না; এই সকল কথায় কি কার্য্য-
কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি দেখিতে
পাই না। আমার বিবাহ! চমৎকার কথা!
পণ্ডিতগণের বিচারে শুনিয়াছি, বিবাহ না
করিলে দুইটি দোষ ঘটে, প্রথম, বংশলোপ
হয়; দ্বিতীয়, চরিত্র নষ্ট হয়। আমার
বংশলোপ জন্য শঙ্কা নাই; আমি অর্থা-
কূলকলঙ্ক, কুকুরাধম বঙ্গসন্তান, পরপ্রসাদ
প্রত্যাশায় অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তকের প-
দলেহন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া
থাকি; আমার এবংশ কি থাকিলেও রা-
খিতে আছে?

তবে, চরিত্র নষ্ট হইবার কথা;—
আমি দাসী-পুত্রের দাস, আমার আবার
চরিত্র কোথায় যে নষ্ট হইবে? যাহা কিছু
সৎ, যাহা কিছু মহৎ, যাহাতে সার
আছে, যাহাতে গৌরব আছে, সে সকলই
বিসর্জন দিয়া নীচতা, ভীকতা, প্রবঞ্চনাকে
জীবনের সর্বস্ব করিয়াছি, আমার কি
আছে যে নষ্ট হইবে? আমার বলিতে
কেবল আমি আছি; আমি আছি বলি-
য়াই, বঙ্গমাতার এ দুর্গতি; নহিলে, বঙ্গ-
ভূমি কি এই স্বাবরদশাপন্ন হইয়া, পূর্বতন
অপূর্ব রূপগরিমার রাশি কলঙ্ক-সাগরে

ডুবায়ে। আমার মা বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়ায় ? আমারই জন্য মাতার এত বিড়-ঘনা ; এখন আমার ধংশ হইলেই মাতার দুঃখাবসান হয় । বস্তুতঃ আমার নিরক্ষণ হওয়াই উচিত ; আমার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা আকাশকুসুম তুল্য অলীক ।

আবার গুরুভাবনা পরিত্যাগ করিয়া লম্বু দৃষ্টিতেও কি বিবাহের কর্তব্যতা বিষয়ে কেহ (দাদা ও বধূচাকুরাণী ব্যতীত) পরামর্শ দিতে পারেন ? বঙ্গক্ষেত্রে আজি কালি কএটি কুমুমকুমারী পাইবে ? রক্ষা জননী প্রত্যয়ে উঠিয়া প্রাজ্ঞ-পরিকরণ-বধি পাক-পরিবেশন সম্পন্ন করিয়া পুত্র-বধূকে আহ্বারার্থ আহ্বান করিবেন, আর বধুর কাককার্য বা কাবাপাঠের বাঘাত হইল বলিয়া তিরস্কার সহিবেন ; পুরা গুরু স্বামি সহধর্মিণীসমীপে ধর্মোপদেশের পাঠ লইবেন, আর প্রণয়চ্ছলে ভক্তি প্রদর্শন জন্য প্রণয়িনীর পাদুকাধূলি মার্জন করিবেন, এদৃশ্য দেখিতে যাহার নিতান্ত সাধ সে বিবাহ করুক । আমি লক্ষ্মী-ছাড়া, আমার এ গৃহলক্ষ্মীতে কাজ নাই। দেবতা আমাকে বিবাহ হইতে রক্ষা করুন !

অতএব আমি বিবাহ করিব না । দাদার সম্মানরক্ষা আশা হইতে হইল না ; বধুর অবাধ্য আমাকে বাধ্য হইয়া, দায়ে পড়িয়া হইতে হইল । শুদ্ধ বিবাহ করিব না, তাহা নয় ; বসন্তকুমারকে ছাড়িব না । আজি হয় ত শেষ দেখা, আজি কি বধূর কথা শুনিয়া, দাদার কথা মানিয়া বসন্ত-

কুমারকে দেখিতে না আসিয়া থাকিতে পারিতাম ? থাকিতে পারিলে আসিব কেন ?

সুরাপানে যদি পাপ হয়, তবে আমার বসন্ত পাপী । আজি বসন্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ; আজি কি কাহারও নিষেধ পালন করিয়া, এখানে না আসা আমার সম্ভবে ? বসন্ত দেবতা নয়, মানুষ ; সুতরাং তাহার সহস্র দোষ থাকিতে পারে, তাই বলিয়া আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ।

আজি যে দৃশ্য দেখিলাম, চিরদিন তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে ; গুরু-জনের আচ্ছাদন করিয়া যে প্রত্যাবার-গ্রস্ত হইয়াছি, এখানে তদধিক জ্ঞানলাভ করিলাম । সংসারের বৈচিত্র্য এই স্থলে আজি একত্র দেখিলাম । স্বর্গে, নরকে, বিলাসভবনে, শ্মশানে, জ্ঞানে, মোহে মিলিলে যাহা হয়, তাহা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলাম । বসন্ত-কুমুমের আজিকার এই ভাবের সমাবেশ চূড়ান্ত কাব্য !

বসন্তকে দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু কথা কহিবার চেষ্টা করি নাই । বসন্ত বড়ই কাতর ; কথা কহিতে কি পারিবে ? সকলেই নীরব, সেই জন্য আমি বসন্তকুমারের নাম ধরিয়া এখন পর্য্যন্ত—এই কি জনমের শোধ ?—সম্বোধন করিতেও সাহস পাই নাই । বসন্ত কি পার্শ্বপরিবর্তন করিতে পারিবে ? বসন্ত কি আমার পানে চাহিয়া দেখিতে পারিবে ? দেখিলে কি

বসন্ত আজি, আমাকে চিনিতে পারিবে ?

কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমাকেও কেহ কোনও কথা বলিল না ; অপেক্ষা করিয়াই রহিলাম। ক্রমে গৃহ পরিষ্কৃত হইল, কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, একে একে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে সকলেই চলিয়া গেল। সকলেই ?—না। আমি রহিলাম, বসন্ত অবশ্যই রহিল, আর রহিল কুসুমকুমারী।

চিকিৎসক ঔষধ রাখিয়া গিয়াছিল, পানপাত্রে ঔষধের মাত্রা পরিমাণ জন্য কুসুমকুমারী গবাংকদ্বার উদঘাটিত করিল, মন্দীভূত রবিকিরণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বসন্তের স্নান পাণ্ডুর মুখে পড়িল, বসন্ত মুখ ফিরাইল ;—সে মুখ দেখিয়া আমিই তাহাকে ভাল মত চিনিতে পারিলাম না, বসন্ত আমাকে চিনিবে কি ? কুসুমকুমারী ঔষধ সেবন করাইল, পুনরপি পূর্বস্থানে গিয়া পূর্ববৎ বসিয়া রহিল ; আমি যেখানকার সেইখানেই।

আরও একটু বেলা গেল। বসন্ত মৃদুজড়িতস্বরে কথা কহিল ; আমি উৎকর্ষ হইলাম। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বসন্ত কথা কহিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না। একবার কুসুমকুমারীর মুখ পানে চাহিলাম, তাহার অশ্রুবগা ছিণ্ডণিত হইল, কিন্তু মুখে শব্দ নাই।

বসন্ত বলিতে লাগিল :—

“আজিকার সম্বাদ কি ? প্রুশিয়ার এ বীরপণা সহিবে না, রহিবে না। নাপোলি-

রন্ বন্দী ? ফ্রান্সের অধঃপতন ? দেখিব না। দেখিতে হইবে না। পতন ও উত্থান, পর্যায় মাত্র। দিনে হউক, মাসে হউক, বৎসরে হউক, যুগে হউক—কালবত্রে অদৃষ্টচক্র ঘুরিবেই ঘুরিবে, স্থির রহিবে না। * * * * *

কি বলিলে ? আমার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে ? আমাকে চরমেচ্ছাপত্র প্রকাশ করিতে হইবে ? এমন দিন কি হইবে ? আমার শেব ? আমি ফুরাইলে আমার নাম ফুরাইবে ত ! যদি না ফুরায়। * * * পিপাসা। মা ! ”

আমি অভিভূত হইয়াছিলাম, কুসুমকুমারী কখন উঠিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই। নিকটস্থ একটি পাত্রে কি ছিল, ঔষধ বিবেচনায় বসন্তের মুখে ঢালিয়া দিলাম। বসন্তের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বসন্ত উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, পারিল না। বুঝিলাম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছি, কোন্ বিষ দিয়াছি !

বসন্ত উগ্র হইয়া উঠিল, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—

“আমি ক্লতশূ নহি। যে হস্তে অমৃত পাইরাছি, সে হস্তে বিষ লইতে কুণ্ঠিত হই না। আমি কারাগারে, যিনি দয়া করিয়া বা নিষ্ঠুরতা প্রকাশিয়া এই কারাগারেব বিভীষিকা আমাকে দেখাইতে জানালোকের সম্পাত করিয়াছেন, তিনি এই যজ্ঞণা ভুলিবার যে উপকরণ দেন, তাহা অবশ্য গ্রাহ্য, তাই আমি

গ্রহণ করিয়াছি । বীধা, সাহস, ক্ষমা, দয়া কাহাকে বলে জানি, আমার প্র-
রোগ শক্তি নাই, তাহা জানি । তবে কি
বন্ধনে মরিব ; তাই এই অমিয় সাগরে
ডুবিয়াছি । সুরেশ্বরী ভগবতি ! দুর্গতি না-
শিনি ! কুপ্রবৃত্তি দনুজ দলনি ! যেদিন কি-
ন্নরীর চরণকিঙ্কিনী তালে তালে রিমি রিমি
ঝিমি করিল, যে দিন তুমি আমার ম-
স্তকে অধিষ্ঠিতা হইয়া সেই মস্তকে সেই ম-
ধুর নিকণ তুলিলে, তুলিয়া এ মস্তকে
সে চরণে প্রভেদ নাই এই দিব্যজ্ঞান আ-
মার দিলে, সেই দিনে তোমার মাহাত্ম্য
বুঝিলাম । দেবি ! তুমি দয়া করিয়া আ-
মার ভ্রমভঞ্জন করিলে । শিখিলাম যে
তুমিই আমার গতি । মা ! আমি অবোধ
সন্তান ; কি দিয়া তোমার পূজা করিব ?
অভিমানপূর্ণ মন ছিল, পরে কাড়িয়া
লইয়াছে ; অবশিষ্ট ভালবাসা ছিল,
অপাত্রে রণরথকে তাহা পূর্বেই দিয়া ফে-
লিয়াছি ”—আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে
পারিলাম না—“ দেহ আছে ; তাহা কি
হইবে ? এ যন্ত্রণা হইতে আমার কি উদ্ধার
করিবে ? পাপদেহের তোষামোদ করিতেই
প্রাণ ক্ষরিত হইয়া গেল, হইতেছে । এখনও
যদি দেহ লও তবে দিতে পারি । কালে
বুঝি ইহাও থাকিবে না । তখন কি দিব

মা ? মুক্তিদাত্রি সুরে ! এখন বল দাও,
লৌহ সেবন করাও, একবার প্রাণ ভরিয়া
তোমার নাম গাইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করি ।
ভারতমাতা আমার বিমাতা-; তোমার
ক্রোড়ে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ দুঃখ ভুলি—
এজ্ঞের মত ভুলাও মা ! যেখানে ইচ্ছা
লইয়া চল, আর তিষ্ঠিতে পারি না মা ! *
* * * * বিষয় বিভবের ব্য-
বস্থা করিতে হইবে ? কি বিষয় ? কাহার
বিষয় ? কি ব্যবস্থা ? কে করিবে ? এ
দেখ ! ঐন্দ্রজালিক দেখ । পৃথিবী সু-
রিয়া গেল, দিবাবসান হইল ; আর ব্যব-
স্থার প্রয়োজন নাই । মুকূট, পদতলে ;
চতুর্দিকে প্রাচীর ; আত্মপর সমান জ্ঞান ।
এ ব্রহ্মজ্ঞান দিতেও তুমি, হরিতেও তুমি ।
আর কেন ? ”

অবস্থা ভয়ঙ্কর ; আমার ভাবনা হইল ।
এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসীসহ বসন্তের
মাতা সেইখানে আসিলেন, আসিয়াই মু-
চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীবৎ পড়িলেন ।
সন্তানের অমঙ্গল সমাচার পাইয়া কাশী-
ধাম হইতে পথে পথে এই মাত্র আসিয়া
এই দেখিলেন । বিবম বিভাট । আমি আর
থাকিতে পারিলাম না, চলিয়া আসি-
লাম ।

শ্রীরণরথ গোস্বামী ।

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ)।

পঞ্চমপ্রস্তাব।

পার্কী, লক্ষ্মী, সরস্বতী।
হিরি, ডিমিটারি, এথিনি।

আমরা প্রথমতঃ ভুবনেশ্বরী পার্কীর
সহিত গ্রীসের সুরেশ্বরী হিরির তুলনা
করিব।

হিরির আরতন দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল গোব ;
তিনি পরমসুন্দরী। তাঁহার মুখশ্রী গ-
স্তীর ভাবব্যঞ্জক এবং গর্ভদ্যোতক। এ-
কটি প্রিয় ময়ূরশিশু তাঁহার অঙ্কে শয়ন
করিয়া আছে। দেবী অতি সাবধানে স্ব-
র্গোজ্জ্বল কেশগুচ্ছ সরাইয়া আপন বদন-
সৌন্দর্য বিকীর্ণ করিতেছেন। এক স্থান
হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইলে
ময়ূরগণ অনন্ত বায়ুমাগরে সন্তরণ ক-
রিয়া তাঁহার শরট চালাইতেছে। তাঁ-
হার একপার্শ্বে আইরিস্ (রামধনু), ও
অন্য পার্শ্বে আরি (পল্লী) গণ সুসজ্জিত
হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। অ-
ন্যান্য দেবতা সকলের ন্যায় হিরিরও দুই
হস্ত, দুই পদ ; আকৃতি মনুষ্যের অনুরূপ।

সুরেশ্বরী পার্কীর একস্থানে বসিয়া
থাকামাত্র কার্য্য নয়। তাঁহার হস্তে ত্রি-

ভুবনের ভার ন্যস্ত ! তিনি শক্তি, সূতরাং
সমস্ত বিশ্বের স্থিতি বিনাশ তাঁহারই হস্তে।
শক্তির অনন্ত শক্তি রণরঙ্গিনী বেশে জগ-
তের বিপদ বিনাশ করিতেছে, ভুবনেশ্বরী
বেশে জগতে রাজত্ব করিতেছে, আবার
স্নেহময়ী জননী হইয়া সন্তানের লালন পা-
লন করিতেছে। নগেন্দ্রনন্দিনীকে তজ্জগৎই
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিধারণ করিতে হইয়াছে।
অমরমর্দিনী ভবানী ' দশবাহু সমন্বিতা',
এই বেশে তিনি এথিনির সহিত উপমেরা।

দুর্গার এই মূর্তি কেবল ভয়ঙ্করী নয়,
আবার পরম রমণীয়া। যদিও তিনি 'জ-
টাঙ্গুট সমায়ুক্তা, অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা'
তথাপি আবার ভক্তের নিকট তখনই,
'পূর্বেন্দু সদৃশাননা' 'অতসী পুষ্পব-
র্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা' 'নবযৌবন-
সম্পন্ন। সর্বাভরণভূষিতা' 'প্রসন্নবদনা'
দেবী সর্বকামফলপ্রদা'।

আপন সন্তানগণের বিপন্নিসারগার্থ
পার্কী দশবাহু ধারণ করিয়াছেন, 'ত্রি-

শূল, খজা, চক্রাদি ' অস্ত্রের সাহায্যে অসুরগণের বিনাশ সাধন করিতেছেন। বিপদের শীঘ্র দূরীকরণ জন্য ইচ্ছাময়ী, অনেক-হস্ত প্রসারিত করিয়া একদা অনেক শত্রু সংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ভক্তের নিকট কিছুই ভয়ঙ্কর নয়, সকলই মনোহর। ভক্ত দূর হইতে দেখিতেছে মূর্তিমতী ক-কণাময়ী তাহার জন্য সংগ্রামপ্ররক্তা। তাহার জন্যে একহস্তে বর ও একহস্তে অ-ভয় রহিয়াছে, ত্রিনয়নীর একটি নয়ন মধুর হাসি বিকাশ করিয়াই যেন ভক্তের প্রতি ন্যস্ত রহিয়াছে। সেই পূর্ণেন্দু সদৃশ আ-নন, সেই অতমী কুমুদিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, তাহার চিত্তে সন্তোষ প্রদান পূর্বক তা-হাকে উৎসাহিত করিতেছে।

সমরাবসানে পার্শ্বতী আবার দ্বি-ভূজা ভুবনমোহিনী, উপাসক তখন :—

অশোকনির্ভংসিত পদ্মরাগং
আক্কেহেমদ্যুতি কণিকারং
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তি ।

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব—

বাসোবসানা তরুণার্করাগং
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনত্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লভেব ।

শুগন্ধিনিধাস বিরুদ্ধ তৃষ্ণং

বিশ্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেকং

প্রতিফলং সংভ্রম লোলদৃষ্টি-

লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী—

সেই পার্শ্বতীকে মনোহর শরীরে দে-

খিতেছে। পার্শ্বতী এক্ষণে ষোড়শী, রূপবতী, যৌবনমোপানারুঢ়া। কখনও বা তিনি জীবগণের মঙ্গলার্থ ভিক্ষার্থিনী ; কখনও জগৎপতি পতিসহ শ্মশানবাসিনী, জগতের কার্য্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির দিয়য় অথবা অভ্যুচ্চ পরমার্থতত্ত্ব স্বকান্ত-মুখে শ্রবণে যত্নবতী। আবার প্র-য়োজন বিশেষে কালীমূর্ত্তি প্রভৃতিও পরি-গ্রহ করেন।

পার্শ্বতীতে গৌরব আছে, কিন্তু সে গৌরব হিরির ন্যায় বাহ্যিক আকারে প্র-কাশ হইয়া দান্তিকতায় পরিণত হয় নাই। জননী আপন গান্ধীর্ধ্যমিশ্র গৌরবসহ আ-পন সন্তান সমীপে যেমন হাস্যময়ী, স্নেহ-ময়ী, মাতা শৈলসূতাও তাহাই। তাঁহাতে কোনরূপ বিলানচিহ্ন নাই, হিরিতেও নাই। কিন্তু হিরির ক্রোধ, অহংকার, ঈর্ষা ও কপ-টতা আছে। পার্শ্বতীতে এসমস্ত দোষ সম্ভবে না। তিনি অকারণ ক্রোধবশব-র্ত্তিনী হইয়া হিরির ন্যায় ট্রুগনগরীর বি-নাশ সাধন করেন নাই, বিষাক্ত বসনে বা কপট মন্ত্রণায় সপত্নীসংহারও করেন নাই। রূপগর্বে গর্জিতা হইয়া সামান্য মানবকে রূপবতীত্বের রূপনির্ণয়মধ্যস্থও মান্য ক-রেন নাই।

হিরিও সতী, সতীও সতী। এক্ষণে সতীতে সতীতে প্রভেদ আছে কিনা এক-বার দেখা যাউক। হিরি স্বামী ভিন্ন অ-ন্যের প্রণয় ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ে স্থান দান করেন নাই, এজন্য গ্রীসে তিনি প্র-

শংসনৌয়া। আটিমিস্ (চন্দ্র) চিরকৌমার্য-
ব্রতাবলম্বিনী বলিয়া সতী নামে অভিহিতা।
পতিগতপ্রাণা পার্শ্বতীও ভারতে সতী
নামে প্রসিদ্ধা। এক্ষণে দেখিতে হইবে
কে শ্রেষ্ঠ।

আটিমিসের সতীত্বের সহিত হিরি ও
দুর্গার সতীত্ব উপায়ের নয়। কারণ এ স-
তীত্ব ভিন্ন প্রকৃতির। স্বামী ও স্ত্রীর প্রণয়ে
ঐক্যমুতা ও সুখাবস্থান সতীত্বের সুফল।
অপ্রিয়কার্যকারী গুণহীন স্বামীর প্রতিও
যে স্ত্রী প্রিয়বাদিনী ও তদগতপ্রাণা, বা-
স্তবিক তাহাকেই সতী বলা যাইতে পারে।
হিরি, যিসের আচরণে সর্বদাই অস-
ন্তোষ। তাহাকে পারজয়িকতা জন্য অ-
পমানিত ও লাঞ্চিত করিতে হিরি এত
কৌশল ও এত পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন
যে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায়
না। এমন কি, একদা নিতান্ত সামান্য
নরস্ত্রীর ন্যায়, একান্ত ইতরভাবা পর-
স্পৃহাবন্তী গোষিতার ন্যায় আপন কন্যা ও
দেবরের সহিত পরামর্শ করিয়া যিসকে
বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! এই কি
সতীত্বের লক্ষণ! এরূপ যে স্থলে সুরেশ্ব-
রীর পতিভক্তি সে স্থলে নৈতিকবল কত
প্রবল পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই জ-
ন্যাই কবি এগামেম্নন, ইডিপস্ প্রভৃতির
পরিবারের দুর্গতি বর্ণনার কৃতকার্য। এই
জন্যই হেলেন গ্রীসের সর্বপ্রধান মহা-
কাব্যের নায়িকা।

আবার পার্শ্বতীকে দেখ। সাধারণ

লোকের মধ্যে এইরূপ গম্পা প্রচলিত আছে
যে শিব ভাস্ক ধৃত্যায় সর্বদা উন্মত্ত ;
ভিক্ষাজীবী দেবের গৃহে খাদ্য বস্তুর অ-
ভাব ; সন্তানগণ কাঁদিতেছে। পার্শ্বতী
তাহাতেও স্বামীপ্রতি অপ্রিয়বাদিনী বা
অপ্রিয়কারী নয়, সর্বদা পতিসেবার
ব্রতা ; পতির জন্য সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে-
ছেন ; ঘৃণা নাই, আলস্য নাই। মায়াক্রমে
শিব জরাগ্রস্ত, সকলে ঘৃণা করে ; কিন্তু
পার্শ্বতীর পতিভক্তি তখনও অবিচলিত।
তিনি পতিসহ শয়ানে, পতিসহ ভিক্ষা-
খিনী, পতিসহ জগতের হিতাকাঙ্ক্ষিনী,
আবার পতিপাশে ত্রিভুবনেশ্বরী। তাঁহার
রাজত্ব জাকজমক নাই। হিরির ন্যায় তাঁ-
হার শিরে হৈমকিরীট মণি মাগিকাদিতে
সুশোভিত হইয়া ‘সময় ও গুণরশ্মির’ সহিত
উজ্জ্বলতা প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা করেন।
তাঁহার নিকট পার্থিব স্বর্ণাদি নিতান্ত অ-
কিঞ্চিৎকর। ঐশ্বর্য্য বিলাসীর জন্য, অ-
প্রিত জীবের জন্য। ঐশ্বরের ঐশ্বর্য্য কি ?

হিরির রূপে তুলনা নাই, রূপে অগ্নি
জ্বলে ; প্রভাবেরও তুলনা নাই, ত্রিদিবেশ
যিস্ও তাঁহার ভয়ে কম্পিত ; আবার
ক্রোধেরও তুলনা নাই। সামান্য জীবগণ-
কর্তৃক অবজ্ঞাত হইলে, অথবা পরমশক্তি-
ব্যবস্থাপিত জগতের কোন নিয়ম অতিক্রম
করিতে দেখিলে দেবগণের যে ক্রোধ স-
ম্ভবে, তাহা হইতে প্রায় কেহই মুক্ত ন-
হেন। আবার অনেকের মনের গতি অনু-
যায়ী ক্রোধোদ্বেগও দেখা যায়। হিরির

ক্রোধ এই শেবোক্ত প্রকারের । এ ক্রোধ নিতান্ত দুষণীয় । স্বার্থের সহিত এ ক্রোধির নিকটসম্বন্ধ । জগতের প্রচলিত রীতির পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিলে, জীবসাধারণের অন্যাগ সাধন করিলে, অথবা আপন যোগসাধনের ব্যাঘাত জন্মিলে তমোগুণের অপর সীমান্তস্বৰ্ভী দেবাদিদেব ভগবান ভূতভাবনেরও ক্রোধ হয় । সে ক্রোধ ভয়ঙ্কর । ক্রোধের লক্ষ্য অসহ্য ও অদম্য । যখন শূনীর শূল কম্পিত হয়, জটাবন্ধন খসিয়া পড়ে, এবং রবীন্দ্রপাবক এই ত্রিনয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন জগতে কাহার সাধা যে সে ক্রোধ নিবারণ করে ? কিন্তু সে ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, কারণ নিঃস্বার্থ ও বিরোচিত । তাহার শান্তি ও শান্তি নিমেষ মধ্যে সম্পাদিত হয় । এজন্য তিনি আশুতোষ । পার্শ্বতীর ক্রোধও নিঃস্বার্থ ও ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু হিরির ক্রোধ নৈরূপ নহে । তাঁহার ক্রোধানল তুবানলের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করে । ঠিকের অবরোধ সময়ে তাঁহার আচরণে, সপত্নী ও সপত্নী-তনয়দিগের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং স্বামি প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণিত আছে । পার্শ্বতীর হৃদয় স্নেহ ও কোমলতার প্রিয়নিকেতন । অরণ্যের মৃগ, আকাশের পক্ষী, বনের রক্ষ সকলেই তাঁহার স্নেহের অংশভাগী । তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতৃস্বরূপা, ভক্তের নিকট ক্রীতপাত্রী, সর্বসাধারণের আশ্রয়দায়িনী স্নেহ-

ময়ী জননী । তিনি রামপ্রসাদের সহিত 'বেড়া' বাধিতেও ক্রেশ বোধ করেন নাই, সুরথ রাজার জীবন রক্ষার্থ লক্ষ অসি প্রহার সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ।

পার্শ্বতীর পৌরাণিক মত উল্লিখিত হইয়াছে । আর এক প্রকৃতি আছে, সে তাত্ত্বিক প্রকৃতি * । ইউরোপীয়গণ কালী ও শিবকেই হিন্দুদিগের দেব দেবীর মূলধার জ্ঞান করিয়া কালীর তাত্ত্বিক প্রকৃতির এক অংশ এবং শিবের তাপস প্রকৃতির কদর্যাংশ নিতান্ত অপকৃষ্টবর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠকগণসমক্ষে উপস্থিত করেন । তাহাতে ইউরোপীয়দের ত কথাই নাই অনেক এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকও বিশ্বাস করিয়া, সাদাচক্ষে (!) স্পষ্ট দেখা যায়, বিবেচনায় এদেশীয়দিগের পৌত্তলিকতার নিন্দা, এবং গ্রীসের পৌত্তলিকতার প্রশংসা করিতে ত্রুটি করেন না । প্রথমতঃ তাঁহাদের মতে মত দিয়া দেবীর তাত্ত্বিক প্রকৃতি নিতান্ত অবজ্ঞেয় ও অশ্রদ্ধেয় মনে করি । এক্ষণে দেখিতে হইবে গ্রীসের ব্যাকস্ এবং তাহার উপাসনা কি পদার্থ । যদি ব্যাকস্কে প্রশংসা কর, কালীকে নিন্দা করিলে কেন ? কালীর উপাসক অধিক,

* কেনেডি সাহেব বলেন, মাত্র ত-
ত্রেই দুর্গাপূজা, কিন্তু সেটি ভ্রম । মার্কণ্ডেয় পুরাণের সর্ব প্রধান উপগল্পই দুর্গাপূজা (জর্নাল অব্ এসিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ১৮৩৭ । ২৪১ খ্রী) পৌরাণিক সময়ের পূর্বোক্ত দুর্গাপূজার উল্লেখ দেখা যায় ।

না ব্যাকস্মিন্য অধিক ? যদি ব্যাকস্ম
পরিভাগ কর, তত্ত্বও ছাড়িয়া দাও ; ছিন্ন-
মস্তকার শরীরোপরি আবরণ বস্ত্রের পতিত-
হউক । আর যদি তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়,
তত্ত্বও,—হিন্দুসমাজের অধিকাংশ স্থলে
অবজ্ঞেয় তত্ত্বও জারজ ; অনাদৃত তত্ত্বও
অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওবে ।

কালে সকলই বিকৃত হয় । উৎকৃত
তান্ত্রিকগণমধ্যে অনেকে তত্ত্বের যেরূপ
অর্থ করিয়া আসিয়া কর্দমিত করিতেছে
পূর্বে সেরূপ ছিল না । ভ্রান্তবুদ্ধি, অথচ
শিক্ষিত কএকজন ইপিকিযুরস বা চাকরী-
কের মতের পক্ষপাতী হইয়া সাময়িক সুখ
মূল্যবান জ্ঞানে তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছে ।
কিন্তু তত্ত্ব প্রশংসনীয় না হইলেও একথা
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না যে, ব্যাক-
সের উপাসনা উপলক্ষে ঐসে যেরূপ পা-
পানুষ্ঠান হইত, তত্ত্ব সেরূপ কখনও হয় নাই ।

হিরির প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া
তাঁহার উপাসককেও ভীত থাকিতে হয় ।
কালী কেবল বিপক্ষের কালরূপিণী । তবে
কালীকে ভয়ঙ্করী বলিব কেন ? কালী-
মূর্তি ভয়ঙ্করী হইলেও প্রকৃতি অনেক স-
ময়ে মনোহারিণী সংশয় নাই ।

সতী হিরি সতীত্বের উপর বিরাজ ক-
রেন । কুমারীগণের বিবাহানুষ্ঠানে তিনি
সর্বদাই আগ্রহপরা । পার্শ্বতীও তাই ।
যে পর্যন্ত কুমারী অষ্টমবর্ষীয়া থাকে, তা-
হার পবিত্রতা গিরিজার প্রিয় নিকেতন ।
বিবাহ উপলক্ষে হরপার্শ্বতীর বিবাহ প্র-

স্তাব, স্ত্রীলোকদিগের গম্পা নকল ও গান
সকল, এদেশে যেমন আদরের সহিত
শ্রুত হয় এবং প্রত্যেক স্থলেই উপমারূপে
বাবস্তব হয়, ঐসেও সেইরূপ হিরির সহিত
যিহসের পরিণয় বিষয়ক প্রস্তাব সকল
গানে, প্রস্তাবে এবং ললনাকণ্ঠে শ্রুত হ-
ইত । তবে বিশেষ এই যে সতী সর্বদাই
সতীর পক্ষপাতিনী, তাঁহার প্রার্থনা সর্ব-
দাই পূর্ণ করেন । হিরির নিকট প্রার্থনা
করিতে হইলে তাঁহার প্রকৃতি বুঝিয়া প্রা-
র্থনা করিতে হয় । ভক্ত অকুতোভয়ে পা-
র্শ্বতীর নিকট সর্বদাই বলিতে পারে :—

“ও মহিষঘ্নি ! মহামারে ! চামুণ্ডে !

মুণ্ডমালিনি !

আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি

নমস্ততে ।

ও ভূত দৈত্য পিশাচেভ্যো রক্ষা-

ভ্যশ্চ মহেশ্বরি !

দেবেভ্যো মানুষোভ্যশ্চ ভয়েভ্যস্ত্রা-

হিমাংসনা ।

সর্বমঙ্গল মঙ্গলো ! শিবো ! সর্বার্থ-

সাধিকে !

উষো ! ব্রহ্মাণি ! কৌমারি ! বিশ্বরূপে !

প্রসীদ মে !

• রূপদেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী

দেহি মে

পুত্রদেহি ধনংদেহি সর্বান্ কামাংশ্চ

দেহি মে ।

• হৃদয়েন সমারন্ধে কুঙ্কমেণ বিলেপিত

বিশ্বপত্র কৃতাবাসে দুর্গেহং শরণং গতঃ ॥”

এক্ষণে লক্ষ্মীকে কাহার সহিত তুলনা করিব ? সমুদ্রমন্ডনে তাঁহার উৎপত্তি, সুতরাং সমুদ্রের ফেনজা এফ্রোডাইটের সহিত কি কমলার তুলনা হইবে ? লক্ষ্মীর পাদস্পর্শে ধরা শমাপূর্ণা ও হাসামতী হন। আবার এফ্রোডাইট যেন্তাল পাদার্পণ করেন, সেস্থলও সবুজ শোভার স্বশোভিত হয়। তবে এফ্রোডাইট ও লক্ষ্মী কি এক প্রকৃতির ? না। এফ্রোডাইটের এমন দুঃখলতা আছে যে লক্ষ্মী তাহা হইতে অনেক উচ্চ অবস্থান করেন। এফ্রোডাইট সৌন্দর্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; লক্ষ্মী প্রীতিমণী লক্ষ্মী ধন ও সৌভাগ্যের ঈশ্বরী। সুতরাং লক্ষ্মীকে ডিমিটারের সহিত তুলনা করিয়া এফ্রোডাইটকে রতির সহিত তুলনা করা উচিত।

ডিমিটার গ্রীসের লক্ষ্মী। শমশোভিত ক্ষেত্রসকল তাঁহার প্রিয় নিকেতন। উজ্জ্বল পীতবর্ণ কেশঃস্ব শমাছটার স্বশোভিত করিয়া, দক্ষিণহস্তে ধানার্শীর্ষ ধারণ করিয়া এবং বামহস্তে আলোক ও কর্ত্তরিকা লইয়া, অথবা রাজদণ্ড ধারণ করিয়া ডিমিটার শ্রমজীবী কৃষকগণের পরিশ্রম পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ আরতন, উজ্জ্বল মুখশ্রীতে মিলিত হইয়া গৌরব ও গাভীর্য যুগপৎ প্রকাশ করে। ইলিয়ুসিশের পবিত্রতা তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি শান্তপ্রকৃতি, আবার ভামিনী। কিন্তু লক্ষ্মীর ন্যায় চপসা নহেন।

ডিমিটারের অন্য নাম সিরেস। তিনি

যিয়সের প্রতি অসমুখ্য হইয়া কিলিয়স নামক এক সজ্জতিপন্ন মানবের বাটীতে গমন করিয়া গন্ধহারিকার বেশে অনস্থান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সম্ভানের লালন পালন করিতেন। এক দিবস সেই মানবশিশুকে অমর করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া উঠাইতেছিলেন। তাঁহার অপরিজ্ঞাত কার্যসকল দর্শন করিয়া সকলেই সন্দেহপর হইয়াছিল। সুতরাং তাহার অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বালকের প্রতি সিরেসের আচরণ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। ঐ অমানুষিক অগ্নিনিক্ষেপব্যাপার সন্দর্শনে সকলেই ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ডিমিটার ক্রোধপরবশ হইয়া বালককে তাহার মাতৃঅঙ্গে প্রদান করিলেন, এবং নিজরূপ ধারণ করিয়া আপন উদ্দেশ্য বর্ণন করিলেন। বালকের অমরত্বে ব্যাঘাত হওয়ার সকলেই যার পর নাই দুঃখিত হইল। ডিমিটার অদৃশ্য হইলেন।

এই প্রস্তাবের সহিত ভারতীয় অনেক প্রস্তাব একা হয়। ডিমিটারের ন্যায় লক্ষ্মী অন্যের বাটীতে যাইয়া দাসীত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু ডিমিটারের অনুগ্রহে কিলিয়সের যেমন অতুল ঐশ্বর্য হয়, লক্ষ্মীর পদার্পণে এবং ককণাকটাক্ষে সেইরূপ অনেকেরই অতুলবিভব হইয়াছে। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা অনেকেই এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব সকল আলোচনা করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী সমুদ্রমন্ডনে উদ্ভল ফেনরাশিতে

উৎপন্ন হইয়াছিল; বিষ্ণুর সহধর্মিণী হইয়া বৈকুণ্ঠের সিংহাসনের অর্দ্ধভাগ লাভ করিয়াছেন; আপন প্রকৃতির কোমলতায় কমলে পদস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, রূপজ্যোতি শরীরে ধরেনা, কমলালয়া কমলা পূর্ণ যৌবনা। মুখে, সরল শুভ্র দশন জ্যোতি-বিকাশক, নয়ন সরলতাব্যঞ্জক, স্বভাবের পবিত্রতাদোষাতক হাসি প্রকাশ হইয়া অঙ্গলতিকা যৌবনলহরীতে দোলাইতেছে, কিন্তু অনঙ্গার নাই। সুন্দরী মানবীর ঋায় রূপগর্বে গর্জিতা হইয়া প্রসাদনবাহুল্যেও প্রয়াস পান না। পুরুষোত্তম স্বামী লাভ করিয়াও হরিপ্রিয়া রুখা গৌরব প্রকাশ করেন না। তাঁহার স্নেহময়ী মূর্তি, সুধাময়ী দৃষ্টি সকলই মনোহারিণী। লক্ষ্মী জগতের স্রী, বৈকুণ্ঠের স্রী, শরীরের স্রী, সবুজবসনে সুসজ্জিতা প্রকৃতি দেবীর স্রীসম্পাদনকারিণী। লক্ষ্মী স্রীস্বরূপা। তিনি সর্বদাই মিস্ত্রীভাষিণী, পতিব্রতা।

পার্বতী, লক্ষ্মী, হিরি এবং ডিমিটার সকলেই সুন্দরী। পার্বতীর বর্ণ অতসী পুষ্পের ন্যায় অথবা তপুকাঞ্চনতুল্য, অথবা নিরুজ্জ্বল প্রদেশস্থ প্রদীপবৎ স্থির। লক্ষ্মীর বর্ণ চপলার ন্যায়, অতি মনোহর, অথচ চঞ্চল। হিরির বর্ণ উজ্জ্বল পাবকবৎ অথবা নৈদাম্যমার্ভণ্ড তুল্য। ডিমিটার বর্ণ হরিদ্রবর্ণ রূপত্রেয় ন্যায়। এক গৃহে দীর্ঘকাল সৌভাগ্য থাকে না, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এজন্য লোলা।

সরস্বতী তাঁহার সপত্নী। তাঁহার সহিত কমলার প্রণয় সম্ভবে না। বাহ্য প্রকৃতির কর্ত্রী, বাহ্য সুখসম্পদবিধারিণী দেবীর সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অধীশ্বরী দেবী বীণাপাণির কখনও প্রণয় সম্ভবে না। সম্পদ থাকিলে বিদ্যা বিরল, বিদ্বান প্রায়ই দরিদ্র।

চপলা চপলা হইলেও ডিমিটারের ন্যায় ক্রোধাভিভূতা নহেন। ডিমিটার পার্সিফোণির অনুসন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া দেব ও মানবের প্রতি যেরূপ ক্রুদ্ধব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্নবদনা দেবী কমলবাসিনীর সহিত উপমের বলিরা বোধ হয় না।

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী, সর্ব বিষয়েই ঐশ্বর্যশালিনী। তাঁহার সুচিকণ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছমধ্যস্থ সোনামিনীতুল্য বদনসৌন্দর্যের সহিত জগতের কোন সৌন্দর্যই উপামেয় নয়। জীবনস্বরূপ অর্থ লক্ষ্মীর প্রসাদমাত্র। তিনি সকল বিষয়েই ধনশালিনী। তাঁহার প্রকৃতিও অমূল্য। ডিমিটার সেরূপ নন। তাঁহার হস্তে মনুষ্যজীবন, লক্ষ্মীর হস্তেও মনুষ্যের জীবন। লক্ষ্মী রাজবেশধারিণী, কিন্তু ডিমিটার কৃষকসহচরী, এবং কৃষককন্যার ন্যায় সামান্য শয্যায় সুশোভিতা। এম্বলে সারল্য ও অমারিকতায় ডিমিটারের চিত্র অধিক মনোহর সন্দেহ নাই। অন্যদিকে কৃষকগণের দারিদ্র্য এবং রাজা, বণিক, শিল্পী এবং রাজপুরুষগণের ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে ঐকরুচির কল্পনা অযথা প্রযুক্ত বোধ হইবে।

বীণাপাণি দেবীর সহিত পেলাস এ-
থিনীর তুলনা চলে। পেলাস্ রোমের মিন-
ভার আরও অধিক সুন্দররূপে চিত্রিত।
ঐককবি পেলাসকে বাজজগতে সংস্কৃ-
ত রাখিয়াছেন ; রোমের কবি মিনভাকে অ-
মরমু জগতের অধীশ্বরী করিয়াছেন, সুতরাং
মিনভার ও সরস্বতীতে অধিক সাদৃশ্য
পরিদৃষ্ট হয় ।

ঐক কবি এথিনীকে স্ত্রীমূলভ কোমল-
সৌন্দর্য্যে সাজাইতে প্রয়াস পান নাই।
তিনি পার্শ্বতীর ন্যায় রণরঞ্জিনী। সৌন্দ-
র্য্যের লক্ষণ ইউরোপে অঙ্গপ্রাঘিয়া, সু-
তরাং দেবী এথিনীর আকৃতিও দীর্ঘ। তিনি
যিয়সের মস্তকভেদ করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে সু-
সজ্জিতাবস্থায়, ভূতলে অবতীর্ণা হন। স্বয়ং
শৈলেশতনয়্যার ন্যায় সর্বদা দৈত্যবধ ক-
রেন না বটে, কিন্তু, দৈত্যাদলন হিরাক্লিস্,
বেনারোফটেস্ পার্সিগ্‌স্, থিসিয়স্ প্রভৃ-
তির সাহায্যার্থ সর্বদাই বন্ধপরিহার।
আবার তিনি জ্ঞানজগতের অধীশ্বরী, সকলের
বুদ্ধি সম্পথে পরিচালন, সকলকে বিজ্ঞা ও
জ্ঞানে শিক্ষিত করণ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য
সম্পাদন তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। এই গুণে তিনি
সরস্বতীর সহিত তুলনীয়। গ্রীসে শিল্প
বিজ্ঞানাদির অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবী আছেন,
তাঁহাদিগকে মিয়ুজ্জ বলে। এথিনী সেই
মিয়ুজ্জগণের কর্ত্তা। বীরগণের বীরধর্ম্ম রক্ষা
করা তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি
সতী। কিন্তু তাঁহার দুর্কলতা আছে, কখন
একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

এথিনী গ্রীসের দেবীগণ মধ্যে সর্ব্বা-
পেক্ষা উত্তমা হইলেও কদর্য্যকচির হস্ত
হইতে মুক্তা নহেন। গ্রীসের দেবী মান-
বের দেহধারিনী। গ্রীসের পৌরাণিক
সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই দেবদেবীগণ
মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু
এথিনীর কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই,
অথচ তিনি ফিবস্ ও লিকনসের জননী!
কেহ কেহ বলেন, এপোলন হিফিস্টেসের
ঔরসে তাঁহার ভগ্নী এথিনীর গর্ভে জন্ম
গ্রহণ করেন। আবার এথিনী মৃত্যুশীল
মানব পিসিট্রেটস্ ও প্রমিথিয়সের প্রণয়-
কাঙ্ক্ষিনী! আবার প্রমিথিয়সের প্রেমে
মুগ্ধ হইয়া স্বীয়জনক যিয়সকে বন্ধনা পূ-
র্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে অগ্নি অপহরণ
কার্য্যে সহকারিনী। আবার আপন পি-
তাকে বন্ধন করিতে চেষ্টা করিয়াও
অকৃতকার্য্য।

একগুণে শুভ শরীর, শ্বেতাঙ্গরা, জ্ঞান-
ময়ী দেবী সরস্বতীর আকৃতি ও প্রকৃতি
পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। বা-
গ্‌দেবী ‘তব্ধন সকল মিন্দোর্ব্বিত্তী শুভ-
কাঙ্ক্ষী’।

রোমীর মিনভার ন্যায় বিদ্যার্থীর প্র-
তিই তাঁহার বিশেষ স্নেহ। তাঁহার সক-
লই শুভ, সকলই সরল ; তিনি বেলফুল।
তাঁহাতে মানবীর বিনাস লালসা, সামান্য
দেবীদিগের অকাঙ্গন ক্রোধ বা পরানিষ্ট
কামনা কিছুই নাই। তাঁহার সকলই নি-
র্ম্মল ও পবিত্র। যদি জ্ঞানের মনোমোহন

চিত্র কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, যদি সেই চিত্র অরূপসরলসজ্জায় সুশোভিত করিয়া শরীরী ও দৃষ্টব্য করা যাইতে পারে তবে সে চিত্র বীণাপাণি সরস্বতীতে আছে। যখন তাঁহার ঈশ্বর-প্রস্ফুরিত অধরাশ্রু শুভ্রদশনের জ্যোতি ও প্রকৃতিলব্ধ প্রকৃতিতা বিকাশ হয় তখন জ্ঞানীর হৃদয় জ্ঞানালোকের বিমল জ্যোতিতে সুশোভিত হইয়া উঠে।

বাগ্দেরীও কমলাসনা। শ্বেত শতদলে চরণ-যুগল স্থাপন করিয়া দেবী ভারতী সুযমুখ বীণা বাদন করিতেছেন; সেই মনোহর স্বরে জ্ঞানীর হৃদয়-সরোবরে জ্ঞানের লহরী চলিতেছে। অফিসের গান শুনিতে স্রোতস্বতীর স্রোতগতি রোধ হইত, পশু-পক্ষিগণ নিশ্চল ও নিম্পন্দ হইয়া সেই দুর্লভ কণ্ঠনিবাদের শ্রবণ করিত, প্রসুরাদি নিজীব পদার্থে সজীবতা সঞ্চালিত হইত। সে গানে অভিষিক্ত যমোরাত্রি নিচয় উত্তেজিত হইত। কিন্তু সে উত্তেজনা স্থায়ী হইতে পারিত না, হৃদয়স্থ যমুনা-স্রোত উজান বহিত না—নিষ্কামিযুগ বেগ বর্ধিত হইত মাত্র। বীণাপাণির বীণাস্বর সেরূপ ক্ষণস্থায়ী নহে। সে স্বর কীর্তিদেবীর সুকঠিনঃস্রুত সুধাপূর্ণ স্বর। তাহাতে দুর্বল মন সবল হয়, নিরাশ হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হয়, ধমনীতে উষ্ণ-শোণিত-স্রোত বিদ্যায়-বেগে প্রধাবিত হইতে থাকে। বরদার বরপুত্র কালিদাস সরস্বতী কূণ্ডে স্নাত হইয়া সেই দেবদুর্লভ বীণা-নিবন্ধ শ্রবণ

করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবনালিত-কবিতামুখা বর্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

তুমি বিপন্ন, বাগ্দেরী দৈববাণীতে তোমার আশ্বস্ত করিলেন। তুমি বিদ্যার্থ যত্নশীল, ভারতীর অনুগ্রহে বেদবাস হইলে। তোমার জীবনের প্রথমার্ধ অকার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছে, দৈবদসার দেবীর রূপাকটাক্ষ মুহূর্ত্তজনা তোমাতে নাস্ত হইল, তুমি ক্রৌঞ্চমিথুন-নিধন-দর্শনে ব্যাধকে ভৎসনা করা উপলক্ষে ভূমণ্ডলের প্রথম কবি বাল্মীকি হইলে!

মিনর্তা যেমন টেলিমেকসের ভ্রমণসময়ে অরণ্যে, পর্বতে, সমুদ্রে, পরগৃহে সর্বদাই তাহাকে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতিপালন ও শুল্কিত করিয়াছিলেন, বিদ্যা-দেবীও সেইরূপ ভারতসন্তানকে জ্ঞান-ভূষণে ভূষিত করিয়া নিরাপদ ও উন্নত করিতে সর্বদাই যত্নশীল। এ চন্দ্রে কলঙ্ক নাই, এ শুভ কুসুম পর্য্যাসিত হয় না, এ ধবল বসনে দাগ নাই, এ হীরকে ছিদ্র নাই। সরস্বতী পবিত্রতা, সরলতা এবং উত্তমতার জীবময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

আমরা দেখিলাম সুরেশ্বরী হিরি এবং জ্ঞানেশ্বরী এগিনীর গৌরব পার্শ্বতীতে আছে। ডিমিটারের গুণ ও শক্তি এবং এক্সোডাইটের সৌন্দর্য্য লক্ষ্যীতে আছে; এথিনীর লোকহৃদয়ের অভ্যন্তরম্পর্শি কার্য্য ও শক্তি সরস্বতীতে আছে। কিন্তু যে পার্থক্য অবলম্বন করিয়া ভারতীয় দেবীদিগকে আধ্যাত্মিকগণ স্বর্গে স্থাপন করি-

রাছেন, সেই লোকাভীত পবিত্রতা গ্রীসে কোথায় পাইব ? কোথায় সে বিলাসবিরতা লোকাভীত দেবপ্রসূতি, আর কোথায় সামান্য জনসুলভ কলহপ্রিয়তা ও দুর্জ-লতা ! সামান্য মানবের গৃহবিবাদে হি-রিকে একপক্ষ সমর্পণ করিতে দেখিলে, অসং চৌর্য্যানুষ্ঠানে এখিনীকে সহকারিণী মনে করিলে, এবং ভিনমপ্রকৃতি স্মরণ হইলে, কোন্ মহদয় ব্যক্তি গ্রীসের দেবী-গণকে সামান্য কলহপ্রিয়া রমণী বিবেচ-নায় তাহাদিগের মূগম্পদ প্রকৃতির প্রতি মৃণা করিয়া প'কৃতি লক্ষ্যী সরস্বতীর সহিত তুলনায় না বিরত হইবে ? কেই বা বলিবে যে গ্রীক দেবীগণ সহানুভূতি বিষয়ে অ-ধিক সমর্থ ।

উৎপাদিকা প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বর্তমান, শারীরিক, মানসিক এবং আ-

র্থিক । ভগবতী সৃষ্টিমতী দৈহিকশক্তি, সরস্বতী মানসিক এবং লক্ষ্মী আর্থিক-শক্তিস্বরূপা । এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য্য প্রদর্শনেই ভারতীয় দেবোপোখ্যানে দেবী-ত্রয়ের অবতারণা । দেবত্রয়কে স্বতন্ত্র স্ব-তন্ত্ররূপে পুরুষকল্পনা করিলে দেবীত্রয়-মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃতি । এই প্রকৃতি ও পুরুষেই জগতের স্রষ্টাদি ব্যাপার সম্পা-দিত হয় । কখনোনি কখনও প্রকৃতি কখনও পুরুষ, কারণ তিনি স্রষ্টিকর্তা ।

একগে যে ভাবে ইচ্ছা হয়, দুই দেশের দেবীগণকে তুলনা কর । আকৃতি সমা-লোচনা কর, প্রকৃতি পরীক্ষা কর এবং নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ ভারতীয় দেবীসকল প্রকৃত দেবীই কি না । এ-খনও কি বলিবে সহানুভূতি প্রদর্শনে গ্রী-কদেবীগণেরই একচেটিয়া অধিকার ? ব্র—

শব্দ-সাধন ।

১

নিবেছে অনল ?—নিবে নি এখন,
কে নিবাবে বন, নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,

কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?

যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !

কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !

শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !

রাবণের চিতা, লক্ষ্মীর প্রমাণ !

২

ঢাল যদি সপ্ত মহাপাণ্ডাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্যাণ,
দেহ চাপাইয়া ছিয়ারির ভার,

যাবে ভস্ম হয়ে ভূগের সমান ।

দুঃখিনী কল্পনে ! কেন উদাসিনী

রূপা নেত্রবারি কর বরিষণ,

নয়নের জলে জান না তাপিনী,

এ প্রচণ্ড শিখা হবে না বারণ ।

৩

এই মহা অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভুঙ্কারের বারি উপহাস তার;
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা!—

ভারত হৃদয় করহ বিদার;
ভোগবতী গঙ্গা ভীষ্ম-প্রবাহিনী
অন্তঃস্থল হাতে উঠিবে লুপ্তারি,
নিবাবে শ্মশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী,
যুড়ানে ভারত অমৃত সঞ্চারি।

৪

না পার,—নসিয়া এ মহা-শ্মশানে,
বিশতিকোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা মহাসুরা পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন,
শ্মশান-অনল গর্জিছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে শ্বনিছে পবন।

৫

আর্য্য-বীৰ্য্য-ভস্ম মাখি কলেবরে,
স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,
'ত্ৰাহি মে ভৈরবি'—ডাক উঠেঃশ্বরে
সাধ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার।
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জন, পাশ-অনংকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন্
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয়? আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা মহাসুরা পান,

করতালি দিয়া, নরন মুদিয়া,

কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান;—

‘করালবদনা, হৃয়ুণ্মালিনী,
লেলিহান জীহ্বা কধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশানদামিনী,
স্বক-বন্দ গলজ্জ্বার চর্চিত।

৭

‘মহামেষপ্রভা! কর বরিবণ
মহা বারি ধারা জ্বলন্ত শ্মশানে;
ফলুক আবার সাধনার ধন
বীর রত্নরাশি এই আর্ধ্যস্থানে!
সদাচ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,
কি লাঞ্জে ধর মা দেও ফেলাইয়া,
খরশান খড়্গে মলিন কধির,
সদা রক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া!

৮

‘ঘোরারাবে মাতা ছাড়িয়া লুপ্তার,
মহারৌজীরূপে হও অধিষ্ঠান,
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,
দেখুক নয়নে ভারত সন্তান!
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,
দেখি মহাক্রম দিলেন পাতিয়া
হিমাজি সদৃশ হৃদয় অটল,—
দেখিব সে মূর্তি নয়ন ভরিয়া।

৯

‘অভয়, বরদ,—অধ উর্দ্ধ কর,
শোভিছে দক্ষিণে ভারতের তরে,
দেহ মা অভয়, হায়! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে;
প্রচণ্ড অনলে কত কাল হায়!

জ্বলে আর্ধ্যজাতি কাল-নির্বিশেষ,
একি অভিশাপ ! তথাপি ধরায়
হতভাগা জাতি হলো না নিঃশেষ ।

১০

‘অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কত কাল সবে ভারত দুঃখিনী ?
মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,
অর্ধ মৃত, অর্ধ দগ্ধ অভাগিনী !
তুমি মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি জীবন নিবুক শ্মশান ;
কিন্মা চিতানল নিবাও সত্তর,
মৃতকম্প দেহে কর প্রাণ দান !’

১১

‘অচল ধমনী—উঠুক উছলি,
নব বরষায় জাহ্নবী যেমন ;
স্থির রক্ত স্রোতে ছুটুক বিজলি,
‘জয় মা ভৈরবী’—উঠুক গর্জন ।’
ফলিরাছে শব-সাধন তোমার,
নরন মেলিরা দেখহ কম্পনা ;
ভারত শ্মশানে আজি আরবার ;
কি ভীষণ হতা, কি ঘোর বাজনা !

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে শ্মশানে !
মহাবিশু দিনে মহাশক্তি ওই
নাচিছে রঙ্গিনী সুর-কৃপাণে,

গর্জিছে সাধক ‘মা ভৈ মা ভৈ’ ।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে ;
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,
ত্রিনেত্র হইতে অনল জ্বলারে,
মহাকালী মূর্তি—ভীমা দিগম্বরী !

১৩

বাঞ্চে জয়টাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কঁাশা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা,—কভু ধরা কোলে,
রক্তারক্ত অস্থ-নর-রক্ত আবে !
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাঞ্চে,
নর-মুণ্ড-মালা হুলিছে গলায় ;
কধির-আধার এক করে নাঞ্চে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায় ।

১৪

ভারত সম্মান ! দেখ না মাতার
লোলজীহ্বা শুক, শুক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারষাধ ।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,
ভারত শ্মশানে শক্তি আরাধন ।

শ্রীঃ—

লাক্ষ্মণায় ।

মনুষ্য-হৃদয়ে স্রুথের কথা অপেক্ষা
 হুঃথের কথা অধিক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত
 থাকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষই হুঃথের সময়েও
 আমরা স্রুথের কথানুষ্ঠানে ক্ষণকালের
 জন্য উৎসাহ এবং উল্লাসে মাতিয়া উঠি,
 স্রুতরাং ভালবাসি। বর্তমান কচি অনু-
 সারে, এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুদর্শন
 করিলে কৃতবিদ্যগণের অশ্রদ্ধাভাজন হও-
 য়ারই অধিক সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা করিয়া
 বাঙ্গালির বর্তমান হুঃখ অথবা পূর্বস্রুথ,
 কিছুই স্পর্শ করিব না। শুদ্ধ বঙ্গের পুরা-
 নত্বটিও কএকটি ঐতিহাসিক কথা আ-
 লোচনাই এই প্রবন্ধে আমাদের একমাত্র
 উদ্দেশ্য রহিল।

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউ-
 দ্দীন তাহার ‘তবকাৎনাসরী’ গ্রন্থে ব-
 লিয়াছেন—বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়-
 কালে * * * ‘লক্ষ্মণিয়া’ নামে
 জনৈক রাজা বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
 ছিলেন। ইনিই তাহার মতে বঙ্গদেশের
 শেষ হিন্দুরাজা। কিন্তু এতদেশীয় প্রাচীন
 গ্রন্থসমূহে ‘লক্ষ্মণিয়া’র কোন বিব-
 রণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় বল্লালসে-
 নের পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধব-
 সেন এবং তদীয় ভাতা কেশবসেন অতি

অল্পকাল রাজত্ব করা নিবন্ধন, মুসলমা-
 নেরা তাহাদের পরবর্তী ভূপতিকে লক্ষ্মণ-
 সেনের পুত্র বিবেচনায়—‘লক্ষ্মণিয়া’
 নাম দিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ‘লক্ষ্ম-
 ণিয়া’ সংস্কৃত বা বাঙ্গলা শব্দ বলিয়া
 বোধ হয় না। স্রুতরাং ইহা ‘লাক্ষ্ম-
 ণয়’ (লক্ষ্মণ শব্দের উত্তর ‘ফের’ প্রত্যয়
 নিপ্পন্ন) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, এইরূপ অনু-
 মান একেবারে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসম্মত নয়।

মুসলমানদিগের মতে কেশবসেনের
 পরে নোজিব, নারায়ণ, (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ,
 এবং লক্ষ্মণিয়া এই চারিজন ক্রমান্বয়ে
 রাজত্ব করেন। রাজাবলী গ্রন্থে মাধবসে-
 নের পর স্রু অথবা সুরসেনের নামোল্লেখ
 দেখা যায়। আবার কিংবদন্তী এইরূপে সে
 অশোক নামে আর একজন রাজা ছি-
 লেন। কিন্তু ইনি কাহার পরবর্তী বা
 কাহার পূর্ববর্তী তাহার কোন নির্দেশ
 নাই। এখন দেখা যাউক বল্লালসেন হ-
 ইতে বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গাধিকার কতদূর
 ব্যবধান, এবং তাহাতে এতগুলি রাজার
 সমাবেশ সম্ভবে কি না।—বল্লালসে-
 নের রাজত্বকাল সম্পর্কে ‘সময়প্রকাশ’
 এবং ‘আইন আকবরীতে’ ঐক্য দেখা
 যায়। ‘সময়প্রকাশ’ অনুসারে ১০১৯

শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃঃ অঙ্গে বল্লাল-
সেন 'দানসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন * ।
অতএব তিনি অবশ্য একাদশ শতা-
ব্দীর শেষভাগে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছি-
লেন । 'আইন আকবরী' মতে বল্লাল-
সেন ১০৬৬ খৃঃ অঙ্গে রাজপদে অভি-
ষিক্ত হয়েন । 'দান সাগর' গ্রন্থ প্রণয়-
ণের পর তিন বৎসর কাল জীবিত থা-
কিলে, ১১০১ খৃঃ অঙ্গে তদীয় পুত্র লক্ষ্ম-
নসেনের রাজ্যারম্ভ গণনা করিতে হ-
ইবে । এদিকে, মিনহাজ্জুদ্দীন বখতিয়ার-
কর্তৃক বঙ্গাধিকারের (৫৮) অষ্টাধিক
পঞ্চাশৎ বৎসর পর অর্থাৎ ১২৬০ খৃঃ
অঙ্গে বঙ্গদেশে লক্ষ্মণসেনের সমকালিক
লোকের প্রমুখাৎ প্রকৃত অবস্থা অবগত
হইয়া 'তবকাৎনাসরী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ;
কাছেই তাঁহার কণা সর্বাপেক্ষা অধিক
প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ।
তাঁহার মতে বঙ্গদেশের শেষ রাজা 'ল-
ক্ষ্মণিয়া' অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া
১২০৩ খৃঃ অঙ্গে বখতিয়ার কর্তৃক পদচ্যুত
হয়েন । সুতরাং তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল
১১২৩ খৃঃ অঙ্গ বলিয়া স্থির করা যাইতে
পারে । এখন ১১০১ হইতে ১১২৩ খৃঃ
অঙ্গ পর্য্যন্ত মাত্র ত্রয়োদিক বিংশতি বৎসর
রহিল । এই অঙ্গকালের মধ্যে এতগুলি
রাজাকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে ।

* নিখিল নৃপচক্রতিলক-জীবল্লালসেন
দেবেন । পূর্ণেশ্বরিল নব দশমিতে/ন-
কাঙ্গে দান সাগরো রচিতঃ ।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের গণনা
কোনস্থলে সঠিকরূপে নির্দিষ্ট নাই । আবুল-
ফাজেল বলেন তিনি মাত্র আট বৎসর
কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু তদীয়
মন্ত্রী হলায়ুধ 'ত্রাঙ্গণ-সর্বস্ব' গ্রন্থে
লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে 'কৈ-
শোর বয়সে সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন,
যৌবনাবস্থাতে মন্ত্রিপদ প্রদান করেন এবং
অবশেষে ধর্ম্মাধিকার পদে বরণ করেন ।
কিন্তু এত অঙ্গকাল মধ্যে এইরূপ পরিব-
র্তন কোন মতে সম্ভবে না । এতন্নিবন্ধন
বর্তমান তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ ১১০১ হইতে
১১২১ খৃঃ অঙ্গ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল
বলিয়া স্থির করেন ! ইহার পরে মাধব-
সেন এবং কেশবসেন । সুতরাং দেখা
যায়, হয় নৌজিব, (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ এবং
সু অথবা সুরসেন ও অনোক প্রত্যেকে
মাত্র দুই এক মাস রাজত্ব করিয়াছেন—
অথবা এই অভিধানগুলি এক লক্ষ্মণের
নামান্তর মাত্র । প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়
অনুমান অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং প্রামাণিক
বলিয়া বোধ হয় ।

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু লিখিতে
গেলে তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের উল্লেখ না
করা ভাল দেখায় না, এই জন্য এস্থলে
তাঁহাদের সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যিক হ-
ইতেছে ।

মেট্‌কাফ্ সাহেব রাজসাহীর অন্তর্গত
দিয়পাড়ার নিকটবর্তী বুড়িন (Burrin)
নামক স্থানে একখানা তাম্রশাসন প্রাপ্ত

হয়েন। তাহাতে বিজয়সেন, হেমসুসেন, শামসু সেন এবং বীরসেন এই চারিজন সেনবংশীয় রাজার নাম লিখিত আছে। সম্ভবতঃ বীরসেনই এই বংশের নায়ক, কারণ তিনি চন্দ্রের অপত্য বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার পূর্ববর্তী আর কাহারও নাম উল্লিখিত নাই। বীরসেনের পুত্র শামসু-সেন, তৎপর হেমসুসেন, হেমসুসেনের পুত্র বিজয়সেন। কথিত আছে বিজয়-সেন আসাম (কামরূপ) ও কলিঙ্গ দেশ * অধিকার করিয়া পাশ্চাত্য ভূপতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন।

বরিশালে ৮ কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারিতে প্রিন্সেপ সাহেব যে দানপত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর কেশবসেন জ্ঞানৈক ব্রাহ্মণকে বাঙলে, বেতোগাত ও উদয়ল † নামে তিনখানি গ্রাম দান করেন। সম্প্রদাতা কেশবসেন ‡ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বল্লাল-

* “তুং নানাবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বাহন্যাথা মননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।

গৌড়েশ্বরমজ্জবদপাকৃতকামরূপ-

ভূপং কলিঙ্গমপি যন্তরমা জিগায় ॥

এই শ্লোকের শেষার্ধের অর্থ সম্পর্কে যতপার্থক্য দৃষ্ট হয়।

† প্রসিদ্ধ আছে যে, এই গ্রামত্রয় বিক্রমপুরের নিকটবর্তী ছিল।

‡ শিম্পলিপির যেস্থলে কেশব সেনের নাম লিখিত আছে, সেইস্থলে বোধ হয়, পূর্বে অপর একটি নাম ছিল; সেই নাম

সেনের পৌত্র এবং বিজয়সেন অগবা শ্রুতসেনের প্রপৌত্র, অস্ব পরিচয় দিয়া-
ছেন। ‘আইন আকবরী’ তেও শ্রুগ-
সেনকে বল্লালসেনের পিতা বলা হই-
য়াছে। ‘দানদাগর’ এস্থে বল্লালসেন-
প্রদত্ত যে দানপত্রের উল্লেখ আছে, তা-
হাতে তিনি বিজয়সেনের পুত্র এবং হে-
মসুসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচিত। অ-
ধুনাতন স্মারকবনে লক্ষ্মণসেনের যে তাম্র-
শাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত
আছে লক্ষ্মণসেন বল্লাল সেনের পুত্র,
বিজয়সেনের পৌত্র এবং হেমসুসেনের
প্রপৌত্র। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় ব-
ঙ্গদেশের সেনবংশীয় ভূপতিদিগের কীর্তি-
স্তম্বরূপ শিম্পলিপি সমূহে উল্লিখিত রা-
জগণ একই বংশ সম্ভূত।

লাক্ষ্মণেয় হইতে বল্লালসেন পর্যন্ত ভূ-
পতিগণের রাজত্বকালের একরূপ নির্দেশ
আছে। কিন্তু বল্লালসেনের পূর্ববর্তীগ-
ণের কাল নিরূপণ চেষ্টা সম্যকরূপে অনু-
মান মূলক হইবে বলিয়া উহা হইতে বিরত
থাকিলাম।

সেনবংশ এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে।

কাটিয়া হুতন নাম সংযোজিত হইয়াছে।
সেই অপর নাম মাধবসেন। বোধ হয়
দানসিদ্ধির পূর্বেই মাধবসেনের মৃত্যু
হয়। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যায়, কেশবসে-
নের পূর্ববর্তী মাধবসেনও লক্ষ্মণসেনের
পুত্র।

বীরসেন *
 সামন্তসেন (পুত্র)
 ছেমন্তসেন (পুত্র)
 বিজয়সেন ওরফে
 সুরসেন (পুত্র)
 বল্লালসেন (পুত্র) ১০৬৬ খ্রীঃ অঃ
 লক্ষ্মণসেন (পুত্র) ১১০১ খ্রীঃ অঃ
 মাধবসেন (পুত্র) ১১১১ খ্রীঃ অঃ
 কেশবসেন (ভ্রাতা) ১১২২ খ্রীঃ অঃ
 লক্ষ্মণের ওরফে
 অমোক, নু অথবা } (পুত্র) ১১২৩ খ্রীঃ অঃ
 সুরসেন ।

অনেকের মনে এই সিদ্ধান্তটি বদ্ধমূল আছে যে বঙ্গদেশের সেন রাজারা বৈদ্যবংশীয় ; এবং এখনও অনেক বৈদ্যসন্তান বর্তমান আছেন যাঁহারা বল্লাল সেনকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মনে করিয়া গর্ব করেন । একবার উচ্চবংশজ বলিলে যতদূর কার্যাসিদ্ধির সম্ভাবনা সহস্রবার অন্য প্রকার জুতিবাদের ততদূর হওয়ার নহে । কেউকে সম্ভুত করিবার এ একটি অব্যর্থ মহান উপায় । কুলাচার্যগণ ইহা বিলক্ষণ

* রাজা আদিশুর এবং বীরসেন প্রায় সমকালিক, একরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু আদিশুরকে পালবংশীয় বলিয়া বোধ হয় না । এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন ‘ আদিশুর ’ বীরসেনের নামান্তর । ‘ শুর ’ এবং ‘ বীর ’ একই অর্থ ব্যঞ্জক ; এবং ‘ আদি ’ প্রথম, অর্থাৎ বংশনামক, এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।

জানিতেন, এবং জানিয়া স্বার্থসাধন মানসে অনেক অপেক্ষাকৃত নীচবংশজাত ব্যক্তিদিগকে কোন প্রসিদ্ধ রাজকুলের বংশধর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের সঙ্গে বল্লালসেনের এইরূপ সম্বন্ধ হওয়াই নিতান্ত সম্ভব । বর্তমান সময়েও এতদেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন বিবাহাদি কার্যোপলক্ষে কুলীনগণ মৌলিকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ‘ ঘটক চুড়ামনি ’ গণ অর্থলোভে মৌলিকদিগকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়া দেন ; আবার সময়ান্তরে ইচ্ছামত অর্থসাহায্য না হইলে তাহাদিগকে নরকের কীট বলিতেও অগুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না । সকলেরই বিদিত আছে এই পতিতপাবন মহাত্মাদিগের অসাধ্য কর্ম নাই ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ‘ অম্বষ্ঠ ’ নামক এক শ্রেণী ক্ষত্রিয় বাস করিত । ‘ বিষ্ণু-পুরাণে ’ † উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জাতিসমূহের উল্লেখ আছে এবং পাণিনীয় ব্যাকরণে ‘ অম্বষ্ঠ ’ শব্দ ক্ষত্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । মহাভারতে ‘ অম্বষ্ঠ ’ শব্দের অর্থ এক স্থলে ‘ ক্ষত্রিয়জাতি ’ এবং স্থানান্তরে স্বনামখ্যাত ক্ষত্রিয়বংশজাত রাজা । মহাভারতের ‘ অম্বষ্ঠ ’ এবং মনুর উক্ত ‘ অম্বষ্ঠ ’ একই অর্থব্যঞ্জক বলিয়া ভ্রম হওয়া বশতঃই, বোধ হয়, সেন রাজারা বৈদ্যবংশজ, এই জনজাতি প্রচলিত হইয়া

† ‘মজারামাস্তথাস্বষ্ঠাঃ পারসিকাদয়স্তথা’ ।

থাকিবেন। আবার আবুলকাডেল এবং পীর তেফেনখেলার সেনরাজাদিগকে কার্যস্থ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্তমান সময়েও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ‘অ-ম্বষ্ঠ’ নামক এক শ্রেণী কার্যস্থজাত বাস করে। সম্ভবতঃ ইহাই এই গুরুতর ভ্রমের মূল কারণ হইবে। কিন্তু এইরূপ অর্থো-ক্রিক জনশ্রুতির প্রতিকূলে সেনবংশের ক্ষত্রিয় সম্পর্কে যে সকল যুক্তিসম্মত প্রমাণ বর্তমান আছে, তাহাতে কোন মতে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া পারা যায় না।

রাজসাহীর তাম্রশাসনে স্পষ্টে লিখিত আছে, সেনবংশনারক বীরসেন * চন্দ্র-বংশজাত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়। অপরস্থলে শামসুসেন ‘ব্রহ্মক্ষত্রিগাম্য কুলশিরো-দাম’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন †। বা-

* ‘যৎ সিংহাসনমীশ্বরারস্য কণক-
প্রায়ং জটামণ্ডলং
গজাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্ষট্টামরপ্র-
ক্রিয়া।

শ্বেতোৎকলকগাঙ্গুলঃ শিবশিরঃ স-
ন্ধানদামোরগ-
চ্ছত্রং যস্য জয়তাসাবচরমো রাজা
সুধাদীধিতিঃ ॥

বংশোতস্যামরজীবিতত্তরতকলাসাক্ষি-
গোদাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রকীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ
কীর্তিমল্লিক্ৰভুবে। ইত্যাদি’।

† ‘সব্রহ্মক্ষত্রিগাম্যজনি কুলশি-
রোদামশামসুসেনঃ।’

খরগঞ্জের তাম্রশাসনেও সেন রাজাদিগকে সেনবংশসম্বৃত বলা হইয়াছে। স্কন্দরবনে লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারেও সেনবংশ ক্ষত্রিয়, এ কথা প্রতিপন্ন হইতেছে ‡। এইরূপ ভূরি ভূরি প্রবল প্রমাণ বর্তমানে বোধ হয় কাহারও মনে সেনবংশের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ক্ষত্রিয়বংশসম্বৃত রাজা লাক্ষ্মণিরাজ জন্মসম্বন্ধে ‘তদকংনাসরীতে’ একটি গল্প লিখিত আছে। এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা বোধ হয় দোষাবহ হইবে না। পিতার মৃত্যুকালে লাক্ষ্মণের মাতৃগর্ভস্থ, সূত্রাত্ত রাজমুকুট গর্ভোপরি স্থাপিত হয়। রাজমাতার এসবকাল উপস্থিত হইলে দেশীয় জ্যোতির্বিদগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, এই সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নানা অনর্থের কারণ হইবে, কিন্তু দুই ঘণ্টা পর প্রসব হইলে ভাবী রাজা অশীতিবর্ষকাল সিংহাসনারূঢ় থাকিবেন। রাজমাতা তদনুসারে

‡ (ক) ‘তেজোবিষজ্বর যুষোধিবতা-
মভূবন্ ভূমীভুজঃ ক্ষুটমণৌবধনাথ-
বংশে।’

(খ) ‘দোকষ্যাকপিতারি সঙ্কররসে।
রাজনাধর্ম্যায়ঃ
ক্রীমলক্ষ্মণসেনভূপতিরতনৌজনাশীমা-
ইজনি ॥’

এই গল্প-লিপির কোন স্থলে বল্লাল সেনকে ক্রীবিক্রমপুরবাসী বলা হইয়াছে।

পদদ্বয়ে রজ্জুবন্ধন দ্বারা উদ্ধৃপাদ হইয়া
ঝুলিয়া থাকেন, এবং শুভলগ্ন উপস্থিত হ-
ইলে বন্ধনমুক্ত হইয়া লাক্ষ্মণেরকে প্রসব
করেন । কিন্তু অসহ্য প্রসবযন্ত্রণায় তাঁহার
মাতার তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিরোগ হয় ।

লাক্ষ্মণের বিলক্ষণ শাস্ত্রপারদর্শী এবং
ধর্মজ্ঞ বলিয়া কথিত । তাঁহার রুদ্ধাবস্থায়
১২০২ খৃঃ অঙ্গে যখন বখতিয়ার বেহার
জয় করেন, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং জ্যোতির্বিদ্-
গণ সমবেত হইয়া রাজাকে বলিলেন—
তাঁহাদের পুরাতন গ্রন্থসমূহে তুরস্কদিগ-
কর্তৃক বঙ্গ অধিকৃত হইবে বলিয়া লিখিত
আছে এবং তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই
সময় উপস্থিত ; সুতরাং দেশ পরিত্যাগ
করা বিধেয় । লাক্ষ্মণের রুদ্ধবরসে রাজ-
ধানীর মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন
না, অথচ দেশরক্ষার্থ কোন উপায়ও অব-
লম্বন করিলেন না । এস্থলে বক্তব্য এই যে,
লাক্ষ্মণেরকে ভীক, কাপুরুষ, যাহাই যিনি
বলুন, দেখিতে হইবে বখতিয়ারকে বঙ্গ-
বিজয় উপলক্ষে ইতিহাসবিদগণ যে য-
শোরাশিতে বিভূষিত করিয়াছেন, প্রকৃত
পক্ষে তিনি তাহার উপযুক্ত কি না । ব-
খতিয়ার সমস্ত সেনা নিকটবর্তী অরণ্যে
লুকায়িত রাখিয়া মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী
সমভিব্যাহারে নদীয়ার প্রবেশ করেন ।
নিরস্তুর ধূর্ততা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং অ-
সরল ব্যবহারে আত্মগোপন করিয়া ক্রমে
রাজপ্রাসাদপর্যন্ত নির্বিবাদে প্রবেশাধি-
কার প্রাপ্ত হইলেন এবং অতিনিষ্ঠুরভাবে

নিরস্তর রাজানুচরবর্গকে অন্যায়রূপে আক্ৰ-
মণ করতঃ অবশেষে সোনার বাজাল। এ-
কেবারে ছারখার করেন । যদি বলেন,
ইহা প্রবঞ্চনা বা ধূর্ততা নহে, ইহা যুদ্ধ-
কৌশল ; আমি জিজ্ঞাসা করিব, মিথ্যা
কথা বা অন্যায় এবং অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা
কি প্রকৃত যোদ্ধার ধর্ম ? উহা চোরের
ধর্ম, দস্যুর ধর্ম । একপ ছলনা করাতে
কি বখতিয়ারের ভীকতা প্রকাশ পায়
নাই ? তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে রক্ষক-
দিগের নিকট দূত বলিয়া আত্মপরিচয়
দিলেন ? কি অভিপ্রায়ে প্রকৃত যোদ্ধার
ন্যায় স্পৃহভাবে যুদ্ধঘোষণা করিলেন না ?
হিন্দুরা কোন কালে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ব-
লিয়া ভুবনবিখ্যাত ছিলেন । এমন দিন
ছিল, যখন হিন্দুযোদ্ধাবর্গের সর্গর্ষপদ-
ভরে মেদিনী কম্পমান হইত । কিন্তু তাঁ-
হার কোন কালে প্রবঞ্চনা এবং ছলনা,
মিথ্যাকথা এবং অসত্য ব্যবহার স্বপ্নেও
জানিতেন না । সর্বত্র সর্বদা সরলতা-
পূর্ণ, শত্রু মিত্র উভয়েরই প্রতি সমভাবে
সরল এবং উদার । হিন্দুদিগের সঙ্গে
তুলনা করিলে যবনদিগের চরিত্রের অপ-
কৃষ্টতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে । বাস্ত-
বিক এইরূপ ছলনা এবং অসত্য ব্যবহারে
বখতিয়ারের চরিত্রে অনপনের কলঙ্ক রহি-
য়াছে, সন্দেহ নাই । তাঁহার সমক্ষে ন-
দীয়ার একটি প্রাণীরও মনে কোন সন্দেহ
উপস্থিত হইয়াছিল না ; বরং তাহার বখ-
তিয়ারকে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী হইয়া-

অশ্রদ্ধারণ না করা পর্যান্ত অশ্রদ্ধাবসায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যখন অকস্মাৎ রাজপুরী এবং নগরমধ্যে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল, তখন লাক্ষ্মণের আহ্বার করিতে বসিয়াছিলেন এবং প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্বেই বখতিয়ার প্রবলবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তোপায় হইয়া স্বক রাজ্য পরিবার ও অনুচরবর্গ এবং সমস্ত অর্থসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্বক একাকী শূন্যপদে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন।

আর গুটি দুই কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বখতিয়ার সমস্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য নহে। ১২৬০ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন ‘রায় লাক্ষ্মণিয়া সঙ্কট (জগন্নাথ ?) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানেরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছেন।’

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আরবী ভাষাবিশারদ বুকমেন সাহেব লিখিয়াছেন ‘বখতিয়ার সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায়। তিনি মাত্র মিথিলার দক্ষিণপূর্বাংশ, বারেইল, রাঢ়ের উত্তরাংশ এবং বগড়ির উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পদ্মানদীর পূর্বপারস্থিত বঙ্গরাজ্য তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় নাই। ‘তবকৎ নানরী’ বা বঙ্গে মুসলমানরাজত্বের প্রথম শতাব্দীর কোন মুদ্রাতে সুবর্ণ গ্রামের নাম উল্লেখ নাই। ‘তারিখিবরনী’ ঐতিহাসিক গ্রন্থে বুলবন বাদসাহের সময়েও (১২৮০ খৃঃ অঃ) সুবর্ণগ্রাম এক জন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখনক সাহার রাজত্বকালে (১৩২৩ খৃঃ অঃ) সোনারগাঁ প্রভৃতিস্থল মুসলমানদিগকর্তৃক প্রথম অধিকৃত হয়।

শঃ—

প্রাতঃস্থান ও প্রাতঃক্রিয়া।

‘পাখী রবে কলরবে, এখনো ঘুমায়ের রবে?’

স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী উষা দুয়ারে দাঁড়ায়ে ঐ।’

‘শরীরমাদাং খলু ধর্মসাধনং’— এই অমূল্য কবিতাটুকি যে মহাত্মার অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি যে শরীরিমাত্রেয়ই চিরকৃতজ্ঞতাভাজন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিক

শরীররক্ষাই আদি ও সর্বপ্রাণী ধর্ম। দেহের প্রতি যত্নশূন্য হইয়া ঐহিক বা পারলৌকিক কোন প্রকার ধর্মসাধন করাই দুকহ—যদি কেহ তাহা করিতে চেষ্টা করে, তাহাও নিডম্বনামাত্র। এই জন্যই

উল্লিখিত কবিতাংশের স্মৃতি হইয়াছে । যদিও পুরাতন ঋষিগণ সময়ে সময়ে দেহের প্রতি মমতামূল্য হইয়া ধর্মসম্বন্ধের বিধান দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা আবার শরীর রক্ষার জন্য নানাবিধ স্বাস্থ্যকর নিয়মসমূহের তত্ত্ব ও উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্রটি করেন নাই । আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রই তাহার উদাহরণ স্থল । এই সকল গ্রন্থ পূর্বতন ঋষিগণেরই লেখনীপ্রসূত । প্রকৃতির সহিত প্রাণিগণের নিত্যান্ত ঘনিষ্ঠতা আছে, সুতরাং কিরূপ নিয়মে চলিলে সেই ঘনিষ্ঠতার যোগভঙ্গ না হয়, এবং কীদৃশ অনিয়মের বশীভূত হইলে উহার বিচ্ছেদ ঘটে, তদ্বাবলি এই সকল গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । এই সকল গ্রন্থের মর্মগ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিয়া চলিলে দীর্ঘকাল শরীর সুস্থ থাকে এবং বিবিধ আমরসমূহের বস্তুনা হইতে পরিভ্রাণ লাভ করা যায় । কিন্তু ইহার ব্যতিচার ঘটিলে শরীর দুর্বল হয়, বাঁচিয়া থাকা ভার বোধ হয় এবং অস্বপ্নকালের মধ্যে মৃত্যুও ঘটে । অনেক সবলকায় ব্যক্তি প্রথমতঃ রক্তের তেজে স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনসম্বন্ধে শৈথিল্য প্রকাশ করে; তাহারা মনে করে যে, যথেষ্টাচারী হইয়া জীবনধারণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না ; কিন্তু তাহারা যদি একবার চাবিয়া দেখে যে, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির

অভেদাত্মক সম্বন্ধ আছে, তাহার পার্থক্য ঘটিলে অবশ্যই বিপর্যয় ঘটিবে, সুতরাং এতদুভয়ের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করা নিত্যান্ত কর্তব্য—ইহার অন্যথা করিলে অকালে কালকবলিত হইতে হইবে, তাহা হইলে অসময়ে প্রায় কাহাকেই জীবন-বিসর্জন দিতে হয় না । কিন্তু মানুষের যে কেমন এক অমনোযোগিতা, সে সুস্থাবস্থায় আত্মশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করে না । সুতরাং অচিরেই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয় । যখন শরীর সুস্থ থাকে, সেই সময় হইতে ভাবি স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলা উচিত । বরাবর শরীরের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিয়া চলিলে অনিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত প্রকার নিয়ম আছে, তন্মধ্যে প্রাতঃকথান একটি অতুল্যরূপে নিয়ম । এই প্রস্তাবে তাহাই লিখিব ।

ব্রাহ্ম মুহূর্তে গাত্রে স্থান করিয়া ধর্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে । মনে মনে ঈশ্বরের ধ্যান করিবে * । সুস্থ ব্যক্তি অয়ুঃ রক্ষার্থ ব্রাহ্ম মুহূর্তে উঠিয়া শারীরিক চিন্তা অর্থাৎ জীর্ণাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেক † । রজনী অপমৃত

* ব্রাহ্ম মুহূর্তে উক্ত ধর্মমর্থক চিন্তয়েৎ ।
কায়ক্লেশস্তদুদ্ভূতং ধ্যয়েত্তু মনসে স্বরং ॥ কু-
র্মপুরাণ, উপবিভাগ; ১৭ অধ্যায় ।

† ব্রাহ্ম মুহূর্তে উত্তিষ্ঠেৎ সুস্থো রক্ষার্থমায়ুঃ ।
শরীরচিন্তাং নিবর্ত্য মৈত্রকর্মং সমাচরেৎ ॥ রাজবল্লভ গ্রন্থ ।

হইলে পূর্বদিকে যে তমিস্রালোক জন্মিত একপ্রকার আভা সমুদ্ভূত হয় তাহারই নাম ব্রাহ্মমূর্ত্ত বা উষাকাল। খনার বচন বলিয়া বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে, ‘ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, খনার মতে সেই সে উষা’। পেচক প্রভৃতি কয়-প্রকার পক্ষী ব্যতীত অপরাপর বিহঙ্গ রাত্রিকালে দেখিতে পায় না, সুতরাং উষাকালের আলোক ও অন্ধকার নিবন্ধন পক্ষিগণ জাগ্রত হইয়াও উড়িতে পারে না। ক্রমে আলোকের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উহার উদ্ভীন হয়। এই সময়ে মৃত জগতের নবজীবন সঞ্চার হইতে থাকে। এই সময়ে মনুষ্যমাত্রেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোস্থান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবন আশা করে, এই সময়ে তাহাকে শয্যা ছাড়িয়া উষাচরণে প্রণিপাত করিতে হইবে। এই সময়ে গাত্রোস্থান করিয়া ‘জীবনেন্ধু ধীর ব্যক্তি স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত মলমূত্রাদির বেগধারণ করেন না, কিন্তু স্বভাব প্রবৃত্ত কামক্রোধাদির বেগধারণ করিয়া থাকেন’ *। ‘যে ব্যক্তি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আকাজক্ষা করে সে এই সময়ে গাত্রোস্থান করিয়া বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও দৈবজ্ঞ এই চারি ব্যক্তিকে দর্শন করিবে’,† অর্থাৎ তাঁ-

* স্বভাবতঃ প্রবৃত্তানাং মলাদীনাং জিজীবিষুঃ। ন বেগাক্ষারয়েকীরঃ কামাদীনাস্তু ধারয়েৎ ॥ রাজবল্লভ।

† বৈদ্যঃ পুরোহিতোমন্ত্রী দৈবজ্ঞো-

হাদিগের নিকটে দৈনন্দিন শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবে।

সূর্যোদয়ের পূর্বে গাত্রোস্থান করিয়াই ক্রিয়াক্ষণ ইত্যন্তঃ পদচারণা করা কর্তব্য। কেননা সে সময়ে নিদ্রা শরীরকে একরূপ জড়ভাবাপন্ন ও নেত্রকে অসন্ন করিয়া রাখে যে, উঠিয়া শয্যোপরি অবস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ আবার নিদ্রাভিভূত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। পদচারণার সময়েই শীতল জলে একবার নেত্রপ্রক্ষালন করা উচিত। ইহাতে নিদ্রার আবরণী শক্তি নষ্ট হইয়া যার এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে। অনন্তর সূর্য উঠিতে না উঠিতে প্রত্যহ অমৃতঃ একঘণ্টা কাল প্রাতঃভ্রমণ করা বিধেয়। এতদ্দেশীয় এবং পাশ্চাত্য কৃতবিদ্যা ও সুবিচক্ষণ চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাতঃভ্রমণ অতিমাত্র হিতকর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমান ভিষকেরাও ইহাই বলিয়া থাকেন। এইরূপ ভ্রমণে কফ, মেদরোগ, শরীরের সুলভা প্রভৃতি নষ্ট করে ॥ যাহাদিগের শরীর দুর্বল বা পাণ্ডিত, তাহাদিগেরও এ সময়ে সুখপ্রচারে অর্থাৎ পাদচারে ক্রিয়াকাল বেড়ান বিধেয়। সুখপ্রচার আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধিকর

ইথ চতুর্গকঃ। প্রভাতকালে ত্র্যম্বকোনির্ভাঃ
স্বপ্রিয়মিচ্ছতা ॥ রাজবল্লভ।

অথ। মেদঃকফশ্চৌল্য * * * শি-
নাশনঃ। রাজবল্লভ।

এবং পদরোগ বিনাশক * । ঝাঁহারা ধনবান্, তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া বেড়ান লজ্জাকর বিবেচনা করিলে স্বাস্থ্য বাহনে আরোহণ করিয়া প্রাতঃভ্রমণ করিতে পারেন । হস্তীতে, অশ্বে, শকটে বা পাল্কীতে চড়িয়া বেড়াইলেও অঙ্গের স্থিরতা, বল ও অগ্নিরূপ হয়, কেবল কিয়ৎপরিমাণে বায়ু প্রকোপিত হইয়া থাকে † । কিন্তু অধিক-ভাগে উপকার লাভ হইলে যৎসামান্য অপকার অনায়াসে সহ্য করা বাইতে পারে ।

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যে শীতল বায়ু মৃদুমন প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা বিশিষ্টরূপে স্বাস্থ্যপ্রদ । তদ্বারা নিদ্রাজাত শারীরিক ক্লম ও জড়তাপনোদন হইয়া থাকে, এবং হৃদয় বলের সঞ্চার হয় । এই জন্যই আমাদের দেশে উহাকে ‘বীরবায়ু’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । শীতকালে উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে কফ-বর্ধক হয়, সুতরাং সে সময়ে প্রাতঃভ্রমণের পরিচ্ছদ উষ্ণ হওয়া আবশ্যক । বিশেষতঃ বক্ষ, কণ্ঠ ও পাদদ্বয় উত্তমরূপে পশমজাত বস্ত্রাদির দ্বারা গরম রাখা নিতান্ত কৰ্ত্তব্য । এই কয় অঙ্গেই অধিক পরিমাণে শীতানুভব হইয়া থাকে, বাসন্তীর উষাকালের ভ্রমণ পরিচ্ছদ পশম ও কা-

পাসমুজ্জ নিৰ্ম্মিত বা কেবল কার্পাসের মোটা সূতা নিৰ্ম্মিত হইলে ভাল হয় । গ্রীষ্মকালে উষাক্রমণের সময় কার্পাসজাত সূক্ষ্ম পরিচ্ছদ ব্যবহার্য্য । বর্ষাকালে প্রাতঃভ্রমণ নিষিদ্ধ ; কেবল মধ্যো মধ্যো এক একদিন আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত ও ভূভাগ বিশুদ্ধ থাকিলে বেড়ান উচিত । কিন্তু বর্ষাকালের উষাকালীন বৃষ্টিবর্ষণে সূক্ষ্মানুভব করিয়া উষোখান করিতে অলস হওয়া নিতান্ত অনুচিত । বর্ষা সময়ের উষাকালে নিদ্রিত থাকিলে অত্যন্ত বায়ুরূপ হয়, সুতরাং স্বাস্থ্যসম্বন্ধে অনেকটা অপকার ঘটে ।

প্রভাতকালে ভ্রমণ যেরূপ উপকারি, ঐ সময়ে সেইরূপ ব্যায়ামের দ্বারাও বহুল পরিমাণে কার্য্যিক স্বাস্থ্যলাভ হয় । কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ব্যায়াম উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত । স্নিগ্ধ জব্য (ঘৃত, দুগ্ধাদি) ভোজনশীল ও বলবান্ ব্যক্তির প্রতাহ ব্যায়াম (কুস্তি) চৰ্চ্চা কৰ্ত্তব্য । বিশেষতঃ শীত ও বসন্তকালে ইহা উৎকৃষ্টতম পথ্য । অপর কএকটি ক্ষতুতে আত্মহিতার্গে স্বাভাবিক ক্ষমতার অর্ধ পরিমাণে কুস্তি করা বিধেয় । যে পর্য্যন্ত কুক্ষিদেহে, ললাটে ও গ্রীবার যক্ষোদগম এবং শ্রম-বোধ ও স্বাসোন্তব না হয়, সেই পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে, তদতিরিক্ত করিলে উপকারের পরিবর্তে অপকার ঘটিবে । প্রতাহ কুস্তি করিলে শরীরের লঘুতা, কার্য্যকরণে সামর্থ্য্য ও ক্লেশসহিষ্ণুতা জন্মায় এবং বাত-পিত্ত-কফের সমতা ও অগ্নিরূপ হয় ।

* মুখপ্রচারমায়ুবাং বলাং পাদকজা-
পহং ॥ রাজবল্লভ ।

† হস্তাশ্বরথদোলাদৈর্ভ্রমণং বাতকো-
পমং স্থিরীকরণমঙ্গানাং বলাং বহ্নিব-
র্জনং ॥ রাজবল্লভ ।

বিরুদ্ধ ও অজীর্ণকর জ্বা ভোজন করিলেও পরিপাক হইয়া যায়। ব্যায়ামের আর অস্বাভাবিক শৌল্যবিনাশক অন্য ক্রিয়া নাই। যে রূপ গকড়ের নিকটে সর্পসমূহ গমন করিতে পারে না, সেইরূপ জ্বর, বাধি, শত্রু প্রভৃতি ব্যায়ামশীল মনুষ্যকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয়কাশী, যক্ষ্মারোগী, শ্বাসকাশযুক্ত, ভুক্ত, ও ক্রীসংসর্গে রূশ ব্যক্তির ব্যায়াম কর্তব্য নহে *। অতাস্তু বা-

* ব্যায়ামোহি সদা পথো। বলিনাং শ্লিষ্টভোজিনাং। স চ শীতে বসন্তে চ তেষাং পথ্যাতমঃ স্মৃতঃ ॥ সর্কর্তুযু সর্কৈর্হি মর্ত্তোরাহুহিতার্থিভিঃ শক্ত্যর্কো ন তু ক-
র্তব্যো। ব্যায়ামার্কো ন চান্যথা ॥ কুক্ষৌ ললাটে গ্রীবায়াং যদা ঘর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে। শক্ত্যর্কং তং বিজানীয়াদগ্নাসোচ্ছ্বাস-
মেব চ ॥ লাম্ববং কর্ম্মসামর্থ্যং শৈশ্ব্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা। দোষক্ষরোহগ্নিরুদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে ॥ ব্যায়ামং কুর্ক্বতো নিত্যং বিরুদ্ধমপি ভোজনং। বিদগ্ধম-
বিদগ্ধংবা নির্দোষং পরিপচাতে ॥ ন চ ব্যায়ামসদৃশমনাং শৌল্যাপকর্ষণং। ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্ত্যমরয়োহপিহি নোবলাং ॥ ন চৈনং সহসাক্রম্য জ্বরং সমধিগচ্ছতি। ব্যায়ামক্ষুণ্ণগাত্রস্য পদ্ম্যামুঘর্ষিতস্য চ ॥
ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি বৈনতেয়মিবো-
রোগাঃ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী শোষী কাশী শ্বা-
সীক্ষতাভূরঃ। ভুক্তবান্ ক্রীষু চ ক্ষীণো ব্যা-
য়ামং পরিবর্জয়েৎ ॥ রাজবল্লভ।

স্বাস্থ্যার্থে অর্থাৎ অর্থাৎ কৃষ্ণিতে কাশ, রক্তপিত্ত, শ্বাসক্রান্তি, শরীরক্ষয়, তৃষ্ণা জ্বর ও ছর্দি (বমন) প্রভৃতি রোগের উপশান্তি হয় *। ব্যায়াম পূর্ব্বোক্ত রোগগ্রস্ত, তাহাদের প্রতি ব্যায়ামের পরিবর্তে কেবল প্রাতঃভ্রমণই সুপ্রশস্ত।

প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যায়াম বা প্রাতঃভ্রমণের পূর্ব্ব মল মূত্রাদি পরিভাগ করা উচিত। তাহা না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিপরীত হইয়া পড়ে।

প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ উত্তমরূপে দন্ত-
ধাবন, জিহ্বামর্দন ও মুখ নেত্রাদি প্রক্ষা-
লন করা নিতান্ত কর্তব্য। ভারতবর্ষ উষ্ণ-
প্রধান দেশ, এখানে রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বই প্রায়
অনেকেই দন্তপতন হইয়া থাকে। প্রাচীন
ঋষিগণ ও ভিষগণ ইহা বিশেষরূপে অ-
বগত ছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা দন্তধাবন
প্রভৃতির নিমিত্ত নানাবিধ নিয়ম উদ্ভা-
বন করিয়া গিয়াছেন। রাত্রিকালে দীর্ঘ
নিদ্রাবশতঃ মুখের বৈজাত্য জন্মায় এবং
লালা নিগত হইয়া ওষ্ঠপার্শ্ব ও গণ্ডস্থল
দুর্গন্ধ হইয়া উঠে, সুতরাং ভাল করিয়া
মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। দীর্ঘকাল নেত্র
নিমিলিত থাকিলে নেত্রমল সমুদ্ভব হইয়া
দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটায়, সুতরাং শীতল জলে
নেত্রধাবনও কর্তব্য। জিহ্বায় ক্লেদ জন্মায় সু-
তরাং মার্জ্জনীলহযোগে জিহ্বামার্জন বিধেয়।

(ক্রমশঃ) শ্রীরাজ—

* অতিব্যায়ামতঃ কাসো রক্তপি-
ত্তঃ প্রবর্ত্ততে। শ্রমঃ ক্লমঃ ক্ষয়ঃ তৃষ্ণা
জ্বরছর্দিশ্চ জায়তে ॥ রাজবল্লভ।

বিরজা ।

উপাখ্যান ।

প্রথম অধ্যায় ।

আষাঢ় মাস ; বেলা প্রহরেক মাত্র আছে, আকাশের উত্তর পূর্ব কোণে এক ঋণু রহৎ নীল মেঘ সাজিয়াছে, তাহার ইতস্ততঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিদধণ্ড ছড়াইয়া রহিয়াছে । ভগবান্ কমলাপতি যতই অস্তাচল-শিখরাভিমুখী হইতে লাগিলেন, রহৎ বারিদধণ্ড ততই রহতর হইতে লাগিল । গ্রামে কেহ বলবান্ ও ক্ষমতাশালী হইলে অন্য পাঁচজনে যেমন তাহার শরণাগত হয়, তজপ ক্ষুদ্রকায় বারিদধণ্ডগুলি দেখিতে দেখিতে রহৎ বারিদধণ্ডের সঙ্গে মিশাইয়া গেল । সূর্য্য-কিরণে মেঘগুলির পশ্চিম প্রান্ত রক্তবর্ণ হইল । ঝড় স্রষ্টি আগমনের পূর্ব লক্ষণ দেখিয়া গগনবিহারী বিহঙ্গেরা ধীরে ধীরে নিম্নগমন করিতে লাগিল । দুই একটি শ্বেতকায় পক্ষী বারিদধণ্ডকে বিজ্রপ করার ছলে তাহার ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল । নদীর আর পতিব্রতা নারীর একই স্বভাব; স্বামীর মুখ বিষম দেখিলে পত্নীর বদনকমলও বিষম হয় ;—বারিদধণ্ডের কৃষ্ণকায় দেখিয়া পতিত-পাবনী ভাগীরথীও কৃষ্ণকায় হইলেন ।

এই সময়ে একখানি নৌকা গঙ্গা দিয়া নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল । নৌকাখানি আষাঢ়মাসের গঙ্গার তীক্ষ্ণ-স্রোতেনেগে পূর্বপার দিয়া দ্রুতগমনে যাইতেছিল । আরোহীরা ছইয়ের ভিতরে ছিলেন, অতি অবেলায় আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন ; আকাশে যে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সাজিয়াছে তাহা তাঁহারা দেখেন নাই । যে স্থান দিয়া নৌকা যাইতেছিল, সেখানে এমন বিপদ সময়ে নৌকা রাখিবার উপযুক্ত স্থান নাই । আকাশে যে কৃষ্ণকায় মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহা নৌকার মাঝি দেখিয়াছে, দেখিয়া ভীত হইয়াছে । উপযুক্ত স্থান পাইলে সে এখনই নৌকা রাখিবে, কিন্তু স্থান নাই । এমন সময়ে, যাহারা নৌকার সম্মুখদিকে বসিয়া দাড় বাহিতেছিল, তাহাদের একজন মাঝিকে অনুরোধেঃ স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিল, ‘দাদা কি আন্দাজ কর ?’, মাঝি কহিল ‘আন্দাজ করব আর কি ? পাখী সব নাচতেছে দেখ না ?’ পাছে আরোহীরা শুনিতে পান ও শুনিতে পাইয়া ভীত হন, এই জন্য উহারা অনুরোধেঃ স্বরে কথা কহিয়াছিল, কিন্তু

কথা তাঁহাদের নিকট অব্যক্ত রহিল না। নৌকার মধ্যে সকলেই ঘুমাইতেছিলেন, কেবল একটি বালিকা জাগরিত ছিল। আকাশে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই; কিন্তু গঙ্গার জল অত্যন্ত ক্রমবর্ধন দেখিয়া সে চমৎকৃত ও ভীত হইয়াছিল। এখন সে মাঝিদের কথা শুনিয়া আপনা আপনি কহিল, ‘গঙ্গার জল এমন হইল কেন? আকাশে বুঝি মেঘ করিয়াছে?’ তাহার কথা এক জন যুবক আরোহীর কর্ণে গেল, তিনি আকাশে মেঘের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নৌকার ঝাপ খুলিয়া দেখিলেন, পূর্ব ও উত্তরদিকে ভয়ানক মেঘ করিয়াছে। তিনি ভৃত্যকে তামাকু সাজিতে আজ্ঞা করিয়া ছইয়ের উপরে উঠিয়া বসিলেন। যুবক বড় ভীত হইয়াছিলেন, তিনি যদি এই সময়ে একাকি এই নৌকার থাকিতেন, এত ভীত হইতেন না; কিন্তু তাহার সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল।

ভৃত্য তঁহা কাটি বাবুর হাতে দিল। বাবু তামাকু টানিতে টানিতে মাঝিকে কহিলেন ‘যেখানে হউক, এক জায়গায় নৌকা ধর।’

মাঝি কহিল, ‘কর্তা এ পারে নৌকা রাখ্বে জায়গা নাই। আর দুকোশ ভেটিয়ে গেলেও এপারে নৌকা রাখ্বে জায়গা পাব না। হুকুম হয়ত ওপারে গিয়ে নৌকা ধরি।’

বাবু কহিলেন ‘পাড়ি দিবার সময়

নাই, পাড়ি দিতে দিতে জল ঝড় আসিয়া পড়িতে পারে; এই পারেই নৌকা ধর।’

নৌকার একজন পূর্ববাসিনা অঙ্কলের দাড়ি ছিল, সে বাবুর কথায় বিরক্ত হইয়া কহিল ‘এ পারে নাও রাখ্বে কি জান খোয়াবার লৈগা, আশা আশা পড়ি ধর, যা থাকে নসিবে, আপনি আপনে হইবে।’

ইহার কথা শুনিয়া বাবু রাগত হইলেন, কহিলেন; ‘মাঝি ওর কথা শুনিও না। নৌকা ডুবি হইলে ওদেরত কোন ভর নাই। ওরা জলজন্তু।’

বহুরদি বাবুর কথা শুনিয়া বড় রাগিয়া কহিল ‘বাবু কথা কৈবা, গালি দিবা কেন? আর যদি কসুর করি আমারে গালি দিবা, আমার দেশের লোকের গালি দিবা কেন? আমারে গালি দিলে সহিতে পারি, আমার দেশের লোকের গালি দিলে আমার দিলে খোঁচা লাগে।’

মাঝি বহুরদিকে দুই একটি মিষ্ট ভৎসনা করিয়া চুপ করাইল, পরে বাবুকে কহিল ‘বাবু পূবে হাওয়া আছে, দেখতে দেখতে পাড়ি দিব, ভয় নাই।’ মাঝি নিজে ভীত হইয়াছিল, তথাপি বাবুকে কহিল ‘ভয় নাই।’ মানুষের স্বভাব এই আপনি বিপদ সাগরে ভাসিয়া অন্যকে বলে ‘ভয় নাই।’

বাবু মাঝির কথায় কোন উত্তর করিলেন না; মাঝি তাঁহার মৌনভাব সম্মতির লক্ষণ জানিয়া পাড়ি ধরিল। দা-

ড়িয়া পাইল তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুসলমান দাড়িয়া আল্লা আল্লা বলিয়া নৌকার গলুইয়ে জল ছিটাইয়া দিল ।

নৌকার অভ্যন্তরে স্ত্রীলোক দুটির একটি বালিকা আর একটি মধ্যবয়স্ক । বালিকাটি সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল ‘ঝি, তুমি সাঁতার জান ? ।’ সে কহিল ‘বক্রেস্বর নদীর তীরে আমার জন্ম বটে, কিন্তু আমি কখনও সাঁতার জানি না ।’

বালিকাটি আবার কহিল, ‘তবে যদি নৌকা ডোবে ত কি করিবে ?’

ঝি কহিল, ‘অমন কথা বলতে নাই, শ্রুর হয়ে বোসে থাক ।’

এমন সময়ে পূর্বদিক হইতে প্রবল বেগে বায়ু বহিল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় ফোটার রুষ্টি আসিল ; গঙ্গা জলের উপর চড় চড় শব্দে ও নৌকার ছইয়ের উপর চটাস্ চটাস্ শব্দে জল পড়িতে লাগিল ।

পাইলে দম্কা বাতাস লাগাতে নৌকা কাইত হইল, নৌকায় বিস্তর জল উঠিল । ঝি ভয়ে কাঁপিতেছিল এবং ত্রাহিরবে মা গঙ্গাকে ডাকিতে লাগিল । এক জন দাড়ি নৌকার জল সঁচিতে আরম্ভ করিল । অন্যরা পাইলের দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । বাবু হুঁকা হাতে করিয়া নীচে নামিলেন, এবং নৌকা ডুবিলে যেন সঁহজে বাহিরে পড়া যায়, এমন স্থানে রহিলেন ।

বাবুর অবস্থা দেখিয়া বছরদি নিকটে

আসিয়া কহিল, ‘বাবু তোমার ডর লাগছে ? ডরাইও না ! যদি নাও ডোবে, আমি থাকতে তুমি মরবা না ।’

চারিদিক অন্ধকার করিয়া ভয়ানক ঝড় রুষ্টি হইতে লাগিল । নদীর কূল দৃষ্ট হয় না । বিপদ নিশ্চিত জানিয়া সকলে ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিল । যুবক নাস্তিক ছিলেন, তিনিও এক্ষণে বিপদবান্ধব ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিলেন । ইতিমধ্যে আবার দম্কা বাতাস আসিয়া নৌকা জলমগ্ন করিল ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

গঙ্গার উভয় তীরে গঙ্গাযাত্রীদের বাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে গৃহ নির্মিত আছে । তাহাকে মরার ঘর বলে । কাহারও জীবনসংশয় পীড়া হইলে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে আনিয়া সেই গৃহে রাখে । গাঙ্গ্যপ্রদেশের অনেক দূরবর্তী স্থান হইতেও মরণাপন্ন পীড়িতদিগকে এইরূপে গঙ্গাতীরে আনা হয় ।

পাঠককে এক্ষণে আমাদের সঙ্গে একটি মরার ঘরে যাইতে হইবে । ঐ দেখ, এক তক্তাপোষে একজন রুদ্ধ প্রাণসংশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়া আছেন । উহার শয্যাপাশ্বে উহার দুই পুত্র বসিয়া আছেন । আর ঐ যে রুদ্ধ আসন্নমরণ ব্যক্তির মস্তকে হস্তপ্রচার করিতেছেন, তিনি রুদ্ধের পত্নী । অমটাই অতীত হইল

এ পীড়িত ব্যক্তিকে এখানে আনা হইয়াছে। জলহিম্মোলে পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হওয়াতে রক্তের আত্মীরেরা অত্যন্ত ভাবনামুক্ত হইলেন। কেননা গঙ্গাযাত্রার পর কোন ব্যক্তির মরণ না হইলে, এদেশে বড় কষ্টের বিষয় হয়। বহুবারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে গৃহে লইতে হয়; তথাপি একটা অখ্যাতি থাকিয়া যায়। কিন্তু আজি ঝড় রুষ্টি দেখিয়া রক্তের আত্মীরেরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা রক্তকে গঙ্গাজলে স্নাত করিয়া দপি ভাত খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আবার যে গৃহে রক্তকে রাখা হইয়াছে, সে গৃহের দ্বারসকল মুক্ত; মুক্তদ্বার দিয়া বিলক্ষণ স্নিগ্ধ মাকতহিম্মোল গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। এই সকল কারণে রক্তের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। এক জন কবিরাজ নিকটে ছিল, সে নাড়ী ধরিয়া কহিল, 'আর বিলম্ব নাই।' সকলে রক্তের প্রাণপ্রস্রাবের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে কবিরাজের অনুমতি পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নাভীদেশ পর্যন্ত গঙ্গাজলে রাখিয়া, মস্তকে গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃত্তিকা দিয়া (কফের জোর বাড়াইয়া) সকলে হরি নাম করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, এ সময়ে রুষ্টি নিবারণ হইয়াছিল, কেবল বেগে শীতল বায়ু বহিতেছিল। রক্তের জন্য চিতা প্রস্তুত, কেবল তাঁহার মৃত্যু হইলেই হয়। অনেক

ক্ষণ পরে তাঁহার কঠিন (নির্মজ্জ) প্রাণ প্রয়াণ করিল। শাস্ত্রবিহিত কার্য করিয়া তাঁহার দেহ চিতায় আরোহিত করা হইল। চিতা বায়ুতরে জ্বলিয়া উঠিল। রক্তের পত্নী গঙ্গাতীরে চিতার অনতিদূরে বসিয়া অনুচ্চ রোদন করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের নব্যদলের পাঠকেরা হয়ত বলিবেন, 'এ বড় বেহারা স্ত্রীলোক; যাহাকে জোর করিয়া মারিল, তাহার জন্য আবার রোদন কেন?' আমরা একপা পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের কথা স্মরণ করুন। পুত্র বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলে যে হিন্দুমাতারা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, তাঁহারাই এক কালে, ধর্মের অনুরোধে, পাবাণে বুক বাঁধিয়া, গঙ্গাসাগরে মহাস্তে সন্তান বিসর্জন করিতেন। ধর্মের অনুরোধে স্ত্রীলোক কেন, পুরুষ কি না করিতে পারে? আর কি না করিয়াছে?

ঝড় রুষ্টি থামিয়া গিয়াছে; আবার আকাশে বড় বড় নক্ষত্র ফুটিয়াছে; আবার অনন্ত নীল আকাশে শশধর দেখা দিয়াছেন; আবার ভাগীরথীর তরঙ্গ নানা রঙ্গে নক্ষত্রশশধরশোভিত আকাশমণ্ডলের ছবিখানি বুকে করিয়া নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে যাইতেছে।

পণ্ডিতেরা বলেন, এ জগতের ধন মান সকলিই অস্থায়ী; আমরা বলি, এ জগতের শোক দুঃখও অস্থায়ী। কালে সকলই সহিয়া যায়। রক্তার শোকাবেগ অনেক

হাস পাইল । তিনি রোদন পরিত্যাগ করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন । মনে মনে কি ভাবিতেছেন । এমন সময়ে অদূরে স্ত্রী লোকের অনুরু রোদন শুনতে পাইলেন । প্রথমবার শুনিয়া কিছু চাহিতে পারিলেন না ; আবার মন দিয়া শুনিলেন ; বুঝিলেন, এ স্ত্রীলোকের রোদন শব্দ । রুদ্ধা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন, ‘গঙ্গাধর !’ গঙ্গাধর মাতার নিকটে আসিলে রুদ্ধা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ‘ঐ দিকে মেয়ে মানুষের কারা শুনতে পাচ্ছি ; আমার সঙ্গে এস, দেখে আসি ।’ মাতাপুত্র চলিলেন, যাইয়া দেখেন, একটি বালিকা নদীতীরে বালুকা চড়াতে পড়িয়া রহিয়াছে, অনুরূপে রোদন করিতেছে, উচ্চ রোদন করিবার যেন শক্তি নাই । রুদ্ধা অতিবাস্তে নিকটে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসিলেন, ‘তুই কে মা ?’ বালিকা কোন উত্তর করিল না, হাত বাড়াইয়া রুদ্ধার হাত ধরিল । কিন্তু রুদ্ধা তাহাকে তুলিতে পারিলেন না দেখিয়া গঙ্গাধর তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে লইল । রুদ্ধা কহিলেন, ওকে আগুনের কাছে নিয়ে চল । গঙ্গাধর লইয়া চলিল । যাইতে যাইতে রুদ্ধা বালিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘বাছা তোর এ দশা কেন ?’ বালিকা অতি অক্ষুট স্বরে কহিল, ‘নৌকা ডুবি হয়েছে ।’ রুদ্ধা বুঝিলেন যে, বৈকালিক ঝড়ে উহার এই দশা করিয়াছে ।

চিতার নিকটে আসিয়া রুদ্ধা আপনি স্বতন্ত্র অগ্নি জ্বালিলেন, এক জনকে দিয়া একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া বালিকাকে পরাইলেন, এবং অগ্নির নিকটে একটি মাদুরে বালিকাকে রাখিয়া সৈঁকিতে আরম্ভ করিলেন । অনেক সৈঁকিতে সৈঁকিতে বালিকার শরীর একটু উষ্ণ হইল । রুদ্ধা দেখিলেন, বালিকাটি পরমসুন্দরী ; শরীরে নৃতন গহনা । এক্ষণে জিজ্ঞাসিলেন, ‘হাঁ মা, তোর নাম কি মা ?’ বালিকা উত্তর করিল, ‘আমার নাম বিরজা ।’ রুদ্ধা বালিকার অর্দ্ধশুষ্ক কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোরা আপনারা কি ?’ বালিকা কাদিতে কাদিতে বলিল, ‘আমরা ব্রাহ্মণ ।’ রুদ্ধা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ‘কাদিও না ; এখন আমাদের বাড়ী চল ; খোঁজ করিয়া আমি তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিব । আমি তোমাকে আপনার মেয়ের মত রাখিব ।’

অনেকক্ষণ পরে শব্দাহ শেষ হইল । শাস্ত্রকৃত্য সম্পাদন করিয়া সকলে সেই মরার ঘরে যাইয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিল । পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে যাত্রা করিল । সে দিবস তাহারা গৃহে পৌঁছিতে পারিল না ; পথে এক চটিতে রাত্রি যাপন করিল ; পর দিন অপরাহ্নে গৃহে পৌঁছিল । ইহাদিগের বাটী গঙ্গাতীর হইতে ১৬ ক্রোশ দূরে । বিরজা ইহাদের সঙ্গে গিয়া ইহাদের বাটীতে

রহিল। বাণীস্ব সকলে বিরজাকে যথেষ্ট
স্নেহ করিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে রক্তকে পাঠক গঙ্গাভীরে তনু-
তাগ করিতে দেখিলেন, তাঁহার নাম
রামতনু ভট্টাচার্য্য; এ বাণী তাঁহার।
রামতনু ভট্টাচার্য্য বিনক্ষণ সজ্জতিপন্ন গৃ-
হস্থ ছিলেন। দশ বিঘা জমি জুড়িয়া
তাঁহার বাণী। বাণীর বাহিরে একটি ও
খিড়কিতে একটি, এই দুইটি পুষ্করিণী।
প্রায় দুই শত বিঘা জমি আবাদ করা হয়।
বাহির বাটির ও ভিতর বাটির উঠান দুটি
যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এতদ্ভিন্ন টাকা
কড়ি ধার দেওয়া আছে। ভট্টাচার্য্য ম-
হাশয়ের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম গোবিন্দ-
চন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম গঙ্গাধর। ইহাদের
বিবাহ হইয়াছে। এক্ষণে গোবিন্দের বয়ঃ-
ক্রম পঞ্চবিংশতি, গঙ্গাধরের অষ্টাদশবর্ষ।
গঙ্গাধর বর্দ্ধমানের ইংরাজি বিদ্যালয়ে
লেখা পড়া যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছে। আ-
মরা যৎকিঞ্চিৎ বলি, কিন্তু রামতনু ভ-
ট্টাচার্য্য মনে করিতেন, লেখা পড়া ইহা
অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যৎ-
কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিলে যে দোষ
হয়, তাহা গঙ্গাধরের হইয়াছিল। কিন্তু
গোবিন্দচন্দ্র বড় ধীরস্বভাব—যদিও তিনি
কখনও বিদ্যালয়ের কাষ্ঠাসন স্পর্শ করেন
নাই তথাপি সচ্চরিত্র। গোবিন্দ সর্বদা

সংসার সইয়া বাস্তু। সময়ে আহার হয় না,
সময়ে নিদ্রা হয় না। প্রাতঃকালে মাঠে
যান, একটা দুটার সময় গৃহে আসিয়া
স্নানাহার করেন; আহারান্তে আবার
তাগাদায় বাহির হন। কিন্তু গঙ্গাধর
এ সকল চাষার কর্ম মনে করে; সকালে
সকালে স্নানাহার করিয়া সে গ্রামের নি-
ক্ষম। লোকের সঙ্গে তাস পিটে ও বড়ে
টিপে সময়সংহার করে। গুণ ত এই, ই-
হাতে যদি আবার দেও বলিলে বাড়ীতে
কোন জিনিষ না পান, তবে মায়ের প্রতি
রাগ, বড় বউয়ের প্রতি রাগ, দাসদাসিদের
প্রতি রাগ। সকলে গঙ্গাধরকে বাবু বলে,
গঙ্গাধর বাবুর ভয়ে সকলে ভীত। জ্যেষ্ঠ-
ভ্রাতা গঙ্গাধরকে অত্যন্ত ভাল বাসেন,
তাঁহার চক্ষে গঙ্গাধরের দোষ দোষ বলিয়া
বোধ হয় না। গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী অ-
ত্যন্ত সাধুশীল; তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি
বৎসর, দুটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। গো-
বিন্দের মাতা নামে গৃহিণী, কিন্তু ঘরকরা
সকল জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর হাতে। গঙ্গাধরের
পত্নী আর বিরজা একই বয়েসী; অর্থাৎ
গঙ্গাধরের পত্নীর বয়স দশবর্ষ মাত্র, নাম
নবীনমণি। এ বয়সে বালিকারা স্বামি-
গৃহে যার না; কিন্তু সংক্রামক জ্বরে ন-
বীনের পিতা মাতা উভয়ের মৃত্যু হওয়াতে
নবীনকে এখানে আনা হইয়াছে।

বিরজা এই গৃহে আসিয়া বাস করিতে
লাগিল। সে আপনার স্বভাবগুণে সক-
লের প্রিয়পাত্র হইল। বিশেষ ছোট বউ

নবীনের সহিত তাহার অত্যন্ত ভালবাসা
হইল। দুইজন এক সঙ্গে স্নান করে, এক
সঙ্গে আহার করে, এক সঙ্গে খেলা করে।

এক দিন গৃহিণী আহারাশুে দাবায়
মাদুর পাতিয়া শুইরাছেন। বিরজাকে
মাথা দেখিতে বলিয়াছেন, সে শিয়রে
বসিয়া মাথা দেখিতেছে। এমন সময়ে
গৃহিণী বিরজাকে নৌকা ডুবির রক্তান্ত
বিরত করিতে অনুরোধ করিলেন।

বিরজা বালিকা, নবীনের সঙ্গে খে-
লার মত থাকিত, স্মরণে সে সকল বিষয়
এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল। এক্ষণে
তাহার সকল কথা মনে পড়িল। তাহার
চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। গৃহিণী
কহিলেন, ‘এখন আর ভর কি? এখন
বল। না বলিলে কেমন করিয়া তোমাকে
তোমার বাপের বাড়ী পাঠাব?’

বিরজা কহিল, ‘আমার বাপ মা
কেউ নাই, আমি কোথা যাব; এখানেই
থাকিব।’

‘তা থাক না, কে তোমাকে তাড়ার?
তবে তোমার আর কে আছে?’

বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,
‘আমার কেউ নাই।’

রক্তা যে রাত্রে বিরজাকে পাইরা-
ছিলেন, সে রাত্রে বিরজার সীমন্তে সিন্দুর-
ফোটা দেখিয়াছিলেন, সে কথা তাহার
মনে আছে। তিনি আবার কহিলেন, তো-
মার বিয়ে হয়েছে কোন্ গ্রামে?’

‘আমি সে গ্রামের নাম জানি না।’

‘তোমার বাপের বাড়ী কোন্ গ্রামে?’

‘আমি জানি না।’

‘তোমার মামার বাড়ী কোথা?’

‘আমি তাও জানি না।’

রক্তা আর কোন কথা উদ্ঘাপন না
করিয়া নিদ্রা যাইতে মনস্থ করিলেন।
নবীন নিকটে আসিয়া বিরজাকে হাতে
ধরিয়া লইয়া গেল। যাইতে যাইতে তা-
হার চক্ষের জল মোচন করিয়া দিল।

ইহার একবৎসর পরে বিরজা একদিন
নবীনকে আত্মবিবরণ বলিল, তাহা এই—

‘অতি ছোট বেলায় আমার পিতার
মৃত্যু হয়, তাহার পর আমার মাতা শান্তি-
পুরের এক গোস্বামীর বাড়ীতে আমাকে
লইয়া থাকেন। মাতা সেই বাড়ীতে রা-
ধুনীর কৰ্ম করিতেন। আমার যখন চারি-
বৎসর বয়স, তখন মাতার মৃত্যু হয়। মা-
তার মরণে আমি অনেক কাঁদিয়াছিলাম।
সেই অবধি আমি সেই গোস্বামিদের বাড়ী-
তেই থাকিতাম। দশ বৎসর বয়সে আ-
মার বিবাহের কথা হয়, কলিকাতার এক
বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের
আট দিন পরে সেই বাবু আমাকে লইয়া
কলিকাতায় যাইতেছিলেন, সেই দিন ঝড়
রষ্টি হইয়া নৌকা ডুবি হয়। আমি বড়
সঁতার জানিতাম; সকলে আমাকে জল-
জন্তু বলিত। আমি সঁতার দিয়া দিয়া
নদীর তীরে আলো দেখিয়া সেইখানে
উঠি। তাহার পরে এঁরা আমাকে দে-
খিতে পাঁইয়া লইয়া আইসেন।’

আমরা বিরজার রূতাস্তর অবশিষ্টাংশ বলি। বিরজা গোস্বামীদের পালিতা কন্যা বলিয়া তাহার বিবাহের বিষয়ে বড় কষ্ট হইয়াছিল। বিরজার নিজের কোন দোষ ছিল না; সে দেখিতে সর্বাঙ্গসুন্দরী। কিন্তু বিরজা কাহার কন্যা, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ নাই; সুতরাং কোন্ ভদ্র লোক বিবাহ করিবে। শান্তিপুরের একটি যুবক কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত; সে এই সংবাদ তাহার এক বন্ধুকে দেয়। বন্ধু শুনিয়া এক দিন শান্তিপুরে বিরজাকে দেখিতে যান। দেখিয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি বিদেশী, পিতা মাতাকে না বলিয়া গোপনে বিরজাকে বিবাহ করেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, বিরজাকে কলিকাতায় আনিয়া কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ রাখিয়া দিবেন। পথে নৌকা ডুবি হয় পাঠক তাহা নিজে দেখিয়াছেন। ইহার পরের রূতান্ত বিরজা নিজে বলিয়াছে।



চতুর্থ অধ্যায়।

গোবিন্দের পত্নী ভবতারিণীর পিতামহ কোরগরে। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন; এবং বিরজা ও নবীনমণিকে অবকাশমতে শিক্ষা দিতেন। চারি পাঁচ বৎসরে তাহারা উভয়ে এক রকম লেখা পড়া শিখিল, বিরজা কিছু অধিক শিখিল। বিরজা গৃহিণীর কাছে বসিয়া

রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিত, পাড়ার অনেক প্রাচীনা আসিরা জুটিয়া, শ্রবণ করিতেন।

বিরজা এক্ষণে পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে; নবীনরও এই বয়স। বিরজা গৌরাদ্দী, নবীনমণি শ্যামাদ্দী। গৌরাদ্দী হইলেই রূপবতী হয় না, আর শ্যামাদ্দী হইলেই কুৎসিতা হয় না। ইহারা উভয়েই রূপসী; কিন্তু বিরজার রূপলাবণ্য চমৎকার, নবীনের রূপলাবণ্য সাধারণ। বিরজা দীর্ঘকায়া, নবীন খর্বকায়া। বিরজার নাসিকা জয়ুগলের মধ্যস্থলে যতটুকু স্থান থাকিলে মানায়, ততটুকু স্থান অধিকার করিয়াছে; আর ততটুকু উচ্চ। কিন্তু নবীনের নাসিকা কিছু অধিক উচ্চ। বিরজার নয়ন দুটি রূহৎ, দীর্ঘাকার; নবীনের নয়ন দুটি আরও রূহৎ, কিন্তু কলিকাতার কালী প্রতিমার চক্ষের ন্যায় প্রায় কর্ণপর্ষ্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকেই যদি কবিরাজ আকর্ণ বিশ্রান্ত চক্ষু বলেন, তবে আমরা ইহাতে সৌন্দর্য্য দেখি না। বিরজার কপাল সমতল, কিন্তু নবীনের কপাল উচ্চ। বিরজার গ্রীবাদেশ দীর্ঘ, যাহাকে হংসগ্রীবা বলে, কিন্তু নবীনের গ্রীবাদেশ হ্রস্ব। অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের রূপ সমান। উভয়ের কেশদাম নিতম্বচুষিত, উভয়ের বাহু যুগলসম্মিত, উভয়ের অঙ্গুলীগুলি সুগোল পদ্মকলিকা সদৃশ, উভয়ের দেহে নবযৌবনের সম্পূর্ণ আবির্ভাব, কিন্তু স্বভাববিষয়ে বৈলক্ষণ্য আছে। উভয়ে একত্র বাস করেন, অকু-

ত্রিম প্রণয় ; কিন্তু উভয়ের স্বভাব এক-
রূপ নহে । বিরজা মিষ্টভাষিনী, নবীনও
মিষ্টভাষিনী ; কিন্তু যে স্থলে উচিত কথা
বলিলে অন্যের মনে কষ্ট হয়, বিরজা সে
স্থলে কোন কথা বলে না, নীরবে থাকে ।
নবীন তাহা পারে না ; অন্যের মনে কষ্ট
হউক, আর না হউক, আপনি সকল স-
ময়ে উচিত কথা বলে । সত্য ও উচিত
কথা বলাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু বলিলে
যদি পরের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহা
হইলে না বলিয়া মৌনাবলম্বন করা ভাল ।
নবীন ইহা জানিত না, বা বুঝিত না ।
গঙ্গাধরের সঙ্গে নবীনের সুপ্রণয় না হই-
বার ইহাই এক প্রধান কারণ । গঙ্গাধর
সমস্ত দিন তাস পিটে ঘরে আনিলে,
বিরলে পাইয়া নবীন তাহাকে ভৎসনা
করিত । অকপটচিত্তে তাহার দোষের কথা
উল্লেখ করিত । গঙ্গাধরের মঙ্গল সাধনো-
দ্দেশে নবীন এরূপ করিত ; কিন্তু গঙ্গা-
ধর তাহা বুঝিত না । সে মনে করিত স্ত্রী
স্বামীর অধীন ; স্বামীর দোষ উল্লেখ ক-
রিতে তাহার অধিকার নাই । তাহার স্ত্রীকে
গৃহের সামগ্রাবিশেষ জ্ঞান করেন, তা-
হার গঙ্গাধরের সঙ্গে একমত হইবেন ;
এবং স্ত্রীর মুখে আপনার দোষ উল্লেখ শু-
নিয়া বিরক্ত হইবেন । কিন্তু এরূপ মহাত্মা-
দিগকে আমরা জানাইতেছি যে, স্ত্রীলো-
কেরা আপনাদিগকে স্বামিগৃহের তৈয়ম-
বিশেষ জ্ঞান করে না ; তাহার আপনা-
দিগকে স্বামীর সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী,

স্বামীর বন্ধু, স্বামীর সুপরামর্শদাতা মন্ত্রী ;
অধিক কি, তাহার আপনাদিগকে সং-
সার রূপ তরণীর হালি জ্ঞান করে । এজন্য
আবশ্যক স্থলে স্বামীকে ভৎসনা করিয়া
থাকে । কিন্তু নবীন যেমন দোষী স্বামীর
প্রতি সর্বদা আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করিত,
আমরা এরূপ করিতে কোন সুন্দরীকে
পরামর্শ দি না । মিষ্টবাক্যে ও সপ্রেম
ব্যবহারে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে । এবং
পরে স্বামীর অসদ্যবহারে নিজের দুঃখিত
হইয়া দুঃখের সহিত কোমল নয়ন দুটি বাষ্প-
বারি পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীকে ভৎসনা
করিয়া দেখিও, স্বামী সুপথে আইসে
কি না ।

এই কারণে গঙ্গাধর পার্শ্ব্যমানে নবী-
নকে দেখা দিত না । তাহাতে নবীনের
আরও অনিষ্ট হইতে লাগিল । গঙ্গাধর
বিরজার প্রতি অনুরক্ত হইল । বিরজার
হাস্যবেদন, বিরজার মধুর বাক্য, বিরজার
অনুরাগের ভাব, সদাই সে ধ্যান করিত ।
বিরজা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই ।
শেষে গঙ্গাধরের ভাববৈলক্ষণ্য টের পা-
ইল । কিন্তু নবীনকে বলিল না, বলিলে
নবীনের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয়,
এই ভাবিয়া বলিল না । নবীনের বির-
জার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও ভালবাসা
ছিল । এজন্য তাহার প্রতি সন্দেহ হইল
না । বিরজা আরো ভাবিল যদি একথা
নবীনকে বলি, গঙ্গাধরের প্রতি নবীন
আরও হতশ্রদ্ধ হইবে । বিরজা নবীনকে

স্বামীর সহিত মধুর ব্যবহার করিতে, ও স্বামীর মন যোগাইয়া চলিতে পরামর্শ দিল। নবীন বিরজার পরামর্শে সেরূপ করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পারিল না; যাহা তাহার স্বভাবের বিপরীত, তাহা পারিবে কি প্রকারে? বিরজা ভাবিরাছিল, নবীনের প্রতি যদি অনুরাগ দৃঢ় হয়, তবে আর গঙ্গাধর তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে না। সে কল্পনা সিদ্ধ হইল না; নবীন গঙ্গাধরকে বশ করিতে পারিল না। গঙ্গাধরের অনুরাগ বিরজার প্রতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদিন গঙ্গাধর বিরজাকে বলিল, ‘তুমি কলিকাতায় চল; এখানে দাসীভাবে আর কতকাল থাকিবে? কলিকাতায় বিধবাবিবাহ হয়, তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি কলিকাতায় থাকিব।’ বিরজা ‘অমন কথা বলিও না,’ বলিয়া গঙ্গাধরের সন্মুখ হইতে বিদ্যুতের ন্যায় চলিয়া গেল। গঙ্গাধর অবোধ, সে মনে করিল, তাহার প্রতি বিরজাও অনুরাগিনী।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভাদ্র মাস, শরতের পূর্বীয় পবন মেঘরাশি সরাইয়া অনন্ত আকাশ নির্মল করিয়াছে। মাট, ঘাট, সরোবর জলে পরিপূর্ণ। ভট্টাচার্য্যদের বাটীর খিরকির পুষ্করিণীতে বিস্তর জল হইয়াছে। আজি পূর্ণিমা রাত্রি। আহা! বিরজা ও নবীন খালাহাতে করিয়া ঘাটে গিয়াছে। পু-

ষ্করিণীর জলে অসংখ্য কুমুদিনী ফুটিয়াছে, সরোবরের কোলে তারকামণ্ডিত ও পূর্ণচন্দ্র পরিশোভিত নীল নভোমণ্ডল হাসিতেছে। কুমুদপত্রগত বারি-মধ্যে পর্যন্ত চন্দ্ররশ্মি খেলা করিতেছে। পুষ্করিণীর চারি তীরস্থ রক্ষাবলীর পত্রে চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিরজা যে খালা ধুইয়া বানবাঁধা ঘাটে রাখিয়াছেন, তাহাতে পর্যন্ত চন্দ্রকিরণ পড়িয়া হাসিতেছে। বিরজা ঘাটের আলিমায় বসিয়া আছেন, নবীন গা ধুইতে জলে নামিয়াছেন।

নবীন গা ধুইতে ধুইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বিরজা তাহা লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন, ‘নবীন এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কেন?’

‘মনের দুঃখে।’

‘কি দুঃখ?’

‘তা কি জান না?’

বিরজা, ‘জানি’ বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার কহিল, ‘ও কি ও, নবীন! তুমি কাঁদিতেছ না কি?’

‘কাঁদিতেছি।’

‘এত জলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছ কেন?’

‘বিরজে! আমার কেউ নাই যে, কাঁদিলে চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়। তাই জলে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছি যেন চক্ষের জল পুকুরের জলে মিশে যায়।’

‘কেন আমি আছি—আমি কি তোমার চক্ষের জল মুছিয়া দেই নাই?’

‘দিয়াছ—কিন্তু কতকাল দিবে?’

‘যতকাল বাচিব।’

‘তুমি কি আমার এত ভাল বাস?’

‘তা তুমি জান?’

‘আমি যদি মরি, আমার জন্তে তুমি কাঁদিবে?’

‘কাঁদিব।’

কেবল কাঁদিবে, আমি মরিলে মরিতে না?’

নবীন বিরজাকে ভাবনায় ফেলিল।

বিরজা বলিল, ‘মরিব বই কি?’

‘আমি মরিলে, আমার জন্যে মরিতে পার, তুমি আমার এত ভাল বাস না। তাহা হইলে অত ভাবিয়া বলিবে কেন ‘মরিব বৈ কি?’

বিরজা কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কহিল, ‘আচ্ছা, আমি তোমায় ভাল বাসি না, আর তোমারও মরে কাজ নাই, আমার ভালবাসাও দেখাইয়া কাজ নাই; এখন গা ধুইয়া উঠ।’

এমন সময়ে পুষ্করিণীর তীরে টিপ করিয়া একটি পাকা তাল পড়িল। তখন নবীন হানিয়া কহিল, ‘তবে বুঝি ভালবাসা, যদি আমাকে ঐ তালটি কুড়িয়ে এনে দাও।’

বিরজা একটিও কথা না কহিয়া তাল কুড়াইতে গেল। আমাদিগের পল্লীগ্রামস্থ পুষ্করিণী ও পার্শ্বকারী জানেন যে, তাল তুলার প্রায়ই ছোট ছোট অনেক রক্ষণ-তাড়ি থাকে। এ তালতলায়ও তাহা

ছিল। স্বতরাং পূর্ণিমার রাত্রি হইলেও তালতলায় কিছু কিছু অন্ধকার ছিল। তালের রং আর অন্ধকারের রং একই; বিরজা যাওয়া মাত্রই তালটি পাইল না। সে উবুড় হইয়া জঙ্গলের মধ্যে তালটি খুঁজিতে লাগিল। তাল খুঁজিতে অনেক ক্ষণ লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে তাল পাইয়া ‘পেয়েছি, পেয়েছি’ বলিয়া মস্তক তুলিয়া ঘাটের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, জল হইতে একজন পুরুষ মানুষ উঠিয়া চলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া বিরজার শরীর শীহরিয়া উঠিল। আবার তদুপে সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে আইল। ঘাটে আসিয়া নবীনকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু পুষ্করিণীর জল যেন অত্যন্ত গভীর বোধ হইল। বিরজার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। হাতের তাল অজ্ঞাতসারে মাটিতে পড়িয়া গেল। বিরজা শেষে থালা কথানি কম্পিত হস্তে তুলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল।

বাটীতে আসিয়া, অন্য যেন সন্দেহ করিবার কারণ না পায়, এমন ভাবে নবীনের অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। নবীনের শয়নগৃহ দেখিল, সলিতা আনিবার ছল করিয়া বড়বধূর শয়নগৃহে গেল, মহাভারত খানা আনিবার ছল করিয়া গৃহিণীর ঘরে গেল, কোথাও নবীনকে দেখিতে পাইল না! পাছে অন্য সন্দেহ করে, এই ভয়ে আর কিছু না করিয়া

বিরজা আপনার ঘরে ঘাইয়া শয়ন করিল।

মন উৎকণ্ঠিত থাকিলে নিদ্রা হয় না।
রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বিরজার চক্ষে নিদ্রা
নাই। বিরজার মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ;
কেবল পাশ্চ পৰিবর্ত্ত করিতে লাগিল।
এই প্রকারে আরও প্রহরেক গত হইল।
বিরজা তখন ভাবিল, এখন সকলে নি-
দ্রিত, একবার ঘাটে ঘাইয়া দেখি, কি
হইয়াছে। বোধ হয়, নবীনকে কেউ
জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তা হলে এ-
তক্ষণ নে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বিরজা
সাহসে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে
গেল। দেখিল, জলে একটি শব ভানি-
তেছে। বিরজা শব দেখিলামাত্র পশ্চাৎ
সরিয়া বাগীর ভিতরে আসিল। পরে
আপনার কক্ষে আসিয়া ভাবিল, এখন কি
করি? দুই জনে এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছি-

লাম, সকলে জানে। নবীন যদি নিজেও
জলে ডুবিয়া মরিয়া থাকে, কিম্বা আর
কেহও যদি তাহাকে মারিয়া থাকে, দোষ
আমার উপরে পড়িবে। সকলে আমাকে
সন্দেহ করিবে; নানা লোকে নানা কথা
কহিবে। থানা পুলিশ হইবে, অপমান
ও লাঞ্ছনা আমার হইবে। ‘নবীন, তুই
মরিলি, আমাকে মারিসি কেন?’

বিরজা শেষে, অনেক চিন্তার পর
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,
আজি হইতে এ বাড়ীতে আমার অন্ন উ-
ঠিল। যদি নৌকাডুবিতে মরিতাম, এ
দুঃখ হইত না। এখন কি করি? অনেক
ভাবিয়া বিরজা স্থির করিল, এস্থান পরি-
তাগ করাই পরামর্শ। এই স্থিরসংকল্প ক-
রিয়া সে ধীরে ধীরে রাত্রি থাকিতে থাকিতে
ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিল।

নিশীথ চিন্তা।

নদীর জন।

“মাগর উদ্দেশে নদী, ভ্রমে দেশে দেশে রে,
অবিরাম গতি!
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশী রূপবতী।”

ঐ যে কলকলানুমানা নদী, জ্যোৎস্না-
তরঙ্গে তরঙ্গ মিশাইয়া, উষাদিনীর মত,
প্রেম-বিস্মলার মত, আনন্দের প্রবাহের মত,
উছলিয়া উছলিয়া চলিয়া যাইতেছে, আ-

জিকার এই আনন্দময়ী উষাদিনী জ্যোৎস্না-
শায় উহার সহাস্য পুলিনই আমার এ হৃদ-
য়ের বিশ্বাসস্থল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে,
নদীর তরঙ্গও হাসিতেছে, অথচ এই হাসি-

সিতে প্রাণ কেন যে উদ্বেল, উদাস এবং
কেমন এক সহর্ষ যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উ-
ঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না । যাহারা
স্বার্থের দাস, সুখের ভিখারী এবং স-
মাজরূপ অভিনয়গৃহের ক্রীড়াপুতল তা-
হারাই গিয়া ধনীর প্রাসাদ এবং বিলা-
সীর প্রমোদভবনে স্বার্থ, সুখ এবং
সামাজিক সম্মানের অন্বেষণ করুক ; যা-
হারা অর্দ্ধমৃত, তাহারাই গিয়া মনুষ্যের
অর্দ্ধমৃত প্রণয়, অর্দ্ধমৃত আমোদ, অর্দ্ধমৃত
উপদেশ এবং অর্দ্ধমৃত হৃদয়ের জন্য লালা-
য়িত রহুক । আমার ভোগের স্থান ঐ ন-
দীর জল, বিলাসের স্থান ঐ নদীর জল,
এবং শিক্ষার স্থানও ঐ নদীর জল । আমি
উহার তর-তর-বাহি সজীব প্রবাহে যে স-
জীব সৌন্দর্য্য এবং চল-শোভা দেখিতেছি,
সংসারে কিসের সহিত তাহার তুলনা দিব ?
উহার হাস ও হৃদয়, আবর্ত ও আবেগ,
উহার ক্রোধের গর্জন, উহার মধুর সম্ভা-
ষণ, উহার অবিলম্বিত এবং অটুটহাস্যও আ-
মার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে, জ-
গতে কোন্ বস্তুকে তাহার উপমাশূল
বলিব ?

ভরঙ্গিণি ! তুমি মায়াময়ী, তুমি মহিমা-
ময়ী, তুমি চিন্তার চির-উদ্দীপনা । তোমায়
আমি ভালবাসি । তোমারও নিদ্রা নাই,
আমারও নিদ্রা নাই । তুমি অবিরাম প্র-
বাহিত হইতেছ ;—জান না কোথায় যায়,
তথাপি বহিয়া যাইতেছ । আমার হৃদয়-
নিঃসৃত দুর্গিবার স্রোতও অবিরাম প্রবা-

হিত হইতেছে ;—জান না কোথায় যায়,
তথাপি বহিয়া যাইতেছে । তুমিও আপ-
নার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপনাকে
আপনি গাইতেছ, এবং আপনার গীতে
আপনিই ঢল ঢল রহিয়াছ ;—আমিও আ-
নার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপনাকে
আপনি গাইতেছি, এবং আমার এই অ-
ক্ষুট অথচ গভীর সংগীতে আপনিই বি-
ভোর রহিয়াছি । আজি তুমি যেমন চন্দ্র-
মার অমল কৌমুদী-রাশিতে মিশিয়া গি-
য়াছ, সর্ব্বদেই কৌমুদী পরিয়াছ, এবং
সমীরণের হিল্লোলে হিল্লোলে হিল্লোল তুলিয়া
ঐ কৌমুদী লইয়াই ক্রীড়া করিতেছ,
আমার ইচ্ছা করে আজি আমিও সেইরূপ
সর্ব্বদেই তোমাকে মাখিয়া, তোমার স-
হিত মিশ্রিত হইয়া, তোমার ঐ মরাল-
নিন্দ্রা লহরীচরের সহিত ক্রীড়া করিতে
করিতে একবারে সেই অনন্ত সাগর-ক্রোড়ে
গিয়া নিপতিত হই । কিন্তু তুমি স্বাধীন,
আমি পরাধীন ! কে আমার চরণের লৌহ-
নিগড় ভাঙ্গিয়া আমাকে তোমার মত স্বা-
ধীন করিয়া দিবে ? তুমি কাহারও অ-
কুটি-ভঙ্গিতে ফিরিয়া চাও না ; আমি ম-
নুষ্যের ভয়ে সতত শশবাস্ত । কে আমার
অভয় দান করিয়া আমাকে তোমার মত
দুঃখপাতশূন্য করিবে ? হায় ! আমি যদি
তোমার ঐ একাগ্রমতি, নির্ভীকগতি এবং
উচ্ছৃঙ্খলতা লাভ করিতে পারিতাম, তবে
এতদিনে আমিও, তোমার মত, আমার
গম্যস্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতাম ।

কিন্তু আমার সে মনোরথ কি কখনও সফল হইবে ?

হে মোহাক্ষ মনুষ্য-কবি ! তুমি আমায় কি কাব্যে মোহিত করিবে, বল। তোমার কাব্য অপূর্ণ, অর্দ্ধবিকশিত। কল্পনা তোমার মানসপটে কখনও খেলা করে, কখনও খেলা করে না। উহা তোমার নিকট বিদ্ভূতের ক্ষণিক ক্ষুরণের ন্যায় এই দৃশ্য, এই অদৃশ্য। তুমি শত আরাধনা করিয়াও উহাকে হৃদয়ে বাস্তবায়িত রাখিতে পার না। তুমি লৌকিক যশের জন্য নিয়ত আকুলিত; কল্পনার অলৌকিক-শোভাময় কেলিকাননে কিরূপে প্রবেশ করিবে! তুমি হেম-হিংসার অধীন; কল্পনার অপাপবিদ্ধ অমৃতসাক্ষনে তোমার ঐ পাপচক্ষু কিরূপে রঞ্জিত হইবে! আর ভাষা? তুমি কল্পনার আকস্মিক কঙ্কণায় সত্য ও সৌন্দর্যের যে টুকু আভা দৈবাৎ দেখিতে পাও, তোমার মানুষী ভাষায় তাহাও পরিব্যক্ত হয় না;—তোমার দুর্বল বর্ণতুলিকায় তাহাও ফলায় না। আমার কাব্য ঐ তরঙ্গিনী,—পরিষ্কৃত, পূর্ণবিকশিত, এবং তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত। আমি উহাতে কখনও প্রীতির প্রমত্ত উচ্ছ্বাস দেখিয়া পুলকে পরিপূরিত হই, কখনও কঙ্কণার শূদ্রকণ্ঠ শুনিয়া দর দর ধারায় অশ্রুবিসর্জন করি, কখনও বীররসের তটাতীত কল্লোল-নাদে মত্ত হইয়া উঠি, এবং কখনও উহার অবাতিবিক্ষোভিত প্রশান্ত মূর্তি অবলোকন করিয়া, ধীরে ধীরে, চৈতন্যেরও

অগোচরে, শান্তির নির্মলনিলে নিমজ্জিত হইতে থাকি।

মনুষ্যের প্রেমে আমার বিশ্বাস নাই, মনুষ্যবর্ণিত প্রেমিক এবং প্রেমিকারও আমার শ্রদ্ধা নাই। আমি অমন আশ আশ ভালবাসা ভালবাসি না, প্রেমের অমন ভ্রমর-রক্তিতায় কখনও ডুলিয়া পড়ি না। যে প্রেম আখির পলকে পরিবর্তিত হয়, আতপতপ্ত কুরূমের মত দেখিতে দেখিতেই শুকাইয়া যায়, অথবা ত্রুতীর ন্যায় কাত্যাহত হইলেই ছিন্ন হইয়া পড়ে,—যে প্রেম মুখে এক, হৃৎক্ষে এক, সম্পাদে এক, বিপদে এক, যখন নূতন তখন এক, এবং যখন পুরাতন তখন এক, কুকবির কুহকাচ্ছন্ন চঞ্চল মনুবাই তাহা লইয়া তৃপ্ত রহিতে পারে। আমার প্রেমের গুরু তরঙ্গিনী। যদি কখনও ভালবাসি,—যদি কখনও সাধনা করি, তবে ঐ তরঙ্গিনীর নিকটই ভালবাসা এবং সাধনার মন্ত্র গ্রহণ করিব। জোয়ারে উঠিব, ভাটার নামিব, বর্ষায় ক্ষীণ হইব, শীতে ক্ষীণ হইয়া যাইব, তথাপি গতি সাগরের দিকে। যদি পক্ষতও সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহা ভাসাইয়া দিব, কি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইব, এবং যদি প্রাণ-প্রবাহ একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি অন্তঃসলিলা ফল্গুগঙ্গার ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইব। প্রেমের এমন নীলা আর কোথায় আছে?

মনুষ্য যে মনুষ্যের জন্য বিনাপ করে, তাহাও আমার হৃদয় আত্ম হইয়া না।

মনুষ্যের বিলাপ ক্ষণস্থায়ী, উহা প্রায়ই
স্বার্থ এবং কপটতার জড়িত, এবং অধিক
শুনেই নটনৈপুণ্যের ন্যায় প্রদর্শিত। প্রাতে
যাহার শোক, এবং সন্ধ্যাগমেই যাহার সুখ-
লালসা, যে লোকচারের বশবর্তী হইয়া
হাসিতে হাসিতে কান্দিয়া ফেলে এবং
ক্রন্দনের আত্মনাদ নিরন্তর না হইতে হই-
তেই কুল অরবিন্দের ন্যায় হাসিতে থাকে,
শোক যাহাকে অন্ততঃ এক যুগও ক্ষুধাতৃ-
ষ্ণায় বর্জিত, আনন্দ ও উৎসাহে বিরত এবং
শয্যাগত করিয়া না রাখে, সে কেন রুখা
শোকাকুলতা দেখাইয়া মমতার বিড়ম্বনা
করে? আমার যদি কখনও কেহ প্রিয়
হয়, আর আমি যদি কখনও প্রিয়জন-
শোকে আকুল হই, তবে ঐ পুরোনহিনী
তরঙ্গিনীর ন্যায় বিলাপ করিব। সূর্য্য উ-
দিত হইবে এবং সূর্য্য অস্ত যাইবে, চন্দ্র
তারা নভোমণ্ডলে প্রক্ষুটিত হইয়া পুন-
রায় বিলীন হইবে, আমি তথাপি ঐ দ্রব-
ময়ীর ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিব। যদি
প্রাণ ভরিয়া এবং যগান্ত বাপিয়া কা-
ন্দিতে না পারিলাম, তবে আর সে ক্রন্দ-
নের তাৎপর্য্য কি?

হে সহৃদয়! তুমি কি তোমার জীবনে
কখনও কাহারও জন্য কান্দিয়াছ, অথবা
অন্যের ক্রন্দন শুনিয়াছ? যদি কান্দিতে
কি ক্রন্দন শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে স্বচ্ছ-
সলিলা সরসুর তটে গমন কর। কত রাজা
ও রাজ্য জগতে বিরাজ করিল, কত রাজা
ও রাজ্য বিলয় পাইল। পরিবর্তনের

স্রোতে কতই কি পরিবর্তন ঘটিল। কিন্তু
সরসুর তটে আচ্ছিন্ন হা রাম! হা অযোধ্যা!
এই একমাত্র হাহাকার! জোৎস্নায় এবং
অন্ধকারে, সন্ধ্যার রক্তিমায় এবং উষার বি-
রসলাবণ্যে, সকল সময়েই ঐ হা রাম!
হা অযোধ্যা! এই একই হাহাকার-ধ্বনি
স্নেহগদগদ স্রোতস্বিনীর বক্ষঃস্থল বিদারণ
করিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, এবং প-
রদুঃখকাতরা প্রতিধ্বনিও যেন হা রাম!
হা অযোধ্যা! বলিয়াই নিশার নিস্তব্ধ গা-
ভীরোর মধ্যে বিলাপ করিতেছে।

অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী, বর্তমান যুহূর্তের
ভোগে মুখে নিমগ্ন হইয়া, ভারতের ভূত-
পূর্ব-কীর্তি চিরকীর্তনীর আরাধ্যাতিকে অ-
নায়াসে ভুলিতে পারিয়াছে;—যাঁহাদি-
গের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়া-
ছিল, যাঁহাদিগের গুণগরিমায় এবং তে-
জঃপ্রভায় ভারতভূমি দেবভূমি বলিয়া প-
রিচয় পাইয়াছিল, যাঁহাদিগের কবিজন-
স্পৃহণীর পৌকষ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত
হইয়া কবিতা আপনিই এক সময়ে প্রেমা-
ধীন। কুলকামিনীর ন্যায় ভারতনিকুঞ্জে
বিরাজমানা ছিল, ভারতসম্মান সেই প্রাণা-
ধিক-প্রিয় পৃষ্ঠনীর পূর্বপুরুষদিগকে অ-
কাতরমনে পাসরিয়া রহিয়াছে। কা-
হারও চক্ষু একবিন্দু অশ্রুবাবি দিয়াও তাঁ-
হাদিগের তর্পণ করে না; কাহারও হৃদয়
তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া সামান্য একটি
নিঃশ্বাসেও উত্তপ্ত হয় না; কেহ দিনান্তেও
একবার তাঁহাদিগের নাম করিয়া স্ববংশ-

বাৎসল্য ও স্বজনানুরাগের পরিচয় দেয় না। কিন্তু আর্থের গৌরবসহচরী কালিন্দী এবং ভাগীরথী, নর্মদা এবং গোদাবরী আজি বিংশতি শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানেও আর্থ্যনাম ভুলিতে পারে নাই। উহারা অদ্যাপি পুত্রশোকাতুরা জননীর ন্যায়, পতিশোক-বিবশা বিধবার ন্যায়, ভারতীয় আর্থের জন্য নিয়ত বিলাপ করিয়া, তটস্থিত তকলতা এবং তরুণাশ্রিত বিহঙ্গনিচরকেও শোকে সংজ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিতেছে; এবং যাহার শরীরে শোণিতের কিঞ্চিদ্রোণও সঞ্চার আছে, যাহার হৃদয়যন্ত্র প্রায়-নিষ্পন্দ ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় এখনও একটুকু একটুকু স্পন্দিত হইতেছে, ঐ মর্ম্মস্পর্শি নৈশবিলাপ তাহাকেও আকুল ও উন্মত্ত করিয়া ভুলিতেছে।

ধিক্ আমার! আমি আপনাকে আপুনি মনুষ্য বলিয়া গণনা করি! ধিক্ আমায়! আমি আমার এই শীতমকুচিত পাষণকঠিন প্রাণের আবার স্পর্শা করি!

আমি যদি এইরূপ নিম্নগ্ন মনুষ্য না হইয়া বৃক্ষের একটি পাতা কি বনের একটি কুল হইতাম, তাহাও ইহা অপেক্ষা শতগুণে আমার ভাল ছিল। আমার এ আশুণ তাহা হইলে আর আমার দাহন করিত না, লজ্জার এবং অনুতাপে অহোরাত্র এইরূপ পুড়িয়া মরিতাম না, এবং স্মৃতি ও আশা, অভিমান এবং আত্মাবমাননার বিরোধ-দুঃখও আমাকে সর্ব্বদা এরূপ দংশন করিত না। যেমন স্রোতের জলে নির্ঝালা পুষ্প,—হর্ষ নাই, বিষাদ নাই, ভূত নাই, ভবিষ্যত নাই,—আমিও তাহা হইলে ঠিক সেইরূপ থাকিতাম, এবং চিরকাল তরঙ্গবক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া অবশেষে ঐ স্রোতের জলেই মিশিয়া যাইতাম। আমি আছি কি নাই কেহ তাহা দেখিত না, আমি ছিলাম কি না তাহাও কেহ জানিত না। যদি দেখিত কি জানিতে পাইত, তাহা হইলেও কেহ আমার হাসিত না, কি আমার জন্য কাদিত না।—(উদাসীন।)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সরোজিনী, বা চিতোর আক্রমণ নাটক। পুরুবিক্রম নাটকরচয়িতা কর্তৃক প্রণীত।—এই নাটকখানি গ্রীক-কবি ইউরিপাইডিজের ইফিজিনিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকের অনুরূপ। কিন্তু অনুরূপিতে প্রায়ই যে সকল দোষ ঘটে, ইহাতে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। ইহা

সর্ব্বাংশে নূতন সৃষ্টির মত হইয়াছে; যাহার কবিত্ব নাই, যাহার রূপনা স্ফূর্তিমতী নহে, যিনি পুরাতনকে নূতন করিতে না পারেন, এইরূপ অনুকরণ তাঁহার পক্ষে এক অসাধ্যব্যাপার। আমরা পুরুবিক্রম পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে যুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছি; সরোজিনী পাঠে বুঝিয়াছি যে,

তিনি আত্মগোপনের জন্য অশেষ যত্ন ক-
রিলেও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আর অ-
ধিকদিন অপরিচিত রহিতে পারিবেন না।
গ্রন্থনায়িকা সরোজিনী সৌন্দর্যের এক
আশ্চর্য্য প্রতিমূর্তি। প্রীতি এবং পবিত্রতা
সরোজিনীতে যেন এক হইয়া গিয়াছে।
পবিত্রতা প্রীতির ন্যায় কমলীয়া প্রতিভাত
হইতেছে, এবং প্রীতি কুসুমকোমলা হই-
য়াও পবিত্রতার উজ্জ্বল জ্যোতিতে শোভা
পাইতেছে। এইরূপ চিত্রনৈপুণ্য সামান্য
শক্তির কার্য্য নহে। আমরা এই নাটক-
খানির সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু
না বলিয়া ইহার দুইটি কবিতা পাঠকব-
র্গকে উপহার দিব। আমরাদিগের নি-
শ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ
করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে মুকবি ব-
লিয়া প্রশংসা করিবেন, সহৃদয় বলিয়া
ভাল বাসিবেন, এবং স্বদেশবৎসল বলিয়া
তাহার নিকট শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাশে
বদ্ধ হইবেন।—

“পরানে আত্মি দিয়া সমর-অনলে,
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চ’লে,
এখন কি মুখ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,
এখন কি মুখে আর ধরিব পরাণ।
হৃদয় হরেছে ছাই, দেহও করিব তাই,
চিতার অনলে শোক করিব নিৰ্ব্বাণ।

দূর হ ! দূর হ তোরা ভূষণ-রতন !
বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায় ;
কবরি ! তোরেও আজি করিনু মোচন,
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায় ;
অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,
লয়ে যাও পুতি পুত্র আছেন যথায় ;
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়।

(সকলে সম্মুখে)

জ্বল জ্বল চিতা ! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বাল।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুণ
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥
শোন্‌রে যবন ! শোন্‌ রে তোরা !
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালানি সবে,
সাক্ষী রলেন দেবতা তার,
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

* * *

(কতকগুলি আহত রাজপুত সম্মুখে)

দ্যাখ্‌ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,
দ্যাখ্‌ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্‌ রে গগন !
স্বর্গ হ’তে সব দ্যাখ্‌ দেবগণ,
জ্বলদ-অক্ষরে রাখ গো লিখে ।
স্পর্কিত যবন, তোরাও দ্যাখ্‌রে,
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,
সঁপিছে পরাণ-অনল-শিখে ॥ ”

সাধনা ও সিদ্ধি।

মনুশ্যালোকে যাহা কিছু লুপ্তকর, যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তাহাই সাধনাসাপেক্ষ। বিনা সাধনায় কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। বিদ্যা, বৈভব, মান, প্রণয়, প্রভুত্ব, পরাক্রম, চারিত্রবল, আত্মশোধন, স্বজাতির উন্নতি, স্বদেশের গৌরব বিস্তার, স্বাধীনতা অথবা স্বর্গমুখ, ইত্যাদি সর্বপ্রকার সম্পদই সাধনার অধীন। সাধনায় বজ্রবিদ্যায় ভূতোর কার্য্য করে, পর্ব্বত স্বকীয় পাষাণবন্ধ বিদারণ করিয়া সাধকের গতানুগতের জ্ঞান পথ খুলিয়া দেয়, অন্ধকার আলোকের দ্বারা দৃষ্টি সহায় হয়, এবং যাহা কল্পনার চক্ষেও কেহ দেখিতে পায় না, তাহা স্বাভাবিক কার্য্যের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এই নিমিত্তই সাধনার নাম ব্রত, সাধনার নাম তপশ্চর্যা, এবং সাধনার নাম যোগ। যাহারা সাধনার পথে পথিক হইয়া যত্নসহকারে ব্রত পালন করেন,—তপস্বীর দ্বারা উচ্ছাতেই একবারে ডুবিয়া যান, তাঁহারা সিদ্ধ হন। যাহারা তাহা না করিয়া চিরকালই স্রোতের জলে ভাসিতে থাকেন, তাঁহারা চিরকালই ঐরূপ ভাসমান রহেন।

যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে চাহেন, তাঁহাকে তদুপযোগিনী সাধনা অবলম্বন করিতে হয়। যথা, যিনি সরস্বতীর সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা; যিনি জা-

তীয় স্বাধীনতারূপ মহামুদ্রের সাধক তাঁহার আর একরূপ সাধনা। যিনি প্রভুত্বের সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা, যিনি প্রেমের সাধক, তাঁহার আর একরূপ সাধনা। গাণিনিও আর গারিবল্ডী, শঙ্করাচার্য্য আর শিবদ্রী, অথবা হাওয়ার্ড আর ক্রমওয়েল, এবং চৈতন্য ও প্রতাপাদিত্য, ইহারা সকলেই অতি শ্রেষ্ঠ কল্পের সাধক, অথচ ইহাদিগের সাধনা বিভিন্ন প্রকারের। ইহাদিগের কাহারও হস্তে বীণা, কাহারও হস্তে ভেরী। কেহ কেবলই কুমুম চয়ন করিয়াছেন, কেহ কেবল কণ্টক চয়ন করিয়া তদ্বারাই পরিশেষে কুমুম-কোমল শয্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, কেহ অশ্রুর মূল প্রস্রবণ পর্য্যন্ত শোষণ করিবার জন্য আপনার ক্রুপিওকেও ছিড়িয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই অনেকোও একতা আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও কতকগুলি নিয়ম বিষয়ে অভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে সর্বনিম্ন সাধনার বীজমুদ্রারূপ সেই সাধারণ নিয়মগুলিই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

সাধনার প্রথম অঙ্গ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ—অথবা মন্ত্রপরিগ্রহ। কৃতী পুরুষেরা বহু-

চিন্তা, বহুপর্ষাবেক্ষণ এবং নিঃসঙ্গ হৃদয়ে বহু আলোচনার পর কোন না কোন মস্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং শয়নে, জাগরণে, নির্জনে কি লোকারণ্যে সতত ঐ ইষ্টমন্ত্রই জপ করিতে রহেন। এই মন্ত্র গ্রহণেই মনের একাগ্রতা, এবং এই একাগ্রতাতেই উন্নতি। নাবিক যেমন গভীর অন্ধকারের মধ্যে নক্ষত্রবিশেষের প্রতি চক্ষুঃ স্থির রাখিয়া সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, প্রকৃত সাধকেরাও সেইরূপ আপনার মূলমন্ত্রে মনঃসম্মিবেশপূর্বক অনন্ত সংসার সমুদ্রের তরঙ্গরাজি ভেদ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হন। সুতরাং তাঁহাদিগের দৃষ্টি অর্থযুক্ত, এবং তাঁহাদিগের হাস্য, উল্লাস, আমোদ, উৎসব, ভোগ, বিলাস, শ্রম ও বিরাম সমস্তই অর্থযুক্ত।

তাঁহাদিগের প্রতিপদনিক্ষেপেই জীবনের এক একটি কার্য্য। তাঁহাদিগের গতি স্থির।

যখন ইটালীর চিরকীর্তিস্বরূপ ফণ-জম্মা রায়েঞ্জি, রোমের দুর্জয়রত দুর্জয় আভিজাতদিগের প্রমোদগৃহে উপবিষ্ট রহিয়া, সুরসিক বিদূষকের ন্যায় তাঁহাদিগকে প্রতিদিন নানাবিধ নূতন কথায় পরিভূষিত করিতেন,—কখনও হাসিতেন, কখনও হাসাইতেন, কখনও আপনাকে হাস্যাস্পদ করিয়া পরের মন যোগাইতেন, যদি কেহ তখন তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তদীর ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিতে পারিত, সে নিশ্চয়ই ভয়ে কটকিত কিংবা ভক্তিতে স্তম্ভিত হইত। মুখেরা

তাঁহাকে আমোদলহরীর ফণা মাত্র মনে করিত, কিন্তু তিনি নিয়ত আপনার মন্ত্র সাধন করিতেন। যখন মস্ত্রিবর কলবাট, চতুর্দশ লুইর স্বর্ণময় সিংহাসনের এক পাশ্বে অতি নির্বোধের মত দণ্ডায়মান থাকিয়া, কৃতাজ্জলিপুটে রাজনিয়োগ পালন করিতেন, যদি পুরাতন রাজপুরুষগণ তাঁহার সেই লাবণ্যশূন্য, মাধুর্য্যবিহীন নিস্তেজ মূর্তির বহিরাবরণ ভেদ করিয়া, তিনি কি নাম জপনা করিতেছেন তাহা তখন জানিতে পাইতেন, তবে তাঁহারা তদ্দণ্ডেই তাঁহাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতেন। জন্মান্তর পৌরবর্গ তাঁহাতে কেবল রূপেরই অভাব দেখিত; কিন্তু তিনি তখন গুণগত পরাক্রমের এক আশ্চর্য্য প্রাসাদ নির্মাণেই অহোরাত্র যত্নপর রহিতেন। যখন বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্টি, যোসিফিনের মৃণালনিন্দি বাহুল্যে অবলম্বন করিয়া, পারিসের তদানৌত্তম প্রভু প্রসিক্কায়া বেরাসের বিহারিভবনে তালে তালে নৃত্য শিক্ষা করিতেন, যদি কেহ তখন তাঁহার অন্তরতম মস্ত্রের অক্ষুট গর্জ্জন শ্রবণ করিতে সমর্থ হইত, সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অধীর হইয়া দূরে সরিয়া পড়িত। লোকে ভাবিত তিনি নৃত্য শিখিতেছেন; কিন্তু যে তালে সমগ্র ইউরোপ এক সময়ে ভয়ানকরূপে নৃত্য করিয়াছিল, তিনি তখন সেই কজতালই অভ্যাস করিতেন। পৃথিবীতে যাহারা কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এইরূপ এক একটি মন্ত্র ছিল। তাঁহারা ম-

জ্বলে পৃথিবীকে স্বর্গে তুলিয়া নিয়াছেন, অথবা স্বর্গের শোভা সম্পাদ পৃথিবীতে আনিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন,—মৃতদেহে জীবনী দান করিয়াছেন, এবং পুতুল ও ক্রীড়াকনুক লইয়া পর্বত ভাঙ্গিয়াছেন।

যাহারা কোন মস্ত্রৈকদীক্ষিত নহে, তাহাদিগের সকলই ইহার বিপরীত। তাহাদিগের জীবন অর্থশূন্য, তাহাদিগের গতি বাতহিলোলে ভূণের মত। তাহারা কখনও উত্তরে যায়, কখনও দক্ষিণে গড়াইয়া পড়ে, কখনও পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, কখনও প্রতিকূলবায়ুতে পশ্চিমে নীত হইতে থাকে। তাহাদিগের মন্ত্র নাই, মন্ত্রসাধনা নাই, সুতরাং কিছুই ‘কার্য’ নাই। ক্ষুধার সময়ে তাহারা আহার করে, নিদ্রার সময়ে তাহারা শয়ান রহে; কেহ জাগাইলে তাহারা একটু জাগে বা না জাগে, কেহ না জাগাইলে তাহারা ঐরূপই পড়িয়া থাকে। লালসা আর ইচ্ছা এক নহে। ‘লালসা প্রকৃতির দাসী, প্রকৃতিরই অনুগামিনী;—ইচ্ছা অধীশ্বরী, প্রভাবশালিনী। লালসা প্রকৃতির উদ্বেগে উদ্ভ্রান্ত হয়, প্রকৃতির নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত রহে। ইচ্ছা আপনার ক্ষমতাতেই আপনি উদ্ভ্রান্ত থাকিয়া সমস্ত প্রকৃতির উপর আধিপত্য করে। বস্তুতঃ ইচ্ছা একটী মহতী শক্তি। যাহারা মস্ত্রদীক্ষিত, তাহারা লালসাশূন্য, কিন্তু ইচ্ছান্বিত; তাহাদিগের ইচ্ছা প্রগাঢ়, ঘনীভূত, কেন্দ্র-নিবদ্ধ। তাহাদিগের বুদ্ধি, হৃদয় ও সর্ব প্রকার মানসিক

বলি সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের ইচ্ছাধীন। আর যাহারা উল্লিখিত প্রকার মন্ত্রহীন, তাহারা ইচ্ছাশূন্য, কিন্তু লালসান্বিত। তাহাদিগের সমুদয় মনোবলিই স্বতন্ত্ররূপে কার্য করে, কোনটিই কাহারও প্রভু মানে না। যদি তাহাদিগের মনে ইচ্ছার কিস্কিন্ধ্যাত ক্ষুতি জন্মে, সে ইচ্ছা গাঢ় হয় না, ঘনীভূত হয় না, এবং কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইতে পারে না ব-লিয়াই কদাপি ফলে আসে না।

সাধনার দ্বিতীয় অঙ্গ রহস্যরক্ষা অথবা মন্ত্রগুপ্তি। মন্ত্রগুপ্তি মন্ত্রসিদ্ধির কি-রূপ অনুকূল, তাহা সহজে বুঝান এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাহারা, কল্পনার নিনোদকাননে বিচরণ না করিয়া, মানব-জীবনের বহুকটকময় দুর্গম পথে পাদচা-রণা করিয়াছেন, যাহারা লোকপ্রকৃতির বহির্দেশেই চিরদিন অজ্ঞের ন্যায় দণ্ডায়-মান না থাকিয়া, চিন্তার সহায়তার উহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াছেন, তাহারা ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ উপদেশও দিয়া-ছেন যে, কোন মন্ত্রই মন্ত্রগুপ্তির দুর্ভেদ্য-বন্ধবিরহে দীর্ঘকাল সজীব থাকে না। যে মন্ত্র সাধকের হৃদয়মধ্যে কূপোদক-নিষ্কিপ্ত লোষ্ট্রবৎ লুকায়িত রহিল, তাহা মন্ত্র; যাহা লোকের মুখে মুখে পরিভ্রমণ ক-রিল,—এক কর্ণের পর আর এক কর্ণ এইরূপ করিয়া সহস্র কর্ণে যাতায়াত ক-রিতে লাগিল, তাহা কথা। কণায় কার্য

হয় না, কার্য্য যাঁহা হয় তাঁহা মস্ত্রে । অ-
তএব মস্ত্র যাঁহাতে কথার কথায় পরিণত
না হয়, এবিষয়ে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে
বিধেয় ।

খৃষ্ট বলিয়াছেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত
যে কার্য্য করে, তোমার বাম হস্ত যেন
তাঁহা জানিতে না পায় । অধুনাতন খৃ-
ষ্টীয় ইউরোপ দানাদি সম্বন্ধে এ বিধির
অনুবর্তী হইয়া না থাকিলেও মস্ত্রগোপন
বিষয়ে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ক-
রিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে । বলিনের
লৌহময়ী রাজনীতি শুদ্ধ মস্ত্রগুপ্তির ঘ-
হিমাবলেই বাহুবলদৃপ্ত উদ্ধত ফরাশি জা-
তিকে পদতলে আনিয়াছে । কশিয়া
মস্ত্র-গোপন বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ
করিয়াছে বলিয়াই সমস্ত প্রতিবেশীকে স-
তত শঙ্কান্বিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ।
রোমের বর্তমান রাজবৈজয়ন্তী মস্ত্রগুপ্তির
প্রসাদেই পুনরায় রোমীয় প্রাসাদসমূহে
বহুদিনের পর শোভা পাইতেছে, এবং
ব্রিটিশ মস্ত্রনাও এমিয়া এবং আফ্রিকায়
বিশ্বাস-বিমুক্ত রাজ্যনিচয়ে এই হেতুতেই
সমধিক প্রভাবের সহিত কার্য্য করিয়া
আসিতেছে ।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতবর
পিথাগোরাস তদীয় শিষ্যবর্গকে পাঁচ বৎ-
সর কাল মৌনী রহিতে বাধ্য করিতেন,
এবং যে এই পাঁচবৎসরের মৌনব্রত সাধুতার
সহিত উদ্‌যাপন করিতে সক্ষম হইত, তা-
হাকে পরিগৃহীত শিষ্যজ্ঞানে শিক্ষা দি-

তেন, যে তাঁহাতে অক্ষম হইত, তাঁহার
নিকট হইতে একবারে বিদায় লইতেন ।
মূলদর্শী বান্ধব পিথাগোরাসের এই ক-
ঠিন নিয়মে যত কেন উপহাস করুন না,
ইহার প্রকৃত অর্থ অতীব গভীর । মৌনে
মনোনিধান, মৌনে গান্ধীর্ষ্য এবং মৌন-
ব্রতেই চিত্তসংযমের প্রথম সোপান । কোন
কোন ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্য যে বিনা প্রয়োজ-
নেও মর্দ্দনিহিত গৃঢ় সংকল্প অথবা সম্প্র-
দায় বিশেষের গৃঢ় মস্ত্র প্রকাশ করিয়া
ফেলে, ইহার কারণ কি ? — না সে তরল, সে
লঘু, সে ভারবহনে অসমর্থ, সে লৌকিক
যশের জন্য লালসায়িত । সে অগাধ-জ্ঞান-
সঞ্চারী অবিকারী রোহিতের নৈর্ঘ্য ও অ-
টলতায় কি যাহা আ আছে তাঁহা বুঝিতে
পারে না । তাঁহার হৃদয় শফরীর মত, উহা
গণ্ডুষজলেই নৃত্য করিয়া সুখানুভব করে ।
কার্য্যের সুসমাप्ति দূরে থাকুক, কার্য্য অ-
বস্ত না করিয়াই সে তাঁহার পরিণামভোগ্য
প্রশংসাবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠে ।
অবলা যেমন অবলার কণ্ঠে ভর করিয়া অ-
কারণেও মনের সুখদুঃখঘটিত কথা লইয়া
আমোদ করে, সেও রাজ্যের উত্থান ও প-
তন এবং সমাজের সৃষ্টি-বিপ্লব-ঘটিত ভয়-
ঙ্কর কথা লইয়া আমোদ করিতে সেইরূপ
ভালবাসে । পদের চক্ষেই সে সর্ব্বদা দে-
খিতে চাহে, পরকীয় দৃষ্টিতেই সে বিল-
ম্বিত রহে । সুবিখ্যাত রিশিনু এই শ্রেণির
পুরুষদিগকে পুরুষদেহে জীলোক বলি-
তেন । আমরাও ইহাদিগকে জীলোক ব-

লিগাই কুপার ময়নে দেখিয়া থাকি। ইহা-
দিগকে যত ইচ্ছা শুদ্ধা কর, প্রীতি কর,
কাহারও তাহাতে আপত্তি নাই; প্রমোদ-
প্রসঙ্গে ইহাদিগের সাহচর্য্য গ্রহণ কর,
তাহাতেও কাহারও ক্ষোভ দুঃখ নাই।
কিন্তু মজ্জুবনে ইহাদিগকে কখনও আ-
হ্বান করিও না। কারণ, ইহারা মজ্জুরক্ষায়
অক্ষম; ইহারা স্বভাবতঃ অসিদ্ধ।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ উৎসাহ অথবা
মজ্জমদ; চতুর্থ অঙ্গ উদ্যম অথবা মজ্জপ্র-
য়োগ; পঞ্চম অঙ্গ আত্মোৎসর্গ অথবা ম-
জ্জার্থ আহুতি; ষষ্ঠ অঙ্গ অধ্যবসায় অথবা
মজ্জ-শক্তিতে নির্ভর এবং শেষ ও সপ্তম অঙ্গ
অপরাজিত সহিষ্ণুতা অথবা মজ্জপুতচক্রে
কালপ্রতীক্ষা। এই পাঁচটি সাধনার প্রাণ।
ইহাদিগের সংমিশ্রণে মনে কি যে এক
অপূর্ব্ব অবস্থা জন্মে, ভাষা আপনিই তাহা
যথোচিত রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না।

কে বলে যে মনুষ্য দুর্ব্বল?—কে
বলে যে, রোগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হয়,
শোক তাহাকে দাহন করে, ব্যোম্বন্ধিস-
হকারে জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস ক-
রিয়া ফেলে, এবং দুঃখ, দারিদ্র্য ও নানা-
বিধ দুর্গটনায় তাহার আত্মা অবসন্ন হইয়া
পড়ে? যাহার হৃদয়ে উৎসাহের উদ্দীপনা
নাই, এবং স্মৃতরাং আত্মীয় স্মৃতি ও অ-
স্তরে চৈতন্য নাই, তাহার পক্ষে এসকলই
সম্ভব বটে। সে বিনা রোগেও ক্লম, বিনা
বার্দ্ধক্যেও জরাজীর্ণ, এবং শোক দুঃখের
কণাঘাত বিনাও চিরস্নান, চিরবিষণ্ণ, চির-

কালের জন্য অকর্ম্মণ্য। কিন্তু তাহার মজ্জ-
মদে প্রমত্ত, তাহাদিগের কথা স্মৃত্যু। তা-
হার কখনও বুদ্ধি হ্রাস নাই, কখনও ভাঙ্গিয়া
পড়েন না, এবং জীবনের অন্তিমক্ষণেও
তাঁহার উৎসাহশূন্য ও উদ্যমহীন হইয়া
মনুষ্যজীবনের অসারতা প্রতিপাদন করেন
না। তাহাদিগের হৃদয়ের রক্তে রক্তে এক
অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রবাহ প্রবাহিত হয়;
উহা তাহাদিগের প্রত্যেক ধমনীতে তাড়িত
বেগ প্রদান করে, এবং শরীর যখন ছা-
ড়িয়া দেয়, হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়ে,
তখনও উহা তাঁহাদিগকে কেমন এক আ-
শ্চর্য্য প্রভাবে যুবাব মত সজীব রাখে।

মহাত্মা ওয়াসিংটন অতি বৃদ্ধ বয়সেও
যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন, ত-
খন তাঁহার নিস্তেজ নেত্র প্রদীপ্ত হইয়া উ-
ঠিত, তাঁহার নিম্পন্দদেহ শক্তির পুনঃসঞ্চারে
পুনর্জিত হইত। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম
নিদ্রাবস্থারও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে
নাই। ডেনিয়েল ওকোনেল যখন জীবন ও
মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান, অগ্নিশিখার
মন্দল কামনা তখনও তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ
তুলিত, এবং তাঁহার পবিত্র রসনা হইতে
তখনও যে দুই একটি বাক্য বহ্নিকণার ন্যায়
স্থলিত হইত, সেইসব সহস্র হৃদয়ে তাহা এক
ভয়ানক দাবানল জ্বালিয়া দিত। নিকল-
সাহ ও অবসাদ কাহাকে বলে হাম্‌বো-
ল্ড তাহা কখনও জানিয়া যান নাই। যে
বয়সে অন্যেরা বৈরাগ্যের ভজনা করে,
বিষয়ে বীতরাগ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘনিঃ-

খামেই সময়াতিপাত করিতে ভালবাসে, অথবা অতীতস্মৃতির আশ্রয় লইয়া পুরাতন কথার রোমন্থন করিতেই যত্নপর রহে, তিনি তখনও যৌবনের নূতন মত্ততায় জ্ঞান সাধন করিতেন, এবং মুহূর্তের পর মুহূর্তে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য যার পর নাই আকুল রহিতেন। লর্ড পামার্টন যখন চক্ষুমেলিয়া চাহিতেও কষ্ট অনুভব করিতেন, কসিয়ায় তখনও অনেকে অনিদ্ৰ ও প্রকর্ণ রহিয়া তাঁহার মস্তনীর মর্মার্থভেদ করিতে চেষ্টা করিত। চিরজীবী টিয়ার চুষণী কাকের মত ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভূকম্প দেখিয়াছেন, প্রথম নেপোলিয়নের বিজয়-দুন্দুভিনাদে নৃত্য করিয়াছেন, তৃতীয় নেপোলিয়ানকে পিতৃব্যের সিংহাসনে অধিকৃত দেখিয়া করতালি দিয়াছেন, আবার নেদিন সিডানের বিপৎপাতের পর হইতে পারিসের কধিরাকু দেহে ঔষধি লেপন করিয়া আপনি যে অদ্যাপি ইহলোকেই রহিয়াছেন এবং অদ্যাপি স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, সংসারকে তাহা কার্যভঃ জানাইয়াছেন। লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে রুটিশ রাজতরঙ্গীর বর্তমান কর্ণদার বার্ককে অত্যন্ত জড়িত হইয়াছেন। কিন্তু আজও রুটিশ প্রাণ তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইতেছে; রুটেনিয়ার মন্দীভূত প্রতাপ-শ্রোত তাঁহারই অভিধাতে বেগে বহিতেছে। সাধকের উৎসাহ ও উদ্যম সর্বত্র ও সকল সময়েই এইরূপ। উহা স্ননীভূত বহি। যে উহা নির্ভীক

কিংবা উহার গতিরোধ করিতে যায়, সে আপনিই উহাতে পুড়িয়া মরে।

সাধক সম্প্রদায়ের আত্মোৎসর্গ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক। তাঁহাদিগের এই আত্মোৎসর্গই যথার্থ আরাধনা। ভক্ত যেমন আপনাকে আরাধ্য দেবতার পদারবিম্বে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ সমর্পণ করিয়া উহাতেই বিলীন হইতে কামনা করেন, তাঁহারাও সেইরূপ তনু, মন, প্রাণ সর্বস্বই তাঁহাদিগের আরাধ্য মন্ত্রে আহুতি স্বরূপ উৎসর্গ করিয়া নিজ নিজ পৃথগস্ত্রিও উহাতেই নিমজ্জিত করিয়া দেন। তখন তাঁহারা তদাত, তদায় হন। সুখ তখন তাঁহাদিগকে সূখী করে না, প্রশংসার মৃদুমোহন মধুর ধ্বনি তখন তাঁহাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, মন সেই মমতার মায়াময় বন্ধনীতে বদ্ধ হইয়া চায় না, এবং কিছুই তাঁহাদিগকে তখন দক্ষিণে কি বামে হেলাইতে পারে না। তখন তাঁহারা অত্যন্ত জীবিত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত মৃত, অথবা অত্যন্ত মৃত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত জীবিত রহেন। বাল্মীকির অশ্ব পঙ্কুর হইতে রাম নামের ন্যায় তাঁহাদিগের মর্মাস্থি হইতেও তখন কেবল একই নাম নির্গত হয়, এবং তাঁহাদিগের পরিগৃহীত মন্ত্র যত কেন-দুঃসাধ্য হউক না, আত্মোৎসর্গের অভাবনীয় বলেই তখন তাহা সুসাধ্য হইয়া উঠে।

কাব্য ও পুরাণে যাহাদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত প্রাচীন সাধকগণ শী-

তের সময় হিমরাশিতে পরিবেষ্টিত রহিতেন, অতি ঘোরতর গ্রীষ্মের সময়ে চারিদিকে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন। কেহ আপনার চক্ষু দুটিকেও সাধনার পরিপন্থী বিবেচনায় উপাটন করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কেহ অন্য প্রকারে মনোনিবেশে সমর্থ না হইলে জিহ্বা কিংবা হস্ত পদ প্রভৃতি অপরিহার্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অকাতরমানে পরিবর্তন করিতেন। এসকল কার্য সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার বিচার করা এইক্ষণ অনাবশ্যক। সাধারণতঃ বলিতে গেলে প্রকৃতির বিরোধী না হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাহারা সাধনায় রত হইতে চান, তাগ এবং আত্মনিগ্রহই তাঁহাদিগের প্রধান সহায়। যাহারা তাগে ভীত, যাহারা আত্মনিগ্রহে কুণ্ঠিত, তাহাদিগের মত লোকের দ্বারা সত্য যুগেও কোন কার্য হয় নাই, কলি-যুগেও কোন কার্য হইবে না।

তুমি জ্ঞানী,—তুমি সরস্বতীর সাধক। তোমার আবার সুখের লালসা কেন? যদি তুমি জ্ঞানের নিখুল আনন্দ অপেক্ষা সাংসারিক খ্যাতি প্রতিপত্তিকেই অধিক মনে করিলে—তোমার আরাধ্য শক্তির প্রসন্ন দৃষ্টি অপেক্ষা ভোগ বিলাসের আবিল আনন্দের জন্মই অধিকতর অধীর রহিলে, তবে তোমার আবার সাধনা কি? তুমি প্রেমিক, তুমি অপার্থিব বৈভবের জন্য লালসাগ্রিত। এই বনিধূতিসম্পন্ন কলুষিত মনুষ্যলোকে যাহা স্বপ্নে বই কেহ

দেখে না, কবি বই যাহা কেহ জানে না, কবিমুখে বিনা যাহার কথা শুনা যায় না, তুমি সেই জ্ঞানের অগম্য অজ্ঞেয় ধনের জন্য চিরতৃপ্ত। তোমার আবার ধন, মান, ক্ষতিলাভ গণনা কেন? আর তুমি স্বদেশবৎসল! স্বজাতির বন্ধু! তুমি যে প্রত্যেক কার্যেরই পরিণাম চিন্তার পূর্বে আত্মপরিণাম চিন্তা করিতেছ, দেশ-হিত-ব্রতে ত্রুটি হইতে গিয়া প্রতিফলিত হইতেছে ব্রতে অগ্রসর হইতেছ, দেশীয়দিগের মধ্যে স্বাধীনতার পবিত্র নীতি লইয়া ধীরে ধীরে পরাধীনতার বিষাক্ত বীজ ছড়াইয়া দিতেছ, সকলকে স্বর্গের শোভা দেখাইবে বলিয়া নরকে আনিয়া ডুবাইতেছ,—প্রভুস্বরূপ পূজা করিবে বলিয়া পদতলে আনিয়া বান্ধিতেছ, তোমারও এ প্রতারণা, এ বিড়ম্বনা কিসের জন্য? তুমি অধিকুণ্ডে আপনাকে ভাস্কর আর না কর, সে এক পৃথক কথা। কিন্তু যদি তুমি জ্ঞান চাও, কি প্রেম চাও, কি স্বজাতির অভ্যুদয় চাও, তবে আগে আপনাকে বলি দান কর,—আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা দূরে ফেলিয়া দাও, সাধকের নায় আপনি কুলকাঠে বিলম্বিত হও, তাহার পর সিদ্ধির কম্পালতা হইতে আপনার আকাঙ্ক্ষিত ফল বাছিয়া লও। জনক রাজা যোগী হইতে পারেন নাই; তিনি তাঁহার কমণ্ডলুটি বড় ভাল বাসিতেন। সলোমন জ্ঞানী হইতে পারেন নাই; তিনি জ্ঞান অপেক্ষা সুখ

সন্তোষের অধিক আদর করিতেন । এবি-
লার্ড প্রেমিক হইতে পারেন নাই ; তিনি
প্রেম অপেক্ষা আপনাকে অধিক জানি-
তেন । রবিন্সনীয়র স্বজাতির স্মৃৎ হইতে
পারেন নাই, তিনি দেশের স্বাধীনতা ও
গৌরব অপেক্ষা আপনার স্বাধীনতা ও
গৌরবের জন্য অধিকতর ব্যগ্র রহিতেন ।
ইহারা কেহই আত্মোৎসর্গ করেন নাই ।

অধাবসায় উল্লিখিত সর্বপ্রকার সাধক-
ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ । উহা স্বাস্থ্য অমৃত,
উহা রোগে ঔষধ, এবং উহাই যুযুয়র অ-
বলম্ব-সক্তি । যদি এ সংসারকে সমুদ্র বল,
অধাবসায়ই তাহার একমাত্র ভেলা ; যদি
সাধনাকে জ্বলন্ত বহ্নি বল, অধাবসায়ই
তাহার একমাত্র উদ্দীপনা । সাধকের ক্ষম-
নিহিত যে ভাব যখন ভীম-শক্তি হইয়া
পড়ে, অধাবসায়ই সেইটিকে তখন আশ্রয়-
দানে দৃঢ় করিয়া রাখে, এবং যে ভেজ
নির্ব্বাণপ্রায় হয়, অধাবসায়ই তাহাকে
পুনরায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলে । অধাবসায়
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ; স্মৃতিও যদি বিপর্য্যস্ত
হইয়া যায়, তথাপি উহা টলে না ; উহা
সাহসের সার, ভয়ের কোন রূপ কারণই
উহাকে বিচলিত করিতে পারে না ।

অভীষ্ট সংকল্প প্রথম উদ্যমেই সংসিদ্ধ
হইবে এমন আশা করা কাহারও উচিত হয়
না, এবং প্রথম পদস্বল্পনে কি প্রথম বিদ্ব-
দর্শনেই যাহার উদ্যম-ভঙ্গ, আশা-ভঙ্গ
ও ব্রত-ভঙ্গ হয়, তাহার দ্বারাও কখন কোন
রূপ কঠোর সাধনা হইয়া উঠে না । অত-

এব অধাবসায়ের আবশ্যিকতা । সামর্থ্য
আর কি ? অধাবসায়ই প্রকৃত সামর্থ্য । ঐ
যে দুর্ব্বল শিশু, অদূরবর্ত্তিনী স্নেহময়ী জন-
নীর আশ্বাস-প্রদ মধুর হাসো উৎসাহিত
হইয়া, অল্পে অল্পে দণ্ডায়মান হইবার
ক্রম শিখিতেছে, উহার ঐ দুর্ব্বল দেহ-
লতিকা কতবার ভুলিয়া পড়িবে, কতবার
ক্ষত বিক্ষত হইবে, কে তাহা এইক্ষণ বলিতে
পারে ? কিন্তু হয়ত ঐ শিশুটিরই পদত্বরে
পর্ব্বতও এক সময়ে বিকম্পিত হইবে ।
একখানি প্রস্তরের ক্ষুদ্রতম এক অংশও
উহার নিকট এইক্ষণ হিমাদ্রিসদৃশ ; কিন্তু
অধাবসায় থাকিলে হয়ত উহারই পদ্বরে
থায় কোমল হস্ত পিরামিড গড়িয়া তুলি-
বে । বস্তুতঃ, অধাবসায়ের তুলনা নাই ।
অধাবসায় বিষ বিপত্তির সহিত ক্রীড়া
করে, নাগর শোষণ করিয়া ফেলে, এবং
সহস্র বিভীষিকা, বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবায়ুর
মধ্যেও তকলতাশূন্য তুষারমণ্ডিত অচলের
ন্যায় নির্ভীক ও নিষ্কম্প রহিয়া আপ-
নার মন্ত্র আপনি সাধন করিতে থাকে ।

সহিষ্ণুতা অন্য এক পদার্থ । উহা
অধাবসায়ের সদৃশ, অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে
অধাবসায় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন । সা-
ধারণতঃ সহিষ্ণুতার অর্থ ক্ষমা, সহিষ্ণুতার
অর্থ মৃদুশীলতা । কেহ তোমায় তিরস্কার
করিল, তুমি প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিরস্কার
করিলে না ; কেহ তোমায় মন্তকে পদা-
ঘাত করিল, তুমি তাহার পদনখও স্পর্শ
করিলে না । লোকে ইহাকেই সহিষ্ণুতা

বলিবে। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রকৃত নাম কাল-প্রতীক্ষা। যে কার্যো যশ নাই, মান নাই, আশু সুখের প্রলোভন নাই, এবং সম্মুখেও আশার উত্তেজনা নাই, —যে কার্যো এইক্ষণে কোনরূপে সহায় নাই, এবং শত বৎসরেও যাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা নাই, যিনি তাহাতেও হৃদয় মন ম'পিয়া লিপ্ত রহিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সহিষ্ণু, এবং যিনি এই প্রকার সহিষ্ণুতাকে আপনার প্রাণের মধ্যে পোষণ করিয়া ভবিষ্যতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ পূর্বক কালের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই যথার্থ পুরুষ।

প্রকৃতির সহিষ্ণুতা দেখ। আজি যে প্রকাণ্ড বটরক্ষ সহস্র বিহঙ্গকে আশ্রয় দান করিয়াছে, সহস্র তাপিতদেহ শীতল করিতেছে, এক সময়ে তাহা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র একটি বীজ মাত্র ছিল; প্রকৃতি ধীরে ধীরে উহাকে এইরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। আজি যে দৃঢ় ভূমি অসংখ্য জীব জন্তুর আবাস-স্থান এবং গ্রামনগরে শোভিত হইয়াছে, এক সময়ে তাহা একটি বালুকণা মাত্র ছিল; প্রকৃতি বালুকণার সহিত বালুকণা বান্ধিয়া তাহাতেই ধীরে ধীরে এই আশ্চর্য্য ভিত্তি গড়িয়াছেন। আজি যে প্রশস্তহৃদয়া স্রোতস্বিনী লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উপজীব্য এবং সমগ্র একটি দেশের সুখ ও সৌভাগ্যের ভার বক্ষে ধারণ করিয়া গর্ভভরে বহিয়া যাইতেছে,

এক সময়ে তাহা অতি সূক্ষ্ম একটি রক্তরেখা মাত্র ছিল; প্রকৃতি সেই রক্তরেখাটিকেই ধীরে ধীরে কি না করিয়া তুলিয়াছেন! আবার, যুগান্তের পরে যে বিপ্লব ঘটিবে, যে বিপ্লবে কত কি উচ্ছিন্ন যাইবে, কত কি উন্মূলিত হইবে, —যে বিপ্লব কোথাও প্রলয়পর্য্যোধির তিমিরারত তরঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর রাবে গর্জন করিবে, কোথাও কালের সর্বসংহারিণী মূর্তিতে জগতের সুন্দর ও কুৎসিত, স্থায়ী ও অস্থায়ী, দ্রব ও ঘন সমস্ত বস্তু লইয়া ক্রৌড়া করিতে রহিবে, —যাহার শ্বাস প্রশ্বাসে অনন্ত অশনিপাত, যাহার আবর্তে আবর্তে অনন্ত জ্যোতিরাবর্ত স্ফুটিত ও আলোকিত হইতে থাকিবে, প্রকৃতি এখনই তিল তিল করিয়া তাহার শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন, —নীরবে, নিস্তব্ধ ভাবে, তাহার কারণ পরম্পরার শৃঙ্খল গাঁথিছেন, —কেহ দেখে না, দেখিয়াও কেহ বুঝে না এমন রূপে তাহার উপকরণ সংগ্রহে রত রহিয়াছেন। ইহাই সহিষ্ণুতা। যদি অনন্ত শক্তিও সাধনা ত্রুতে এইরূপে সহিষ্ণু হইতে পারে, মনুষ্য কি তবে অসহিষ্ণু হইবে?

হায়! যে দেশে বাবদুকতাই ক্রমশঃ রক্ষি পাইতেছে, আর সাধনা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইতেছে, সে দেশে কাহার আর কিমে সিদ্ধি হইবে? যে দেশে প্রত্যেকেই শতমন্ত্রে দীক্ষিত এবং মন্ত্র রক্ষায় সকলেই অশিক্ষিত, যাহাদিগের মধ্যে পরম্পর-বিদ্বেষ ও

আক্ষালনের নাম উৎসাহ, চীংকারের নাম উদ্যম, অঞ্চলবায়ু-সেবনের নাম আত্মোৎসর্গ এবং অবিচলিত নিষ্কার নাম অধাবসার, তাহাদিগের আর ভরসা কোথায় ? যাহার প্রাতঃসূর্যের অভ্যাসে যে কার্যের কল্পনা করে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহার ফলভোগের জন্য বাস্তব হয়,—এক রাত্রিতেই

রোম নির্মাণ করিতে চাহে, ঋতুসময়ের পূর্বেই জীবনের সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া কীর্তিশৈলে আরুঢ় হইয়া বসে, তাহাদিগের আর আশা কি ? তবে জা-নি না, কবে সাধকের পুনরুদয় হইবে,—কবে আবার সাধনা পুনঃপ্রবর্তিত হইয়া অন্ধকারকে আলোক করিবে ।

বিরজা ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

রাত্রি প্রভাত হইল । সকলের অগ্রে ভবতারিণী খিড়কির ঘাটে গিয়াছেন । বায়ুর হিম্মলে নবীনমণির মৃতদেহ ঘাটের দক্ষিণ পাশে আনিয়াছে । ভবতারিণী প্রথমেই মরা মানুষ জলে ভাসিতে দেখিয়া শীহরিয়া উঠিলেন । তিনি ভয় পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পাদসঞ্চার হইল না ; স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন । ইচ্ছা, পশ্চাৎ সরিয়া বাটীতে যান, কিন্তু পদযুগল তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইল না ; তিনি দণ্ডবৎ স্থির রহিলেন । যতক্ষণ সেই মৃতদেহের প্রতি তাঁহার চক্ষু রহিল, ততক্ষণ একপদও পশ্চাৎ সরিতে পারিলেন না । এক্ষণে চক্ষু অন্যদিকে পতিত হইল, অমনি তিনি পশ্চাৎ সরিতে আরম্ভ করিলেন । খিড়কির দ্বার পর্যন্ত ধীরে ধীরে গেলেন ; দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র উর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া একবারে আপন কক্ষে প্রবিষ্ট হই-

লেন । গোবিন্দ পত্নীর এতাদৃশভাবে গৃহপ্রবেশ দেখিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন ‘রক্তান্তটা কি ? এমন করিয়া দৌড়িয়া আসিলে যে ?’ ভবতারিণী ঘন-নিশ্বাসত্যাগজনিত অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, ‘ঘাটে মড়া ভাস্ছে ।’

‘ঘাটে মড়া ভাস্ছে ?’

‘হাঁ, দেখ সে !’

‘তুমি আর কিছু দেখেছ ?’

‘না ; মড়া ভাস্ছে । চল দেখ্বে এখন ।’

গোবিন্দচন্দ্র দেখিতে চলিলেন । ভবতারিণী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । যাইবার সময়ে ভব নবীনের শয়নকক্ষের জানালায় আঘাত করিয়া নবীনকে ডাকিলেন । উত্তর না পাওয়াতে কহিলেন, ‘আবাগি, ওঠ্ ওঠ্ দেখ্বে ঘাটে মড়া ভাস্ছে ।’ এই বলিয়া দ্রুতপদে শ্বামির অনুগমন করিলেন । তাঁহার যাইবার পূর্বে গোবিন্দ ঘাটে

পলছিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলেন।
ভবকে তাঁহার গালে হাত দিয়া ভাবিবার
কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল না; তিনি
এখন চিনিতে পারিলেন যে, নবীনের দেহ
জলে ভাসিতেছে। ভব উচ্চরবে কা-
দিতে উদ্যত হইলে গোবিন্দ তাঁহার মুখে
হাত দিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে নিষেধ করি-
লেন। ভব কাঁদিলেন না।

কিয়ৎকাল পরে বাড়ীর সকলেই জা-
নিল যে, নবীন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।
আরো দেখা গেল যে, বিরজা নাই; তা-
হার টিনবাক্স খুলিয়া দেখা গেল, তাহার
গহনার কোটাও নাই। তখন স্পষ্ট জানা
গেল যে, বিরজা পলায়ন করিয়াছে;
বিরজা যখন পলাইয়াছে, তখন তাহা হ-
ইতেই নবীনের প্রাণনষ্ট হইয়াছে। গ-
জাধর সে রাতে বাহিরে শুইয়াছিল; সে
বলিল, আমি নবীনকে ও বিরজাকে রাতে
থানা হাতে করিয়া ঘাটে যাঁইতে দেখি-
য়াছিলাম। তখন সকলেরই বিশ্বাস হ-
ইল যে, বিরজাই নবীনকে মারিয়া ফে-
লিয়া পলায়ন করিয়াছে। গজাধর আ-
পনি থানায় সংবাদ দিতে গেল। পাড়ার
সকল লোকে জানিল। নবীনের দেহ
পুকুরিণীতে ভাসিতে লাগিল; চৌকিদার
তীরে বসিয়া চৌকি দিতে লাগিল।

গৃহিণী শোক করিতে বসিলেন।
তিনি ভাবিলেন, আমি কেন এ পাপ ঘরে
আনিয়াছিলাম। এ হইতে আমার সর্ব-
নাশ হইল; কুলে কলঙ্ক হইল! আমার

বাঁটিতে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা হ-
ইল। ভবতারিণীও অনেকক্ষণ রোদন
করিলেন। তাঁহার অনেকক্ষণ রোদন
করিবার কারণ এই যে, তিনি নবীন ও বি-
রজা, উভয়কেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।
তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, বিরজা নবী-
নকে বধ করিয়াছে। তিনি গজাধরের
চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন; আরও জানি-
তেন যে, গজাধরের বিরজার প্রতি আ-
সক্তি জন্মিয়াছে; তজ্জন্য দুই একবার বি-
রজাকে সাবধানও করিয়া বলিয়াছিলেন,
'বিরজে! সাবধান, ভয় পিছনে লাগি-
য়াছে।' তাহাতে বিরজা বলিয়াছিল,
'ভয় নাই, দিদি!' বিরজা বরসে ছেলে
মানুষ বটে, কিন্তু ধর্মভয় আছে। তাঁ-
হার অনেক কথা মনে পড়িল। কোন
দিন গজাধর বিরজার প্রতি কি প্রকার
সম্মুখ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তাহাতে
বিরজা কেমন করিয়া ঘোমটা টানিয়া স-
রিয়া পড়িয়াছিল, তাহা মনে পড়িল।
গজাধর নবীনের প্রতি সচরাচর কি প্রকার
বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিল; নবীন
গজাধরের অসদ্ব্যবহারে কি প্রকার খেদ
করিত, তাহাও মনে পড়িল। তিনি গৃ-
হকর্ম ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে, ভাবিতে—
আবার ভাবিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন।
বাড়ী নিতান্ত শূন্য ও শোকপরিপূর্ণ বোধ
হইতে লাগিল। সকলেরই মুখে বিষা-
দের চিহ্ন, সকলেই শোকাকুল। গোবিন্দ-
চন্দ্র শোকে ও লজ্জায় অধোমুখে বাহির

বাড়ীতে বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন । কলিকায় আগুন নাই, টানে ধূমা বাহির হয় না ; তথাচ তিনি হুঁকা টানিতে ও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । গ্রামস্থ প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ কাছে বসিয়া তাঁহাকে সাশ্রুনা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাক্যব্যয় মাত্র সার হইল । কেন না তাঁহাদের সাশ্রুনাশ্রুচক বাক্যসকল গোবিন্দচন্দ্রের কণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, সন্দেহ । কাহারও কথায় শোক নিরুত্তি হয় না । সময়ই একা শোক নি-বারণ করিতে পারে । শোক যত বড়ই হউক না কেন, সময়ে শমতা প্রাপ্ত হয় ।

বৈকালে হরিপুরের থানার নাএব-দারোগা লোক জন সঙ্গে করিয়া তদারক করিতে আসিলেন । তিনি তদারক করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, বিরজা হইতেই এ কর্ম হইয়াছে । মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও সেই প্রতীতি হইল । তিনি বিরজার আ-কৃতি বর্ণনা করিয়া ইন্সিহার জারি করিলেন ; আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কেহ বি-রজাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পাইবে । থানার থা-নায় এই কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল ।

এই ঘটনায় গঙ্গাধরের চরিত্র এক-বারে পরিবর্তিত হইল । সে এখন আর গ্রামের গাঁজা ও গুলিখোরদের সঙ্গে মিশে না । ব্যবসায়ী অলসদের সঙ্গে দি-বারাত্র তান পিটিয়া ও বড়ে টিপিয়া সময় নষ্ট করে না । কিন্তু বাড়ীরও কোন কর্ম

করে না । বাহির বাটীতে বসিয়া মনে মনে কি ভাবে আর কেবল তাহাকে সর্বনাশ করে । স্থান করিতে গেলে গামছা বন্ধে করিয়া ঘাটে বসিয়া ভাবে, অ'হারে ব-সিলে ভাবে, শয্যায় শুইয়া ভাবে । স-দাই তাহার বিষন্ন বদন । ইহা দেখিয়া বাটীর সকলে মনে করিল যে, গঙ্গাধর যদিও নবীনকে মুখে ভালবাসা দেখাইত না, তথাপি মনে মনে ভাল বাসিত । এ-খন তাহার শোকে গঙ্গাধরের এ দশা হ-ইয়াছে । গ্রহিণী গঙ্গাধরকে আপনার কুঠরীর এক অংশে শয্যা করিয়া দিলেন । গঙ্গাধর সেইখানে শুইত । রাত্রে সে এক একবার চমকিয়া উঠিত ।

ক্রমে বৎসরের অতীত হইল । বা-ড়ীতে যে কাণ্ড হইয়াছিল, সকলে তাহা এক প্রকার বিস্মৃত হইলেন । গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাধরের আবার বিবাহ দেওয়া স্থির ক-রিলেন । সহস্র দুশ্চরিত্র হইলেও এদেশে—এদেশে কেন ? এসংসারে—পুরুষের বি-বাহের কোন অশ্রুবিধা নাই । অধিকাংশ স্থলে—লোকে পুরুষের রূপ দেখে না, গুণ দেখে না, চরিত্র দেখে না ; কেবল দেখে কুল ও ধন । গঙ্গাধরের তাহা ছিল ; কুল ছিল, ধন অধিক ছিল না বটে, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা যথেষ্ট । অনেক স্থলে বিবাহের কথা হইল । গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং দুই এক স্থলে কন্যা দেখিতে গেলেন । অনেক স্থলে কন্যা দেখিবার পর একস্থলে একটি মনের মত পাওয়া গেল । বিবা-

হের বিষয় সকলই স্থির হইল। কেবল দিন ধার্য্য হওয়া বাকি। এমন সময়ে গঙ্গাধর একদিন নিকুদ্দেশ। গ্রামস্থ কোন বাড়ীতে তাহাকে পাওয়া গেল না। গ্রামান্তরে কুটুম্ব বাড়ীতে সন্ধান করা গেল, সেখানেও পাওয়া গেল না। দুই মাস অনুসন্ধান হইল, গঙ্গাধরের উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। শেষে স্থির হইল, গঙ্গাধর মনের দুঃখে উদাসীন হইয়াছে। গৃহিণী কহিলেন, ‘আহা, বাছা আমার বউয়ের শোকে বাহির হইয়া গেল!’

সপ্তম অধ্যায়।

ঐতিহাসিক কালের বা ভৌগোলিক পন্থার অনুসরণ করা উপন্যাস রচনার প্রথা নহে। অতএব সময়—গঙ্গাধর নিকুদ্দেশের দুই বৎসর পর; স্থান—কলিকাতার জেনেরেল পোষ্টাফিস।

ডাকঘরের নিয়ম এই, যে সকল পত্র বিলি হয় নাই ও বিজ্ঞাপন দিলেও যে সকল পত্র কেহ লইয়া যায় না, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। একজন বাবু তাহা খুলিয়া দেখিয়া দেন, তাহাতে কোন মূল্যবান বস্তু আছে কিনা। বাবু আজি অনেক পত্র দেখিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে এক খানি বাঙ্গালী পত্র তাঁহার হাতে পড়িল। পত্রখানি মোটা জীরামপুরী কাগজে লিখিত হইয়াছিল। বাবু পত্রখানি খুলিলেন, দেখেন, তাহাতে জীলোকের নাম স্বাক্ষরিত।

তিনি পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিলেন; মনে মনে বলিলেন, এ কোন মেয়ে মানুষের প্রণয় পত্রিকা হবে, বাসার গিয়া পাঠ করিব। পত্রখানি পকেটে রহিল। তিনি আপন কর্তব্য ব্যাপ্ত হইলেন।

এই বাবুর বাসা সিমলার। বাবু অপরাহ্নে বাসার আশিরা! আহা! বি-শ্রাম করিতেছেন। এমন সময়ে সেই পত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর। এতদসে বাঙ্গালি বাবুরা অবিবাহিত থাকেন না। কিন্তু ইনি বিবাহ করিয়াছেন কিনা আমরা জানি না। ক্রমে জানা যাইবে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বাবুর ললাট দেশ স্বেদান্ত হইল, বদনে আনন্দ, বিষয় প্রভৃতি নানা মানসিক ভাবের প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইতে লাগিল। যে পত্র পড়িয়া বাবুর মনে একরূপ ভাবোদয় হইল, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

“জীমতী ভবতারিণী দেবীর শ্রীচরণেষু আপনারা জানেন, আজি দুই বৎসর ধরিয়া আমি নিকুদ্দেশ। আমি কাহাকে না বলিয়া আপনাদের বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কারণ কি? পাছে নবীনকে খুন করিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে পুলিশে দেন। কেন না নবীন আর আমি এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলাম,

ভোর রাতে নবীনের দেহ জলে ভাসিয়া উঠিল ; আমার প্রতি সকলের সন্দেহ । আমি যদি বলিতাম, আমি নবীনকে খুন করি নাই, কে বিশ্বাস করিত ? নানা কারণে লোকে আমার প্রতি সন্দেহ করিত । এই জন্য আমি পলাইয়া আসি ।

কিন্তু আজি বলিতেছি আমি নবীনকে খুন করি নাই । আজি বলিতেছি, নবীনকে আমি মারি নাই ; আমি তাহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতাম । কিন্তু তাহার মরণে নিজের প্রাণভরে আমি তখন প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেও পারি নাই । তাহার পরে কাঁদিয়াছিলাম ।

গঙ্গাধর বাবু ভরানক পীড়িত হইয়া কলিকাতার ডাক্তার খানায় আইসেন । মরণকালে তিনি সমস্ত স্বীকার করিয়াছেন । নবীন আর আমি এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলাম সত্য ; বাগানে তাল পড়াতে নবীন আমাকে তাহা কুড়াইতে বলে, আমি তাল কুড়াইতে যাই ; তাল খুঁজিতে আমার বিলম্ব হয়, তখন নবীন গা ধুইতেছিল । ইতিমধ্যে গঙ্গাধর বাবু বাইরা নবীনকে জলে ডুবাইয়া ধরেন । যতক্ষণ সে জলের ভিতরে নড়িল, ততক্ষণ ছাড়িলেন না । আমি তাহাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম । কিন্তু একথা আমি বলিলে তখন কে বিশ্বাস করিত ? গত কল্যা প্রাতঃকালে গঙ্গাধর বাবুর মৃত্যু হইয়াছে । মৃত্যুকালে তিনি আমাকে বাচাইয়া গিয়াছেন । আরো শুনিলাম, তাহার কথা সকলি হাস-

পাতালের বড় সাহেব লিখিয়া আপনাদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সুতরাং আমি এখন মুক্ত ।

আমি আর আপনাদের বাণীতে যাইব না ; আর কি করিতে যাইব ? আর সে নবীন নাই ? কাহার সঙ্গে প্রাণ ভরিয়া কথা কহিব ? গঙ্গাধর বাবু আরো বলিয়াছেন যে আপনার শাশুড়ীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে । সুতরাং আর কাহাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইব ? আপনাদের বাণীতে আর যাইব না । কিন্তু আপনাকে ভগিনীর মত ভালবাসি তাহা জানেন, বড়বাবু যখন কলিকাতায় আসিবেন, শিবনাথ ডাক্তারের বাসার আমায় সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন, আপনার ছেলেদের জন্য কিছু জিনিষ দিব ।

আমি আপনাদিগের দয়া প্রাণ থাকিতে ভুলিতে পারিব না । বলিতে কি, আপনার স্বর্গীয়া শাশুড়ী আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি যদি আমাকে গঙ্গাতীর হইতে তুলিয়া লইয়া না যাইতেন, আমি সেই রাতে পঞ্চু পাইতাম । কিন্তু আমার মৃত্যুই ভাল ছিল । আজি আট বৎসর, স্বামির উদ্দেশ্য পাইলাম না । তিনি কি নৌকা ডুবিতে মরিয়াছেন ? তবে বিধাতা আমাকে বাচাইয়া রাখিলেন কোন্ বিবেচনায় ? বোধ হয়, তিনি মরেন নাই, নৌকার একজন বাঙ্গাল মাঝি বলিয়াছিল, সে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে । দিদি আ-

মার মন বলে, তিনি বাঁচিয়া আছেন।
মুশীলের বাপকে বলিবেন, যদি বিপিন
বিশারী চক্রবর্তী নামে কোন লোকের স-
ন্ধান পান, তাহার কাছে যেন আমার বি-
বরণ বলেন। দিদী এখন পত্র শেষ করি।

‘‘ আমি সেই বিরজা। ’’

পত্রখানি একবার, দুইবার, তিনবার
পড়া হইল। তিনবারের পর বাবু পত্রখানি
তাকিয়ার উপরে রাখিয়া একটি দীর্ঘনি-
শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কোন কোন
লোকের স্বভাব এই, একটি গুরুতর বিষয়
উপস্থিত হইলে বহুক্ষণ বহুদিন অগ্রপ-
শ্চাৎ বিবেচনা করেন, ভবিষ্যৎ ভাবেন।
এমন লোক প্রায় কোন বিষয়ে কৃতকার্য
হয়েন না। আমরা যে বাবুটির কথা বলি-
তেছি, ইনি এরূপ স্বভাবের লোক ছি-
লেন না, ইনি একেবারে কর্তব্য স্থির করি-
লেন। উঠিয়া কামিজটি পড়িয়া, চাদর
ও যষ্টি লইয়া বাটীর বাহির হইলেন।
যাত্রাকালে পত্রখানি সঙ্গে লইলেন।

ডাক্তার শিবনাথ বাবু কলিকাতার
মধ্যে ডাক্তারি কার্যে বড় বিখ্যাত লোক
ছিলেন না। কলিকাতায় অনেক ডাক্তার
আছে, হাইকোর্টের অনেক উকিলের ম-
তন তাহাদের বাসাখরচ পর্য্যন্ত চলে না।
শিবনাথ বাবু এদলের ডাক্তার নহেন,
কিন্তু একজন বিখ্যাত ডাক্তারও নহেন।
তাহার প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ছাড়া
অন্যে বড় তাহাকে ডাকে না; হাসপা-
তালে যে বেতন পান তাহাতে স্বচ্ছন্দে

চলে। শিবনাথ বাবু এক সময়ে ব্রাহ্ম ছি-
লেন, গোপনে যজ্ঞোপবীতও ত্যাগ করি-
য়াছিলেন, কিন্তু শুনিতে পাই, মাতার মৃত্যুর
পর আবার হিন্দু হইয়াছেন। ব্রাহ্ম হইয়া
স্ত্রীকে নিলক্ষণ লেখা পড়া শিখাইয়া-
ছিলেন, এবং অনেকটা স্বাধীনতাও দিয়া-
ছিলেন; এখন হিন্দু হইয়া সে স্বাধীনতা-
টুকু কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। এখন
আপত্তিকর ভক্ষ্য অপেক্ষাকৃত অধিক প-
রিমাণে ভক্ষণ করা হয়; কিন্তু তাহাতে
কোন দোষ নাই; কেননা হিন্দুধর্মের আ-
বরণ অঙ্গে আছে। সে যাহা হউক, শিব
নাথ বাবু বড় ভদ্র লোক, তাহার পত্নী
কাতারনীও বড় দয়ালবী ও মুশীল।
আমাদের বিরজা ইহাদের বাড়ীতে থাকে।
যে বয়সে ইংরেজ পুরুষ ও কামিনীদিগকে
যুবকযুবতী বলা যায়, শিবনাথ বাবু ও কা-
তারনীর সেই বয়স; অর্থাৎ চল্লিশ ও
পঁয়ত্রিশ। বিরজা শিবনাথ বাবুর বাড়ীতে
সামান্য পরিচারিকার ন্যায় থাকে না;
শিবনাথ বাবুর দুটি কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া
বিরজার কর্তব্য কর্ম।

পুনঃ পুনঃ ধর্ম পরিবর্তনে শিক্ষিত স-
মাজে শিবনাথ বাবুর নাম রাষ্ট্র হইয়া
যায়। আমরা পূর্বে যে বাবুর কথা ব-
লিতেছিলাম, গোবরগুলি নিবন্ধন তিনিও
শিবনাথ বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন।

রাত্রি দশটার পরে শিবনাথ বাবুর
দ্বারবান্ উপরে যাইয়া সংবাদ দিল যে,
একটি বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক-

রিতে আসিয়াছেন । শিবনাথ বাবু তৎ-
কালে আহারাদি করিয়া সর ওয়ান্টার স্ক-
টের আইবানহো নামক আখ্যায়িকা পাঠ
ও তাহার অর্থ পত্রীকে বুঝাইয়া দিতেছি-
লেন, এবং এই পুস্তকের কোন্ কোন্ চি-
ত্রের সহিত বাঙ্গলা উপন্যাস বিশেষের
কোন্ কোন্ চিত্রের সাদৃশ্য আছে তা-
হাও বলিতেছিলেন । ভগবতী যেমন ম-
হাদেবের মুখে অনন্যমনে যোগকথা শ্র-
বণ করিতেন, পতিপ্রাণা কাত্যায়নী ত-
দ্রূপ কাপেট বুনিতে বুনিতে শ্রবণ করি-
তেছিলেন । দ্বারবান্ সম্বাদ দিলে শিব-
নাথ বাবু পুস্তক বন্ধ করিয়া নীচে গে-
লেন ।

নীচেকার বৈঠকখানার আগন্তুক বাবু
বসিয়াছিলেন, শিবনাথ বাবু তথার যাইয়া
বসিলেন । আগন্তুক জিজ্ঞাসিলেন, ‘মহা-
শয়ের নাম শিবনাথ বাবু ?’

‘অজ্ঞা হাঁ ।’

‘কি প্রয়োজনে আসা হইয়াছে ?’

‘এই পত্রখানি পাঠ করিলেই জা-
নিতে পারিবেন ?’

এই বলিয়া আগন্তুক ডাক্তারের হাতে
পত্রখানি দিলেন, শিবনাথ বাবু প্রদীপের
নিকটে সরিয়া গিয়া পত্রপাঠ করিতে
লাগিলেন ।

দীর্ঘ পত্র পড়িতে একটু সময় লা-
গিল । পড়া শেষ হইলে পত্রের যে পৃ-
ষ্ঠায় বিপিন বিহারী চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ
ছিল, সেই পৃষ্ঠা উন্টাইয়া শিবনাথ বাবু

জিজ্ঞাসিলেন, ‘আপনার নাম কি বিপিন
বাবু ?’

‘আমার নাম বিপিন বিহারী চক্র-
বর্তী—আমি বিরজার স্বামী ।’

‘এখন আপনার অভিপ্রায় কি ?’

‘আমি বিরজাকে গ্রহণ করিতে
চাহি ।’

‘আপনি সেই অবধি বিবাহ আর
করেন নাই ?’

‘করি নাই—করিতামও না ।’

‘শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম । আমি
বিরজার বিবরণ সমস্ত শুনিয়াছি । আপনার
অনেক অনুসন্ধান গোপনে গোপনে করি-
য়াছি, কিন্তু উদ্দেশ্য পাই নাই । বিরজা
অতি মতী লক্ষী মেয়ে, আমার ব্রাহ্মণী
বিরজাকে আপনার কন্যাবৎ স্নেহ ক-
রেন । তবে বিরজাকে ত সহসা বিদায়
করিতে পারি না । বিরজা আমার কন্যা-
সদৃশী, আপনি জামাতা ; যেমন করিয়া
কন্যা বিদায় করিতে হয়, তেমনি করিয়া
বিরজাকে বিদায় করিব ।’

‘আপনি যে সম্পর্ক পাতিলেন, ই-
হাতে অধিক কথা বলিতে পারি না ; তবে
এই মাত্র বলিতে চাই যে, অদ্য একবার
আমি কি বিরজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে
পারি না ?’

‘অবশ্য পারেন । আপনি বসুন,
আমি বাড়ীতে এ সংবাদ দি ।’ বলিয়া
তিনি অন্তঃপুরে যাইয়া পত্রীকে সমস্ত ব-
লিলেন । তিনি বিরজাকে ডাকিয়া জি-

জামিলেন, ‘বিরজা, বিপিনবিহারী চক্র-বর্তীকে তুমি চিন ?’ বিরজা শীহরিয়া উঠিল; আনন্দ ও বিস্ময়ে বিরজাকে পরাভূত করিল; ক্ষণেক কাল স্তম্ভিতের ন্যায় থাকিয়া বিরজা উত্তর করিল, ‘আমার স্বামির ঐ নাম।’

‘তাঁহাকে দেখিলে এখন তুমি চিন্তিতে পারিবে?’

‘পারিব’ বলিয়া বিরজা কাঁদিয়া ফেলিল।

‘আমি তাঁহাকে উপরে লইয়া আসি’ বলিয়া শিবনাথ বাবু নীচে গেলেন।

গৃহিণী বিরজাকে কহিলেন, তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

আশার আশ্বাস মাত্রে যে মিলন এতদিন বিলম্বিত ছিল, বহুদিন পরে, যুগান্তে, গভীর নিশীথে দম্পতীর সেই মিলন কি সুখের সামগ্রী। শিবনাথ বাবুর দোতালার বারেন্দায় আজি সেই গভীর আনন্দময় মিলন। বিপিনবিহারীর পদপ্রান্তে বিরজা কাঁদিতেছেন, আর নিশীথিনী লক্ষ চক্ষু মেলিয়া তাহাই দেখিতেছে। বিপিনবিহারী উদাসীনের মত স্পন্দরহিত, রবরহিত দণ্ডায়মান আছেন। যে পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে সে উদাসীন। পূর্ণতায় আজি বিপিনবিহারী উদাসীন।

সহৃদয় শিবনাথ নিরর্থক শব্দ করিয়া গৃহহইতে গৃহান্তরে গমন করিলেন। তখন

বিপিন বিরজার চমক হইল। তখন বোধ হইল যে সংসারে এরূপ মিলন অনন্তকাল স্থায়ী নহে। ক্রমে আরও বোধ হইল যে, একবার নব্ব সমক্ষে উভয়ে উভয়ের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

বিরজা অগ্রেই কথা কহিলেন; ‘আমি যে এখানে আছি, আপনি কেমন করিয়া জানিলেন’ বলিয়া এতক্ষণ পরে বিরজা চক্ষু মুছিবার চেষ্টা করিলেন। আবার জল বেগে উছলিয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলেন ‘হায় আমি এমন কপালও করিয়াছিলাম, এই প্রীতিপূরিত হৃদয়ের প্রথম সন্মোদনে হৃদয়েশ্বরকে এমন করিয়া সম্ভাষণ করিতে হইল।’

বিপিনবিহারী এখনও নীরব; তিনি বিরজার পত্র বিরজাকে প্রদান করিলেন।

বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন এ পত্র আপনাকে কি ভবতারিণী দিদি দিয়াছেন? বিপিন বলিলেন ‘না’। একটি কথার পর দশটি কথা বলা অতি সহজ। এখন বিপিন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভবতারিণী’ তিনি কে? তুমি তাঁহাদের বাড়ী কতদিন ছিলে? সেখান হইতে তুমি তাঁহাদের না বলিয়া কোথায় গিয়াছিলে? আমি পত্রের সকল কথা বুঝিতে পারি নাই।’

বিরজা আবার অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ‘আমি হতভাগী একটা সংসার মজাইয়াছি; আমার দুর্দৃষ্ট বশে একটা বৃহৎ সংসার হতভাগী হইয়াছে। ভবতারিণী দি-

দীর দেবর আমাকে কলুষিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন ।’ বিরজা ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, বিপিন বিহারী পার্শ্বস্থ একখানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন ।

বিরজা বলিতে লাগিলেন ‘আমি তাঁহার পত্নী নবীনমণিকে প্রাণের মত ভাল বাসিতাম, আর ভবতারিণী দিদী আমাকে স্বীর অনুজ্ঞা ভগিনীর মত ভাল বাসিতেন । আমরা নবীনমণির স্বামীর অসৎ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতাম । সে আপনার অসৎ পথ হইতে কণ্টক দূর করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিযোগে নবীনমণিকে হত্যা করে । আমি সেই রাত্রিতেই সেখান হইতে পলায়ন করি । হতভাগা কিছুদিন পরে গৃহ হইতে নিকৃদ্দেশ হইয়া যায়, এবং বাতুলের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । পরিশেষে সে কলিকাতার অন্যান্য রোগীদিগের আশ্রয়ে সর্ব সমক্ষে নিজ গুরুতর পাপ স্বীকার করিয়া ইহসংসার হইতে অপমৃত হইয়াছে । আমি আমার আশ্রয়দাতা শিবনাথ বাবুর মুখে সকল শুনিয়া ভবদীদিকে পত্র লিখিয়াছিলাম । সে বাড়ীতে আমি আর ইহ জন্মে মুখ দেখাইতে পারিব না । আমি সে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, নবীনমণি এতদিন স্বামী-সোহাগে সেই সংসারের শোভা বর্জন

করিত, আর বর্ষীয়সী গৃহিণীও পুত্র শোকে প্রাণ বিসর্জন করিতেন না । যখন দেখিলাম যে হতভাগোর হৃদয়ে কালাগ্নি জ্বলিয়াছে, তখন কেন আমি সেই গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলাম না । আমি সেই গভীর রাত্রিতে পথচারিণী হইয়াছিলাম, কিছুদিন পূর্বে সেরূপ করিলে আমার আজি তোমার কাছে অনুশোচনা করিতে হইত না ।’

এবার বিরজার হৃদয়ভার অনেক লঘু হইয়াছে, তিনি মুখ ফুটিয়া কাদিতে লাগিলেন । এতক্ষণ বিপিন বিহারী প্রায়ই নীরবে ছিলেন, তিনি এখন প্রকৃত পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইয়া, রোক্তদ্যমানা বিরজাকে হৃদয়প্রান্তে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, এবং বলিলেন—‘সখি, তুমি কেন অনুশোচনা করিবে ? পবিত্রহৃদয়া অবলা প্রদীপ্ত পাবকশিখা ;—যে প্রেমের অবমাননা করিয়া পতঙ্গের মত তাহাতে ঝাপ দিয়া পড়িবে সেই এইরূপ পুড়িয়া ভস্ম হইবে । তবে নবীনের সারল্যময়ী প্রতিমূর্তি যে তোমার চিত্রপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে, এবং উহা যে অনেক সময়েই তোমাকে দগ্ধ করিবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি । অবলা কোমলপ্রাণা, কুসুমকোমলা । ইহাতেই অবলার সুখ, ইহাতেই অবলার দুঃখ । ইহাই অবলার গৌরব, ইহাই অবলার যজ্ঞগা ।’ (হ)

সমাপ্ত ।

বধূর অঞ্চল।

গাওরে সকলে গাও 'বজ্রের বিজয়'
গাও সুগভীর স্বরে, গাও ছয় কোটি নরে,
জয়নাদে দশদিশি হোক জয় জয়
হোক আজি স্বর্গে মর্ত্যে অকাল প্রলয়।

কুসিয়ার বীরগর্ব যা'কু রসাতলে,
কাঁপুক ইংলণ্ড বাঙ্গালির ভূজবলে,
দাপটে অধীর হোক ফরাশির দল,
ভয় পোরে ভীত হোক কুসিয়ার বল;
ঘুটিল বজ্রের ভয়, গাওরে বজ্রের জয়,
নির্জীব ভারত হোক সজীব এখন;
মাতুক পামাণচর, জলস্থল সমুদয়,
জ্বলুক বজ্রতে আজি জ্বলন্তুদহন।

কি ভয় বজ্রের, আর কি ভয় বজ্রের?
প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে, বাঙ্গালির করতলে,
কামিনী-অঞ্চল-অস্ত্র অমোঘ অজয়,
ধর অস্ত্র, মাজ রণে, কর বিশ্বজয়
গাওরে আবার গাও 'বজ্রের বিজয়'।

নাহি অসি চর্য, নাহি বন্দুক কামান,
নাহি তেজ, নাহি বীৰ্য, নাহি ধনুর্কাণ,
হৃদয়ে সাহস নাই, দেহে নাই বল,
নাই বা থাকিল—আছে বধূর অঞ্চল!
বীরত্ব গৌরব স্থল, প্রেমসী বসনাঞ্চল,

ছাড়িও না, ছাড়িও না কহু বঙ্গবাসি!
বাজাওরে জয়ভেরী, মাজাওরে নিজনারী,
ছড়াওরে স্বাধীনতা, হাস মুখহাসি।

নখ দন্তে সিংহ ব্যাঘ্র রণেতে ভীষণ,
ভূজবজ্রের বরাহের সম্মল দশন,
মদমত্ত করী করে কর আশ্ফালন,
মেঘ মহিষের শৃঙ্গ রণে প্রহরণ,
সারসের বারসের চঞ্চুই সম্মল
বাঙ্গালির ব্রহ্ম অস্ত্র বধূর অঞ্চল।

তবে কেন?—বল তবে কেন আর
রুগা কাল হর, হও অগ্রসর,
'বাঙ্গালি বিজয়ী' গাওরে আবার,
কর সমাগরা ধরা অধিকার।

অর্জুনের গাণ্ডীবের নাই প্রয়োজন,
জুলিয়স সিজরের, অথবা সেকন্ডরের,
শাণিত অসির বাণী ক'রোনা কখন;
বাণ্ডিও না রাইফল বন্দুক কামান
অঞ্চলের নিধি! কর অঞ্চলের ধ্যান।

কিসের অভাব তবে বঙ্গ যুবকের?
সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত দর্শন;
লোক ব্যবহার নীতি বিবরণ,

অস্ত্র পাশপত, চক্র সুদর্শন,
গদা কোমোদকী, অশনি ভীষণ,
বজ্র কুলবধূদের আঁচলের কোণে ;
ভুবনে অতুল বজ্র আঁচলের গুণে,
বল আর বাঙ্গালির অভাব কিসের ?

পিতৃভক্তি ভাতৃস্নেহ দূরমপসর,
ভগিনীর প্রতি প্রীতি প্রকাশে কি কাজ ?

চিরন্তন সমাজবন্ধন ছিন্ন কর,
দূর কর লজ্জাবতী রমণীর লাজ ;
হউক উজ্জ্বল বজ্র যশের কিরণে
ঘুমুক বজ্রের যশ সমগ্র ভুবনে ।

স্বর্গাদপি গরীয়সী সুহপ্রবাহিনী
কে বলিবে একগতে কেবলি জননী ?
আছে ভক্তি-প্রীতি-সুহ-আদরের খনি,
প্রাণাধিকা প্রণয়িনী নয়নরঞ্জিনী ;
যার চঞ্চল অঞ্চলে, বিলম্বিত কুতূহলে,
রসাল বাঙ্গালি, সেই বজ্র বধূ কুল,
একমাত্র বাঙ্গালির উন্নতির মূল ।

ললিত লতিকা শোভে কিসলয় দলে,
সুদৃশ্য পাদপচর ফুল কুল ফলে,
নব দূর্বাদলে শোভে শিশিরের বিন্দু,
শারদ গগনে শোভে সুবিমল ইন্দু,
আবার—

শশীসহ তারাদলে নিশি শোভা পার,
কামিনীর কণ্ঠ শোভে মুকুতামালায়,
হৃপূর সিঞ্জে শোভে নর্তকীচরণ,
বধূর অঞ্চলে শোভে বজ্রবাসিগণ ।

আর কি ভাবনা,—তবে আর কি ভাবনা ?
কর মন্ত্রপুত আঁচলের কোণা ;
ছুটিবে বিদ্রাতরাশি, কাঁপিবে ত্রিলোকবাসী,
দেব দৈতা নর গন্ধর্ব্ব কিরর,
যক্ষ রক্ষ আদি কাঁপিবে সকল,
ঝলসিবে চক্ষু, ঘুড়িবে মস্তক,
মানিবে সভয়ে সবে পরাক্রম,
বাজ্রিবে অস্ত্রের বিজয় ঝঙ্কনা
হইবে অচিরে বিজয় ঘোষণা ।

তাই বলি—

দম্ভভরে মেতে উঠ বজ্রবাসিগণ !
প্রচণ্ড প্রতাপ তাপে, ভয়ঙ্কর বীরদাপে,
ভূজদণ্ডের প্রভাবে, হৃদয়ের উষ্ণভাবে,
টলুক কৈলাসপুরে শূলীর আসন ;
কাঁপুক অবনী ব্যোম, ধমুক আদিত্য সোম,
পড়ুক নক্ষত্র পুঞ্জ হয়ে কক্ষচ্যুত ;
মাত ভীম রণমদে, ধাও সবে ক্ষিপ্রপদে,
দেখাও বিক্রম আজি চিরনির্বাচিত ।

কি ভয় ?

ক্রান্তকলেবর যবে হইবে আহবে,
ধরিয়া চিবুকখানি, বামকরে বামাজিনী,
অঞ্চল দোলায়ে মৃদু বাতাস করিবে,
ললাটের স্বেদজল অঞ্চলে মুছিবে,
কি ভয় ? অঞ্চল যার সহায় এভাবে ।

আক্রমে বিপক্ষ যদি হর্যাক্ষ বিক্রমে,
আকর্ণ-পূরিয়া করে বাণবরিবণ,
আঁচল সাজেয়া দিয়ে, কুলতনু আচ্ছাদিয়ে

দিবে ফুলময়ী, হবে অভেদ্য তখন,
শ্রান্ত হবে শক্রচমু শুধু পশুশমে ।

অনংখা অরুণ করে সংখ্যাতীত অসি,
দেখিয়া স্তম্ভিত ভয়ে হ'ওনা কখন ;
ধীরে আঁচলের আড়ে, ধীরে দাঁড়াইবে স'রে,
মেঘ আড়ে মেঘনাদ যুঝিত যেমন,

যুঝিবে তেমতি, দে'খে সৌদামিনী হাসি ।
শিরে শিরস্রাণ দিবে আঁচল টানিয়া,
কামিনী-কটাক্ষ লবে নাগাইয়া ;
লভিবে বিজয়লক্ষ্মী আঁচলের বলে,
কর সিংহনাদ, ভরে কাঁপুক সকলে ।
জান কি ভবের ভাব কিমে কিবা ফলে ?
বন্ধের অব্যর্থ সন্ধি বধূর অঞ্চলে । শ্রীম

প্রাতঃস্থান ও প্রাতঃক্রিয়া ।

(পূর্ব প্রকাশিতের অবশিষ্ট ।)

মনুষ্য বাসীমুখে থাকিলে সর্বদা অপবিত্র, সেই হেতু যত্নপূর্বক দন্তধাবন করিবে (১) । প্রাতঃকালে নিশিঞ্চল পান করিয়া কোমল অথচ কষায়, কটু ও তিক্ত রসযুক্ত দন্তকাষ্ঠ (দাঁতন) দ্বারা দন্তঘর্ষণ কর্তব্য । কিন্তু একপভাবে ঘর্ষণ করিতে হইবে যে, তদ্বারা দন্তমাংসের (মাড়ির) যেন পীড়া না হয় (২) । দন্তকাষ্ঠ মধ্যাঙ্গুলির ন্যায় সুল, দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ ও ত্র্যচ-যুক্ত হইবে । তাহাতেই দন্তধাবন করিবে (৩) কিংবা উহা কনীনী অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগের ন্যায় সুল হইলেও চলিতে

পারে (৪) । করবীর, আত্র, করঞ্জ, বকুল, ক্ষীরি, মালতী, অপামার্গ, বিষ্ণু প্রভৃতির এবং কটেকযুক্ত রক্ষমাত্রের কাষ্ঠে দন্তধাবন কর্তব্য (৫) । যাবতীর তিক্তরসযুক্ত দন্তকাষ্ঠের মধ্যে নিষের দন্তকাষ্ঠই সবিশেষ প্রশস্ত । বঙ্গদেশোপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে অনেকেই দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করে । গুবাক, তাল, হিঙ্গাল, খজ্জুর, কেতকী, নারিকেল, তেড়ে প্রভৃতি কএক

স্তম্বাণ্ডেণ চ ধাবয়েৎ ॥ (কুর্ম্মপুরাণ, উপবিভাগ, ১৭ অধ্যায় ।) — (৪) কনীনা-গ্রনিভম্ভৌল্যং সর্করং দ্বাদশাঙ্গুলং । (নরসিংহ পুরাণ ।) — (৫) করবীরর-সালশ্চ করঞ্জবকুলাসনান্ । দন্তকাষ্ঠার্থ-মন্যে তু সর্কালুরুন্ কটকিতান্ ॥ (রাজবল্লভ) । — ক্ষীরিরক্ষসমুদ্ভূতং মাল-তীসম্ভবং শুভং । অপামার্গঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ ক-রবীর বিশেষতঃ ॥ (কুর্ম্মপুরাণ, উপবি-

(১) মুখে পর্য্যুষিতে নিত্যং ভবতাপয়তো নরঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদন্তধা-বনং ॥ (রক্ষশাত্তপ ।) — (২) প্রাত-ভুক্ত্য চ পানীয়ং কষায়কটুতিক্তকং । ভক্ষয়েদন্তকাষ্ঠকং দন্তমাংসান্যাবাধয়ন্ ॥ (রাজবল্লভ) । — (৩) মধ্যাঙ্গুলসমম্ভৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলসম্মিতং । সত্র্যচং দন্তকাষ্ঠং স্যা-

প্রকার কাঠে দন্তধাবন কর্তব্য নহে (১) । এই সকল রক্তের শিরা (ডাঁটা) পত্র প্রভৃতির দ্বারা দন্তধাবন করিলে, যে পর্য্যন্ত গোদর্শন না হয়, তাবৎকাল চণ্ডালত্ব ঘটে (২) । দন্তমাংসে আঘাত লাগিয়া পাছে রক্তপাত ও পীড়া উপস্থিত হয়, সেই জন্যই এই সকল রক্তকাষ্ঠাদিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ বলিয়া নানা প্রকার শাসন সজ্জিত হইয়াছে । ইচ্চক (ইট বা অন্য প্রকার দক্ষমৃত্তিকাখণ্ড) লোম্ভ (লৌহ-মল) প্রসূর ও অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবনও কর্তব্য নহে । কিন্তু সময়বিশেষে যদিও অঙ্গুলিযোগে দন্তধাবন করিবার আবশ্যক ঘটে, তাহা হইলে অনামিকা ও রক্তাঙ্গুলি যেন ব্যবহৃত না হয় (৩) । অঙ্গুলি দিয়া দন্তধাবন করিলে নখরাঘাতে দন্তমাংস ছিন্ন হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন । কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ভাগ, ১৭ অধ্যায় ।)—(১) গুবাকতাল-হিষ্টালখর্জুরৈঃ কেতকীযুতৈঃ । নারিকেলেন তাড়্য চ ন কুর্যাদদন্তধাবনং ॥ (রাজবল্লভ ।)—(২) গুবাকতালহিষ্টালান্তথা তাড়ী চ কেতকী । খর্জুরনারিকেলো চ সপৈণ্ডতে তৃণরাজকাঃ ॥ তৃণরাজনিরাপ-ত্রৈবঃ কুর্যাদদন্তধাবনং । তাবদুভতি চাণ্ডালোযাবদ্যাত্নৈব পশ্যতি ॥ (ক্রিয়া-কৌমুদী ।)—(৩) নেম্টাকালোম্ভপাষা-গৈরিতরাঙ্গুলিভিস্তথা । তাক্তা অনামিকা-ঙ্গুষ্ঠৌ বর্জয়েদদন্তধাবনং ॥ (পরাশরভাষ্য

যদি দন্তকাঠের প্রচলন দোষাবহ নহে, তবে অঙ্গুলি ব্যবহার কি জন্য দোষের হইবে ? দন্তমাংসে শোণিতপাত ও পীড়ার ভয় কি কেবল অঙ্গুলিতেই হয়, দন্তকাঠে হয় না ? আমরা স্বীকার করি, তাহা হয় বটে, কিন্তু অনিষিদ্ধ দন্তকাঠের দ্বারা দন্তধাবনের সময়, যদিও সময়ে সময়ে মাড়ি ছিন্ন হইয়া পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না । নখরদ্বারা একপ্রকার বিষাক্ত দ্রব্য আছে, সুতরাং নখর দ্বারা দন্তমাংস ছিন্ন হইলে স্বাস্থ্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা নখর-বিষের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এমন কি দন্তকাঠের অভাবে ও দন্তকাঠ দ্বারা দন্তমাংসের প্রতিষিদ্ধ দিবসেও অঙ্গুলি ব্যবহারে অনুমতি দেন নাই ; কেবল দ্বাদশ গণ্ডুষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধির বিধান দিয়া গিয়াছেন (৪) । দক্ষিণাস্যে দন্তধাবনে আয়ুঃকয়, পশ্চিমাস্যে রোগ, উত্তরাস্যে ও পূর্বাস্যে সম্পদ লাভ হয় (৫) । অমাবস্যা, প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ (৬) । যাজ্ঞবল্ক্য ।)—(৪) অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা । অপাং দ্বাদশগণ্ডু-ষৈর্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে ॥—(হৃসিংহপুরাণ ।) (৫) মৃত্যুস্যাদক্ষিণাস্যেন পশ্চিমাস্যেন চাময়ঃ । পূর্বাস্যেনোত্তরাস্যেন সম্পদে-দন্তধাবনাং ॥ (রাজবল্লভ ।)—(৬) প্রতিপদর্শষষ্ঠীষু নবম্যষ্টৈব সন্তমাঃ । দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাঙ্গুষ্ঠমং

অজ্ঞীর্ণ হইলে, ত্রুত বা উপবাস করিলে, এবং জন্ম, বিবাহ ও শ্রাদ্ধ দিবসেও দন্তধাবন পরিত্যাগ করা উচিত (১)। বোধ হয় অনেকে দন্তধাবনের একরূপ শাস্ত্রীয় বিধি দেখিয়া উপহাস করিবেন। বিশেষতঃ অধুনাতন নব্য-বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর নিকট ঐদৃশী শাস্ত্রবিধি পাগলামি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহারা একরূপ কথা বলিতে অগ্রসর, তাহারা একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, পূর্বতন আৰ্য্যমনীষিগণ কেবল সনাতন হিন্দুধর্মেরই চরমোৎকর্ষ স্থাপনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন না, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান মিশাইয়া বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে কোন আৰ্য্যধর্মশাস্ত্র খুলিয়া দেখ, তাহার মধ্যে বিজ্ঞান মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আবার যে কোন আৰ্য্য-বিজ্ঞান-শাস্ত্র উন্মোচন কর, তন্মধ্যে বিজ্ঞানের হাড়ে হাড়ে ধর্মের নাম উজ্জ্বলিত দেখিবে। একরূপ হইবার কারণ কি? মনুষ্য পাপের ভয়ে ও পুণ্যের লোভে ধর্মকে ভয় করে। বিশেষতঃ প্রাচীন কালে যখন সমগ্র জগৎ সরলতাপূর্ণ ছিল, তখন লোকের মনে ধর্মধ্যান স্বতঃই জাগ্রত থাকিত। ধর্মোপার্জনের জন্য সকলেই আত্মবিসর্জন দিতেও কাতর হইত কুলং ॥ (নৃসিংহ পুরাণ।) — (১) শ্রাদ্ধে জন্মদিনে চৈব বিবাহেহজ্ঞীর্ণমন্তবে। ত্রুতে চৈবোপবাসে চ বর্জয়েদন্তধাবনং ॥ (বৃদ্ধশাতাতিপ।)

না। এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে ধর্মবন্ধন শিথিল হইতেছে দেখা যায়, তখন ধর্মবন্ধন শিথিল না হইয়া বরং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়াছিল। অপিচ তৎকালে নীরস বিজ্ঞানের দিকে বড় কেহ আদর প্রদর্শন করিত না, বরং উহাকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করিত। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যকে বিজ্ঞানে বিশ্বস্ত করিবার জন্য উহার সহিত ধর্মশাসন মিশ্রিত করিতে হইয়াছিল। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্যতর অংশ বলিয়া পরিগণিত। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ যেখানে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে কোন কথা বলিয়াছেন, সেই খানেই ধর্মভয় দেখাইয়া উহা দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন্ দিকে অভিযুখীন হইয়া দন্তধাবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য করিলে রোগ, কোন্ দিকে সম্পদ, বা কোন্ দিকে আয়ুঃক্ষয় এবং চণ্ডালত্ব, পাপগ্রন্থ বা পতিত হইতে হয়, এবং বিধি নানা প্রকার কথা লিখিত হইয়াছে। সুচতুর ঋষিগণের এই প্রকার কৌশলে প্রাচীন সময়ে সকলে ধর্মভীত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হইত। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র সমূহ উদ্ঘাটন করিয়া দেখ, তৎসমুদয়ে ধর্মের কোন সংশয় আছে কি না সন্দেহ। তাহারই বা কারণ কি? আমরা এক প্রকার বলিতে পারি যে, আৰ্য্য-ধর্ম যেরূপ উৎকৃষ্ট ও আৰ্য্যজাতি যেরূপ ধর্মভীত, সে রূপ পৃথিবীর অন্য কোন দে-

শের ধর্ম উৎকৃষ্ট বা তথাকার লোক ধর্ম-
ভীক বলিয়া বোধ হয় না । ভারতবর্ষে
ধর্মের বন্ধন নিরতিশয় দৃঢ় বলিয়াই যান-
তীয় বিষয়েই কোন না কোন রূপে উহা
প্রতিভাসিত হইয়াছে । যাহা হউক, আ-
মরা প্রাচীন ঋষিগণকর্তৃক স্বাস্থ্যের স-
হিত ধর্মমিশ্রণসম্বন্ধে আর একটি কথা ব-
লিব । তাঁহারা যে কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বি-
ষয়ে খালি খালি ধর্মের দোহাই দিয়া
গিয়াছেন, এমন নহে । কেন না তাঁহা-
গের বিধিব্যবস্থাসমূহের প্রতি বিশেষ ম-
নোযোগসহকারে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলে,
তাঁহার নিগৃঢ় তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় ।
বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন যে,
চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে জীব-
শরীরের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ আছে ।
তিথিবিশেষে ঐ সকল গ্রহের সংক্রমণ
কালে মানব শরীরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে হ্রাস
বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে । এইজন্য অমাবস্যা,
পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে লঘু
আহার বা উপবাস ইত্যাদির বিধান প্রদত্ত
হইয়াছে । এবং এইজন্যই অমাবস্যা, প্র-
তিপদ দ্বিতী ও নবমী তিথিতে দন্তকাষ্ঠদ্বারা
দন্তধাবনাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই ।
দিক্-বিশেষে অভিযুখীন হইয়া দন্তধাবনেরও
এই প্রকার নিগৃঢ় কারণ আছে, তাহাতে
সন্দেহ নাই । প্রাচীন মনীষিগণ মানবকু-
লের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত এবংবিধ নানা
প্রকার বিধি ও উপদেশ দিয়া গিয়া সাধারণ-
ণের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । যে

পরিমাণে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, সেই
পরিমাণে তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা, চিন্তার
গভীরতা ও অপূর্ব কৌশল সমন্বিত স্বাস্থ্য-
বিধান সমূহের অন্তস্তনস্থ মর্ম হৃদয়স্থম ক-
রিতে সক্ষম হইবে । কতকগুলি অদূরদর্শী
ব্যক্তির মতে প্রাচীন হিন্দুগণ বিজ্ঞান-
চর্চার অনিপুণ ছিলেন বলিয়া প্রতিষে-
ষিত হইয়াছে, কিন্তু সেটি নিতান্ত ভ্রম ও
অন্যায় । আমরা বলিতে পারি, ধর্ম স-
ম্বন্ধে হিন্দুজাতির নিকট কাহারও উচ্চশির
হইবার পন্থা নাই, কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে
যদিও তাঁহারা মধ্যো মধ্যো অতিব্যাপ্তি প্র-
ভৃতি কোন কোন দোষ ঘটাইয়া গিয়া-
ছেন বটে, তথাপি বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের
অসাধারণ জ্ঞান ছিল না বলিয়া কে প্রতি-
পন্ন করিতে পারে ? এ প্রস্তাবে সে বিষ-
য়ের অবতারণা করা উদ্দেশ্য নহে ।

দন্তধাবনের পক্ষে লবণ ও তাল প-
দার্থ । ইহা দ্বারা দন্ত মাংসের দূষিত রস নি-
র্গত হইয়া দন্তমূলকঠিন হয় । দন্তের উর্দ্ধাধঃ
ঘর্ষণ পূর্বক মুখে জলপূর্ণ করিয়া নেত্রদ্বারে
জল সেচন করিলে শীঘ্র দৃষ্টিপ্রসন্ন হয়
(১) । কিন্তু অর্দিতরোগী অর্থাৎ বায়ু রোগে
বক্রীকৃত মুখরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কণ্ঠরোগী, দন্ত-
রোগী, নবজ্বরী, মক্ষ্মারোগী, কাসরোগী
ও মূচ্ছারোগযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দন্তকাষ্ঠ
দ্বারা দন্তধাবন কর্তব্য নহে (২) এতদ্বা-

(১) দন্তানূর্দ্ধ মধোমুখে জলসিঞ্চেত লো-
চনে । তোরপূর্ণমুখস্থেন দৃষ্টিরাশু প্রসী-
দতি ॥ (রাজবল্লভ ।)—(২) অর্দিতী ক-

তীত ব্রহ্ম ও অপরিমিত পীড়াগ্রস্ত লোক-
দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দন্তকাষ্ঠ
ব্যবহার করা প্রযুক্ত।

প্রাতঃক্রিয়ার আর একটি অঙ্গ জিহ্বা-
মার্জন। সুবর্ণ, রক্তত, তাম্র অথবা লৌ-
হের দশাঙ্গুল পরিমিত সূক্ষ্ম অথচ কো-
মল মার্জ্জনীতে (জিব-ছোলাতে) জিহ্বা-
মার্জ্জনে মুখের বিরসতা ও জিহ্বা ও দন্ত-
ক্রেদ দূর হয়, এবং আরোগ্য, কচি ও দ-
ন্তের সদ্যঃ বিশুদ্ধতা জন্মে (১)। জিহ্বা-
মার্জ্জনের দ্বারা জিহ্বামার্জ্জনের এই সকল
গুণ থাকিতেও অনেকে উহা ব্যবহার করে
না, সেটি কেবল আলস্যদোষে ঘটয়া
থাকে। আবার কেহ কেহ অনালসা পর-
তন্ত্র হইয়া কেবল তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গু-
লিঙ্গয় মুখমধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করাইয়া
জিহ্বার উপর ঘন ঘন সঞ্চালন করিয়া
থাকে। এ উভয়ই ভাল মহে। কারণ, এ-
কবারে জিহ্বামার্জন না করিলে জি-
হ্বায় ক্রমে ক্রমে ক্রেদ জন্মিয়া জিহ্বাক্রত
হইবার সম্ভাবনা এবং অঙ্গুলি প্রবেশনে
জিহ্বা মার্জন করিলে কণ্ঠনালীর বিকৃততা
ঘটিয়া উঠে।

প্রাতঃভ্রমণ ও তদনন্তর মুখ, দন্ত, জি-
হ্বাশূলী চ দন্তরোগী নবজ্বরী। শোষী কাসী
চ মুচ্ছার্ত্তো দন্তকাষ্ঠং বিবজ্জয়েৎ ॥ (রাজ-
বল্লভ)। (১) জিহ্বানিলেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণ-
তাম্রমারসং। তন্মলাপহরং শস্ত্রং মৃদুসূক্ষ্মং
দশাঙ্গুলং ॥ নিহস্তি বক্তুর্বৈরসাং জিহ্বা-
দন্তাশ্রিতং মলং। আরোগ্যং কচি মাধতে

স্বাদি ধাবনের পর প্রাতঃস্থান করা অতি
বিধেয়। প্রাতঃস্থান করিলে যে দেহী মা-
ত্রেই স্বাস্থ্য অটুট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা
প্রাচীন আৰ্য্য মনীষিগণ বিশেষরূপে অব-
গত ছিলেন। প্রাতঃস্নায়ী ব্যক্তি পূর্ব-
দিক্ অকণকিরণগ্রস্ত দেখিয়া প্রাতঃস্থান
করিবে (২)। প্রতিদিবস প্রাতঃকালে
সুস্থ ব্যক্তি দন্তধাবন করিয়া নদাদিতে বা
গৃহে স্নান করিবে (৩)। প্রাতঃস্নানে বি-
শেষরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় বলিয়া প্রাচীন
ঋষিগণ ইহার মধ্যেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া
গিয়াছেন (৪)। বাস্তবিক স্নান করিলে

সদ্যোদন্তবিশোধনং ॥ (রাজবল্লভ) — (২)
প্রাতঃস্নায়াকণকিরণগ্রস্তাং প্রাচীনবলোকা
স্মারাৎ। (সমুদ্রকর)। — (৩) যথাহনি
তথা প্রাতর্নিতাং স্মারাদনাতুরঃ। দন্তান্
প্রক্ষাল্য নদাদৌ গেহে চৈতদমত্ৰবৎ ॥
(কাভ্যায়ন)। — (৪) উষঃকালে তু সং-
প্রাপ্তে কৃতাচাবশ্যকং বুধঃ। স্মারান্নদীষু শু-
দ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ প্রাতঃস্নানে
পূরন্তে যেহপি পাপকৃতো জনাঃ। তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ প্রা-
তঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্বিচিন্তিতং ॥
প্রাতঃস্নানে পাপানি ধূরন্তে নাত্র সংশয়ঃ।
নচ স্নানং বিনা পুংসাং প্রশস্তং কৰ্ম্ম সং-
স্মৃতং ॥ হোমে জপো বিশেষণে তস্মাৎ
স্নানং সমাচরেৎ। (গারুড় পুরাণ, ৫০
অধ্যায়।) — অপিচ — উষস্বাসি যৎ স্নানং
সক্কায়া মুদিতেরবৌ। প্রাজাপত্যেন ত-

শরীর পবিত্র হয়, অর্থাৎ ঘর্ম, গাত্রমল
প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বিধৌত এবং শারী-
রিক বল প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে (১) ।
অধিকন্তু লোমকূপ সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া
শোণিত বিশুদ্ধ হয় । সুতরাং স্বাস্থ্য বর্দ্ধ-
নের পক্ষে স্নান অত্যন্ত হিতজনক । অ-
নেকে সুবিধানুসারে দিবাভাগের মধ্যে যে
কোন সময়ে স্নান করে, কিন্তু নৈরূপ না
করিয়া যদিপি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের
কোন সুবিধা করিতে পারে, তাহা হইলে
শারীরিক সুস্থতা বিষয়ে অধিকতর উপ-
কারলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

স্নান প্রধানতঃ দুই প্রকার । অবগাহন
ও উল্লবর্ষণ । নদী, সরোবর প্রভৃতি জলা-
শয়ে বা স্বহস্তে জলপূর্ণ পাত্রে সমুদয় শ-
রীর নগ্ন করাইয়া প্রথম প্রকার ও পাত্রস্থ
জল উল্ল হইতে মস্তকাদিতে ঢালিয়া দ্বিতীয়
প্রকার স্নান হইয়া থাকে । এতদ্ব্যতীর মধ্যে
অবগাহন স্নানই প্রশস্ত ও অধিকতর হিতকর ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সুস্থ ব্যক্তির
পক্ষে প্রত্যহ স্নান করা কর্তব্য । কিন্তু অ-
তুল্য মহাপাতকনাশনং ॥ যৎফলং দ্বাদ-
শাব্দানি প্রাজাপতৈঃ কৃতৈর্ভবেৎ । প্রা-
তঃস্নাতী তদাপ্নোতি বর্ষণে শ্রদ্ধয়াস্থিতঃ ॥
য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহো-
পমান্ । প্রাতঃস্নাতী ভবেন্নিত্যং ধৌমাসৌ
মাঘফাল্লুনৌ ॥ (গারুড়পুরাণ ২১৫
অধ্যায়)—(১) স্নানং পবিত্রমায়ুষ্যং
অমশ্বেদমলাপহং । শরীরবলসন্ধানং কে-
শমাজস্বরং পরং ॥ (রাজবল্লভ ।)

দ্বিতরোগী, নেত্ররোগী, কণরোগী, অতি-
সাররোগী, আধ্বানরোগী, পীনসরোগী,
অজীর্ণরোগী এবং ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে
নিতান্ত নিষিদ্ধ (২) । এবংবিধ রোগীদি-
গের রোগ শমতা ও ভুক্ত ব্যক্তির আহার্য্য
জীর্ণ হইলে স্নান করা বিধেয় । অনেকে,
পেট ফাঁপিলে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া
ডুব দিতে থাকে, কিন্তু তদ্বারা উপকারের
বদলে অনিষ্ট ঘটবার নিতান্ত সম্ভাবনা ।
বায়ু প্রকুপিত হইলেই পেট ফাঁপে, সু-
তরাং তখন উদরে তৈলমর্দন করাই বি-
ধেয় (৩) ।

উল্লিখিত উভয়বিধ স্নানই শীতল
(কাঁচা) ও উষ্ণ (পাকা) জলে সম্পন্ন
হয় । তন্মধ্যে উষ্ণজলে অধঃকায়ের (ম-
স্তক ব্যতীত দেহাংশের) পরিষেক করিলে
বলহ্রাস হয়, কিন্তু মস্তকের পরিষেক ক-
রিলে কেশ ও চক্ষুঃসত্তা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।
আর শীতল জলে শিরঃস্নান অর্থাৎ অব-
গাহন স্নান করিলে তৃষ্ণা, তালু ও ওষ্ঠ-
শোথ, মলা, উষ্ণব্রণ, গাত্রকণ্ডু এবং পি-
তুজনা শিরোরোগ বিনষ্ট হয় (৪) ।

—(২) স্নানমর্দিতনেত্রাস্যকর্ণরোগা-
তিসারিষু । আধ্বানপীনসাজীর্ণভুক্তবৎসু
চ গর্হিতং ॥ (আয়ুর্বেদ ।)—(৩)
নাস্তি তৈলাৎ পরং কিঞ্চিদৌষধং মা-
কতাপহং । (রাজবল্লভ)—(৪) উ-
ষ্ণানুনাধঃকায়েন পরিষেকো বলাপহং ।
তেনৈবভূতমঙ্গস্য বলকৃৎ কেশচক্ষুবোঃ ॥
বিনিহন্তি শিরঃস্নানং তৃষ্ণাতাংলোষ্ঠশো-

প্রতাহ যাহাদিগের প্রাতঃস্থান মহা হয় না এবং যাহারা অশকু ও পীড়িত, তাহাদিগের পক্ষে প্রাতঃবগাহন স্নানের পরিবর্তে আশিরঙ্কস্নান অর্থাৎ গাত্র প্রক্ষালন বা আর্জ গাত্র-মার্জনী (গামোছা) দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা কর্তব্য (১) ।

প্রাতঃস্নানের অব্যবহিত পূর্বে নিদান পক্ষে ১৫ মিনিটকাল উত্তমরূপে তৈলমর্দন করা উচিত । লোমকূপ দিয়া শরীরভাঙ্গুরে তৈল প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা উপকার দর্শে । তৈলমর্দনে শরীর কোমল, কফ ও বায়ুর শমতা, ধাতুপুষ্টি এবং কান্তিপ্রসন্নতা হয় । পায়ের তলায় তৈলমর্দন করিলে নেত্রের উপকার দর্শিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে না । এবং পায়ের কোনপ্রকার পীড়া থাকিলে, তাহার শমতা হইয়া থাকে । কিন্তু কফরোগী, জীর্ণ রোগী ও বমনবিরেকাদি দ্বারা সংশুদ্ধ দেহীর তৈলমর্দন কর্তব্য নহে । তৈলমর্দন করিয়া স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয় এবং লোমকূপ দিয়া শিরামুখযোগে নাড়ীতে তৈল প্রবিষ্ট হইলে শরীরের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে । সর্বদা তৈল দ্বারা ঘণং ॥ মলোক্ষপিড়কাকণ্ড শিরোরোগাঞ্চপৈতিকান্ । (রাজবল্লভ ।)—(১) অশক্তাবশিরঙ্কং বা স্নানমস্য বিধীয়তে । আদ্রেণ বাসসা চাথ মার্জনং কারিকং স্মৃতং ॥ (কুর্ম্যপুরাণ, উপ, ১৭ অঃ)—অপিচ—আশিরঙ্কং ভবেৎ স্নানং স্নানশক্তৌ চ কর্মিণাং । অদ্রেণ বাসসা বাপি মার্জনং

মস্তক আর্জ রাখিলে শিরঃশূল, টাকপড়া প্রভৃতি মস্তকের পীড়া হয় না, এবং শীত্ৰ কেশপক ও কেশ পতন না হইয়া বরং ঘন, দৃঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ হয় । তৈলমর্দনে মুখশ্রী বৃদ্ধি হয় এবং কণে নিত্য তৈলপূরণ করিলে বায়ুজন্য কণরোগ, বাধির্ষ্য অর্থাৎ উঠকঃশ্রবণ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে (২) । মর্দনের পক্ষে তিল ও সরিষার তৈলই সুপ্রশস্ত । সার্বপ তৈল কটু, উষ্ণবীর্ষ্য, এবং কফ, বায়ু, গাত্রকণ্ডু ও ক্রিমিরোগনাশক; কিন্তু রক্তপিত্ত রোগে অহিতকারী ও শুক্রনাশক (৩) । তিলতৈল বয়ঃক্রমের সৈর্ষ্যকর, বায়ুনাশক, বস্তিকর্ষে অর্থাৎ পিচ্কারীতে, মর্দনে, নৈহিকং বিদুঃ । (জাবাল)—(২) অভ্যঙ্গো মার্দবকরঃ কফবাতবিনাশনঃ । ধাতুনাং পুষ্টিজননো মৃজাবর্ণপ্রসাদনঃ । পাদাভ্যঙ্গোহথ নিদ্রাক্লৃষ্ণকৃবঃ পাদরোগহা । বর্জ্যোহভ্যঙ্গঃ কফগ্রাস্তরুতসংশুদ্ধ-জীর্ণিতিঃ ॥ স্নেহোহবগাহনে যুক্তঃ শরীরে বলমাচরেৎ ॥ শিরামুখে রোমকূটপৈর্দমনী-ভিষ্ণু তর্পয়েৎ । নিত্যং স্নেহাঙ্গশিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে । ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ ॥ দৃঢ়মূলশ্চ কৃষ্ণাশ্চ ভবন্তি চ ঘনায়তাঃ । ইন্দ্রিয়ানি প্রসীদন্তি শুদ্ধং ভবতি চাননং ॥ কণপ্রপূরণান্নিত্যং ন মন্যাহনুসংগ্রহঃ । নোঠকঃ অতি ন বাধির্ষ্যং ন কণে বাতজ্বাকজঃ ॥ (রাজবল্লভ ।)—(৩) কটুক্ষং সার্বপং তৈলং রক্তপিত্তপ্রদূষণং । কফশুক্রানিল-

নাসিকা ও কণ্ঠ প্রভৃতিতে সম্পূর্ণে হিত-
কারী (১) । নিম্বতৈল তিক্তরস, ক্রিমি
ও কুষ্ঠরোগ পর্য্যন্তেরও শমতাকারক (২) ।
কিন্তু স্নানার্থ মর্দনের পক্ষে যাবতীর
তৈলাপেক্ষা তিল তৈলই অধিকতর প্র-
শস্ত (৩) ।

স্নানকালে তৈলমর্দনে যেমন উপকার
লাভ হয়, সেইরূপ গাত্রমার্জনে ও গাত্রঘ-
র্ষণ দ্বারাও অনেকটা উপকার হইয়া থাকে ।
গাত্রমার্জনে দুর্গন্ধ, গাত্রের গুরুতা, চুলকনা,
ছুলি, মলা, অকচি, ঘর্ম্ম, ঘৃণা ইত্যাদি নষ্ট
হয় (৪) । গাত্রের দুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট হ-
ইলেই ঘৃণা অপনোদিত হইয়া থাকে । স্নান
কালে গাত্রমার্জনে ব্যতীত দিবসের মধ্যে
আরও দুই তিনবার ঐরূপ করা আবশ্যিক ।
গামোছা, তোয়ালে প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ
গাত্রমার্জনে করিলে লোমকূপ সমূহ আবদ্ধ
থাকে, সুতরাং তন্মধ্য হইতে শরীরান্তরস্থ
ঘর্ম্ম প্রভৃতি দূষিত পদার্থের নির্গমন এবং
বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশন হইয়া স্বা-
স্থ্যের উপকার সাধিত হয় ।

উদ্বর্তন অর্থাৎ গাত্রঘর্ষণ করিলে বাত,

হৃৎ কণ্ঠ ক্রিমিদিনাশনং ॥ (রাজবল্লভ)—
(১) তিলতৈলং বয়ঃ-ঐশ্বর্য্যকরং বাতহৃৎমুক্তকং ।
হিতং বস্ত্রাভ্যঙ্গপানে-নসৌ কণ্ঠাঙ্গিপূরণে ॥
(ঐ) ।—(২) নিম্বতৈলকু কুষ্ঠং তিক্তং
ক্রিমিহরং পরং । (ঐ) ।—(৩) সর্ষপ-
শিহ তৈলেভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্ত্যতে । (রা-
জবল্লভ ।)—(৪) দৌর্গন্ধং গৌরবং কণ্ঠং
কক্ষুং মলমরোচকং । শ্বেদং বীভৎসুতাং

কফ, মেদরোগ ও বায়ু নষ্ট হয় এবং অঙ্গ
সমূহের ঐশ্বর্য্য ও ত্বকের প্রসন্নতা হইয়া
থাকে (৫) । হরিদ্রাদিতে গাত্রঘর্ষণ ক-
রিলে গাত্রচুলকনা, বিবর্ণতা ও রুক্ষতা নষ্ট
হয় (৬) । এবং তিলের দ্বারাও এই স-
কল ক্রিয়া হইয়া থাকে (৭) । কিন্তু কথা
এই যে, হরিদ্রার দাগ লাগিয়া বস্ত্র প্রভৃতি
কুৎসিত হইয়া যায় এবং বর্তমান সময়ে স-
ভাভা সম্বন্ধেও হরিদ্রাঘর্ষণ ভঙ্গমাজে
প্রচলিত নহে ; সুতরাং তিলের দ্বারা
মধ্যে মধ্যে উদ্বর্তন কার্য্য সমাধা করা অনু-
পযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না ।

প্রাতঃস্নানের পর প্রাচীন ঋষিগণ চ-
ন্দন প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও মৃতিকা দি দ্বারা
তিলক ও দেহলেপনাদির বিধান দিয়া গি-
য়াছেন (৮) সুগন্ধি দ্রব্য লেপনে প্রীতি
হন্তি শরীরপরিমার্জনং ॥ (রাজবল্লভ)—
(৫) উদ্বর্তনং বাতহরং কফমেদোহনিলাপহং ।
শ্রীরীকরণমঙ্গানাং ত্বকুপ্রসাদকরং পরং ॥
(ঐ) ।—(৬) উদ্বর্তনং হরিদ্রাঐদং কণ্ঠ-
বৈবর্ণ্যরৌক্ষ্যজিৎ । (ঐ) ।—(৭) তিলে-
নোদ্বর্তনং কণ্ঠরৌক্ষ্যভ্রুদোষনাশনং । (ঐ)

(৮) জাহ্নবীতীর সমুদ্রত্যাগ মৃদং
মূর্দ্ধা বিভর্তি যঃ । বিভর্তি রূপং সৌন্দর্য্য
তমোনাশার কেবলং ॥ (ব্যাস)—গোম-
তীতীরসমুদ্রত্যাগ গোপীদেহ সমুদ্রবাং ।
মৃদং মূর্দ্ধা বহেদ্যন্ত সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
(শাতাতপ ।)—উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্য্যাৎ
ত্রিপুণ্ড্রং ভ্রমণা সদা । তিলকং বৈ দ্বিজঃ
কুর্য্যাৎ চন্দনেন যদৃচ্ছয়া ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ

ও তেজোরন্ধ্রি হয় এবং ঘর্ম, দুর্গন্ধ, তত্ত্বা, পাপ অর্থাৎ পীড়া, শ্রম ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় (১)। ফলকথা, দুর্গন্ধ নি-
বারণের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ প্র-
য়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন মৃত্তি-
কা দ্বারা তাড়িৎ নষ্ট হইয়া থাকে।
বোধ হয়, এই জনাই বহিঃস্থ শরীরজ প্র-
য়োজনাতিরিক্ত তাড়িৎ নিবারণার্থ মৃত্তিকা
তিলকাদি ধারণের বিধান প্রচারিত হইয়া
থাকিবে। অধুনা আমাদের বঙ্গদেশে
নব্যশ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট
হওয়াতে চন্দন বা মৃত্তিকার তিলকাদি অ-
প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যদিও পল্লিগ্রাম
অঞ্চলে কোন কোন স্থলে ইহা দৃষ্ট হয়
বটে, কিন্তু রাজধানী প্রভৃতি স্থানে এক-
বারেই অদৃশ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে
তিলক বা অনুলেপনের প্রচলন এখনও
পূর্বের ন্যায় বর্তমান আছে। অশ্বদেশীয়
নব্য শ্রেণীর মধ্যে আতর, গোলাপ, বিস্মতি
সুগন্ধি দ্রব্য এক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,
তাহাও ভাল। যে কোন প্রকারেই
হউক, সুগন্ধি দ্রব্য হইলেই চলিতে পারে।

প্রাতঃস্নানের পরেই যেন সম্পূর্ণরূপে
আহার করা না হয়, কারণ, তৎকালে
শিরাসমূহে দ্রুতবেগে রক্ত চালিত হইতে
কুর্ধ্যাৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিপুণ্ড্রকং। অন্ধ চন্দ্রশ্চ
বৈশ্যশ্চ বর্তুলং শূদ্রয়োনিজঃ ॥ (ব্রহ্মা-
ণ্ডপুরাণ।) — (১) প্রীতিতেজকরং হ-
ব্যং শ্বেদনৌর্গন্ধনাশনং। তত্ত্বাপাপোপ-
শমনং শ্রমঘ্নমুলেপনং ॥ (রাজবল্লভ।)

থাকে। স্নানের এক ঘণ্টা পরে ভোজন
করা বিধেয়; কিন্তু স্নানের অব্যবহিত
পরেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও উপযুক্ত।

আমরা প্রাতঃকথান ও প্রাতঃক্রিয়ার
বিষয় বলিতে গিয়া শেষটিরই কথা অনেকটা
বলিলাম। কিন্তু এক্ষণে প্রথমটির
সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের
উপসংহার করিব। আমরা পূর্বে বলি-
য়াছি যে, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ
করিতে ইচ্ছা করে, উষাকালে তাহার গা-
ত্রোৎখান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু
এক্ষণে বলিতেছি যে, যাহার ঐ উভয়
এবং জ্ঞান ও প্রসিদ্ধি লাভ করিবার বা-
সনা থাকে সে অবশ্য সূর্যোদয়ের পূর্বে
শয্যা ত্যাগ করিবে। প্রাতঃকথান ব্যতীত
দীর্ঘজীবী ও প্রসিদ্ধ হওয়া অতি অল্প
লোকের ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। সুতরাং
সাধারণের তাহাতে নির্ভর করা অদূরদর্শি-
তার কার্য্য। যাহাদিগের প্রাতঃকথান অ-
নভ্যস্ত তাহাদিগের স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি
হয়, সেইরূপ আবার প্রয়োজনীয় কর্মেরও
অনেকটা ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই ম-
হাত্মা ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়া গিয়াছেন যে,
“যে ব্যক্তি বিলম্বে গাত্রোৎখান করে,
তাহাকে স্বকার্য্য সাধনের জন্য সমস্ত দি-
বস অত্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, অ-
থচ রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়াও সম্পূর্ণরূপে
সমাপ্ত হয় না।” সুবিজ্ঞ ডীন সুইফট ব-
লেন যে, তিনি প্রাতঃকথায়ী ব্যতীত কোন
ব্যক্তিকে সক্ষম ও মহৎ হইতে দেখেন

নাই। পণ্ডিতবর বফন্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রথম-বস্থায় অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং তদীয় বহুমূল্য সময় অনেকটা রথায় নষ্ট হইয়া যাইত। এই জন্য তিনি তাঁহার জো-জ্জেফ্ নামক একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা করেন যে, সে যেন প্রত্যহ তাঁহাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে একটি করিয়া ক্রাউন্ মুদ্রা প্রদান করিবেন। জোজ্জেফ্ তদনুসারে তাঁহাকে ভোরে জাগাইতে গেল, কিন্তু তিনি এতদূর পর্য্যন্ত প্রাতঃনিদ্রার বশীভূত হইয়াছিলেন যে, কর্তব্যকর্মপরায়ণ ভৃত্যের আহ্বানে তদনিদ্রা হইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ভৃত্য পলায়ন করিল। তদনন্তর তিনি অভ্যাসানুসারে ১০।১১ টার সময়ে উঠিয়া জড়ভরতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার তিনি জোজ্জেফ্কে জাগাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, আমি যদি সে সময়ে তোমাকে গালি দিই বা মারিতে যাই, সে আমার দোষ, তোমার নহে। কিন্তু জোজ্জেফ্ ক্রাউন্ লাভের আশা পরিত্যাগ করিও না, আর আমারও স্বাস্থ্য ও উন্নতির উপায় যেন তোমার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকে। কএক দিনের পর জোজ্জেফ্ কৃতকার্য হইল— দ্বিপ্রহরোখ্যায়ী বফন্ সাহেবও প্রাতঃকথায়ী হইলেন। তিনি একদা বলিয়া ছিলেন যে, ‘আমি যতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে ১০।১২ খানির জন্য মদীয় পরম

হিতৈষী জোজ্জেফের নিকট চিরজীবন স্থায়ী থাকিলাম।’ বাস্তবিক, প্রাতঃকথানবশতঃই উল্লিখিত পণ্ডিত একজন উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার হইয়া গিয়াছেন। প্রাতঃকথানবশতঃই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। যিনি একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা করেন, বফন্ সাহেবকে তাঁহার সর্বদা স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রসিয়াধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডরিক প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময়ে গাত্রোখান করিয়া কর্তব্য কার্য ও ভ্রমণ করিতেন। অনেকেই কসিয়াধিপতি পিটার দি গ্রেটকে অবগত আছেন। ঐ মহাত্মা যখন লণ্ডন নগরস্থ একটা ডকে পোত-স্বত্বধরের কার্য করিতেন, যখন কামারের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে যখন কসীয়-রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, সকল সময়েই তিনি উষাকালে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, ‘আমি আমার জীবনকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য যতদূর পারি নিদ্রাকে অল্প সময় প্রদান করিয়া থাকি।’

প্রাতঃকথান সম্বন্ধে ডব্লিঙ্গ্ সাহেব বলেন যে, ‘প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে গাত্রোখান করিয়া আমি নিউটেম্ফামেণ্টের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিদ্রা গিয়া প্রাতঃকালে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শয্যাভ্যাগ করিলে ৪০ বৎসরের

মধ্যে প্রায় ১০ বৎসরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং এই ১০ বৎসরে জীবনের অনেক উন্নতি হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি? একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকারকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ‘মহাশয় আপনি প্রতাহ বেলা ১০টা হইতে সমস্ত দিন আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু এত পুস্তক কিরূপে রচনা করিলেন?’ তিনি তদুত্তরে বলেন যে, ‘আমি প্রতাহ রাত্রি শেষে ৩টার সময় গাত্রোত্থান করিয়া সকাল পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকি’।

বিদ্যাধ্যায়ী ছাত্রগণের পক্ষে প্রাতঃকাল সন্ধ্যাক্কে কিছু বলা আবশ্যিক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস কখনই কর্তব্য নহে। একেত অধ্যয়ন কেবল মানসিক পরিশ্রম, তাহাতে আবার অধিক রাত্রি-জাগরণ করিলে যে, কি পর্য্যন্ত বিষময় ফলোৎপাদন হয়, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবিষয়ে সতর্ক হইতে আদেশ দিয়া থাকেন। রাত্রি ৯টা হইতে দশটার মধ্যে ছাত্রদিগের শয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে ৬।৭ ঘটাকাল নিদ্রার পর ভোরে ৪।৫ টার সময় গাত্রোত্থান করিবার সুবিধা হইতে পারে। দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর শরীর ও মন প্রকৃতিস্থ থাকে, সুতরাং প্রাতঃকালে অধ্যয়ন কার্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ স্বাস্থ্যেরও ব্যাঘাত ঘটিবে না। রাত্রি শয়নের জন্য, জাগি-

বার নিমিত্ত নহে—প্রাতঃকাল জাগরিত হইবার জন্য, নিদ্রার নিমিত্ত নহে। সুতরাং দীর্ঘকাল রাত্রি জাগিয়া ও দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকিয়া স্বভাবের নিয়মভঙ্গ করা অতি গর্হিত কার্য। মনকে নিরতিশয় পীড়িত করিয়া, রাত্রি জাগিয়া অধিক বিদ্যোপার্জনের অপেক্ষা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে চলিয়া অপেক্ষাকৃত কম বিদ্যা হয়, তাহাও ভাল। কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি সর্বপ্রযত্নে দৃষ্টি না রাখা নিতান্ত মন্দ। ডাক্তার পেরিস্ সাহেব বলেন, মনকে বিদ্যাভারে অতিমাত্র ভারি করিয়া শরীরকে দুর্বল করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে মনোরত্তির চালনা করিয়া হার্ক্যুলিসের ন্যায় শরীরকে বলিষ্ঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

যে ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাতঃকাল করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে দিবা নিদ্রা ও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রিজাগরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দিবসে নিদ্রা গেলে রাত্রিকালে শীঘ্র নিদ্রা আসে না এবং অধিকক্ষণ রাত্রিকালে জাগিয়া থাকিলে শেষ রাত্রিতে নিদ্রার অত্যন্ত সমাবেশ হয়, সুতরাং প্রাতঃকালের কিছুই সুবিধা থাকে না। প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে রাত্রির প্রথমভাগেই শয়ন করা কর্তব্য। তাহাতে চক্ষু বা স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। ডাক্তার ডুইট্ তদীয় ছাত্রগণকে বলিতেন যে, রাত্রির প্রথমভাগে এক ঘণ্টা

কাল নিদ্রিত থাকিলে যতটা উপকার দর্শে, উহার অন্তিমে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত শুইয়া থাকিলে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক, উক্ত ডাক্তারের উপদেশ বহুমূল্য। ডুইটের মতানুসারে আমাদিগেরও চিকিৎসা শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেখা যায়। যথাযোগ্যকালে নিদ্রা সেবনে ধাতুর সমতা, তন্ত্রানশ, শরীরের পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে (১)।

ইহা অতিমাত্র বিশ্বাসযোগ্য যে, যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রা-

তক্স্থান ও প্রাতঃক্রিয়া অভ্যাস করে, সে দীর্ঘজীবী, কর্মঠ ও গুণান্বিত হয় এবং তাহার জীবনকাল শান্তি ও আনন্দে অতিবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীতাচরণে প্রায়ই বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়। জীবনের ন্যায় শয্যাও নিদ্রাকে অতিশয় প্রিয়জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অবৈধ কার্য। কিন্তু জীবন সহচর প্রাতক্স্থানকে জীবনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করা অবশ্য করণীয়, ইহা যেন ব্যক্তিমাত্রেরই মনে জাগরিত থাকে।

শ্রীরাজ—

বজ্রদর্শনের বিদায় !

সংসারে অধিকাংশ মনুষ্যই প্ররোচনার দাস, প্রকৃতির ক্রীড়াসামগ্রী, এবং সুখের প্রত্যাশী। যে বস্তুতে যে পরিমাণ প্ররোচনা, প্রবর্তনা ও সুখের প্রত্যাশা, সেই বস্তুতেই সেই পরিমাণে তাহার প্রীতি; এবং সেই বস্তুর বিরোগ কি বিচ্ছেদেই সেই পরিমাণে তাহার দুঃখ। বজ্রদর্শনের আকস্মিক বিরোগ এবং বজ্রীর সাহিত্যসমাজের বর্তমান দুঃখধ্বনিও এই কথাই প্রমাণ করিতেছে। বাঙ্গালি বজ্রদর্শনে সুখী ছিল; বজ্রদর্শনের বিরোগ অথবা বিচ্ছেদ

তাহার নিকট দুঃখপ্রদ এবং অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বজ্রদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে যাহারা অন্ধ-অবলা,—যাহারা স্বভাবতঃ চিন্তায় অসমর্থ, এবং শিক্ষার হীনতাদি কারণে চিন্তার উদ্দীপক বিষয় মাত্রেরই স্মরণ বি-রক্ত, এই চারি বৎসর কাল একমাত্র বজ্রদর্শনই মৃদু মদিরার ন্যায় তাঁহাদিগের অবলম্ব ছিল। বজ্রদর্শন দার্শনিক তত্ত্বের গুঢ় সংবাদ লইয়া কল্পিত ব্যায়াম করিতেন, তাহা তাঁহারা ভাবিতেন না; বজ্রদর্শন ভবভূতি প্রভৃতি কবির কাব্য সমালোচন-প্রসঙ্গে কল্পিত পাণ্ডিত্য, স্বাদগ্রাহিতা ও মনোমত্তা প্রদর্শন করিতেন, তাহা তাঁহারা

(১) নিদ্রোপযুক্তকালে চ ধাতু-সাম্যমতন্ত্রিতাং। পুষ্টিবর্ণবলোৎসাহমগ্নি-দীপ্তিং করোতি চ ॥ (রাজবল্লভ ।)

গগনায় আনিতেন না; বঙ্গদর্শন স্বর্গাযুধী ও প্রতাপ প্রভৃতির অতিমানুষ-সৌন্দর্যময় অপূর্ণ চিত্র সকল আঁকিতে গিয়া কিরূপ কবিত্ব, নৈপুণ্য, এবং কল্পনার কিরূপ লীলা খেলা দেখাইতেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে চাহিতেন না। কিন্তু বঙ্গদর্শনে ললিতসবজ-লতা, কুম্ভনন্দিনী ও শৈবলিনী প্রভৃতি কাহিনীর যে কাহিনী টুকু থাকিত, তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত रहিতেন। সুকুমারমতি বালক বালিকারা ধাত্রীমাতার চতুঃপাশ্বে উপবিষ্ট হইয়া যেরূপ ভূষিত কণে রাজকন্যা ও মন্ত্রিকন্যার কাহিনী শুনে, তাঁহারাও বঙ্গদর্শনের চতুঃপাশ্বে উপবিষ্ট হইয়া শুধু সেইরূপ কাহিনী শুনিতেন। কাহিনীর পর পর ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য তাঁহারা যথার্থই আকুল হইয়া থাকিতেন, এবং কাহিনী শুনিয়াই এই কণ্টকময় পৃথিবীর সকল দুঃখ যজ্ঞগা ভুলিয়া যাইতেন। যে বার বঙ্গদর্শনে কোন কাহিনী না থাকিত, সেবার তাঁহাদিগের ক্রোধ, ক্ষোভ ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিত না। বনের পশু পক্ষী, তরু লতাও তখন তাঁহাদিগের বিষাদে বিষন্ন হইত।

বঙ্গদেশে যাহারা ‘রসিক’ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ,—যাহারা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেই রসিক হইয়া বসেন, ছাত্রমহলে কেবলই রসের কথা কহেন, এবং গ্রাম্য জমিদারের বিলাসভবনে, বিবাহের সভায়, বাসরঘরে, যাত্রার আসরে এবং নৃতন ঐশ্বর্যমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন রসভরঙ্গই তর-

ঙ্গায়িত রহেন, বঙ্গদর্শনে তাঁহাদিগেরও একমাত্র উপজীব্য ছিল। উহাতে বিজ্ঞানরহস্যের মাথামুণ্ড যাহা থাকিত, তাহা তাঁহাদিগের চক্ষে বিষের ন্যায় লাগিত। উহাতে উচ্চ অঙ্গের যে সমস্ত কবিতা প্রকটিত হইত, তাহা তাঁহাদিগকে ভয়ানক কষ্ট দিত। উহাতে চরিত্রবর্ণনচ্ছলে মানবহৃদয়ের যে সকল গভীরতত্ত্ব আলোচিত হইত, তাহা তাঁহাদিগের যতদূর সম্ভব বিরক্তি জন্মাইত। কিন্তু উহার নবীনা ও প্রাচীনার কথা, আলবাল। সুন্দরী কি অলক্তরাগরঞ্জিত চরণের বর্ণনা, ইন্দিরার পরিহাস-রসিকতা, বানরের কল্যাণে আত্মত্যাগী এবং ‘ঢাল ত্রাণি ঢাল’ এইরূপ ব্যঙ্গার্ভ দুই একটি লহরীই তাঁহাদিগের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিত। তাঁহারা দিনান্তে একবার

“আমরে চাঁদের কোণা

তোরে খেতে দিব ফুলের মধু,

পরতে দিব সোনা ”

অথবা—

‘আমার মরম কথা তাই লো তাই’

এইরূপ কতিপয় পংক্তি পাঠ করিতে পুাইলেই চরিতার্থ হইতেন।—নিবিড়জলদাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় কদাচিৎ কখনও চটুপনয়না হীরা কি বচন-চতুরা হরিদাসী বৈষ্ণবীর ক্ষণিক দর্শন পাইলেই তাঁহারা হরিনামভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় ঢলিয়া পড়িতেন। অপিচ, যাহারা পণ্ডিত, যাহারা • সুশিক্ষিত, সুকচিসম্পন্ন, যা-

হার। কাব্যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, কথায় রস-
গ্রাহী, এবং যাহারা স্বাভাবিক ও শিক্ষা-
লব্ধ সামর্থ্যে চিত্তাজনিত ক্রোশে অকাতর,
বঙ্গদর্শন তাঁহাদিগেরও একান্ত আদরের
পাত্র, উহা তাঁহাদিগেরও সহায়, সুস্থ ও
অপরিহার্য্য সহচর ছিল । এই সমুদয়শ্রে-
ণির বান্ধালিই বঙ্গদর্শনের বিয়োগে ক্রমে
আঘাত পাঁইয়াছেন,— প্রিয়বিয়োগদুঃখ
অনুভব করিতেছেন ।

বঙ্গদর্শনের বিলোপ বান্ধবের নিকট
উল্লিখিত সমস্ত কারণের অতিরিক্ত আর
এক কারণে বিশেষ দুঃখজনক । আ-
মরা সেই দুঃখেই প্রকৃত মর্মান্বিত হইয়াছি ।
যদি শুধু উপন্যাস পড়াই উদ্দেশ্য হয়,
তাহা বাঙ্গালায় পড়িলেও চলে, ইংরেজীতে
পড়িলেও চলে । বরং ইংরেজীতেই সে আ-
কাঙ্ক্ষার অধিকতর সম্ভরণ হয় । ইংরেজী
গ্রন্থালয়ে যে সকল রসপরিপূর্ণ উপাদেয়
উপন্যাস স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে,
শতাব্দীর এক চতুর্থভাগেও তাহা পড়িয়া
শেষ করা যায় না । যাহার যেমন কচি,
ইংরেজী উপন্যাসে তাহাই তিনি প্রাপ্ত
হইবেন । যিনি প্রীতির প্রশস্তক্ষেত্র এবং
শোভার অনন্তবিস্তার চাহেন, পুরুষ-
কারের নয়নাভিরাম গান্ধীর্ঘ্য দেখিতে
ভালবাসেন, তিনি কটের গিরিকন্দর-
শোভিত, নির্ঝরবারিসিক্ত কম্পকাননে
প্রবিষ্ট হইলেই স্নিগ্ধ হইবেন ; আর,
যিনি মেঘান্নতচ্ছন্নতার বিষাদময় সৌ-
ন্দর্য্য দেখিয়া সুখী হন, অথবা যিনি

আলোকমিশ্রিত অন্ধকারেই অধিকতর আ-
নন্দলাভ করেন, তিনি বুলওয়ার লিটনের
ধাননিলয়ে প্রবেশ করিলেই পরমা তৃপ্তি
লাভ করিবেন । সমাজে ও মনুষ্য প্রকৃ-
তিতে যাহা কিছু উপহাসনীয়, তিল তিল
করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন বর্ণনে অথচ সা-
ধারণতঃ দয়া ও মহানুভাবতার পুষ্টিসা-
ধনে,—যাহা সর্ব্বত্র উপেক্ষিত, তাহাতেও
আদরের বস্তু প্রদর্শনে ডিকেন্সের তুলনা
কোথায় ? আবার, সমাজে পাপের যে
প্রবল প্রবাহ চলিতেছে, মনুষ্যপ্রকৃতিতে
ভোগভূষণ যেরূপ তর তর ধারে বহি-
তেছে, তাহার উদ্ধাপক ও যুবজনমাদক
অতিবর্ণনেও কে কলঙ্কভয়শূন্য রেনল্ডের
সমকক্ষ হইবে ? বিজ্ঞান ও দর্শনাদিশাস্ত্র
শিক্ষার জন্তও ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয়
ভাষার পুস্তকনিচয় যেরূপ সাহায্য দান
করিতে পারে, বঙ্গীয় কোন পুস্তকেই
তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না । স-
রোবরের স্বচ্ছসলিল পরিভ্যাগ করিয়া
কূপোদকে তৃষ্ণা পূরণ করিতে ইচ্ছা হয়না;
এবং বেকন, কোমত, মিল, বেস্‌মুথ, বাক্সন,
ও স্পেন্সার প্রভৃতি অগাধসত্ত্ব সুখী জনের
সংসর্গ পরিভ্যাগ করিয়া বান্ধালির অপূর্ণ-
বিক্রান্ত প্রতিবিম্বিত চিত্রের আশ্রয় লই-
তেও প্ররক্তি যায় না । যদি কাব্যের কথা
বল, তবে কি কারণে শেক্সপীর কি বায়রন,
মিল্টন কি ড্রাইডেন ছাড়িয়া বাঙ্গালার নক-
লের নকল তরল কবিতা লইয়া সময়ান্তি-
পাত করিব, বল । কেহ ইচ্ছা করিলে,

ইংলণ্ডীয় কাব্যকৃত্তে সমস্ত জীবনও যথেষ্ট
ব্যাপন করিতে পারেন। কিন্তু উহার কি-
ছুই বাঙ্গালা নহে,—যখনাদবধ প্রভৃতি
কাব্য, কিংবা বহুরসের প্রস্রবণ বঙ্গ-
দর্শনের ন্যায় উহার কিছুই বাঙ্গালির নি-
জস্ব নহে। বাঙ্গালির জনা বাঙ্গালায় যে
মুখ, বাঙ্গালায় যে সম্মান, এবং বাঙ্গালায়
যে স্বার্থ, সামর্থ্য, ও গৌরব, জগতে আর
কিছুতেই কি তাহা সম্ভবে?

আমরা ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রকাশ করি-
য়াছি,—আমাদিগের কণ্ঠধনি যতদূর উচ্চে
উঠিতে পারে, সেই স্থলে উঠিয়া আমরা
ইহা তারস্বরে বলিয়াছি যে, বঙ্গভাষা আ-
মাদিগের প্রাণস্বরূপ অথবা প্রাণাধিক
প্রিয়তর। আমরা উহাকে যার পর নাই
ভালবাসি; উহার উন্নতি দেখিয়া আনন্দে
অধীর হই, উহার হীনাবস্থা ও অপোগতি
দেখিলে দুঃখে ত্রিয়মান হইয়া পড়ি। আ-
মাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, বাঙ্গালির
কখনও যদি নিদ্রাভঙ্গ হয়, যদি কখনও শ-
ক্তির অগ্নিময়স্পর্শে বাঙ্গালির মৃৎপিণ্ড স-
দৃশ নিস্তেজ হৃদয় চৈতন্যলাভ করে, বঙ্গ-
ভাষার শক্তিশাল্যতা তাহার কারণ হইবে।
কোট হ্যাট যাহা করে নাই, পরপাদ্রুকা-
লেহনে যাহা হয় নাই, পরকীয় ছন্দানুব-
র্তনে যাহা ফলে নাই, বঙ্গভাষার বিকাশ
ও সামর্থ্যসঞ্চয়েই তাহা সম্পন্ন হইয়া আ-
সিবে; এবং যেমন রক্তসঞ্চারে বলসঞ্চার,
তেমন জাতীয় হৃদয়ে ভাষাপথে তেজঃস-
ঞ্চারেই এই মৃতপ্রায় জাতি পুনরায় দৃঢ়,

বলিষ্ঠ ও কণ্ঠ হইয়া মনুবালাকে মনুষ্যের
ন্যায় উত্থান করিবে।

ঐ যে নব্য বাবু, দুঃখিনীর সন্তান,
আজি পরিক্রমপরিবর্তেই আপনাকে কু-
তার্থ জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় বাসব হইয়া ব-
সিয়াছেন,—স্বদেশ ও স্বজাতির সম্পর্ক
পর্যন্তও ভুলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গাদপি গরী-
য়সী জঘন্যতাকে স্নানিত দাসী জ্ঞানে পায়ে
ঠেলিয়াছেন, উহার নিকট আমাদের
প্রত্যাশা নাই। ঐ যে পদগৌরবাক্ষ
নূতন সভা, ঐ যে ক্ষুদ্রপ্রাণ মহামতি প-
রের উচ্ছ্রিষ্টে প্রতিপালিত, পরপ্রসাদে
হৃদে পুষ্ট হইয়া আপনার জাতীয় চিহ্ন অ-
পসারণের জন্য একটুকু একটুকু করিয়া
যত্ন করিতেছেন,—জাতীয় ভাষার প্রিয়বন্ধন
ছেদন করিতে পারিলেই আত্মলাভে অবশ
হইতেছেন, উহার নিকটও আমাদিগের
ভরসা নাই। আমাদিগের ভরসাস্থল স্ব-
দেশপ্রিয় সহৃদয় বাঙ্গালি, আমাদিগের
আশা বঙ্গভাষার ভাবি সম্পাদে। যে
কোন ব্যক্তি বাঙ্গালার উন্নতি ও ক্ষমতা-
বৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবেন,
তাহাকেই আমরা শ্রদ্ধা করিব,—যে কোন
সদৃশ্যাবিত মৌভাগ্যবান লোক বঙ্গভা-
ষাকে নানা উপচারে পূজা করিবেন, নানা
আভরণে সাজাইয়া তুলিবেন, তাহাকেই
আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিব।

বঙ্গদর্শন এই চারি বৎসরকাল বঙ্গভাষার
পূজা রূপ পবিত্র উৎসবে অকাতরপ্রাণে
পরিশ্রম করিয়াছে;—আর, যদি আমরা

নিতান্ত অন্ধ না হই, বঙ্গভাষার বৈভববিস্তারেও বহুল অংশে কৃতকার্য হইয়াছে । মধুসূদন যেমন দেবী বঙ্গভারতীকে অমিত্রাকর ছন্দের নিগড় হইতে নির্মূলক করিয়াছিলেন, বঙ্গদর্শনও ভাষাকে কতকগুলি কুসংস্কারের নিগড় হইতে নির্মোচন করিবার জন্য সেইরূপ অশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, এবং বস্তুতঃ তদর্থ বীরের মত অশেষ অত্যাচারও সহিয়াছে । এই হেতুতেই আমরা উহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরবন্ধ, এবং এই হেতুতেই আজি উহার তিরোধানে আমরা এইরূপ তীব্র দুঃখে দুঃখিত । বঙ্গদর্শনে আমরা বাঙ্গালার চল সৌন্দর্য্য, লীলাচাতুর্য্য, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সজীবতা দেখিয়াছি । ইহা কেমনে শীঘ্র বিস্মৃত হইব ? উহা আমাদিগের কর্ণে কখনও নিশীথে বংশীধ্বনির ন্যায় মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছে, কখনও বীণার মৃদল স্বরকারে হৃদয় মন উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে । ইহা কিরূপে ভুলিতে পারিব ?

আমরা আশা করি, বঙ্গদর্শন শীঘ্রই আবার অন্য কোন মূর্তিতে পুনর্জীবিত হইবে, এবং যিনি উহার প্রাণ ও প্রতিপত্তি ছিলেন, আর ঐহাদিগের পরিশ্রমে উহার এত গৌরব বাড়িয়াছিল, তাঁহারা সকলে মিলিয়া পুনরায় বঙ্গভাষার অধিকার ও বৈভববিস্তারে যত্নপর হইবেন । বাঙ্গালার আজিও

সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালির সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ জন্মে নাই, আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় নাই । যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা বঙ্গদর্শনের মত প্রতিভাবিত সহায়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব না । আমরা সকল সহিতে পারি, নান্নপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনায় অশ্রুহ্রদয়ে ভোগ করিতে পারি ; কিন্তু জননী, জন্মভূমি, এবং জন্মভাষার কাতর মূর্তি ও হীন দশা চক্ষে দেখিতে পারি না । পৃথিবীতে কোন্ ভূমি বঙ্গভূমির ন্যায় শ্যামল শোভাশালিনী, স্বজনপরিপালিনী ও নদ নদীর স্বাভাবিক সম্পদে উদারতার প্রতিমূর্তিরূপিণী ? কিন্তু বাঙ্গালির আলস্য ও অনাদরে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে ! পৃথিবীতে কোন্ ভাষা বঙ্গভাষার ন্যায় হৃদয়স্পর্শিনী, অমৃতবর্ষিনী এবং আমাদিগের সন্তাপহারিনী ? কিন্তু আত্মাদরশূন্য প্রাণহীন বাঙ্গালির উপেক্ষা ও অবমাননায়, — যাঁহারা ধন-বৈভব-সম্পন্ন, তাঁহাদিগের মোহমহিমায়, যাঁহারা বিষয়রত, গণনাভংপর, তাঁহাদিগের মদাক্রতায়, এবং যাঁহারা শিক্ষিত ও শক্তিসামর্থ্যযুক্ত তাঁহাদিগের নিম্নজ্ঞ উদাসীনতার উহার মুখশ্রী কিরূপ মলিন রহিয়াছে !

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। মানসরঞ্জিনী। প্রথমভাগ।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রমদাচরণ সেন-প্রযত্নে প্রকাশিত।

২। কুমুমকলিকা। শ্রী প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত।

যে রূপ কবিতা পাঠমাত্রেই একবারে হৃদয়ের মর্মস্থলে গিয়া স্পৃষ্ট হয়, এ দুখানিতে সেইরূপ কবিতা নাই, এবং যে রূপ ছন্দের গাঁথনি ও পদাবলিতে ভাষা হেলিয়া তুলিয়া তৃতা করেন এ দুখানির ছন্দোবন্ধনেও তেমন বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই উভয় পুস্তকই সুখপাঠ্য। মানসরঞ্জিনী অপেক্ষাকৃত গাঢ়, কুমুমকলিকা অপেক্ষাকৃত মধুর ও মনোমদ। উভয় গ্রন্থেই প্রশংসার অনেক কথা আছে। মানসরঞ্জিনী-প্রণেতা ককণরসে অধিক রুতকার্য্য হইবেন, এবং বোধ হয় প্রসন্ন বাবু ক্রোধ, বিদ্বেষ ও অভিমান প্রভৃতি মানসিক ভাবের উদ্দীপনে অধিকতর যশোলাভ করিবেন। পাঠকসমাজে এই নূতন লেখকদ্বয়ের আদর হওয়া উচিত।

৩। কবিতা-কলাপ। প্রথমভাগ।—শ্রী রামলাল চক্রবর্তী বিরচিত।

৪। পদ্য-প্রস্থন। প্রথমভাগ।—শ্রীম-হেন্দ্রচন্দ্র সোম প্রণীত।

৫। কবিতাকুমুমাকুর। প্রথমভাগ।—শ্রীময়ন্ উদ্দীন আহাম্মদ এবং শ্রী রামনারায়ণ দাস কর্তৃক বিরচিত।

এই তিনখানি পদ্যপাঠ শিশুদিগের জন্য লিখিত হইয়াছে। দোষ গুণ তিনখানিতেই প্রায় সমান। কবিতাকলাপ নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের উপযোগী হইবে না। যাহারা শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ পর্যন্ত পড়িয়াছে, তাহাদিগের ইহা উপকারী হইতে পারে। ইহার লেখক সরল পদ্য রচনায় ক্ষমতাশূন্য নহেন। পদ্য-প্রস্থনের দুই একটি পংক্তি যেমন সরল, তেমন সদর্থযুক্ত। ‘পার কি না পার ফিরে দেখ আর বার’ এই কবিতাটি বালকদিগের কঠিন করান কর্তব্য।

৬। মণিহারী ফণী ভারতজননী। পদ্য। শ্রী পার্শ্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৭। ভারতবন্দিনী। রূপক। শ্রীম-নোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রণীত।

সকলেই যে কাঁদিতে পারে, এমন নহে। কাঁদিবারও ক্ষমতা চাই। পার্শ্বতী বাবুর কাঁদিবার একটুকু ক্ষমতা আছে। কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণে বড় ঠকিয়াছেন। মণিহারী ফণী বলিলেই গোবিন্দ অধিকারীর কীর্তন এবং ব্রজের বি-রহবিধুরা রাধার কথা মনে আসে, ভারতের কথা মনে আসে না। তাঁহার পুস্তক ভারতবন্দিনী অপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবন্দিনীতে স্থানে

স্থানে শব্দের অসফালন আছে ; কোথাও কিঞ্চিৎ পারিপাট্যও আছে । কিন্তু পারিপাট্য অপেক্ষা অসফালন অধিক ।

৮। সটীক পাঁচালি । প্রথমখণ্ড ।
শ্রীকেশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ।—গ্রন্থকার দাশরথির মন্ত্রশিষ্য । কিন্তু ঐক শিষ্যে অনেক অন্তর । এখনকার ভঙ্গলো-
কেরা দামুরায়ের পাঁচালিতেই যার পর নাই বিরক্ত ;—গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঁচালি তাঁহাদিগের নিকট কি পরিমাণ প্রী-
তিকর, অতিমনোহর, ও রসমাধুর্য্যযুক্ত বোধ হইবে, তাহা অনেকক্ষণ না ভাবিয়া বলিতে পারি না । আমরা নিম্নে পাঠকবর্গের বি-
বেচনার জন্য ইহার কএক পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত করিলাম ।

‘ পাঁচালির ভঙ্গি যত শুষ্ক সমুদয় ।
চৌদ্দহাজার আঁচালপেচাল মিথ্যা সমুদয় ।
ভাল কথা শুভে মিঠা লাগে সমুদয় ।
খান দুই তিন খজার কথা আছে সমুদয় ।
মিঠা যেমন কাশীর চিনি আছে সমুদয় ।

৯। ক্রটশ ও এটেনীর বক্তৃতা ।
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক ।—শেক্স-
পীরের জুলিয়স সিজর নামক সুপ্রসিদ্ধ না-
টকে ক্রটশ ও এটেনীর যে বক্তৃতা আছে,
গ্রন্থকার তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পু-
স্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন । যাহারা
মূলে অনধীষ্ঠী, এই অনুবাদ পাঠ করিয়া
তাঁহারা সুখী হইবেন । তাঁহারা ইহাতে
পদযোজনায় লালিত্য দেখিবেন, এবং অ-
র্থেরও গাভীর্ষ্য দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ

অনুভব করিবেন । আর যাহারা শেক্স-
পীরর পড়িয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারকে
সহোদরের ন্যায় স্নেহ করিলেও বলিবেন
যে, তাঁহার সমস্ত পরিশ্রমই বিফল হই-
য়াছে । হৃদয়ের অনুবাদ কাব্য,—কাব্যের
আবার অনুবাদ কি ? কাব্যের মধ্যে
শেক্সপীরেরও কি আবার অনুবাদ স-
ম্ভবে ? অলৌকিক শেক্সপীরর ক্রটশ ও
এটেনীর মুখে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা
পড়িবার সময়ে মূর্তিমতী কাপুরুষতাও
তেজ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, পাষণ্ডও
কঙ্কণায় বিগলিত হয় । যে ভাষায় উহা
লিখিত হইয়াছে, সেই ভাষায়ও উহার রূ-
পান্তর হইতে পারে না, এবং বোধ হয়
কবি স্বয়ং আসিয়া পুনরায় চেষ্টা করিলেও
উহার একটি অক্ষর অপসারণ কিংবা উহাতে
আর একটি অক্ষর নূতন যোজন করিতে পা-
রেন না । আমরা তথাপি অনুবাদকে নিন্দা
করি না । অনেকেই অনুবাদ করিতে গিয়া
অনুকরণ করিতে গিছেন, অনুকরণ ক-
রিতে যত্নশীল হইয়া শেষে উদ্ভাবনার আ-
লোক দেখিতে পান । যদি তালে আর তিলে
তুলনা কর প্রায়শ্চিত্তশূন্য পঞ্চ মহাপাতক
মধ্যে পরিগণিত না হয়, তবে বলিতে
পারি যে, উপন্যাস-ওক ওয়াল্টার স্ক-
টের প্রথম শিক্ষাও এইরূপে হইয়াছিল ।

গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিত আছে “তাও-
য়াল-রাজ-দুহিতা ক্রীমতী কৃপাময়ী দেবীর
কৃপাশীলতায় এই কবিতাটি লোক লোচনের
বিষয়ীভূত হইল ।” দেবী কৃপাময়ী এবং

তদীয় সহোদর কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ সত্য সত্যই বঙ্গীয় সাহিত্যের স্রষ্টা ও আশ্রয় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত ভূম্যমিবর্গের অনুকরণীয়।

১০। জাতীয়-সংগীত। প্রথম ভাগ। স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-মালা। যাহার প্রযত্নে এই ক্ষুদ্র গীতি-পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। তিনি বুদ্ধিমান, কারণ তিনি কচির গতি বুঝিয়াছেন। তিনি স্বদেশবৎসল, কারণ এই সংগ্রহেই তিনি বিলক্ষণ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করা ধর্মসম্বন্ধ কার্য। ইহাতে কবির হেমচন্দ্রের বিখ্যাত ভারত-সংগীত, বান্ধবের প্রবাসী বন্ধু কর্তৃক লিখিত হৃদয়হারিণী যমুনালহরী, বাবু সত্যেন্দ্রনাথের “মিলে সব ভারত সন্তান” নামক জনদ-গম্ভীর গীতি, বাবু মনোমোহন বসুর ‘দিনের দিন, সবে দীন’ নামক মর্মস্পর্শিনী পদাবলী, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথের “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি” এবং সংগ্রহকারের ‘না জাগিলে সব ভারত ললনা’ প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রশংসনীয় গীত সংগৃহীত হইয়াছে। এই গীত গুলি সর্বত্র এত পরিজ্ঞাত, যে, ইহার কোনটিরই পৃথক উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইল না। সাধারণীর সুবিজ্ঞ সম্পাদক এই গীতসংগ্রহে ‘সাহজাদা আলম’ ইত্যাদিক লখনৌর প্রসিদ্ধগীত নিচয়

গ্রথিত না দেখিয়া ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি সংগ্রহকার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সাধারণীর কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন, এবং পলাসির যুদ্ধের যে সকল দীপক কবিতা গীতে পরিণত হইতে পারে, তাহাও এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করিয়া ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন।

১১। কাশ্মীর কুসুম। অর্থাৎ কাশ্মীরের বিবরণ। জীরাঙ্গেন্দ্রমোহন বসু কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ভারতবর্ষ নৈসর্গিক শোভায় ভূতলে স্বর্গ বলিয়া পরিচিত, কাশ্মীর রাজ্য সেই ভারতবর্ষের মুকুট-মণি। কাশ্মীরের বিবরণ পাঠে সকলেরই যে কোতুহল জন্মিবে, ইহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। গ্রন্থকার কাশ্মীরের প্রাকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং উহার প্রাকৃত সৌন্দর্য্য বর্ণনাই সমধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি ঐতিহাসিক বিষয়ের গূঢ় অনুসন্ধান করা এবং সমাজসংস্থানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত হইত, তাহা হইলে এই গ্রন্থের গৌরব অনেক বাড়িত। যাহা হউক, তিনি প্রথম উদ্যমেই আমাদের কাছে যাহা উপহার দিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট বাধিত রহিলাম। কাশ্মীরের মর্ম কথা বুঝিতে না পারি, এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠে কাশ্মীরের বহিরাবরণ সংক্রান্ত অনেক কথা জানিতে পাইব। ইহার লেখা অনেক স্থলেই উপন্যাসের ন্যায় মনোহর।

১২ । বিনোদিনী । মাসিক পত্রিকা, জীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিতা । আমরা ইহার প্রথমসংখ্যা দর্শনে আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে আমাদেরিগের সেই আশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে । ইহাতে যে সকল কবিতা প্রকটিত হইতেছে, তাহা ভুবনমোহিনীর নামের অযোগ্য নহে । এদেশের আধুনিক সভ্যদিগের মধ্যে অনেকই ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী । বঙ্গীয় কুলকামিনীগণ সুশিক্ষিত হউন, ইহাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্বক রক্তধারা ঢালিয়া দিতেও প্রস্তুত । কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, তাঁহারা এই অযত্নবর্দ্ধিতা বঙ্গবালাকে উৎসাহের সাহায্যদানেও কুণ্ঠিত ।

১৩ । উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক বিবরণ ।—উত্তরপাড়া গ্রাম অন্যান্য সংকারণের সঙ্গে এই হিতকরী সভার অনুষ্ঠাননিচয় দ্বারাই অধিক পরিচিত । আমরা সভার এই বিবরণী পাঠ করিয়া মুখী হইলাম । সভা আপাততঃ ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানেই অধিক মনোযোগ দিতেছেন । ইহার অন্যান্য বিভাগেও উপযুক্তরূপে কার্য্য হয়, এমন বোধ হইল না । হিতকরী সভা সম্প্রতি দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অনুশীলনের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উ-

দ্যোগ করিতেছেন । ইহা প্রশংসনীয় ।

১৪ । উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূর-ভাস্ত্র । আলিগড়ের রাজকীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক শ্রীকানীপ্রসাদ শাণ্ডিনা কর্তৃক সংকলিত ।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভারতবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের স্থান ; বর্ষীয়ান ও যুবক, রোগী ও সুস্থকায় তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণবিনাসী, ঐতিহাসিক ও কবি সকলেরই স্মরণীয় । ভারতের উন্নতি এই প্রদেশে, অধোগতি এই প্রদেশে, এবং বোধ হয় ভাবি আশাও এই প্রদেশে । বঙ্গভাষায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন উৎকৃষ্ট ভূগোল ছিল না । গ্রন্থকার সেই অভাব মোচন করিয়া ধন্যবাদাহ হইয়াছেন । উত্তর পশ্চিমের লোকসংখ্যামধ্যে প্রায় চৌদ্দ আনা হিন্দু, এবং কেবল হিন্দুই ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার দ্বিগুণ ।

১৫ । আমার বাসগৃহ অর্থাৎ মানব দেহের বিবরণ । শ্রীরামচরণ নাথ কর্তৃক সংগৃহীত । এই পুস্তকখানিতে শারীরসংস্থান বিদ্যার অবশ্যজ্ঞেয় কথা সকল সচিত্র বিবৃত হইয়াছে । ইহার লেখা সরল এবং বালক শিক্ষার উপযোগী ।

১৬ । চিকিৎসাসার । শ্রীরামচরণ নাথ কর্তৃক প্রকাশিত । ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, “চিকিৎসাসার কেবল চিকিৎসাব্যবসারিদিগের প্রয়োজনীয় নহে, প্রতি পরিবারের কর্তার বা কর্তীর ইহা অধ্যয়ন করা কর্তব্য ।”

নাটক।

(আধুনিক বাঙ্গালী নাটক।) *

কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যই মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম পাঠ্য পুস্তক। কবি বা দার্শনিক, বাবসায়ী বা রাজনীতিজ্ঞ, সকলের পক্ষেই মনুষ্যচরিত্রের কোন না কোন ভাগ মূলধন। যিনি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি কবি হইলে বাস বা সেক্সপিয়র, দার্শনিক হইলে শঙ্করাচার্য বা কোম্, বাবসায়ী হইলে ক্রম্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং রাজনীতিজ্ঞ হইলে কণিক বা মেকিয়াবেলি, চাণক্য বা ডিসুরেলি।

এই মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে সাধিত হয়। মনুষ্য সমগ্রজাতির ভাঙনাগ্ন নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই রূপেই প্রাচ্য আৰ্য্যজাতির অধঃপতন ও প্রতীচীন আমেরিক জাতির অভ্যুত্থান। এই জন্যই ইংলণ্ড তেরিজ্জ জমা খরচ দেখিতেছে, স্পেন গৃহবিবাদ করিতেছে, ফ্রান্স ক্ষতদেহে প্রলেপ দিতেছে, প্রুসিয়া অস্ত্রবলে গর্জিত, তুর্কি খ্রীষ্টানগণের ষড়যন্ত্রভয়ে বিকম্পিত। ইত্যাদিরূপে সমগ্র জাতির তটাবিধাত ইতিহাসের সমালোচনা। মনুষ্য আবার কিয়ৎপরিমাণে

* ১। শরৎ সরোজিনী। (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

২। হেমলতা। (দ্বিতীয় সংস্করণ)। জীহরলাল রায় প্রণীত।

৩। মহারাষ্ট্রকলক। জীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

৪। যৌবনে যোগিনী। জীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত।

৫। ভারতবিজয়। জীরাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত।

৬। জয়পাল। জীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত।

৭। ভারতের মুখশশী যবনকবলে। জীনবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক বিরচিত।

৮। কঙ্গপাল নাটক। (ইংরেজী মেকবেথ অবলম্বন করিয়া) জীহরলাল রায় প্রণীত।

৯। শত্রুসংহার। (বেণীসংহার নাটক অবলম্বন করিয়া) জীহরলাল রায় প্রণীত।

১০। প্রণয়ের প্রতিফল নাটক। জীমোহিনীমোহন ঘোষাল কর্তৃক প্রণীত।

১১। প্রকৃতবন্ধু। জীব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।

১২। কুমুদকামিনী। জীরজনীকান্ত শর্মা বিরচিত।

১৩। প্রমোদমনোরমা। জীবিশ্বেশ্বর বসু কর্তৃক প্রণীত।

ক্ষিত্যপুতেজোমকং এই ভূত চতুষ্টয়ের নাম ; এবং আহার ও পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যেও মানবীয় চরিত্রের বৈচিত্র্য হইয়া থাকে । এজন্যই নাকি তণুল-ভোজী ভারতবাসী, গোল-আলু-ভোজী আইরিস ও রস্তুফলভোজী দাক্ষিণামেরিক, মাংসভুক বিজ্ঞেতার চিরদামুড়ে নিযুক্ত রহিয়াছে । এজন্যই ভারতবর্ষের বুদ্ধির দীপ এত ঝঞ্জাবাতেও নিবিয়াও নিবে না, আর লাপলাণ্ড বা শিবির দেশবাসীর তিমি-পঙ্কর-নির্মিত কুটীরমধ্যে তিমিতৈল পান করা ঘুচিয়াও ঘুচেনা । মনুষ্যচরিত্র লইয়া শীতবাতাতপের এইরূপ ক্রীড়া কুর্দন উন্নত পদার্থবিদ্যার এবং আধুনিক স্বাকল-বিদ্যার সমালোচ্য সামগ্রী ।

আবার দেখিতে গেলে মনুষ্য কিয়ৎ পরিমাণে নীতিশিক্ষার স্বহস্ত-গঠিত পুতুল । বণিষ্ঠৃতিক ইংরেজের নিকট নিত্য নীতি শিক্ষা করিয়া, আধুনিক আর্য্যসন্তান এখন অনারাসে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান ও স্বীয় ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন;—মুসলমানের নিকট নীতি শিক্ষা করিয়া পক্কা আক্ষাফলের মত, সুগন্ধি কপূরখণ্ডের মত, মহিলাগণকে বায়ুস্পর্শবিবহিত অবরোধে রুদ্ধ করিয়া রাখেন । আবার এই নীতিশিক্ষার প্রভাব বলেই পরমভাগবত নিত্যানন্দগোষ্ঠীসমুহ যুবক সুরা সেবনে মগ্নিত, আর এই শিক্ষাবলেই প্রবঞ্চকের প্রিয়শিষ্য ধর্ম্মাচার্যের পদে অভিষিক্ত ।

আর এক প্রকার দেখিতে গেলে ম-

নুষ্য প্রাসাদশোভিনী বাতশলাকার ন্যায় সর্বদাই তাড়িত হইয়া থাকে । সেই তাড়নাকারি কারণসমষ্টিকে সংসার বলা যায় । সকল মনুষ্যই এই জগৎ সংসারের, ক্রীড়াকম্বুক । সময়ের তরঙ্গাভিঘাতকে, জড় জগতের শক্তি সামর্থ্যকে, বা নীতির উপদেশপরিচালনাকে সংসারতাড়না বলি না ; মনুষ্য এই কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় আবেগের উপর যে পরকীয় আবেগের আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সংসার তাড়না বলি । সংসার তাড়নার একটি অপূর্ব নিয়ম আছে । তাহা এইরূপ;—দশদিক হইতে দশজনে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়ে তোমায় তাড়না করিতেছে, অথচ তোমার প্রকৃতিবলে তুমি একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত হইতেছ । আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলিলাম এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা তাহাকেই অদৃষ্ট বলেন । এই অদৃষ্ট বা প্রকৃতিপরিণত মানবের সহিত,—সংসার বলিয়া অভিহিত পরকীয় আবেগসমষ্টির যে যুদ্ধ, তাহাই নাটকে বর্ণিত হইয়া থাকে । এই যুদ্ধ যে একের সহিত অনেক করিতেছে, এমন নহে । এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অথচ সময় বিশেষে এই সময়ক্ষেত্রে এক একজন মাত্র অধিনায়ক বা অধিনীত রূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন । কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সমরে সপ্ত অশ্বোহিনীর সহিত একাদশ অশ্বোহিনী সমরে প্ররত্ত ছিল, অথচ তাহার ভাগবিশেষ অধিনায়কের নামে ভীষ্মপর্ষ, বা

দ্রোণপর্ষ নলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সংসারও সেইরূপ; কত শ্বেতপুরুষ ভারত-বাসীকে উৎপাদিত করিতেছেন, এবং স্ব-কীর অমল শ্বেত অঙ্গ ফুৎকার দিয়া রাজ-দ্বার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে কেবল মিস্রস বা ফুলারই অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। নাটকে সেইরূপ; কেটে, গ্লস্টার, এডমণ্ড, একুগার, বিদূষক, গণরিল, রিগান, ও কর্দ্বেলিয়া সকলের মধ্যেই আবেগের “ঘাত প্রতিঘাত” চলিয়াছে; কিন্তু সকলের মধ্যে বার্ককে আর বেগপরিচালিত নৃপতি লীয়ারই অধিনীত, স্মরণীয় সমস্ত নাটক খানির নাম ‘লীয়ার’। নাটকের অভিমুরূপী দিনেমার রাজকুমার সপ্তরথী পরিবেষ্টিত,—রজনীযোগে ভূতযোনিকর্তৃক আক্রান্ত, পরদিন প্রণয়িনী-কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত; কখনপাপিষ্ঠা গর্ভধারিণীর সহিত বাগ্‌যুদ্ধ করিতেছেন, আবার কখন বা প্রাণবন্ধু হোরেশিয়ার পরামর্শে সংশয়ী হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; লেয়ার্টনের বিষাক্ত বাণে জর্জরিত কলেবর হইয়া ঈদৃশ কপটাচরণে ঘণার অভিভূত;—আবার সেই মুহূর্ত্তেই বন্ধুর প্রাণরক্ষাজন্য মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন। তিনিই অধিনায়ক এবং তিনিই অধিনীত; স্মরণীয় সেই নাটকের নাম ‘হেমলেট’।

স্মৃত্যুঃ বলিতে গেলে অধিনায়ক বা অধিনীত বিশেষের সংসার তাড়নায় বা

পরকীর আবেগসমষ্টির উত্তেজনায় যে চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি শিখিতে জানেন তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরমশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিষভক্ষণে মৃত্যু হয়, বহুদেশে বাস করিলে শরীর দুর্বল হয়, কেবল মাত্র অনভোজী হইলে মনুষ্য ল-ঘোদর স্মৃতরাং অলস-প্রকৃতি হয়, বিলাস-প্রিয় জাতি ক্রমে কঠোরপ্রাণ জাতির কর-কবলিত হয়, ইতিহাস বা বিজ্ঞানের সমীপে যেমন এইরূপ নানা কথা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কাব্য নাটকের স্থানেও আমরা নানা গভীর নীতি শিক্ষা করিয়া থাকি। যদি ঘৃণাকরেও সরল প্রণয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, তবে তুমি ওথেলো রথা পাঠ করিয়াছ; আবার যদি প্রণয়িনীর অসদ্বৃত আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করিতে ঘৃণাকরে সম্মত হও, তবে তুমি মেকবেথ রথা পড়িয়াছ। সম্মানলুব্ধ ব্যক্তির প্রায়ই চাটুবচনপ্রিয়। তুমি লীয়ার পড়িয়াছ এখনও কি চাটুবচনে মৃত্যু করিবে? আর তুমি নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, বিসমার্ক বা ডিস্ট্রেলি, তোমারা কি মনে কর যে কেবল সীজরের বিরুদ্ধেই ফ্রান্সের বিশ্বাসঘাতকতার সমাধা হইয়াছে? শত শত ফ্রান্স হয়ত এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের নিমিত্ত গুপ্ত-অস্ত্র শাণিত করিতেছে। কবির কল্পনা-হইতে এইরূপ গভীর উপদেশ সকল পাওয়া যায়। তবে কেহ তিনবৎসরেও স্বজু-

পাঁচের বাখ্যা করিতে পারে না, আর কেহ যাবজ্জীবনেও উৎকৃষ্ট নাটকের মর্ম কথার বর্ণনাত্মক বুদ্ধিতে পারে না। সংসার ভাঙনায় অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম যখন নাটকের উদ্দেশ্য, এবং মানসিক আবেগের বা অভ্যন্তরীণ উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গের ‘ঘাত প্রতিঘাতই’ যখন নাটকের জীবন, তখন কথোপকথন বা স্বগত বচনই নাটকের একমাত্র দেহ।

অনুরূপ কাব্যে কল্পনার অধিকতর লীলাচাতুরি আছে, সৌন্দর্যের স্ফুটতর বিকাশ আছে, হৃদয়ের তরতর উচ্ছ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশ করে এমন মোহিনী শক্তি আছে, এবং ভ্রমত অনেক স্থলে আবেগেরও তরঙ্গ আছে, কিন্তু কেবল মাত্র নাটকেই সেই তরঙ্গের “ঘাত প্রতিঘাত” দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন কোন বন্ধুর নিকট চিত্তাবেগ প্রকাশ করিলেন ; বন্ধু তাঁহাকে সামান্যবাক্যে উত্তর দিলেন ; প্রথম বক্তার আবেগ অমনিই অন্যদিকে ধাবিত হইল, বন্ধুহৃদয়ের আর এক দিকে এবার আঘাত লাগিল, বন্ধু এবার সামান্য না করিয়া সহানুভূতি-ভরে দুইটি কথা কহিয়া কক্ককঠ হইলেন, তাহাতেই আবার প্রথম বক্তা বিচলিত হইলেন।—এইরূপ কথোপকথন নাটকের দেহ। কিন্তু কথোপকথন থাকিলেই যে নাটকের বার-আনা হইল এরূপ মনে করা ভিত্তান্ত্রমাস্যক। তাহা হইলে প্লেটোর

তর্কবাদ বা ক্ল্যামোহন বন্দোপাখ্যায়ের ষড়দর্শনসংবাদ উৎকৃষ্ট নাটক ; কেন না তর্কিকের মধ্যে যত আবেগ আছে, এত বোধ হয় সংসারে আর কাহারও নাই। কিন্তু তাহাতে সংসার কৈ ? সংসারের ভাঙনা কৈ ? অধিনায়ক বা অধিনীত কৈ ? ইহাতে অনেক মনে করিতে পারেন, ঐ ষড়দর্শনসংবাদে বা প্লেটোর তর্কবাদে যদি দুটি একটি ত্রিলোক থাকিত, ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর গল্প থাকিত, তাহা হইলেই ঐ গ্রন্থগুলি নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এটিও নিতান্ত ভ্রমের কথা। তাহা যদি হইত তবে টেক চাঁদের হরিহর, পদ্মাবতীর কথোপকথন, এবং যদু বাবুর ধাত্রী-শিক্ষাও উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া সেকপীররের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিত। আধুনিক বাঙ্গালী নাটকের দেহ আছে, প্রায়ই প্রাণ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন আছে, আবেগ তরঙ্গের চলাচল নাই। কেবল নাটক বলিয়া নয়, আমরা সর্বত্রই শুধু বাহ্যভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখি, এবং বাহ্য চিত্রের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যাই। অন্যান্য কাব্যেতেও এইরূপ হইয়াছে। এতদিন বাঙ্গালী সাহিত্যকে প্রধান কবি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেছিল, সেই ভারতচন্দ্র একজন বাহ্যভাষ্য-স্বরপ্রিয় কবি ; তাঁহার দৃষ্টি কেবল ছন্দে আর লালিত্যে, অনুপ্রাসে ও যমকে। এখনও সাহিত্যিককে আমরা কাব্যকাননের সারী শুধু বলিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করি, তাঁ-

হারাও কি অনেক সময়ে কেবল বাধি-
ন্যাসে মত্ত নছেন? তখন সাতু বাবু, নিধু
বাবু, কোকিল, কমল, ভ্রমরগুঞ্জন, কদম্ব,
দাড়িম্ব লইয়া বাস্তু ছিলেন, এখন হইয়াছে
“নৈশগগনের সাক্ষ্য সমীরণ”—আর “নৈ-
দাঘ তপনের মুখ্য রদাহন”। ফল কথা বর্ণন-
কাব্যে এখনও আমরা শব্দের অনুচিত শা-
সন এড়াইতে পারি নাই। সেইরূপ স-
ঙ্গীতে দেখিবেন, কলাবৃত্ত কেবল তান লয়
মান প্রভৃতি সঙ্গীতের বাহ্য প্রকৃতি লই-
য়াই ব্যস্ত। এদিকে ককণরসের গানে
বীভৎস-রসপূর্ণ গমক সন্নিবেশিত করি-
তেছেন, বা ভক্তিরসে উৎকট বিকট গী-
ট্কারি যোজনা করিয়া সম্পূর্ণ রসভঙ্গ
করিতেছেন, সঙ্গীতের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি
উহার দৃষ্টিই নাই। এইরূপ সকল বি-
ষয়েই আমরা বাহ্যাদেশের সন্তুষ্ট। আ-
মাদের মধ্যে সভা আছে, সমিতি আছে,
সমাজ আছে, কিন্তু একতা নাই। ত্রি-
কণীশোভিত, ত্রিপুঞ্জক-চর্চিত, সর্বাস্থে
ইন্দ্রিয়াক্রান্ত গোস্বামী বাবাজী আছেন,
আর ইমন্-গীতি-পরিপূরিত, চল-বীজ্ঞন-সে-
বিত, স্ফাটিক-দীপাধার-বিলম্বিত প্রার্থনা-
মন্দির আছে, কিন্তু কোথাও এক শতক
ভক্তি আছে কি না সন্দেহ? এখন গে-
কয়া বসন পরিধান করিলেই যোগী, আর
কথোপকথন প্রসঙ্গে গম্প রচনা করি-
লেই নাটক। অহো কি দুর্ভাগ্য!

কথোপকথন নাটকের শরীর, এই
কথায় নাটকাবয়ব বর্ণনের পর্যাপ্তি হয় না।

আবেগের তরঙ্গচলাচল সাধারণতঃ ক-
থোপকথনেই বিকশিত হয় বটে; কিন্তু
আবেগচলাচলের আরও দুইরূপ পরিণাম
আছে। এক, আবেগের দুইটি প্রতীপ-
গামী সংঘাত হইতে ঘোরতর সংশয়ের
উৎপত্তি এবং তাহা হইতে আত্মচিত্তপ-
রীক্ষা, আর আবেগের পূর্ণতা হইতে উ-
চ্ছ্বাস এবং সেই উচ্ছ্বাসের পরিণাম
গান। এই আত্মচিত্ত পরীক্ষা ও কঠো-
চ্ছ্বাস উভয়ই স্বগত হইয়া থাকে, এবং ই-
হাও নাটকের অবয়বের মধ্যে। একা-
ধিক ব্যক্তি মিলিয়া যে নাটকের মধ্যে
গান করে, এবং কাহারও আত্মচিত্ত প-
রীক্ষা না হইয়াও যে স্বগত বাক্যের বি-
স্তার থাকে—সে সকল নাটকের অঙ্গী-
ভূত পদার্থ নহে।

এখন নাটকের পরিচ্ছদের কথা।
নাটকের ছন্দোবন্ধন, ভাষার গাঁথনি বা
রচনা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? এই
বার অনেক কৃতবিদের মতের সহিত আমা-
দের মতবিরোধ উপস্থিত। আমাদের মূল-
মতানুসারে বঙ্গীয় নাটককারের আবেগের
তরঙ্গই যখন নাটকের জীবন, তখন ইহার
পরিচ্ছদ বা ভাষাও সম্পূর্ণ তরঙ্গায়িত
হওয়া আবশ্যক। ভাষার নিয়মিত তর-
ঙ্গকেই রচনার ছন্দ বলিতে পারা যায়।
নাটকে সেইরূপ ছন্দোবন্ধ রচনা হইলেই
স্বভাবসঙ্গত হয়। স্বভাবে যেখানে দে-
খিবেন মানসিক উত্তেজা, সেইখানেই দে-
খিবেন কথা ছন্দোময়ী। আনন্দের যে

নৃত্য, তাহাতে যেরূপ ছন্দ আছে, শোকের যে উচ্চাস ও ক্রোধের যে গর্জন, তাহাতেও সেইরূপ ছন্দ আছে ।

মনুষ্যমন আবেগপূর্ণ হইলে কথা কেন ছন্দোময়ী হয়, যদিও এপ্রশ্নের উত্তর দান করা তত সহজ নহে, কিন্তু এরূপ যে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই । এই জগৎ পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট নাটককারই ছন্দোময়ী ভাষাতে নাটক রচনা করিয়াছেন । যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রধান নাটককারেরা গদ্য পদ্য উভয়বিধ প্রকারেই নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের মূল স্তরের সমর্থন হয়, অপিচ খণ্ডন হয় না ; কেন না সংস্কৃতের যে গদ্য তাহা অন্য ভাষার পদ্য বলিলেও চলে । যখন শাপবশে লুপ্তস্মৃতি দুহন্ত নৃপতি শকুন্তলাকে শুদ্ধাস্তচারিণী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সেই যে শকুন্তলা একবার মাত্র উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া আবার নতনয়না হইয়া সর্বসহাকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ভেদিনী উক্তি প্রয়োগ করিলেন,—বলিলেন “ভাবদি বসুন্ধরে দেহি মে অনুরং” এই উক্তিকে আমরা গদ্য বলি না ইহা পদ্যের চরমোৎকর্ষ । ইহাতে তরঙ্গ আছে, ছন্দ আছে, ন্যাস আছে, লয় আছে । সংস্কৃত নাটকের গদ্য এইরূপ, আর তাহাতেই সংস্কৃত নাটকে গদ্য পদ্য উভয় পরিচ্ছদই সন্নিবেশিত আছে । বান্ধালা গদ্যের অবস্থা সেরূপ নহে, বান্ধালা এখনও এলাইয়া

ইয়া এলাইয়া পড়ে, ধরি ধরি করিয়া রাখিতে হয় । সুতরাং বান্ধালা নাটকে অমিত্রাকর ছন্দ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক । যে ছন্দে হিন্দুস্থানী সিপাহী দুর্বল বান্ধালির উপর স্বীয় ক্রোধ প্রকাশ করে, যেরূপ ছন্দে পুত্রশোক-বিহ্বল জননী বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার শোক প্রকাশ করে, আবেগের তাহাই প্রকৃত পরিচ্ছদ । আবেগ-জীবন নাটকে সেইরূপ তরঙ্গায়িত রচনা থাকা নিতান্ত আবশ্যক, অর্থাৎ নাটকের ভাষা সাধারণতঃ অমিত্রাকর ছন্দে নিবদ্ধ হওয়া উচিত ।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে । নাটকের ভাষা কেবল তরঙ্গায়িত বা ছন্দোময়ী হইলেই যথেষ্ট হইবে না । ভাষার জমাট গাঁথনি হওয়া চাই । যেখানে মানসিক আবেগের গভীরতা আছে, সেখানে ভাষার গাঁথনি কখন বালকের মত আধ আধ বা গোস্বামীর গীতিকার মত ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মল্ল-সমীরের ন্যায় দীর্ঘবাহী ও নিদ্রাকর্ষণকারী হয় না । না বান্ধালা দেশেই আছে, আর না বান্ধালা কাব্যেই আছে, কোথাও শোকের বা ক্রোধের, যুগার বা সাহসের গভীরতা নাই । সুতরাং বান্ধালা ভাষা সর্বত্রই চিরবিরহান্তে মিলিত নাগকসমীপে রসালম্ নাগিকার মত কেবলই এলাইয়া এলাইয়া যায় ও হেলিয়া হেলিয়া পড়ে ।

ভাষার এ বিলাসিতা হইতে আমরা কবে মুক্তিলাভ করিব বলিতে পারি না।

সংবাদ পত্রে সর্বদা দেখিতে পাই, বাঙ্গালি আজি কালি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিষ্পীড়িত জীব। শুনিতে পাই এই দুর্বল বাঙ্গালির উপর নাকি স্বদেশী বিদেশী উভয়ই সমান অত্যাচার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই সাহেব বা সাহেবের কর্মচারী, জমীদার বা মহাজন, মহামারী বা জলকষ্ট সকলই নাকি বাঙ্গালির উপর সমান দৌরাখা করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই নিষ্পীড়িত জাতির ভাষায় এত বিলাসিতা কেন? যাহার মধ্যে পীড়া, গাত্রে কশাঘাত, হৃদয়ে বেদনা, সে কেন গলি গলি আধ্ধার তালে ঝিঝিটে খান্নাজ গাইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়? তাহার ভাষায় আবার এত রসাবেশ কেন? লালিত্য কেন? মাধুর্য্য কেন? আর সেই বাঙ্গালির রচিত নাটকনামধারি কথোপকথনঘটায় এত প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়, কেন? বাস্তবিক এই বাল-স্বভাব-মূলভ অল্পপ্রাণ প্রণয়েই ~~নাটক~~ কাব্য বল, নাটক বল, সমাজ বল, আর যাহাই বল, সকলই ছারখার হইল। পূর্বে এই প্রণয়ের ভাড়নায় জটাবল্কলধারী যোগী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, এই প্রণয়ের বেগে শত শত সতী নারী জ্বলন্তচিতায় সুখশয্যাবোধে মৃতপতিপাশে শয়ন করিতেন, আর এখনকার প্রণয়িনীগণ ভর্তার দৃঢ় অনুরোধে দুর্গেশ-নন্দিনী পাঠ করেন, আর প্রণয়বতার প্র-

ণয়প্রতিমার অনুরোধে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ইডন্ উদানে বায়ুসেবন করিতে যান। নমাজে প্রণয়ের বেগ এইরূপ; তবে নাটকে তদপেক্ষা যে গভীর হইবে,—তাহার সম্ভাবনা কেন কর? রাজী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ড-বাসীর মানসিক আবেগের গভীরতা ছিল, সেই সময়ের ভাষার প্রগাঢ়তাও সেইরূপ ভূরি পরিমাণে ছিল, তাহার ফল বেকন ও ফুলর, রালী ও সেক্সপিয়র, বেনজনসন ও মাসিঞ্জর। আমরা মনোমধ্যে একটু মাত্র আবেগ হইলেই শফরীর মত ফর ফর করি, দুখানি ক্ষুদ্র পক্ষ পাইলেই পিপীলিকার মত আকাশে উড়ীন হইয়া হিংস্র পক্ষিগণের কবলাশ্রয়ে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের যেরূপ বেগ নাই, আমাদের ভাষার সেইরূপ গাঢ়তা ও তেজ নাই। সেক্সপিয়রের প্রণয়বীর রোমীয় যখন একটিমাত্র শ্লোক উচ্চারণ করেন,—He jests at scars, that never felt a wound,— আমাদের লীলাবতীর প্রণয়বাতুল ললিতমোহন সেই সময়ে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া কেবল হৃদয়ভাবের ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা ও টীকার উপর টীকা ও ভাষ্যের উপর অনুভাষ্য জল্পনা করিত। যাহাদের যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ, কাব্যও সেইরূপ, নাটকও সেইরূপ। তাহাতেই নাটকের সুদীর্ঘ বক্তৃতা সকল জমাট করিয়া লিখিতে বলি। একে সংস্কৃত কুট-প্রস্থাবলীর অর্থবাদ করিতে এই ‘মাধু

ভাষার' স্থিতি ইহা আছে, বিদ্যালয়ের অঙ্গ-
বহুস্ত্র বালকগণের সম্প্রসারিত অনুবাদে বা
তাঁহাদের উপযোগী অধিকতর সম্প্রসারিত
পাঠ্য পুস্তকে তাহার স্থিতি ইহা আছে, ই-
হার উপর যদি আবার বহুস্ত্র-জন-পাঠ্য
কাব্য নাটকেও তুলির উপর তুলি ঘসিয়া
বর্ণকের উপর বর্ণক ফলাইয়া কেবল রং
চড়াও, ও চিত্র নিসৃত কর, এখনও যদি—হে
জীবিতেশ্বর, হে দগ্নিত প্রাণবল্লভ, হে কাশী-
কাঞ্চী-জাবিড়-মধুরা-উৎকল-অঙ্গ-বঙ্গ-ক-
লিঙ্গ-ভ্রমণ-কারিন্ ! হে তাল-তমাল-শাল-
হিস্তাল-পিয়াল-রসাল-কিশলয়-সদৃশ শা-
মল-শোভন-নয়ন-রঞ্জন ! হে বিপুল-বিশাল-
বক্ষঃ, অতুল-রসাল-চক্ষুঃ, কমলচরণ, চ-
ম্পকাস্থল, বিশেষবিদ্বান্, অশেষগুণনি-
ধান বলিয়া সম্প্রসারিত পদে বিনাইয়া
বিনাইয়া কাঁদিতে বস, তাহা ইহলে আর
নিস্তার নাই। যদি বাঙ্গালির কোথাও
কিঞ্চিদাত্ম স্বাধীনতা থাকে, তবে সে কে-
বল ভাষাতেই আছে। আমাদের সর্বস্ব
গিয়াছে কেবল মাত্র এক সম্বল আছে
এই ভাষা। বিদেশীয় রাজা যাহাকে আ-
দর করিয়া উপাধি প্রদান করেন, আমরা
তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মনে করি যে তিনিই
বাস্তবিক একটি গণ্যজীব; বিদেশীয় শা-
সন-কর্ত্তা যদি কাহারও দণ্ডবিধান করি-
লেন, অমনি আমরা তাঁহাকে হুণা করিতে
আরম্ভ করি। বিদেশীয় রাজা বলিলেন
এইটি অপরাধ, আমরা অমনই সেটিকে ম-
হার্পরাধ বলিয়া মনে করি। এইরূপ আ-

মরা আচারে, বিচারে, শাসনে, রক্ষণে, প্র-
রুতি পরিচ্ছদে দিন দিন অস্থি মজ্জায় প-
রাধীন ইহা পড়িতেছি। একটুমাত্র স্বা-
ধীনতা আছে এই মাতৃ ভাষায়। যদি আ-
মরা বেওয়ারিস মরদার মত তাহা লইয়া
এখন খেলা করি, তবে কি আমরা মহা-
পাপে পাপী নহি? এই জন্ত এক নাট-
কের ভাষা উপলক্ষ করিয়া আমরা এত
কথা বলিতে সাহসী ইহা আছে। কষ্ট ক-
রিয়াও কাব্য নাটকের ভাষা আমাদের
সংযত করা কর্তব্য। ভাষার ভরে ক্রমে
ভাবের প্রগাঢ়তা জন্মিবে, তাহাইহলে
হৃদয়ের আবেগপুঞ্জও ক্রমে গভীর হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা
উপরোক্ত হেতুবাদে সাধ্যসাধনের বিপ-
র্যয় ঘটনা করিতেছি, আবার অগ্রে শকট-
যোজনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে।
আপাততঃ বোধ ইহতে পারে বটে, যে
অগ্রে মানসিক পরিবর্তন তাহার পর ভা-
ষার পরিবর্তন, ও তাহার পরে কাব্য-নাট-
কাদির পরিচ্ছদের পরিবর্তন। অনেকস্থলে
এইরূপ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।
কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতির বলে জাতীয়
চরিত্রের উন্নতি হওয়াও বিচিত্র নহে। জ-
র্মানির পঞ্চম চার্লস বলিতেন, যে আমি নূতন
একটি ভাষা শিক্ষা করিলে আমার বোধ হয়
যেন আমি আর একটি অভিনব আত্মা
পাইয়াছি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা
দেখিতে পাই। এক জনকে বেকনের প্র-
গাঢ় ভাষার শিক্ষাদান করুন, দেখিবেন

তিনি ক্রমেই স্থির গম্ভীর হইবেন । ভাষার এইরূপ মহীরসী শক্তি আছে বলিয়াই আমরা নাটকের ভাষার দিকে নাটককারগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলি ।

এখন নাটকের পরিণামের কথা । এখানে সংস্কৃত আলংকারিকগণের সহিত, আমাদের বাঙ্গালির প্রচলিত প্রকৃতির সহিত এই ডাইডেন প্রভৃতি সমালোচকগণের “ কাব্যোঃ সুবিচার চাই ” ইত্যাদি কথার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মতবিরোধ । উৎকৃষ্ট নীতি ও উৎকৃষ্ট নাটক একই শিক্ষা প্রদান করে, উভয়ই স্পষ্ট-বাক্যে আমাদের মনে করিয়া দেয়, — “ শেষের মে দিন ভয়কর ” । মনুষ্যজীবনের যে পরিণাম, সংসার-তাড়িত মনুষ্য-জীবন-চিত্রেরও তাহাই পরিণাম । ঐ যে জনাকীর্ণ সভাস্থলে ঘোর বাগ্মী স্বদেশী বিদেশী উভয়কে দক্ষিণে বামে ক-শাঘাত করিতেছেন, তাঁহার পরিণাম কি ? আর ঐ যে পতিবিরোগবিধুরা ব-
~~দীর্ঘালা~~ নীরবে—অতি নীরবে, অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে,—উহারই বা পরিণাম কি ? ঐ যে কঠোর-প্রাণ, কঁবাট-বক্ষঃ, বজ্রমুষ্টি সাজেব স্বীয় দুর্বল ভৃত্যকে পাশব-বলপ্রয়োগে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ঘর্ষর-চক্র শকটে ভজনাগ্নয়ে গমন করিলেন উ-
হারই বা পরিণাম কি ? আর ঐ যে শত-প্রাণবসনা ভিখারিণী রোগ-শোক-জরা-জীর্ণা হইয়া রাজপথপাশে পড়িয়া আছে, উহার কীর্ণ কণ্ঠস্বর কেহ শুনিয়াও শুনি-

তেছে না, উহার রক্তহীন পাণ্ডুরঙ্গবি-
কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহারই
বা পরিণাম কি ? সকলেরই একই পরি-
ণাম, সেই সার্বত্রিকসুপরিমিত ভূমিখ-
ণ্ডোপরি “ দৃষ্টিহীন নাড়ীকীর্ণ, হিম ক-
লেবর ” ।

এই জন্যই সকল ভাষারই উৎকৃষ্ট না-
টকের পরিণাম সেইরূপ হৃদয়-ভেদ কর ।
নাটক বলিয়া নহে, উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্রেরই
পরিণাম এইরূপ । বাল্মীকি ও বাসদে-
বের অদ্বুত গ্রন্থদ্বয়, হোমরের ইলিয়দ্ প্র-
ভৃতি উকৃষ্ট কবিসম্মত পৌরাণিক কাব্য বা
মহাকাব্যগুলির পরিণামের বিষয় সকলেই
জানেন । সুতরাং নাটকের পরিণামও যে
সেইরূপ ঘোর বিষাদপূর্ণ হইবে তাহাতে
আর আশ্চর্য্য কি ? নাটকের বিষাদ-পরি-
ণাম সম্বন্ধে কএকটি আপত্তি আছে ।
আমরা বলিয়াছি যে “ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ”
এই কথাই স্বাভাবিক এবং নাটকে তা-
হাই থাকে মাত্র । ইহাতে আপত্তি হইতে
পারে যে, স্বাভাবিক হইলেই যে কাব্যো-
পযোগী হইবে, এমত কি কথা আছে ? বরং
কবির সৃষ্টি সংসারসৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃ-
থক্ । কবি আবেগপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া
কল্পনার সাহায্যে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা
প্রদান করেন । সুতরাং তাঁহার সংসার-
কোশল স্বাভাবিক না হইয়া বরং অনেকটা
কাপ্পনিক ; সুতরাং কাব্যের পরিণাম সং-
সারের পরিণামের অনুরূপ না হইলেও ক্ষতি
নাই । • যাহারা এইরূপ যুক্তিবাদ প্রদর্শন

করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, “ কা-
বালাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্”,
যাঁহাদের মতে কাব্যকলাপ তামসকীড়ার
মত কাল কাটাইবার ও বিনোদনের সা-
মগ্রী, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন
তর্ক নাই । কিন্তু যাঁহারা শিক্ষাবলে কা-
ব্যের উচ্চতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন,
এবং মহর্ষি বাল্মীকি বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে
সংহিতাকারগণ অপেক্ষা আন্তরিক শ্রদ্ধা
করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে
হইবে যে, বিষাদ-পরিণাম নাটকহইতে
আমরা গভীরতর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এবং
সেই সকল উপদেশ গভীরতর খাতে
হৃদয়ে বহিতে থাকে । কেন থাকে তাহা
পরে দেখান যাইতেছে ; এক্ষণে আপত্তি-
কারিগণের আর দুই একটি হেতুবাদের
কথা বলিব ।

অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিগ-
ণকে নীতিশিক্ষক বলিয়া স্বীকার করি-
লেও বিষাদ-পরিণাম নাটক যে অন্য না-
টক অপেক্ষা অধিকতর নীতিপূর্ণ একথা
স্বীকার করা যায় না । প্রথম আপত্তি এই
যে, সংসারে এত বিষাদ আছে যে, বি-
ষাদে হৃদয় জ্বলিত করিবার জন্য ঐরূপ
কাব্য নাটক পাঠের কোন প্রয়োজন নাই ।
এই তর্ক সারগর্ভ হইলে ইহাই প্রতিপন্ন
হয় যে, সাগর দেখিয়াছে সে আবার
বায়রন বা কালিদাস হইতে কি সাগরবর্ণন
পাঠ করিবে ? যুবক যুবতী যদি রুদ্ধাবন
ভ্রমণ করিয়া থাকে, তবে তাহারা আর

জয়দেবভারতী শ্রবণ করিয়া কি করিবে ?
ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—যখন সংসার র-
হিয়াছে তখন আবার কাব্য কেন ? স্ব-
ভাব-সৃষ্টিই যথেষ্ট, ইহার উপর আবার
কবির কল্পনা কেন ? বাস্তবিক বিবেচনা
করিতে গেলে কবির কাব্য ঐরূপ অপ-
দার্থ পদার্থ নহে । কাব্যজগৎ এই জড়-
জীব-জগতের সার,—এখনকার ভাষায়
বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক । কাব্য-
শোধিত সংসার এক অপূর্ব সামগ্রী ।
কাব্যে যে তীব্রতা, যে উপকারিতা আছে,
সংসারে তাহা নাই । কেন না সংসার
যদি গোলাপবারি হয়, তবে আমরা ব-
লিব কাব্য আতর ; আবার সংসার যদি
দ্রাবক হয় তবে কাব্য মহাদ্রাবক । কাব্য
তীব্র বলিয়াই অধিকতর উপকারী । সুতরাং
সংসারে বিষাদ আছে বলিয়া কাব্যনা-
টকে বিষাদ থাকিবার প্রয়োজন নাই, এ-
কথা সারগর্ভ নহে । সংসারে তুমি আমি
আছি বটে, আমাদের বিষাদও আছে, কিন্তু
কাব্যে রাম ও হরিশ্চন্দ্র, জোভা ও হের্মেনট,
ওথেলো ও লীরর, সীতা ও দেসদিমোনা
আছেন, সংসারে সৌরূপ কোথাও নাই ।
যে জন্য কপূর থাকিতেও কপূরের আর-
কের প্রয়োজন সেই জন্যই কাব্যের প্রয়ো-
জন । আর এক প্রকার আপত্তি আছে ।
—কেহ কেহ বলেন যে, বিষাদ-পরিণাম
নাটকের একটি মহান্ দোষ এই যে, ই-
হাতে মনোমধ্যে সহানুভূতি সমুৎপন্ন হয়,
অথচ তাহা হইতে কোন কার্য হয় না ।

এইরূপ বারংবার হইলে মনের এমনই একটি স্বভাব হইয়া উঠে যে তাহাতে কেবল সহানুভূতিই হইতে থাকে, সেই চিত্তবেগ কখনও কার্যে পরিণত হয় না। একথাটি সম্পূর্ণ মনুষ্যস্বভাবের গতির বিপরীত কথা। মহাবীর আলেকজান্ডার জাতিমানার মত হোমরের অদ্ভুত গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; এরূপ প্রবাদও আছে যে, উহার সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কে বলিবে যে সেই বীররসাত্মক মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কেবল বীররসের উদ্দীপনা হইত, কখন প্রবর্তনা হইত না। মহাবীর নেপোলিয়ন সেইরূপ জুলিয়সের স্মরণিত ইতিহাস অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। নেপোলিয়ন কি কিছুই বীরের কার্য করেন নাই? চৈতন্যদেব দিবারাত্রি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির কৃষ্ণ-ভক্তির পদাবলী পাঠ করিতেন। গৌরান্দ্র কি কেবল ভক্তিতেই অভিভূত রহিয়া ছিলেন, কোন কার্য করেন নাই? ~~বাল্মীকির~~ মনে যত ভয়ের ভাব উদ্দীপন করিবে, কার্যকালে তাহার তত ভীত থাকিবে। সংস্কৃত আলেকজান্ডারেরও এইমত। তাঁহার বলেন যে, কোন রসের স্থায়িত্ব হইতেই কার্যের উৎপত্তি হয় এবং সকল কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য হৃদয় মধ্যে স্থায়িত্বের উদ্দীপনা। উৎকৃষ্ট নাটকের স্থায়িত্ব শোক। যিনি কাব্যের লুক্কিশিয়া বা জ্যোপদী দেখিয়া শোকতপ্ত হইয়া রহিয়া-

ছেন, সে নবা টারকুইন বা জরঙ্গ দেখিলে অবশ্য তাহার আক্রমণ বিফল করিতে অগ্রসর হইবে। আরও এক প্রকার আপত্তি আছে; প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি আপত্তি নহে, আব্দার। অনেক আব্দার করেন যে, ভগবানের সৃষ্টিতে সুবিচার হউক না হউক, অন্ততঃ কাব্যে সুবিচার চাই। এসকল কাব্যপ্রিয় শিশুপ্রকৃতির সমালোচক মহর্ষি বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলে এইরূপে সংপরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন,—‘মহর্ষে! আপনি আপনার মহাকাব্যের পরিণামে সীতাদেবীকে পাতালগতা করাইয়া সুবিচারকের কার্য করেন নাই। আহা! সেই দিন যদি রামচন্দ্র সীতা সতীকে বামে বসাইতেন, আর কুশী-লব যদি তাঁহাদের অঙ্কে উপবিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি শোভা হইত! কি আশ্চর্যের কথা হইত! আবার কিছুদিন পরে অষ্টভ্রাতার বিবাহের পর সীতা ভগিনীত্রয়সহ নবদম্পতী চতুষ্টয়কে বরণ করিয়া গৃহে লইতেছেন, দেখিতে কি সুন্দর হইত!’ এই সকল সমালোচকের ইচ্ছা যে, নিমজ্জমানা ওফেলিয়াকে কোন ধীবর গৃহে লইয়া গিয়া রাখে, আর হেমলেট লোরাটিকে বধ করিয়া ও ক্লাদিরসকে কারাকদ্ধ করিয়া গোরার বাজানা বাজাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। ইহাদের ইচ্ছা যে রক্ত লোয়র কর্দেলিয়ার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার বড়মাসীদের রীতি চরি-

ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ইহাদের ইচ্ছা যে জীবদোষ্যত ওথেলোর নিকটে কঠাগত-প্রাণ ইয়াগো মুমূর্ষুজিতে আপনার ষড়যন্ত্রের কথা স্বীকার করে এবং যে রূপ একটি ক্ষুদ্র শিশু ষাপরের ভাস্কর্যমীর নিশীথে বসুদেবের ক্রোড়হইতে যমুনায় স্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু দিন পরে সেইরূপ একটি নীলকান্ত কালমাণিক ওথেলোর অঙ্কহইতে দেশদিমোনার গলা জড়াইয়া ধরে। এসকল বালকের আব্দার বালকের মুখে শুনিতে মন্দ শুনা যায় না, কিন্তু বঙ্গীয় সমালোচকগণ যখন ড্রাইডেনের চর্কিত চর্কণ করিতে করিতে কুন্দমন্দিরী সমালোচনার উপলক্ষে এই সকল কথার উল্লেখ করেন, তখন আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

যদি কর্দ্দেলিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতেন, তবে লীর যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই প্রকৃত হইত। তাহা হইলে লীরের যে এত শোক তাহা কেবল উপন্যাসের রচনাভঙ্গীমাত্র, আর কিছুই নহে। সেকপিয়র কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য কল্পখানিতে সে প্রকার উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন নাই। তিনি এক এক খানিতে এক একটি গভীর রসের অন্তর করিয়া গিয়াছেন। আজি লীরের জন্য কাঁদিতেছি, কাল আবার লীরের দৌহিত্রের সঙ্গে কৌতুককলাপ দেখিয়া আনন্দিত হইতেছি, এরূপ কাব্য লীরনাটক নহে। লীরের জন্য যে দুঃখ তাহা আমা-

দের হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই রূপ হেমলেট, সেই রূপ ওথেলো। সমস্ত শকুন্তলাকে যখন দুঃখ পূর্ণ পরিবর্তন করেন, তখন কেবল দুর্ভাগ্যের উপরেই ক্রোধ হয়, শকুন্তলার জন্য তত দুঃখ হয় না, কেননা জানি যে আবার সেই রাজদম্পতীর মিলন হইবে। কিন্তু চির-দুঃখিনী সীতার দুঃখের কথা শ্রবণে আছে বলিয়া অদ্যাপি কেহ আপন কন্যার নাম সীতা রাখিতে পারে না। আমাদের পূর্বতন মহর্ষিগণ বা পাশ্চাত্য কবিগণ যদি এখনকার যাত্রাকারগণের মত যুগলরূপের মিলন করিয়া সকল কাব্যের সমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে ককণরসের স্থায়িত্ব আমরা কাব্যে কখনই দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে হৃদয়ের প্রধান শিক্ষার অভাব থাকিত। হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-জরা-জড়িত সংসারে, মানবহৃদয়ের প্রধান শিক্ষা ককণরসের স্থায়িতবে। যে পরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরের সহিত চিরদিন কাঁদিত গান কখনও ভুলেনা, ইহজগতে তাঁহার নীতি-শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এক দিন ছিল, এক কাল ছিল, যখন অশ্রু-স্রব সেইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পরের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেন। তখন আশ্চর্যান্বিত বুঝিতেন যে, যে নদীতে জল শুদিকে যায় আবার এদিকে অ'সে, তাহা জোয়ার ভাটার নদী, সমুদ্র-উচ্চাসের লীলাখেতার সামগ্রী, কিন্তু কখনই গভীর

নায়েত্রা প্রপাতের মত আত্মার উচ্ছ্বাসক
নহে। তখনই রামায়ণ মহাভারতের স্মৃতি
হয়। তাহার পর আর্যের অধঃপতন। এই
অধঃপতনের পর না হইলে ভবভূতি কখনও
রামসীতার পুনর্মিলনের কল্পনা করিয়া
বালকরম্ভের করতালির প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান
হইতেন না। তদবধি আমরা অধঃপাতে
হইতেছি, তাহাতেই আমরা এখন শোকের
স্বাস্থ্যব যত্নপূর্বক পরিহার করি। আর
তাহাতেই মীলদর্পণ আমাদের তত ভাল
লাগে না। বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন
আর হৃদয় নাই, মর্ম নাই, আবেগ নাই।
তীব্রতর, কঠোরতর, গভীরতর, গম্ভী-
রতর ভাব প্রকৃতিতে কিছুই নাই। এ-
খন বালকের মত কখন তাখিয়া তাখিয়া
আছে; কখন বা “খাবার দে না” ক-
রিয়া “মা মা” বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার
আছে; কখন বা “দিলি না” বলিয়া
কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমে গড়াগড়ি আছে;
আর কখন বা রজ্জুতে সর্প বোধ করিয়া
ভূমে ঝুঁড়সড় হইয়া মুদিতনয়নে অবস্থান
করা আছে। সকলই বালকের মত। হৃদয়-
মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই, গভীরতা
নাই। জলতলে শৈবালরাজির
ন্যায় আমাদের হৃদয়ভাব সকল পবনদে-
বের স্বেচ্ছাচারকুৎকারে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব
পশ্চিমে যাইতেছে; ভীমের জীবনী বন্ধ-
নের স্রাব, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের
ন্যায়, পাষাণে গভীরখাতে ক্ষোদিত ন-
দীশয্যার মত চিরদিন একদিকে বহে না।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, মানসিক
আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তর-
ঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতই নাটকের জীবন।
এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত
আবেগ নাই। মানসিক হৃদে সামান্য
কুলকলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের
সহিত কলোল নাই। আমরা এখন বা-
তুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া
ফেলি, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি।
সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট না-
টকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না।
ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমা-
দের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য হেতু; কেবল
শ্রম্ভকারগণের দোষে নহে। এই জন্য
আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অ-
থচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। একপ প্রহ-
সন অন্য কোন দেশে আছে কি না স-
ন্দেহ। কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, প-
দ্মাবতী, শর্মিষ্ঠা নাটকগণনার কোথায়
স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন;
কিন্তু দত্তজরুত “একেই কি বলে সভাতা”
ও “বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ” নামক
ক্ষুদ্র শ্রম্ভপ্রহসনের আদর্শ। আবেগপূর্ণ
মানবচরিত্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু
যে রূপ গৌরীশঙ্করের জীব সকল এখন বাস্ত-
বায় ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাদের চিত্র
সেই প্রহসনদ্বয়ে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

তাহার পর পণ্ডিতবর রামনারায়ণ
ভট্টরত্ন। বিবেচনা করিতে গেলে তিনি
পণ্ডিতের পদ্ধতিতে প্রহসনের কবি, নাট-

কের কেহ নহেন । তাঁহার কুলীনকুল-সৰ্ব্বস্ব পাঠ করিলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্তা শুনিলে, যেমন সকলই গড়াপেটা বলিয়া বোধ হয়, মৰ্ম্মকথা যেরূপ কণ্ঠে বাজে সেরূপ হয় না । তাঁহার নারিকার মধ্যে একটি বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন—

“ জাহ্নবী যাইয়া বুঝি জাহ্নবীর ঘাট ।

পাইবে সুন্দর বর সুন্দরীর কাঠ ॥ ”

সুতরাং তর্করত্নের নাটক বিষাদ-পরিণাম হইয়াও একরূপ প্রহসন । তর্করত্নের নাপিতিনী ভাল, যখন সে অলঙ্কৃত-সজ্জা লইয়া—

“ বাড়ী মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছুদূরে,
ঘেরা ঘোরা ঘর দুইখানি । ”

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে দিতে রজ্জাদানে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে ভারতের হীরার সহচরী করিতে প্রস্তুত হই, আর তাঁহার উদরপরায়ণ শর্মা যখন—

“ ঘিয়ে ভাজা তপু লুচি, দুচারি আদার কুচি
কচুরি তাহাতে খান দুই ”

বলিয়া উত্তম ফলার বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন তর্করত্নের নরম লেখনীর গুণে সত্য সত্যই আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পণ্ডিতবর রামনারায়ণকে বৈদিক-কুল-চূড়ামণি বলিয়াই বোধ হয় । তর্করত্নের নবনাটকও সেই ;—নাটক নহে, প্রহসন । নবনাটকের সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গবেষণ বাবুকে ভুলি নাই ।

তাঁহার পর দীনবন্ধু । দীনবন্ধু এক-

কালে প্রকৃত দীনবন্ধুই ছিলেন । প্রসিদ্ধিত প্রজার জন্য দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত বাজালার কোন গ্রন্থকার তাহা করেন নাই । তাঁহার অক্ষয়-কীর্তি—সেই নীলদর্পণ । অনেক মনে করেন যে, নীলদর্পণ কেবল সাময়িক তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র ; এই কথাটা কতক দূর সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে ।

নীলদর্পণ যদি সত্য সত্যই এক দিন বা দশ দিনের জন্য হইত, যদি জেতুবর্গের অত্যাচার কেবল এক দেশেই পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে এসংসার সোণার সংসার, এভারত সোণার ভারত । আমেরিকায় যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও একরূপ নীলদর্পণের অভিনয় । তবে সেখানে শত সহস্র বিন্দুমাধব ও নবীনমাধব একবারে উত্থান করিয়াছিলেন, আর এখানে কচিৎ এক আধ জন দেখা দেন এইমাত্র প্রভেদ । বহুদিন হইল মিস্ ফোর্সে অফিলটম্ কাবিন লিখিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ—আর রুটিশ গায়েনার শ্রমজীবী গৃহস্থগণের কষ্ট বর্ণনা করিয়া একজন বিলাতের বারিষ্টার যে কুলী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ । যত দিন বণিত্বৃত্তিক রাজপুঙ্খ অন্নবৎস্থান জন্য এদেশে আগমন করিবেন, আর যত দিন ইংরেজ রাজবিচারে খেত-কৃষকের প্রভেদ করিবেন, ততদিন নীলদর্পণ আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ চিত্র থাকিবে । নরহত্যাকারী কুলরের উপযুক্ত শাস্তি হয়

নাই, এই কথা নবাগত গণের বলিয়াছিলেন বলিয়া, দেখিতেছ না এখনকার পি পি উড ও ডবলিউ ডবলিউ রোগগণ কিরূপ গর্জন করিতেছেন; তবে আর কোন্ প্রাণে বলিব যে নীলদর্পণ ক্ষণস্থায়ী-সমাজচিত্র মাত্র। তাহা যে নহে এই আমাদের দুঃখ।

দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটককার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্য রস-তরল হইতে থাকে। তাঁহার পরিচয়—সধবার একাদশী। তাঁহার নিমেষদত্ত কবির একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। নিমেষদত্ত স্বর্গভ্রষ্ট সময়তান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকাগ্নি; নিমেষদত্ত, এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নরকাগ্নি দিবারাত্রি গলাধঃকরণ করিতেছে। এই স্বর্গ-নরক-সমষ্টিকে দীনবন্ধু তরলমতি বঙ্গীর যুবকের দলে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিমেষদত্ত পূর্ণকালবর হইয়াও স্ফূর্তি পায় নাই। নিমেষদত্তের প্রয়োজন ছিল কেবল এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহা হইল না। তাহা কোথায়। যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে, নিমেষদত্তকে পাঠান কেন? নিমেষদত্তকে সেই হরিশ, সেই রামগোপাল মধ্যে

স্থাপিত করিতে হয়। তবে নিমেষদত্ত স্ফূর্তি পাইত। আর নীলদর্পণ-কার যেরূপ পল্লী-গ্রামের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগরিক চিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইতেন। তাহা হয় নাই; দীনবন্ধু ক্রমেই তরলভাব অবলম্বন করেন। সেই জন্য তিনি নবীনতপস্বিনীতে নাটক লিখিতে প্রহসন করিয়াছেন, আবার জামাইবারিক প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক করিয়াছেন। তাঁহার লীলাবতীর নায়ক নায়িকাকে যত না মনে পড়ে, তাহার নদেরচাঁদকে তাহার অধিক মনে পড়ে। প্রহসনে দীনবন্ধু অদ্বিতীয়।

তাঁহার পর নয়শোকপেরাকার। তাঁহার নায়ক নায়িকা ঠিক লীলাবতীর মত, কিন্তু তাঁহার সাতুলাল একটি প্রকৃত শোখিত চিত্র। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সাতুলাল গাঁজায় নিমেষদত্ত। সুতরাং বাঙ্গালার পূর্বতন নাটক-কারগণ সকলেই প্রহসন পটু। কেবল এক নীলদর্পণ-কারই প্রগাঢ় ও নীলদর্পণ প্রকৃত নাটক-পদ-বাচ্য।

এইক্ষণ আধুনিক বাঙ্গালার নাটক।

আধুনিক বাঙ্গালার নাটক সমুদ্রবিশেষ, একে একে তাহার তরঙ্গ গণনা করা আমাদের অসাধ্য। তবে সৌভাগ্যক্রমে যে কএক খানি নাটক আমাদের সম্মুখে আছে, সেইগুলিকে আদর্শ করিয়াই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারি। আধুনিক নাটক প্রধানতঃ তিন

শ্রেণীর । (১) দেশ-হিতৈষিতা-প্রাস-
ঙ্গিক । (২) অনুবাদ-মূলক । (৩) প্র-
ণয়-জীবন-নাটক ।

আমাদের উল্লিখিত কয়খানি নাটক
এই তিন শ্রেণীর ; তবে দুই একখানি
একটু বিশেষ সমালোচনের যোগ্য । শরৎ
সরোজিনী * গ্রন্থ নিতান্তুতরলমতি বাল-
কের জন্য নহে । শরৎ সরোজের প্রণয়
প্রগাঢ় ও পরীক্ষিত, শরতের দেশহিতৈ-
ষিতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তুল হইতে মধ্য
মধ্যে উচ্ছসিত হইয়া উঠে । আর ভুবন-
মোহিনীর প্রতিহিংসাও নিতান্ত অশ্রদ্ধার
সামগ্রী নহে । ইহার ভাষা প্রায়ই প্র-
গাঢ় । ছন্দোবদ্ধ হইলে আরও অধিক-
তর আবেগপূর্ণ হইত । ৫৫ পৃষ্ঠার ভূ-
বনমোহিনীর উক্তি মধ্য এইরূপ আছে ;

“ এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক-
য়েম, (দহ-ঘর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান
করে আমার মেয়ে জনম সার্থক করব ।”

আমরা বলি এইরূপ স্থলে অমিত্রাকর-
ছন্দ হইলে অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত ।

“ মনে মনে তাই ভাবি করি নু প্রতিজ্ঞা,
মতিলাল পাপিষ্ঠের রক্তে স্নান করে,
আমার এ নারীজন্ম করিব সার্থক । ”

যাহাই হউক গুণগণনায় শরৎ-সরোজিনী
প্রথম স্থানীয়া ও শরৎ-সরোজিনী-কার আ-
ধুনিক নাটক-কারগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ।

(২) তাহার পর হেমলতা । হেমলতা

* প্রথমসংস্করণের সময়ে আমরা এই
গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি ।

নাটকে দেশহিতৈষিতার সঙ্গে সঙ্গে বীর-
রস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে । আমাদের
পূর্বকথিত নানা কারণে হরলাস বাবু ই-
হাতে বিশেষ কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ।
কিন্তু গ্রন্থকার যে কেবল প্রণয় লইয়া মত্ত
না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে টম্পা-প্রাণিত দেশে
বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, ই-
হাতেই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র
হেমলতার কমলাদেবীতে আমরা বাৎসল্য
রসের বিলক্ষণ পরিপূর্তি দেখিতে পাই ।

৩। তাহার পর মহারাষ্ট্রকলক ।
ইহাতে যখন কলক ওরঙ্গজিবের হস্তে ম-
হারাষ্ট্র-কলক শম্ভুজির হৃদশার কথা ব-
র্ণিত আছে । এই গ্রন্থে সাময়িক চিত্র
প্রদর্শনের অনেক ব্যতিক্রম আছে, আর
এখনকার প্রথমত তুলিকার উপর তুলিকা
ঘষিয়া সুদীর্ঘ আত্ম-সমালোচন ও বক্তৃতা
আছে । বন্ধুঘাতক শম্ভুজি গদ্যে পদ্যে
আড়াই পৃষ্ঠা স্বগত চানিয়াছেন ; স্মরণ্য
আবেগের কঠোর আঘাত ও ভাষার প্র-
গাঢ়তা ইহাতে অতি অল্পই আছে । কিন্তু
তথাপি মহারাষ্ট্র-কলক দ্বিতীয়শ্রেণীর
মধ্যে সর্বপ্রধান নাটক ।

তাহার পর চারি খানি গ্রন্থের সম-
য়ের চিত্র । তন্মধ্যে গৌরবে প্রথম ‘যৌবনে
যোগিনী’ । ইহার অধিনায়ক একদিকে পৃথী-
রাজ প্রভৃতি, অন্যদিকে কুতবুদ্দীন প্রভৃতি ।

দ্বিতীয় ভারত বিজয় । ইহারও অধি-
নায়কগণ পৃথীরাজ, জয়চন্দ্র, একদিকে ;
অন্যদিকে কুতব, মামুদ, রহিম প্রভৃতি ।

তৃতীয়। 'ভারতের মুখশশী যবন-
কবলে' ইহাতেও ঐ সকল অধিনায়ক।

চতুর্থ। 'জয়পাল'। ইহাতে পঞ্চ-
নদেবীর জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপাল
একদিকে, অন্যদিকে পূর্বোক্ত মুসলমান
আক্রমণকারিগণ।

ভারতের সেই দুর্দশার দিন বাঙ্গালি
বা ~~ভারতবাসী~~ যদি এখন উজ্জ্বল অক্ষরে,
আবেগ-সহকারে, প্রগাঢ়ভাষায় বা গ-
ভীরভাবে চিত্রিত করিতে পারিবে, তাহা
ইলে আমাদের ভাবনা কোথায়? ভার-
তের এখনও সে দিন আসে নাই।

এই জন্যই বিদ্যারত্নের পৃথুরাজ ও মিত্র-
জের জয়পাল জীবিতেশ্বরী, জীবিতেশ্বরী,
বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন*। আর
এই জন্যই ভারতবিজয়ের উপসংহারে আ-
মরা ঝিঝিট, মধ্যমানে এইরূপ সঙ্কীর্ণ শু-
নিতে পাই :—

'আহা কি সুন্দর শোভা কর সবে-দরশন।
পবিত্র-প্রণয়-ডোরে বাঁধা প্রণয়ী দুজন।'
যে জাতি এখনও দেশের কথা ভাবিতে
গিয়া গৃহিণীর অলঙ্কারের সৌন্দর্যের জন্য
স্বর্ণকারের সহিত কলহ করে, সেই জাতি
ইহা ~~কি সুন্দর~~ ~~রম্য~~ ~~মাধুর্য~~ বিনা অধিক
আর কি প্রত্যাশা করিব?

• তাহার পর বাবু হরলাল রায় প্রণীত
দুইখানি অনুবাদিত নাটক। সংস্কৃত

* ভারতের মুখশশী যবনকবলের
১৩৭ পৃষ্ঠা ও জয়পাল নাটকের ১১৮
পৃষ্ঠা দেখ।

বেণীসংহার ইহাতে শত্রুসংহার ও সেক-
পিররের মেকবেথ ইহাতে কদ্রপাল। সে-
কপিররের প্রগাঢ়তা বাঙ্গালী কদ্রপালে
অনেক সময়েই রক্ষা হয় নাই বলিলে, কেবল
প্রকারান্তরে সেকপিররেরই প্রশংসা করা
হয় ও প্রগাঢ়তায় বাঙ্গালী ভাষা এখনও
অনেক উন্নতিসাপেক্ষ ইহাই বলা হয়।
কদ্রপাল অপেক্ষা শত্রুসংহার অনুবাদে
ভাল হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারিখানি প্রণয়-জীবন না-
টক। বাঙ্গালির প্রণয়ের অর্থ বেহা-
গের গান—'সখিরে আমার ধর ধর'—
কোমল, মৃদুল, এলায়িত, আবেশময় র-
সালসপূর্ণ। সুতরাং ~~প্রণয়-জীবন~~ না-
টকে আর কিছু না থাকিলেও কোমলতা
থাকে। প্রণয়ের প্রতিফলে সেইরূপ কো-
মল, ললিত পদবিন্যাস আছে। আর
'প্রকৃত বন্ধুর' বনদেবীতে সেইরূপ সরল
লীলাময় আত্মোৎসর্গ আছে। কিন্তু কু-
মুদ-কামিনীতে এইরূপ কিছু না থাকিলেও,
এক প্রমোদ-মনোরমাতেই সকল আছে।
উহাতে রাজা আছে, পুরোহিত আছে,
ভট্টাচার্য আছে, বিদুষক আছে, জমীদার
আছে, ইয়ারগণ আছে, মন্ত্রী, শিক্ষক,
ঘটক, প্রতিহারী, দূত, পাশু, ভূতা, রাজরাণী,
রাজকন্যা, সুদীর্ঘ বক্তৃতা, নানারসের গীত,
রজ্জুকর্ষ, মৃত্তিকা, গোময়, তুষ, ছাই,
পাঁশ, ভস্ম সকলই আছে; নাই কেবল গ্রন্থ-
কারের শিক্ষা কিংবা শক্তির পরিচয় ও
তাঁহার ভাষাজ্ঞান। অনেক নাটককার সং-

স্মৃত বা ইংরেজী নাটক পড়েন না, প্রমোদ-মনোরমা রচয়িতা বাঙ্গালা কোন নাটক পর্যন্তও পড়েন নাই। প্রমোদ-মনোরমা আধুনিক অপকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ।

আমরা নাটক, বাঙ্গালা নাটক ও আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সমালোচনা করিতে গিয়া মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের অপকৃষ্ট গ্রন্থরূপ অধঃপতিত বাঙ্গালার অন্ধতম কূপে আসিয়া পতিত হইয়াছি।

এক্ষণে এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিব।

মনুষ্য নানারূপে তাড়িত। সংসার-তাড়িত মানব-বিশেষের পরিবর্তন ও পরিণাম প্রদর্শন করা নাটকের উদ্দেশ্য। মনুষ্য-হৃদয়ের আবেগ-পরম্পরার চলাচলে এই পরিবর্তন হইয়া থাকে। জীব-শরীরে শোণিতসঞ্চালন যেমন জীবনী শক্তির মূল; আবেগচলাচল সেইরূপ নাটকের জীবন। আবেগপূর্ণ কথোপকথন বা স্বগত আত্মচিন্তাপরীক্ষা বা কঠোচ্ছ্বাস নাটকের শরীর। তরঙ্গায়িত বা ছন্দোবদ্ধ রচনাই নাটকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ। অন্য পরিচ্ছদে একরূপ চলে, কিন্তু সাজে না। উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম অতীব শোক-কর; এরূপ না হইলে ভাবের প্রগাঢ়তা হয় না, এবং রসের স্থাপ্তি হয় না।

উৎকৃষ্ট কাব্যনাটক রচনার জন্য ভাষার প্রগাঢ়তা অবলম্বন করা আমাদের

মিতান্ত্র কর্তব্য। নহিলে রসের ধনীভাব হয় না। ভাষার প্রগাঢ়তা হইতে আমাদের ভাবের গভীরতা হইবে, তাহা ~~হইবে~~ ক্রমে আমরা কার্যকর মনুষ্য হইব। এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব, আর যেরূপ এমায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই ~~হইয়াছে~~। মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, ইহারা সকলেই প্রহসন লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অদ্বিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কেবল দুই এক খানি ব্যতীত সকল গুলিই অসার। যেখানে দেশহিতৈষিতা উদ্দীপনের চেষ্টা, সেখানে গ্রন্থকার প্রায়ই অকৃতকার্য। বাঙ্গালি দেশহিতৈষিতা কহিতে শিখিয়াছে, মর্ম্মকথার দীর্ঘশ্বাসে এখনও অপরের হৃদয়ে দেশবাসল্য উদ্দীপন করিতে শিখে নাই। কোমল বাঙ্গালি একটু কোমল প্রণয় লিখিতে, ~~বলিতে~~ শিখিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটকগুলি তাই লইয়াই বাস্তব। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি, আবারও বলি—মর্মে যার পীড়া, গাত্রে যার কশাঘাত, গৃহে যার অন্তর্কষ্ট, বাহিরে যার দণ্ডবিধি, মস্তকে যার অধিরুদ্ধি, পদে ~~পদে~~ বিপদ, সে কেন আধার তালে ঝিঝিট রাগিনীতে প্রণয়ের গীত গাইয়া বেড়ায়। বঙ্গবাসিন্ একবার প্রগাঢ় ভাসার কঠোরভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা কর দেখি।

অনন্ত সুখ।

আহা! কি সুন্দর নিশি মধুময়,
শুক্ল-কলেবরা, শোভার নিলয়,
সুনীল সলাটে পূর্ণশশধর!—

রজতের চাপ শান্ত মনোহর;
মৃদু নীল-কচি অমল অম্বরে,
শ্বেতাশুদ-দাম মম্বরে বিহরে;
নিশি-অশ্রুজল, তরুর শিখরে,
চন্দ্রের কিরণে ঝলমল করে!
উচ্ছ্বাসিয়া বয় নৈশ সমীরণ,
সৌরভের মনে মৃদু পরশন;
চাক-চন্দ্রচ্ছবি তরঙ্গিনী-নীরে,
শত চন্দ্র চাক চঞ্চলিত ধীরে!

কোলে করি শশধর!

ঝলমলে নীলাশ্বর!

চাক-কৌমুদিনী-মালা,

ফুটাইছে ফুল-বালা,

সরসীর নীল জলে,

তরল কৌমুদী খেলে;

মরি কিবা মনোহর মধুরা যামিনী!

চাক-কৌমুদিনী-চাক-চন্দ্রমা-শালিনী।

(উচ্ছ্বাস)

কোলে করি শশধর!

ঝলমলে নীলাশ্বর!

চাক-কৌমুদিনী-মালা,

ফুটাইছে ফুল-বালা,

সরসীর নীল জলে,

চাঁদের কৌমুদী খেলে;

নীরব যামিনী, নীরব ভুবন,

নীরব সকলি শান্ত দরশন;

প্রকৃতি সুন্দরী, ক্লান্ত কলেবরা,

সারাদিন পরে নিদ্রায় কাতরা;

প্রকৃতির মনে জগত ঘুমায়,

নিদ্রিত পার্থিব প্রাণী সমুদায়;

নিদ্রা বিনোদিনী প্রতি ঘরে ঘরে,

শান্তি-সুখা-রাশি বিতরণ করে,

দরিদ্র দুঃখীরে সুপর্ণ কুটীরে!

পতিবিরোগিনী চির-দুঃখিনীরে!

যুড়ান জননী, সুকোমল করে—

নয়নের জল, মুছি স্নেহ ভরে!

নীরব ভুবন মরি!

শুক্ল নিশি রূপেশ্বরী,

নীল চন্দ্রাতপ তলে,

থরে থরে মণি জ্বলে!

দূরে শ্যাম-তরুপরে,

শুধু ঝিল্লী রব করে,

মঞ্জুল বিপিনে নিশি কোকিল কুহরে!

মঞ্জুল কুমুদীকোলে ভ্রমরী গুঞ্জে!

(উচ্ছ্বাস।)

নীরব ভুবন মরি!

শুক্ল নিশি রূপেশ্বরী,

নীল চন্দ্রাতপ তলে!

থরে থরে মণি জ্বলে!

দূরে শ্যামতরুপরে,
শুধু ঝিল্লী রব করে,
এহেন নিশীথে, মন্দির-ভিতরে,
একটি রমণী বসিয়া কাতরে !
নীরবে ফেলিছে নয়নের নীর !
বিশুদ্ধ-বদন স্নান হুঃখিনীর !
সুখদা নিজ্জার চিত্ত-যুক্তকরী,
ত্রিলোক-মোহিনী সুধার লহরী,
বিমোহিনী সুধা করি বরিষণ,
করেনি মুদিত সজ্জল নয়ন !
নয়ন-সম্মুখে, কোমল শয্যায়,
শায়িত যতনে মলিন বিভায় !
প্রাণের নন্দিনী ! সুবর্ণ বস্ত্রী !
মানসের স্বর্ণ-সরোজ-সুন্দরী !

মলিনবদন শশী !

মলিন সৌন্দর্য্য-রাশি !

স্নান নেত্র-নীলোৎপল !

স্নান বপু সুকোমল !

কোমল বয়ান পরে !

অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !

মেলিয়া নয়নপদ্ম জননীর পানে,
চাহিছে বিষাদে বালা বিকল পরাগে !

(উচ্ছ্বাস)

মলিনবদন শশী !

মলিন সৌন্দর্য্য-রাশি !

স্নান নেত্র-নীলোৎপল !

স্নান তরু সুকোমল !

কোমল বয়ান পরে !

অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !

শিয়রে জননী ! স্নেহ-স্বরূপিনী !

নয়নের নীরে ! তিতিছে হুঃখিনী !

শান্ত-প্রভাময়, নয়নের মণি !

অনন্ত তিমিরে, ডুববে এখনি !

শুকাবে এখনি নিদাশে অকালে,

হৃদয়কুসুম জীবনমৃণালে !

চিরহুঃখিনীর, অতুল অমল—

একটি রতন সংসারে সম্বল !

সেই যতনের জীবনের ধনে,

হরিবে কৃতান্ত অদয় জীবনে !

অই অভাগীর সকলি কুরায়,

জীবন-প্রদীপ নিৰ্ব্বাপিত প্রায় !

জীবনকাননে তার,

যৌবন-কুসুম-হার,

পূর্ণ বিকসিত নয় !

এখনি বিশুদ্ধ হয় !

হে বিধাতঃ বল নাথ !

কেন একুসুম-পাত—

অকালে, মিশার-কেন, চিরদিন তরে

জীবন-প্রবাহ তার, কালের সাগরে !

(উচ্ছ্বাস)

জীবন কাননে তার,

যৌবন-কুসুম-হার,

পূর্ণ বিকসিত নয় !

এখনি বিশুদ্ধ হয় !

হে বিধাতঃ বল নাথ !

কেন একুসুম-পাত ;

ইন্দুমতী নিশি চাকচন্দ্র ভাসে,

নীল জলধর ধরাতল হাসে !

দুগ্ধময় পথে কোমল অম্বরে,

ত্রিদিব-নন্দিনী মর্ত্যে অবতরে !

সুখাঙা চরণ, শত-পদ্য-জ্যোতি !

নিখর বদনে শশধর ভাতি !

মন্দার-দামে বিন্যস্ত কবরী,

যৌবন-সাগরে লাবণ্য-সহরী !

তাজিয়া অঙ্গর উত্তরি অবনী,

কুটীরের ঘারে দাঁড়াল রমণী,

মঞ্চভূমে হল বরিষা সঞ্চার !

অরণ্যে বিজনে ফুটিল মন্দার !

পারিজাত শত শত,

পরিমলে অবিরত,

রমণী-চরণ ধরি,

উল্লাসে ফুটিল মরি !

নন্দনের পরিমলে,

যুগ্ম হল ধরাতলে ;

কাঞ্চন-প্রতীমা হেরি প্রকৃতি সুন্দরী ;

চমকিল ! ত্রান হল সচন্দ্র সর্বরী !

(উচ্ছ্বাস)

পারিজাত শত শত,

ফুটিতথা অবিরত ;

রমণী-চরণ ধরি,

উল্লাসে ফুটিল মরি !

নন্দনের পরিমলে,

যুগ্ম হল ধরাতলে ।

কঙ্কণ-রঞ্জী, কতক্ষণ পরে,

স্বর্গীয় নিকুণে, সুমধুর স্বরে !

সরস বসন্তে কাকলি উগরি,

ঝঙ্কারিল বনে, পিক-কুলেশ্বরী ;

সুস্বর-লহরী, নৈশ সমীরণে,

ভাসিল সত্বরে, অমৃতের সনে ;

“এস প্রিয়তমে এসলো ভগিনী !

তাজ হুঃখময় নশ্বর-মেদিনী !

মায়ায় শৃঙ্খল কাট এইবার !

অনিভা সৃজন অলীক সংসার !

চল যাই সখি প্রফুল্ল বদনে,

চিরানন্দ ময় সুখের ভবনে, ”

“রোগের অনন্ত জ্বালা,

তথায় নাহিক বালা,

তরলতা প্রাণিচয়,

অনন্ত আনন্দময় !

অনন্ত সুখের ধাম,

চিরপুলকিত প্রাণ !

চির কচি মধুমাস প্রফুল্ল কাননে !

চির কচি মৃদু হাসি প্রাণীর বদনে ! ”

(উচ্ছ্বাস)

“রোগের অনন্ত জ্বালা,

তথায় নাহিক বালা,

তরলতা প্রাণিচয়,

সকলি আনন্দময় ।

অনন্ত সুখের ধাম,

চির-পুলকিত প্রাণ ! ”

নীরবিল বালা ; নীরবে যেমতি

শ্যাম-মৃদু-কণ্ঠ ; শ্যাম-রূপবতী—

কোকিল-কামিনী, কানন-অখিলে,

ললিত পঞ্চমে দূরে ঝঙ্কারিলে ;

মরণ-উন্মুখ বালিকা-বদন,

নীহার-নিমিত্ত মলিন-নয়ন !

হল স্নানতর মুহূর্তেক তরে,

ক্ষণে শিহরিল ক্লিষ্ট কলেবরে ;

কমনীয়-কচি বদন-চন্দ্রিমা !

ধীরে ধীরে মরি ব্যাপিল নীলিমা !

বহিল সবেগে ধমনী-নিচয় !

উষ্ণ-রক্ত-স্রোত শুলীতল হয় !

জীবনের লীলা তার,

ফুরাইবে এইবার !

আধারিয়া দশ দিশি,

আসিছে অনন্ত নিশি !

জীবন-তপন হায় !

চির অস্তাচলে যায় !

রক্ত-ভূমে অভিনয় ! হল সমাপন !

জীবনের যবনিকা হতেছে পড়ন ।

(উচ্ছ্বাস)

জীবনের লীলা তার,

ফুরাইবে এইবার !

আধারিয়া দশ দিশি,

আসিছে অনন্ত নিশি !

জীবন-তপন হায় !

চির অস্তাচলে যায় !

নিরখিল বালা মনের নয়নে,

স্বর্গ সুন্দরীয়ে, স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে !

নিরখিল বালা, নয়ন উপরে

আনন্দময়ীয়ে, বসিয়া শিয়রে,

নিরখিল বিশ্ব অন্ধকারময় !

জনমের তরে সব শেষ হয় !

‘ জননী যাই মা ’ বলিল বদন !

নিরখিল মায়ে জন্মের মতন !

মার প্রতিবিম্ব, নয়ন-মুকুরে !

রহিল বিম্বিত ! চিরদিন তরে,

মুদিল যুগল নয়ন মলিন !

জীবন উরজ হইল বিলীন !

মায়ের জীবন-বনে,

নিদাঘের পরশনে,

সোণার কুমুমে গাঁথা,

শুকাল বসন্ত-লতা !

সন্ধ্যার শারদশর্মা,

পশ্চিমে পড়িল ধসি !

উজলি অশ্রুদেশ রূপের কিরণে ;

সুবর্ণের বিহঙ্গিনী উড়িল গগনে !

(উচ্ছ্বাস)

মায়ের জীবন-বনে,

নিদাঘের পরশনে,

সোণার কুমুমে গাঁথা,

শুকাল বসন্ত-লতা !

সন্ধ্যার নবীন-শর্মা !

পশ্চিমে পড়িল ধসি !

পার্শ্ব পিঞ্জরে তাজিয়া অচিরে,

সুরভি কোমল নন্দন-সমীরে !

কাঞ্চন-প্রতীমা ! আরোহি উল্লাসে,

চলিল সতরে, নন্দন সকাশে ;

চির কচি মৃদু, কমল আসনে,

বসিল রমণী প্রকুল আননে ;

শোভিল যেন রে উমা সুবদনে,

বজ্রের মন্দিরে শারদ-পার্বণে !

মিলি ত্রিদিবের, বিলাসিনী গগনে,

সাজিল যতনে, নন্দন-ভূষণে ;

ভুলি ভব-ধাম, পলিল সুন্দরী—

অনন্ত সুখেতে অনন্ত মাধুরী । জীবঃ—

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ)

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

কার্তিকেয় ; গণেশ ; বিশ্বকর্মা।

এরেশ্ ; হিফেস্টস্ ; হার্মেস্।



কার্তিকেয় দেবসেনাপতি, এরেশ্ (মার্চ)ও দেবসেনাপতি। কার্তিকেয় ময়ূর-বাহন শ্রীমান্, এরেশ্ দীর্ঘায়ত বীরপুরুষ। ক্ষমের মুখশ্রী প্রফুল্ল, মার্চের মুখশ্রী কুঞ্চিত, জয়ুগলে এবং ক্রোধকষায়িত নয়নে অকুণ্ঠিত প্রকাশক। কার্তিকেয় মনোহর, এরেশ্ ভয়ঙ্কর।

অমিতপরাক্রম তারকাসুরের বিনাশ-সন্ধিনে কার্তিকেয় জয়প্রাপ্ত করেন। তাঁহার বলবিক্রমের তুলনা নাই, দেব মানব অসুর গন্ধর্ব কেহই সমরে তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না, সকলেই তাঁহার পদা-নত হয়। কিন্তু তাঁহার আকৃতি কোমল, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখশ্রী,—পরমরূপবান্ পু-রুষ। তাঁহার সৌন্দর্যের সহিত তুলনায় মার অর্থাৎ কন্দর্পও কুরূপ, এজন্য কার্তি-কেয়ের নাম কুমার। যদিও আর্য্যকবি দেবগণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন তাঁহাদিগকে মানবগণহইতে ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ক-রিয়্যাছেন এবং যে আকৃতি মানবে অপ্র-

যুক্তা, অথবা প্রযুক্তা হইলেও প্রকৃতিগত দোষের কারণ হয়, দেবগণকে সেইরূপ আকারবিশিষ্ট করিয়া মানব হইতে অ-শেষগুণে উৎকর্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়া-ছেন, তথাপি আমরা ক্ষম ও এরেশ্কে তুলনা করিতে আকৃতিতে এরেশ্কেই প্র-শংসা করিব। কারণ, বিপক্ষের শোণিত-পান যাহার ধর্ম, অনারত সমরাজ্ঞ যাহার প্রিয় নিকেতন, লৌহ যাহার অঙ্গা-বরণ ও অবলম্বন, সে কুমুমসুকুমারদেহ হ-ইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। পুরাণবর্ণিত কার্তিক বজ্রগৃহবিরাজিত বাবু কার্তিক হইতে অনেক পৃথক্ আকার হইলেও মার্চ-কেই এবিষয়ে প্রশংসা করিতে হইবে। মার্চের ভয়ঙ্কর মূর্তিই বিপক্ষকে পলায়নে বাধ্য করে।

সেনাপতির স্কুমার দেহ কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, স্তূতরাং রূপবিষয়ে কার্তি-কের নিম্ননীয়। কিন্তু ইয়োরাপীয় লে-খকগণ যে হিন্দুদেবগণের সকলকেই ভয়-

কর বলেন, কার্তিকের সে অপবাদইহেতে মুক্ত । রূপবর্ণনার গ্রীক কবিগণ প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু গুণবর্ণনার তাঁহারা নিন্দনীয় । তাঁহারা জানিতেন রূপের অনেক দোষ, এজন্য ভিনস্কে পিণাটী করিয়া তুলিয়াছেন, রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ কখনও করেন নাই । কিন্তু হিন্দুগণ দেবগণকে রূপ ও গুণ উভয়েই ভূষিত করিতে যুগপৎ প্রয়াস পাইয়াছেন । তাঁহারা কুমারকে কোমল আকৃতি প্রদান করিয়া প্রকৃতি তদনুরূপ করেন নাই । তাঁহার হস্তে বাবুদিগের প্রিয়, বাতাসের ভরে নত ক্ষীণবেত্র অথবা বিলাসি-কর-লালিত ক্ষুদ্রাতপত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না । তাঁহার অবস্থান-বিলাস ইহেতে অনেক অন্তর, অনেক উচ্চ । আপন বীরধর্মের ব্যাঘাত ইহেবে ভরে তিনি চিরকৌমার্য্য ত্রতাবলম্বী । সমরাজগমনোন্মুখ বীরপুরুষও বিদায় সময়ে আপন প্রেমসীর অশ্রুদর্শনে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-চিন্তা ইয়া আপন নরুপ বিস্মৃত ইহেতে পারেন, আপন জীবনকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তক্ষণ যশইহেতে মূল্যবান্ বিবেচনা করিতে পারেন, এজন্য বীরশ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র আপন হৃদয় অন্যের জন্য উৎসর্গ করেন নাই, স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নাই । এরেশ্ও কি পার্শ্বতীনন্দনের ন্যায় চির-কুমার ? না । পরিণয় কেন ? এরেশ্ বীরধর্মের জলাঞ্জলি দিয়া, বিরজন-কর্তব্য অন্যের ধর্মরক্ষা বিস্মৃত ইয়া পর-ত্মীর প্রণয় পিপাসু ! হিফেস্‌সলস্‌না এ-

ফ্রোডাইট মার্চের অনুগ্রহে তিনপুত্রের জননী ! রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ অবিবাহিতার পক্ষে, এ তাহা ইহেতেও ঘণনীয় । যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া মেসিনার যুদ্ধাবসানে স্পার্টানগরীতে লোকবসতি হয়, যে উপায়ে আর্গোনটগণকর্তৃক অনেক দ্বীপ ও উপনিবেশ জনাকীর্ণ হয়, ট্রয়ের অবরোধ সময়ে গ্রীসের লোকসংখ্যার সমতা রক্ষিত হয়, এ সেই উপায়, সেই প্রণালী । গ্রীকজাতির উপাস্য দেবগণের সেনানায়ক সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এফ্রোডাইটের রমণীয় নিকুঞ্জবনের, ললিত-সবন্ধ-লতা-পরিবৃত-শ্যামল-তমাল-তালী বনের বসন্তের কোকিল, বিলাসের শামাপাখী !

এরেশের এই বীরত্বের,—অবলার প্রতি-বলপ্রকাশের পুরস্কার হাতে হাতে লাভ ইয়াছিল । এলয়েড্রয় তাঁহাকে পরাজিত ও কারাবদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল দাস-রূপে রাখিয়াছিল । পরিশেষে তিনি অন্তর্দীর সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন । যিনি কুমারী রিগাসিসভিয়ার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া রমুলস্ ও রিমসের সুতরাং রোমের জনক, রোমীর দেবত্রে তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তারিতরূপে বর্ণিত থাকিবে আশ্চর্য্য কি?

দেবামুরে যুদ্ধ, সকল দেশীয় দেবতাই বর্ণিত আছে । দেবগণকে এক এক বার দৈত্যগণকর্তৃক পরাজিত ও অপমানিত ইহেতে দেখিয়া সকল দেশীয় কবিই এক একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ।

কিন্তু গ্রীস ভিন্ন প্রায় অন্য কোন দেশেই দেব-সেনাপতিকে দাসত্বে দেখা যায় নাই। পার্শ্বতী-পুত্র কখনও অন্যের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই।

গণেশের সহিত হিফেস্টেমের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। গণেশ পার্শ্বতীর মানসপুত্র,—শক্তির দৈবশক্তিতে জাত। ভল্কান্ও হিরির মানসপুত্র। ভগবতী আপন স্বামীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া গণপতিকে লাভ করেন; জুনো আপন ইচ্ছায় স্বামীর অজ্ঞাতসারে হিফেস্টেমকে প্রাপ্ত হন। নগেন্দ্রনন্দিনী সহর্ষে আপন স্বামীকে তনয় দেখাইলেন, শনির দৃষ্টিতে পুত্রকে প্রথমতঃ ছিন্নমস্তক, পরে গজা-নন হইতে দেখিয়া উভয়েই যারপরনাই দুঃখিত হইলেন। জুনো দেখিলেন তাঁহার পুত্র কুরূপ ও খণ্ড হইল, তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল। কদাকার পুত্র আপন স্বামীকে দেখাইতে লজ্জা বাসিলেন, এবং জননী হইয়া পুত্রহন্ত্রী হইতে প্রয়াস পাইলেন। অচির-প্রসূত হিফেস্টেম পলায়ন করিয়া সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিলেন, এবং সমুদ্রের অ-ধিষ্ঠাত্রীদেবীকর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন*। হিরির আপন মানসত-নয় দর্শনে লজ্জা ও স্বামীকে না দেখাইয়া তাহার বিনাশচেষ্টা, এবং পার্শ্বতীর মা-নসপুত্র লইয়া স্বামীর সহ সুখাবস্থান ও ত-নয়ের বিপদ দেখিয়া দুঃখ, এতদুভয়ের দোষ গুণ পাঠক বিচার করুন।

* নৈবকীনন্দন কৃষ্ণের বাল্যজীবনের সহিত তুলনা কর।

গণেশ খর্ব্বাকার, সুলভনু, গজেন্দ্র-বদন, লম্বোদর, সুন্দর। যেরূপ অঙ্গ-গঠনে অন্যকে নিতান্ত কুরূপ দেখায় গণেশ সে সমস্তেও সুন্দর। ভল্কান্ খণ্ড, সূতরাং খর্ব্ব না হইলেও খর্ব্ব, সুলভনু, বিকৃতব-দন, লম্বোদর, কিন্তু কুৎসিত। দেবমানব সকলের নিকটেই তিনি কদাকার বলিয়া ঘৃণ্য। গণেশ সকলের অগ্রে পূজা লাভ করেন; তিনি সিদ্ধিপ্রদ, কর্তৃদ। হিফেস্টেম কেবল লৌহকর্মকারের নিকটে পূজা লাভ করেন কিন্তু হেরসবৎ বিঘ্ননাশন নহেন। লৌহদ্বারা বজ্র গঠন করিয়া যিসকে মা-হায়া করা মাত্র তাঁহার কর্ম। দেব স-ভায় গণেশের আসন সকলের সম্মুখে, কিন্তু ভল্কান্ দেব সভায় আসন প্রাপ্ত হন না। লঘুহস্ত চতুর্ভূজ গণপতি বেদ-চতুর্ভূজ এবং মহাভারতের লেখক, অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সদ্ভিবেচক। কিন্তু হিফেস্টেমের বুদ্ধি তাঁহার ব্যবসায়ের উপাদানবৎ সুল।

মানবশরীরবৎ শরীরীর চারি হস্ত অ-স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইলেও যখন স্থি-রচিত্তে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, কবিগণ সর্বদাই লঘুহস্ত বুঝাইতে চ-তুর্ভূজ, সঙ্ক্ৰা বুঝাইতে পঞ্চবদন এবং বহুদর্শী বুঝাইতে সহস্রলোচন বলিয়া ব-র্ণনা করিয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর প-রেও সেই উপমা অপরিবর্তিত সেই অর্থই ব্য-বহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন তার অস্বা-ভাবিকত্ব অরণ্য থাকে না। তবে মানব-শরীরে গজমুণ্ড অস্বাভাবিক সংশয় নাই।

কিন্তু প্রকৃতির কোমলতায় ও উত্তমতায় আকৃতিগত দোষ এককালে ঢাকিয়া রাখে। মানবশরীর সময়ে সময়ে এত কদাকার দেখা যায় যে, কবির কল্পনাও তাহার সমতুল হইতে পারে না। সুতরাং ভল্কান্, শরীর কুরূপ হইলেও, অস্বাভাবিক নহে। অন্যদিকে আকৃতি স্বাভাবিক হইলেও প্রকৃতি নিতান্ত কদম্ব্য বলিয়া, কার্ধ্য নিতান্ত সামান্য বলিয়া মহাজ্ঞানী পরমধার্মিক গণেশের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব।

কবিগণ সকল দেশেই নিরতির উপাসক। সৰ্বশক্তিময়ী জুনো নিরতিমার্গ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহার মানসপুত্র নিতান্ত মৃণমীয় হইল। সুরেশ-সুন্দরী পার্শ্বতীও নিরতির হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রিয়তম তনয় নিতান্ত কদাকার হইল।

ভল্কান্ যেমন কদাকার তাঁহার স্ত্রী তেমনই সুন্দরী। লৌহব্যবসায়ীর শরীর ও মন লৌহ ও অশ্বনির ন্যায় কঠিন, প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরীর কুসুম হইতেও সুকুমার, তারল্য হইতেও তরল। হিফেস্টস্ সংগ্রহস্থ, নিরীহব্যবসায়ী, তাঁহার সহধর্মিণী কুলবধূ বা বিবি। রূপবানের ভাগ্যে রূপবতী ভার্যা, গুণবানের ভাগ্যে গুণবতী ললনা, সুন্দরীর ভাগ্যে অনুরূপ স্বামী, অথবা গুণশীলার গুণগ্রাহী পতি লাভ করা প্রায় অসম্ভব, জগতে সচরাচর মণিকাঞ্চনযোগ দেখা যায় না। যে বিধাতা সকল বিষয়ে জগতে অপরিভূষ

অনন্ততৃষ্ণা রাখিবার জন্য প্রাণিগণ ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কে আর কারণ বুঝিতে পারিবে? কারণ যেই হউক গরিব ভদ্রলোক হিফেস্টস্ সেই জন্যই ভিনসের স্বামী, প্রণয়বিহীন ভল্কান্ সৌন্দর্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর প্রাণকান্ত। জগতের কার্যানুকরণ করিয়া দেবমানবে সাদৃশ্য রক্ষা করিতে গিয়া, রূপবতী ভিনসের যৌবনের অপরিভূষ বিলাসবাসনার পরিণাম প্রদর্শনে গ্রীক কবি ভিনস্কে পরকীয়া করিয়াছেন, কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, যাহা মানবে স্বাভাবিক হয়, দেবেও কি তাহাই কল্পনা করা এবং এইরূপে অশেষভাবে শ্রেষ্ঠ প্রাণীকে মানবের ন্যায় দুর্বল ও পাপপ্রিয় জান করা উচিত? এতদ্বারা এরিস্টটলের বাক্য সপ্রমাণ হইয়াছে। গণেশের স্ত্রী নবপ্রতিমা সতী সাবিত্রী। ভারতীয় অন্যান্য দেবললনার ন্যায় গণেশকামিনীও পতিব্রতা। মহামোগী গণেশের সহধর্মিণীও তাঁহার অনুরূপ। ভারতীয় কবি দেবদেবী-গণের মিলন মানবমানবীর ন্যায় না করিয়া সতর্কতার সহিত মণিকাঞ্চনের যোগের ন্যায় করিয়াছেন। ভারতীয় দেবীগণ তাই সুন্দরীর ধর্ম্যনুষ্ঠানের পথপ্রদর্শিনী।

হার্ফেস্ ক্ষীণকায়, দীর্ঘায়ত। তাঁহার হস্তে একখানা যষ্টি, তাহার দুই পার্শ্ব দুইটি সর্পদ্বারা জড়ান। তাঁহার শিরজ্ঞানে

ও পাঙ্কায় পাখীর ন্যায় চারিটি পক্ষ *। জুপিটারের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, তিনি উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

গ্রীকদেবদেবীগণমধ্যে হার্মেসের চরিত্র যেমন বিকল্প ও বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত তেমন আর কাহারও নহে। তাঁহার সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সমস্তও অতি আশ্চর্য্য ও কৌতুহলজনক। তিনি একবার নারদ দেবদূত, অথচ কৌতুক করিবার জন্য, বিরোধ ঘটাইবার জন্য মিথ্যাবাদী। আবার তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় বাণিজ্য দ্রব্য ও শস্যাদির কর্তা। আবার দেহহইতে বিমুক্ত আত্মা প্লুটোর রাজ্যে লইয়া যাইতে পথপ্রদর্শক যমদূত। তিনি সূত্রধর, কৰ্ম্মকার, তন্তুবীর প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোকের উপাস্য দেবতা, সূত্রাং বিশ্বকৰ্ম্ম। তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ও সূচতুর, দেবর্ষি নারদের ন্যায় কৌতুকপ্রিয়, বানরের ন্যায় চঞ্চল প্রকৃতি, এবং মহীরাবণের ন্যায় মায়াবী ও তন্দুর।

রক্তনীতিমিরাবগুণ্ঠিতা, মানবগণ আপন আপন ভবনে নিদ্রা যাইতেছে, হার্মেস্ গোপনে তাহাদিগকে সৰ্ব্বস্বান্ত ও প্রহারিত করিতে একাগ্রচিত্তে যত্ন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার উপাসকও মুক্ত হইতে পারে না। অন্যের অনিষ্ট করার সময় কেহই হার্মেসের অভিপ্রায় পূর্বে বুঝিতে পারে না, এবং কেহই তাঁ-

* কেমন স্বাভাবিক? “পায় পাগড়ী মাথায় জুতা।”

হার নীরস হৃদয়ে দয়ার উদ্বেক করিতে পারে না। মরণধৰ্ম্মশীল মানবের ত কথাই নাই, প্রবলপরাক্রান্ত দিনমণি এপোলোও তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রসিক্ ডেল্ফির মন্দির হইতে এপোলোর বহুকালসঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে এবং তাঁহার গো-সকল আত্মসাৎ করিতে হার্মেসের মনে অণুমাত্রও ভয়সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার জননী ভয়ে অভিভূত হইয়া তাঁহাকে কত নিবারণ করিলেন, হার্মেস্ তাঁহার কথা শুনিলেন না। যখন তাঁহার বৈমাত্র্য ভাতা লেটোনামন্দন এপোলো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং চুরি করা যথার্থ কি না জ্ঞানিতে চাহিলেন, হার্মেস্ স্বীকার করিলেন না, স্পষ্ট কোন উত্তরও দিলেন না, হাসিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিলেন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করার অবশেষে বলিলেন “যদি তুমি আমাকে দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠশ্রেণীতে গণ্য কর এবং তোমার ন্যায় ক্ষমতা ও যশ আমার লাভ হয়, তবে আমি অনুসন্ধান করিয়া তোমার সম্পত্তি তোমাকে প্রতাপন করি।” এপোলো স্বীকার করিলেন, তখন হার্মেস্ তাঁহার সমস্ত বস্তু প্রতাপন করিলেন। এপোলো তাঁহার নিকট হইতে বীণা লইয়া তাহার বিনিময়ে আপন সর্পসংযুক্ত যষ্টি প্রদান করেন, তখন উভয়ের সন্ধি হয়।

একদা হার্মেস্ কোন স্থানে গমন সময়ে দেখিলেন একটি কৃষ্ণ ধীরে ধীরে চ-

লিয়া যাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন,
“এক্ষণে কথা বলিতে পার না, কিন্তু মৃ-
তুর পর উত্তম গান করিতে পারিবে।”
অমনি তাহাকে বধ করিয়া তাহার দৃঢ়
পৃষ্ঠাবরণ দ্বারা আপনার প্রসিদ্ধ বীণা প্র-
স্তুত করেন। এপোলো সেই মনোমোহন
বীণাধ্বনিতে মোহিত হইয়াই হার্মেসের স-
হিত সন্ধি করেন, এবং তাঁহার সকল অ-
পরাধ ভুলিয়া যান।

হার্মেস্ দৌতাকার্য্যে তাড়িৎবার্তা-
বহ। মেঘে আরোহণ করিয়া অতিক্রম
বায়ুসাগর অতিক্রম করেন। অন্যের
বাহ্য অসাধ্য হার্মেস্ তাহা অতি সহজেই
সম্পাদন করেন। কার্য্যসাধনে তাঁহার
ক্ষমতা আশ্চর্য্য। কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বা-
সের কার্য্যে নিয়োগ করিয়া কেহই নি-
শ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

ব্যবসায়ী লোকের নিকট মার্কিয়ুরি
শান্তপ্রকৃতি এবং বিশুদ্ধ কৰ্ম্মক্ষম। শ্র-
মজীবী শিল্পাবসায়ীগণ এই জন্যই ভ-
ক্তির সহিত তাঁহার পূজা করে। বাণিজ্য-
ব্যবসায়ীগণও তাঁহার উপাসক। কিন্তু
যখন ঋটিকারম্ভ হয়, যখন তাহার মার্কি-
য়ুরির আবির্ভাব, সঞ্চরমাণ গাঢ় ক্রমবর্ণ
মেঘমালায় নিরীক্ষণ করে, তখন তাহাদের
প্রাণ উড়িয়া যায়। এবং দেখিতে দেখিতে
সৰ্ব্বশ্বে সহ যখন তাহাদের অর্ণবযান সকল
সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তখন তাঁহার
বানরপ্রকৃতির নিন্দা করিতে এবং নেপচুনের
শরণাগত হইতে কেহই বিমূৃত হয় না।

বিশ্বকৰ্ম্মা পূর্ণায়ত সবলশরীর। তাঁ-
হার আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে কৰ্ম্মক্ষম
বলিয়া বোধ হয়। শিল্পীদিগের মার্কি-
য়ুরি আর পৌরাণিক বিশ্বকৰ্ম্মা একরূপ।
কিন্তু মার্কিয়ুরির অন্যান্য প্রকৃতির সহিত
বিশ্বকৰ্ম্মার কোন সাদৃশ্য নাই।

রহস্পতেষু ভগিনী বরজী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃষ্ণমসক্তা বিচরতুত ॥
প্রভাসমা তু ভাৰ্য্যা সা বসুনাশ্চমসাতু।
বিশ্বকৰ্ম্মা মহাভাগন্তুমাংযজ্ঞে মহামতিঃ ॥
কর্তা শিল্পমহত্মাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্তা শিল্পবতাংবরঃ ॥
যঃ সর্ব্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।
মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পাং মহাত্মনঃ * ॥
আবার,—

বিশ্বকৰ্ম্মা প্রভাসমা পুত্রঃ শিল্পপ্রজাপতিঃ
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রতিমাতৃষণাদিষু।
তড়াগারামকূপেষু স্মৃতঃ সোহমরবর্ধকিঃ ॥†
রহস্পতির ভাগিনের প্রভাসতনয় তম্ভা
দেবগণের শিল্প ও স্থপতিকার্য্য নির্ব্বাহ
করেন। তাঁহার ক্ষমতা আশ্চর্য্য। বৈ-
কুণ্ঠপুরী নির্মাণ করিতে হইবে, আজামাত্র
কার্য্য আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে এক
রজনীর মধ্যেই পুরী নির্ম্মিত হইল। যাহা
হইল তাহাতে কোন অংশে দোষ প্রদর্শন
কাহারও সাধ্য হইবে না। যত সম্পন্ন ও
যত উৎকৃষ্ট অবস্থা কল্পনা করা যাইতে
পারে তাহার কিছুই বিশ্বকৰ্ম্মার স্মনি-

* বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশের ১৫ অধ্যায়।

† মাৎস্য ৫ম অধ্যায়।

পুণ ক্ষম দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পা-
রে না।

.. বিশ্বকৃৎ কখনও ছদ্মবেশ বা কপটতা
অবলম্বন করেন না। তাঁহার আকৃতি
যেমন সরল, প্রকৃতিও সেইরূপ। সুতরাং
তিনি সরলমতি নিরীহপ্রকৃতি কাঞ্চ ও শূ-
পতি গণের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা। স-
কালেই তাঁহাকে আদরের সহিত পূজা ক-
রিয়া থাকে।

হার্মেসের প্রভাবপ্রিয়তা ও খল
প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে এবং তৎসর-
স্বত্তি পরিদর্শন করিলে কাহার মনে ভ-
ক্তির উদয় হইবে? যে দেব আশ্রিতকে
প্রভাবিত ও তাহার সর্বস্বান্ত করিয়া স-
হানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহার সহা-
নুভূতি বিশিষ্ট প্রশস্ত অন্তঃকরণের প্র-
শংসা ইংরেজ ভিন্ন অন্য জাতির নিকট ক-
খনও সম্ভবে না। গ্রীকদিগের মধ্যে অ-

মেকেই তাঁহাকে তাঁহার স্বভাব চপলতা
ও দুর্বৃত্ততা জন্য নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু
ইংলণ্ডীয় রাজনীতি-কুশল সুলেখকগণ
হার্মেসকে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।
আমরা স্বীকার করি, তাঁহাদের এই বর্ণনা
কোন প্রকারে তাঁহাদের মত বিকৃত হয়
নাই। কিন্তু নিরীহপ্রকৃতি দেব বর্জকি,
হার্মেস হইতে সম্পূর্ণ-ভিন্ন-প্রকৃতি-বি-
শিষ্ট।

একগে উল্লিখিত ভূমনা হইতে পাঠক-
গণ এরেশ্, হিফেস্টেস ও হার্মেসের অ-
পেক্ষা ক্ষম, গণপতি এবং ভৃষ্টি। যে কত
ঐত্তম তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।
এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের মত যে নি-
তান্ত ভ্রান্তিযুক্ত ও একদেশদৃষ্ট, তাহাও
সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুতরাং এ প্র-
স্তাবের অ'র বাহুল্য প্রয়োজন নাই।

শ্রীঃ—

প্রভু ও ভৃত্য।

এজগতে বৈষম্যের প্রাচুর্য দেখা
যায়—ধনবৈষম্য, ধর্মবৈষম্য, বিদ্যাবৈ-
ষম্য। এজগৎ বৈষম্যে পরিপূর্ণ। সমাজের
সৃষ্টি অবধি আবহমান কাল পর্যন্ত ইহা
চলিয়া আসিতেছে। আজিও ইহার ভয়া-
নক শক্তি প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। কেহই
কাহারও সমান নহে, আমি তোমাহইতে
পৃথক্, তুমি তাঁহাহইতে পৃথক্ এই ভাবই

বৈষম্যের মূল। সৃষ্টির প্রারম্ভেই 'Might
is Right' অথবা 'জোর যার মুলুক তার'
এই নিষ্ঠুর বিধির প্রচলন হয়। রাম যদি
শ্যামকে এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিতে
পারেন তাহা হইলে রাম প্রভু, শ্যাম
ভৃত্য। রাম আজ্ঞাকর্তা, শ্যাম আজ্ঞা-
পালয়িতা। রাম এই গ্রীষ্মকালের শ্রুত
সুনাশিত সুরমা গৃহে পর্যাক্তে বসিয়া দিন

কাটাইবেন ; শ্যাম ঘন্টাক্ত কলেবরে দুই প্রহর সময়ে মাঠে ঘুরিবে, সন্ধ্যার প্রাকালে আসিয়া আবার রামের আহ্বারের আয়োজন করিয়া দিবে ; রাম পাদোপরি পাদনাস্ত করিয়া স্নেহে উদর পূর্ণ করিবেন । কাহারও পৌষ মাস, কাহারও সৰ্ব্বনাশ । রাম বাবু হইয়া গৃহে বসিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত সামগ্রীর ছড়াছড়ি করিবেন ; আর শ্যাম ? এত খাটিয়াও পরিবারের কথা দূরে থাকুক, নির্বিঘ্নে স্বীয় ভরণ পোষণ করিতেও অক্ষম । ইহাই সমাজের প্রথম বৈষম্য । অর্থাৎ সমাজের প্রথম বৈষম্য বাহুবলজনিত ; যাহার ক্ষমতা আছে সে প্রভু ; যাহার ক্ষমতা নাই সে ভূতা ।

আজি কালি ভূতাব্যবহারবিকল্পে ভয়ানক চীৎকার শুনা যাইতেছে ; কিন্তু বৈষম্যভাব এজগৎ হইতে লুপ্ত হয় নাই । বাহুবলজনিত * বৈষম্যের বিরোধান হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনবৈষম্য, বিদ্যাবৈষম্য, কোন কোন প্রদেশে বা ধর্মবৈষম্য এখনও ভয়ানক প্রবল । পূর্বাপেক্ষা আমরাদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে বটে †,

* প্রজাদিগের মধ্যে বলবৈষম্য কিংবা পরিমাণে দূর হইয়া থাকিলেও রাজাদিগের মধ্যে উহা দূর হয় নাই এবং শীঘ্র যে দূর হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায় ?

† একথা আমরা সকল জাতি সম্বন্ধে বলিতেছি না । আরব ও তাতারদেশীয়দিগের মধ্যে পূর্বে যে রূপ বৈষম্যভাব ছিল

কিন্তু যত দিন সাম্যবিধি এজগতে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত না হয়, ততদিন সমাজের মঙ্গল নাই ।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে এখন যদিও দুই একটি কণা শুনিতে পাওয়া যায়, সমাজের আদি অবস্থায় এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ ন্যায় বা দর্শন কিছুই ছিল না । প্রভুর যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেন ; মারিলে মারিতে পারিতেন কাটিলে কাটিতে পারিতেন, কেহই বারণ করিবার ছিল না । বিশেষ আবার দেশীয় আচার, ব্যবহার, ন্যায়, ধর্ম সকলে মিলিয়া তাঁহার কর্মে স্পষ্ট সম্মতি দান করিত । এই বিধি প্রায় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল । সুতরাং প্রভুদিগের ক্ষমতা অসীম । তাঁহারা আপনাদিগের ইচ্ছামত সকল কার্যই ভূতাদ্বারা সম্পাদন করাইতেন । ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহাও ভূতা করিবে ; প্রভুর পদসেবা আবশ্যক, তাহাও ভূতের কার্য । কোনরূপ ক্রটি হইলে আর রক্ষা নাই, ভূতের যৎপরোনাস্তি শাস্তি আবশ্যক । ক্ষেত্রে যে শস্য জন্মিবে, তাহার সমস্তই প্রভুর ; ভূতা কেবল যৎসামান্য আহাৰ্য্য মাত্র পাইতে পারে ! কোন কোন স্থলে তাহাও পাওয়া দুষ্কর । এই

এখনও সেইরূপ দৃষ্ট হয় ! পূর্ববৎ এখনও তাহারা বনকুটীরে বাস করে, বনের ফল মূলে জীবনধারণ করিয়া থাকে ; সুতরাং তাহাদিগের বর্তমান অবস্থা আদিমাবস্থা হইতে বড় বিভিন্ন নহে ।

রূপে ক্ষেত্রজাত সমস্ত সম্পত্তিই প্রভু মহাশয়ের। আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। আর ভূতেরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় জ্বালাতন হইয়া ক্রমে দরিদ্রভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। একদল ধনী, অপর নির্ধন; একদল ক্রোড়পতি, অপর দল ভিখারী। এইরূপে ধনবৈষম্যের জন্ম। যাহার অগাধ সম্পত্তি, তিনিই জনসমাজে মাননীয়; যাহার ধনসম্পত্তি নাই, তিনি সাধারণো নিন্দিত, ঘৃণিত ও উপহাস্যাম্পদ। আজিও ধন-বৈষম্য প্রায় সর্ব-প্রদেশেই বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ধনীরা নির্ধনদিগকে ঘৃণার সহিত অবলোকন করেন। ভিখারিরা ক্রোড়পতিদিগকে মান্য করিয়া চলেন, সময়ে সময়ে পূজা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ধন-বৈষম্য বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে প্রবল ছিল। ‘ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর দোষ আর কিছুই নাই। ইহলোকে যাহার অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বন্ধুবান্ধবসম্পন্ন প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদ-বাচ্য হইয়া থাকে। ধনই কুলমর্যাদা ও ধর্মবুদ্ধির নিদান। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লোকের শরীর কৃশ হইলে, তাহাকে কৃশ বলা যায় না, যাহার অশ্ব, গো, ভূতা ও অতিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ*।’

সমাজশক্তির অব্যবহিত পরেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা বলবান্

বা ধনবান্ তাঁহারা পৌরহিত্যকর্ম করিতেন। ধর্মসম্বন্ধে সকল ভার তাঁহাদিগের উপর। অন্যের স্বর্গ নরক তাঁহাদিগেরই হস্তে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কাহাকে নরকে ফেলিতে পারেন, কাহাকে বা স্বর্গে তুলিতে পারেন। তাঁহারা সময়ে যুদ্ধকার্য করিতেন, সময়ে আবার ধর্মমন্দিরস্থ দেবতার পুরোহিত সাজিতেন। গ্রীসের পুরাত্তে এরূপ ঘটনার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কালে লোকের ধর্মভয় প্রবল হইয়া উঠিল, ইহকালের সুখের জন্য কেহই আর ব্যতিব্যস্ত নহে। সকলেই পরকাল চায়। পরকালের সুখ, পরকালের শান্তি সকল হৃদয়েই বিরাজমান; কেহ আর সংসারের দিকে তুলিয়াও দৃষ্টিক্ষেপ করে না। এই সকল বড়লোকেরা তখন দেখিলেন, যে বাহুবলজনিত বা ধনজনিত বৈষম্যের আসন্নকাল উপস্থিত; সকলেই বীরবেশ ছাড়িয়া পুরোহিতরূপধারী হইলেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত ধর্মবৈষম্যের স্রষ্টি। যিনি পুরোহিত, তিনিই পূজনীয়, অপরেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তিনি অগ্নাদিগকে ভূতাবৎ আচরণে দিবারাত্র জ্বালাতন করিতেন। ভূতেরা ইচ্ছা থাকিলেও কিছু বলিতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই। ইহকালে ভীষণ অত্যাচার, কঠোর শাস্তি, সাধারণো নিন্দা, আত্মীয় পরিবারের গালাগালি; পরকালে আবার স্বর্গ হ-

* শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ানুবাদিত মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

ইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে । বঙ্গ-দেশে ধর্মবৈষম্য ভয়ানক প্রবল ছিল । ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কুপণ, উহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে । ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র পৌত্র, বন্ধু বান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদয় নিরাপদে অবস্থান করে । ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয় । ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি সাধন করা হয় + । ”

এইরূপে ঐহারা বলবান বা ধনবান, অথবা ঐহারা পৌরহিত্য-কর্মে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা ই সময়ে “বড়লোক” আখ্যা পাইলেন । বড়লোকের সম্ভান বড়লোক ; তিনি মহাপাপ করিলেও বড়লোক ; তিনি বঙ্গহীন ধনহীন হইলেও বড়লোক । তিনি ধর্মের বা পৌরহিত্য কার্যের কিছু না বুঝিলেও বড়লোক । এই স্থলে আর এক প্রকার বৈষম্যের উৎপত্তি — রক্তজনিত বৈষম্য (Ascendancy of noble blood.) অর্থাৎ যদি কেহ বড়লোক হইলেন, তাঁহার বংশধরেরাও বড়লোক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও গণ্যনীয় হইবেন ।

বড়লোকেরা প্রায় পক্ষতাপরি অথবা কোন প্রাচীরবেষ্টিত গ্রামে বাস ক-

+ শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়-
নুবাদিত মহাভারত অনুশাসনপত্র ।

রিতেন । তাঁহাদিগের ভূত্যেরা নগরপ্রান্তে কুটির নির্মাণ করিয়া কায়ক্ৰেশে দিনযাপন করিতেন । গ্রীসের ইতিহাসে ইহারাই পেরোকই (Peroikoi) বা প্রান্তবাসী, বা অনাগরিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । সময়ে সময়ে বিদেশ হইতে লোকজন আসিয়া এই দাসশ্রেণীভুক্ত হইত । অন্য দেশ হইতে যিনিই আসুন না কেন, এই দাসদিগের তিনি বড় প্রিয় পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেন । তাহার বিশেষ কারণ এই যে, দাসেরা প্রভুদিগের অত্যাচারে এরূপ উৎপীড়িত হইত যে, সময়ে সময়ে তাহারা ভাবিত যে যদি কখন কোন জাতি তাহাদিগের সহিত একত্রে মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহাদিগের ক্ষমতা বাড়িতে পারে, এমন কি সময়ে তাহারা অনেকাংশে প্রভুদিগের সমকক্ষ হইলেও হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তখন আর এরূপ যত্নগা থাকিবে না ; অসহ্য অত্যাচারে আর প্রপীড়িত হইতে হইবে না, এবং তাহাদিগের উপর প্রভুদিগের আধিপত্যও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পরিবে । এই ভাবিয়া যে আসিত, এই দাসদল তাহাকেই আশ্রয়দান করিত — কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইত না । যে সকল লোক কোন বিশেষ পাপাচরণের জন্য স্বদেশ হইতে দূরীভূত হইত, অথবা যে সকল জাতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশের মায়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তাহারা এই দাসদলের সহিত এ-

কত্রে মিলিত হইত। মিসরদেশীয় ইস-
রেলাইটিজ্ এবং আটিকার পিলাসজিয়া-
নের। এইরূপ তাড়িত হইয়া বিদেশীয় দাস-
দিগের সহিত যোগ দেয়। এইরূপে দাস
সংখ্যা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল; বলে
ধনে কিছুতেই ভৃত্য আর প্রভু অপেক্ষা
হীন নহে। প্রভুরা আর এক্ষণে তাহা-
দিগের উপর কোন রূপ অত্যাচার করিতে
পারেন না। এই সময় হইতেই ভৃত্যেরা
প্রভুদিগের পরিবারবর্গের মধ্যে গণনীয়
হইতে লাগিল।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে আর এক বৈ-
ষম্য। সে বৈষম্য বিদ্যাজনিত। যাহারা
বিদ্বান্ তাঁহারা ই মহালোক, মূর্খেরা অ-
পর শ্রেণীয়। কিন্তু আজি কালি বিদ্যাজ-
নিত বৈষম্যের ক্রমশঃ লোপ হইতেছে।
দীন, দরিদ্র, রাজা, প্রভা সকলেই লে-
খাপড়া শিখিবার অধিকার আছে, এবং
প্রায় সকলেই শিখিতেছে, সুতরাং বিদ্যা-
জনিত বৈষম্যের শীঘ্রই তীরোভাব হই-
বার সম্ভাবনা। এই বৈষম্যের লোপ হ-
ইলে অনারূপ কোন বৈষম্যের জন্ম হইতে
পারে; কিন্তু পূর্বাপেক্ষা সাম্যবিধির
তত্ত্ব সকলেই অধিকতর যে বুঝিয়াছে ও
বুঝিতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। পূর্বে
যে রূপ অত্যাচার প্রচলিত ছিল এখন তা-
হার অনেক উপশম হইয়াছে; এবং যাহা
আছে, আমাদের দৃঢ় ভরসা, তাহাও সা-
ম্যবিধিপ্রসাদে শীঘ্রই অন্তর্হিত হইবে।
বঙ্গদেশে দাসত্ববিধি প্রচলিত ছিল

বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন। শূদ্রেরা
ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ঘোরতর প্রপীড়িত হ-
ইত, এই কথা বলিয়া অনেকে দুঃখ করিয়া
থাকেন, এবং ব্রাহ্মণেরা যে অতান্ত স্বার্থপর
এই কথা সম্ভ্রমণ করিতে চাহেন, কিন্তু
অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আ-
মাদিগের এদেশকে অনেক সৌভাগ্যশালী
বলিতে হইবে।

সেসিদিমোনিয় যোদ্ধদল দাসদিগকে
তাঁহাদিগের জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়
সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দাস না
হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে কে তাঁহাদের সঙ্গী হইবে?
কে আহারে রন্ধনকারী, শরনে ব্যঞ্জনকারী
হইবে? স্বদেশে বিদেশে কে আজ্ঞাবাহক,
কে আজ্ঞাপালক হইবে? দক্ষিণকশিয়ার
যে অসভ্যজাতি বাস করে, তাহারাও দাস-
প্রিয় *। ক্রীতদাস না হইলে কোন কন্মই
হয় না। দুগ্ধদোহনেও ক্রীতদাস। অন্যান্য
জাতি অপেক্ষা ইহারা ভৃত্যদিগের প্রতি
ঘোরতর অত্যাচার করিতেন; এমন কি
পাছে তাহারা পলায়ন করে, এই ভয়ে তা-
হাদিগকে ক্রয় করিয়াই অন্ধ করিয়া দেওয়া
হইত। পুরাকালে জর্মানজাতীরেরা ধার্মিক-

* আজি কালি আর পূর্ববৎ বৈষম্য
দেখিতে পাওয়া যায় না। কশীয় সম্রা-
টের আজ্ঞানুসারে তথাকার কৃষকদল বহু-
দিন দাক্ষিণ ক্রয় সহ্য করিয়াছিল। এক্ষণ
ওরূপ বৈষম্যভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই
হয়। এইক্ষণে এদেশীয় দাস ও প্রভু প্রায়
একই সোপানারূঢ়।

এগণ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বনমধ্যে কুটীর নির্মাণ করিয়া ফলমূলে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, তাহাদেরও সঙ্গে দাস-গণ দলে দলে বাস করিত। এতদ্ব্যতীত তাহার, করিমু প্রভৃতি যে সকল স্থান বাণিজ্যের জন্য পুরাকালে জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেখানে দাসগণ আলুপটেলের দরে বিক্রীত হইত। পুরাকালের দাস-বিক্রয়ের স্থান বলিয়া আজি পর্য্যন্ত অনেক নগরী পরিচিত। দাসী গর্ভবতী হইলে অথবা দাস একটু গুণবান্ বুদ্ধিমান্ বা বিদ্যাবান্ হইলে দাসস্বামী ক্রেতার নিকট হইতে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিতেন। এই কারণে দাসদিগকে বিদ্যাশিক্ষা, সঙ্গীত-শিক্ষা, রন্ধনশিক্ষা প্রভৃতি নানারূপ অস-ক্ষারে ভূষিত করা হইত, কেননা এরূপ করিলে তাহারা অধিকমূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত এরূপ শিক্ষা দেওয়াতে প্রভুর আর কোন সদভিসন্ধি ছিল না।

কখন কখন প্রদেশ বিশেষে ভ্রম-স্থানদিগকেও দাসরূপে বিক্রয় করা হইত। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই জেতৃগণ অনেক স্থলে বিজিতদিগকে আপনাদিগের ভৃত্যস্বরূপ রাখিত, কখন কখন বিক্রয়ও করিত †। সুন্দর বা বলবান্ বালক, অথবা রূপবতী বালিকা পাইলে তাহাদি-

† ইউরোপীয়দিগের জয়পতাকা যখন আমেরিকায় উড্ডীন হয়, তখনও জেতৃগণ বিজিতদিগকে দাসবৎ আচরণে অহরহঃ ক্রোশিত করিত।

গের আনন্দের সীমা থাকিত না। যখন বাণিজ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়, তখনও মধ্যে মধ্যে দাসপ্রথা কথায় শুনা যাইত। ফলতঃ যেসকল পোতভূম্যাসাগর বা ভারতমহাসাগরের কূলে দিবারাত্র যাতায়াত করিত তাহারাও সুবিধা পাইলে, আমাদিগের ঠগী ডাকাইতের ন্যায়, লোকজন চুরি করিতে ছাড়িত না। কিন্তু শুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় যে, এত অত্যাচারেও কে-হই এই ভয়ানক ভূতাতাবের বিবরণে কোন কথা কহিতেন না। এরিস্ততন্ একস্থলে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রীকেরা প্রভু, রোমীয়েরা ভূত, — কেননা গ্রীকেরা সুশিক্ষিত, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্, রোমীয়েরা অশিক্ষিত, মূর্খ ও নির্বোধ। ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, তিনি দাসত্ববিধির কিছুমাত্র বিরোধী ছিলেন না। তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন যে, দাসেরা সজীব অস্ত্রবিশেষ (Living tool)। সূত্রধর যৈমন্ সূত্রাদি লইয়া আপনার ইচ্ছামত কাষ্ঠ ছেদন বা পরিমাণ করে, প্রভুও তদ্রূপ — ভূতাতাহার স্বকার্য সাধনের অস্ত্র। কর্মকার যেমন সকল কর্মেই তাহার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, প্রভুও দাসকর্তৃক তাহার সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া লয়েন। যাহাই হউক এবিধি রোমীয়দিগের যে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

মিসরদেশে দাসত্ববিধির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রভুরা ইচ্ছা করিলেই ভূতাদিগকে আপনাদিগের কার্যে নিয়োজিত

করিতে পারিতেন । কল, কৌশল, বল, যখন যেটির সুবিধা, তখন প্রভু সেইটির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন । কেহই তাঁহার প্রতিবন্ধক হইত না । অন্ন বস্ত্র দিলেই প্রভু মনে করিতেন, আমি ভূতোর আশা-তিরিক্ত পুরস্কার দিয়াছি । ভূতোরা এক-রূপ ক্রীতদাস । প্রভুর ইচ্ছানুসারে তা-হার বিক্রীত বা পরিবর্তিত হইতে পারিত । প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিলে প্রভু ভূ-তাকে বেত্রাঘাতে শাসন করিতেন । য-খন প্রভুর ক্রোধে পড়িয়া ভূ-তার কোন অঙ্গ বিকল হইত, তখনও প্রভুর একাধি-পত্য । কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলি-বার নাই । ভূতা অকর্মণ্য হইলে প্রভু তা-হাকে দাসত্বভার হইতে মুক্ত করিয়া দি-তেন ; এরূপ মুক্তি দেওয়ার তাঁহার লাভ বাতীত ক্ষতি নাই; অন্ধকে বা খঞ্জকে অন্ন-বস্ত্র দেওয়ার কি উপকার ? বাইবেলের এক-স্থানে (Exodus) উক্ত হইয়াছে, প্রভু বে-ত্রাঘাতে যদি ভূতোর প্রাণ হনন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে ; কিন্তু প্রহারের সময়ে না মরিলে তাঁহার কোন দণ্ড হইবে না, কেন না ভূতা প্রভুরই সম্পত্তি । এরূপ বিধিতে ভূতোর কোন উপকার নাই, প্রভুরও কোন অপ-কার নাই ; কেন না প্রভু কখন ক্রোধ-ভরে ভূতাকে বধ করেন না, বধ করিলে তাঁহারই কার্য্যের ক্ষতি । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিসরদেশে ভূতোর উপর প্রভুর একাধিপত্য ছিল । যাহারা যুদ্ধে

বন্দী, বা যাহারা স্নানপরিশোধে অসমর্থ, যাহারা চৌর্য্যাবসারী, বা যাহারা দাস-তনয়, তাহাদেরই ভূতাভাবে অবস্থান ক-রিতে হইত ।

কিন্তু এই সকল ভূতাসম্বন্ধে একটি সুবিধা ছিল । এক্সোডাসের একবিংশতি অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যদি কোন ভূতা তো-মার আজ্ঞাবাহক হয়, সে ব্যক্তি ছয় বৎ-সরকাল পর্য্যন্ত তোমার অধীন থাকিবেক ; সপ্তমবর্ষে সে আর কাহারও দাস নহে । যদি সে স্ত্রীমহ আসিয়া থাকে, সে স্ত্রীমহ চলিয়া যাইবে, যদি একক আসিয়া থাকে, একাকীই যাইবে ।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক অনুবিধা,— যদি প্রভু তাঁহার সম্বন্ধ দেখিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন, এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে যদি এই ছয় বৎসরকাল মধ্যে ভূতোর কোন অপত্যাদি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে স-ন্তান ও দারাকে পরিত্যাগ করিয়া ভূতাকে একাকী যাইতে হইবে ।

এই ভয়ানক ও নিষ্ঠুর বিধি মৈসরী-দিগের প্রতি যে ঘোরতর অত্যাচারের কা-রণীভূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবি-দিত নাই । যখন মিসররাজ সলোমনের যশপতাকাশ্বরূপ প্রকাণ্ড মন্দির উত্তোলিত হয়, কথিত আছে, তখনও তিনি অহান দেড় লক্ষ দাসকে সেই কর্মে নিয়োজিত করেন । বস্তুতঃ, এদেশে প্রভুরা ভূতা-দিগকে পশুবৎ আচরণ করিতেন ।

স্পেনীয়েরা যখন আমেরিকাতে খনি

আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহারা দেশী-
য়দিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে,
তাহাতেই অনেকের মৃত্যু হয় ।

ফ্রান্স এই নিষ্ঠুর আচরণের আর একটি
দৃষ্টান্তমূল । অষ্টাদশ শতাব্দীতে তথায়
যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, ইতি-
হাস বৈষম্যকেই তাহার কারণ নির্দেশ
করে । পঞ্চদশ লুইর লম্পটতা, বিলাস-
প্রিয়তা প্রভৃতি দুর্কর্মে অপরিমিত অর্থ ব্যয়
হইতে লাগিল । তাহাতে রাজকোষ
শীঘ্র শূন্য হইয়া পড়িল । এক কপর্দকও
মেলা ভার । তখন উপায়? না। দীনদরিদ্রের
প্রতি অত্যাচার, পীড়িতের উপর পীড়ন ।
যে ব্যক্তি সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পরে
কেবল আহাৰ্য্যমাত্র সংগ্রহ করিল, তা-
হাকে উপবাসী রাখিয়া তাহার অর্জিত
ধন রাজার করায়ত্ত হইল । যে সমস্ত দি-
বস ভিক্ষা করিয়া এক কপর্দক অর্জন ক-
রিল, তাহারও নিস্তার নাই । বনে, ছলে,
কলে, কৌশলে দরিদ্রেরা প্রপীড়িত হইতে
লাগিল । তথাপি রাজকোষ শূন্য । আর
ধনীরা? অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া
শিরের উপবিষ্ট । ভাবনা নাই ; চিন্তা
নাই । কৃষকদিগের আগ হইতে রাজ্য
যাহা আহরণ করিলেন, তাহারও অর্ধেক
আত্মসংকটে ধনীরা যত্নশীল । বত জ-
ত্যাচার দরিদ্রদিগের উপর । অস্বীকার ক-
রিলে নিস্তার নাই, গুপ্ততর ও ভীষণ শাস্তি,
কোন কোন স্থলে বা প্রাণবধ । এইরূপে
একদিকে আমোদ ও নিশ্চিন্ততা, অ-

পর দিকে অন্নের জন্য হাহাকার * ।

কিন্তু পৃথিবীর একটি প্রদেশে এরূপ
ভয়ানক দাসবিধি প্রচলিত ছিল না—
একটি দেশে ভূতাদিগের প্রতি ঘোরতর
নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রকাশ করা হইত না ।
অন্যান্য প্রদেশে প্রভু ও ভূতা মধ্যে যে স-
ম্বন্ধ ছিল, একটি দেশে সেরূপ সম্বন্ধ ছিল
না,—সেটি আমাদের ভারতবর্ষ ।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, এ-
দেশে বৈষম্যের জন্ম হয় নাই ; অথবা এ-
খানে একদল প্রভু অপরদল ভূতা ছিল
না । যেখানে সমাজ, সেইখানেই বৈ-
ষম্য, সুতরাং ভারতবর্ষেও যে বৈষম্য ছিল,
তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব । কিন্তু
তাহা হইলেও ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের
মত ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়
নাই । অত্যাচার ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে
ভূতেরা যে অনেকাংশে স্বাধীন ছিল, তা-
হাও স্বীকার করিতে হইবে । পণ্ডিতের
কলকল একস্থলে বলিয়াছেন যে, যে দেশে
শাস্তি অধিক জগ্নো, সেখানে আহাৰ্য্য অতি
মূলভম্বুলো পাওয়া যায় । সুতরাং সে-
স্থলের লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে
থাকে । পূর্বে শত ব্যক্তির মধ্যে যে অর্থ
বিভক্ত হইত, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে
সেই টাকা এক্ষণে সহস্রাংশে ভাগ ক-
রিতে হয়, সুতরাং প্রত্যেকের অংশে পূর্বে

* এই ভীষণ অত্যাচারের ফল শীঘ্রই
ফলিয়াছিল । প্রথম ফোড়ন লুইয়ের সিং-
হাসনচ্যুতি, দ্বিতীয় তাঁহার প্রাণবধ ।

যাহা পড়িত, এক্ষণ তাহা আপেক্ষা নূন পড়িয়া থাকে। কাজেই দরিদ্রদিগের অবস্থা আরও হীনতর হইয়া বৈষম্যভাব প্রবলতর হইতে থাকে। ভারতভূমি শাশালিনী, রত্নগর্ভ, সুতরাং সেখানে বৈষম্য অবশ্যই থাকিলে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই বৈষম্য হইতেই দুইদলের উৎপত্তি, একদল ব্রাহ্মণ, অপর শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা প্রভু, শূদ্রেরা ভৃত্য। ব্রাহ্মণেরা আজ্ঞাকর্তা, শূদ্রেরা আজ্ঞাপালয়িতা।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র যদ্যো যে বিলক্ষণ বৈষম্য ছিল, তাহা মনুসংহিতার স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলম্ভক, ক্ষত্রিয়ের বলম্ভক, বৈশ্যের ধনম্ভক ও শূদ্রের নিন্দাম্ভক নাম করিলে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাবাচক, বৈশ্যের তুষ্টিবাচক ও শূদ্রের দাসবাচক শব্দ ~~করিবে~~ *।

পুনশ্চ প্রথম অধ্যায়ের একনবতি স্লোকে, এক্ষেণ তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কৰ্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুক্রমামনস্বয়য়া ॥

এই কথাদ্বারা দাসত্ব যে শূদ্রদিগের অবলম্বন, ইহা মনু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন। সাধারণ বিধি ব্রাহ্মণদিগের সেবা করা,

* মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য সাং ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং ॥ শব্দবদ ব্রাহ্মণস্য সাদ্রাজ্য রক্ষাসমাদিতং। বৈশ্যস্য পুন্ড্রিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষাসংযুতং ॥ মনু ৩১,২ অ, ৩২ ॥

কিন্তু সুবিধা অভাবে শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারে ২। শূদ্র এরূপ হের জাতি যে, তাহার সমক্ষে বেদ পাঠ করিলেও ব্রাহ্মণকে নরকগামী হইতে হইবে ৩। 'শূদ্র জাতি যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্যদ্বারা আক্ষেপ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাদেহ রূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু পাদরূপ জঘন্য স্থান হইতে উহার জগা হয় ৪'। ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের বিলক্ষণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে ৫। 'তোমা-

২ বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাং। শুক্রমৈব তু শূদ্রস্য ধর্মো নৈঃশ্রেয়সঃ পরঃ। মনু ৯ অ, ৩৩৪ ॥

৩ নানিষ্পষ্টমধীকীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ। ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রাহ্মণীতা পুনঃ স্বপেৎ ॥ মনু ৪ অ ৯৯ ॥

৪ (মনুসংহিতা। কুল্লুকভট্টকৃত টীকা বাঙ্গলানুবাদ সম্বলিতা। কলিকাতা সংস্কৃত কালেন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিতা। পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, যে সকল অনুবাদে উদ্ধৃত চিহ্ন দেওয়া থাকিবেক, তাহা উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত।)

একজাতিব্রিজাতিং শু বাচা দাক্ষণ্যং কিপন্। জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াদেহদং জঘন্যং প্রভবোহি সঃ ॥ মনু ৮ম অ, ২৭০ ॥

৫ মহাসনমভিপ্রেপ্নু কং কৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ। কট্যাং কৃতাক্ষোনির্কাসাঃ স্ফিচ্চৎ

দিগের এই ধর্ম অনুষ্ঠান, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতিকে এইরূপ ধর্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন * ।

শূদ্রগণ এইরূপ দুর্বল হইলেও তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা অন্যান্যজাতিদিগের মত ক্রেশ-বতল ছিল না । তাহারা ইচ্ছা করিলে যাহারই হউক, তাহারই দাস হইতে পারিত । ব্রাহ্মণ বাতীত অন্যান্য বর্ণ যে শূদ্রকে ইচ্ছানুসারে পালন করিতে পারিত, অনেকস্থলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়দ্বারাও তাহাদিগের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল—কেহই প্রতিবন্ধক হইতে পারিতেন না । তাহাদিগের প্রভুরাও তাহাদিগকে ব্যবহার বিকল্প কোনরূপ শাস্তি দিতে, অথবা তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার প্রকাশ করিতে পারিতেন না । ইচ্ছা করিলে শূদ্রও অর্থসঞ্চয় করিতে পারিত । মনুর একস্থলে কথিত আছে যে, অন্যান্য বর্ণেরাও পাপাচরণ করিলে শূদ্রবৎ আচরিত হইত । ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনু লিখিয়াছেন, অনুমতি না লইয়া অন্যের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, ক্ষেত্রজাত ফল ক্ষেত্রস্বামীরই হইবে † ।

বাস্যাবকর্তৃত্বং ॥ মনুসংহিতা ৮ অ ২৮১ ॥

* ধর্মোপদেশঃ দর্পণ বিপ্রাণামস্য কুর্ষতঃ । তপ্তমাসেচয়েতৈলং বন্ধু শ্রোত্রে চ পার্শ্বিণঃ ॥ ৮ অ ২৭২ ॥

† যেক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবা-

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে, ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে শূদ্রের প্রতি যথেষ্টাচারিতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না ।

আর একস্থলে—ভয়প্রদর্শন পূর্বক অন্যের গৃহ, তড়াগ, উদ্যান, বা ক্ষেত্র হরণ করিলে পাঁচশতপণ দণ্ড দিতে হইবে । অজ্ঞানবশতঃ হরণ করিলে কেবল দুইশত পণ লাগিবেক । সীমানিরূপণের গোলযোগ উপস্থিত হইলে রাজা স্বয়ং আসিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন ‡ ।

এই কথা বলিয়া মনু স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচারী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও হইতে পারিতেন না । তাহাদিগকেও শূদ্রদিগের মত নিয়মানুযায়ী কর্ম করিতে হইত । নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতেন ।

রাজাও ইচ্ছা করিলে যথেষ্টাচারী হইতে পারিতেন না । সকল বিষয়েই তাহার প্রাপ্য কর নির্ধারিত ছিল, তাহার অধিক তিনি চাহিতেন না, চাহিলেও পাইতেন না । “ বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য তাহা কতদূর হইতে আনীত পিণঃ । তে বৈ শস্যস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং কচিৎ ॥ মনু, ৬ অ ৪৯ ॥

‡ গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্ । শতানি পঞ্চ দণ্ডাঃ শ্রাদ্ধজ্ঞানদ্বিশতোদমঃ ॥ মনু । ৮ অ, ২৬৪ ॥

সীমারামবিষহারঃ স্বয়ং রাষ্ট্রব ধর্মবিৎ ।
প্রদিশেদু মিমেষেতস্যাপকারাদিতি স্থিতিঃ ॥
মনুসংহিতা ৮ অ, ২৬৫ ॥

পাথের বায় এবং তাহা চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে বায়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যত বায় ধরিয়া তদতিরিক্তে যাহা লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে বাণিজ্যদ্রব্যাদির উপর বণিকদিগের নিকট হইতে রাজ্য কর লইবেন। সর্বতোভাবে বিবেচনা পুরঃসর রাজ্য তাঁহার রাজ্যে কর নিরূপিত করিবেন, যাহাতে উভয়পক্ষ অর্থাৎ নিজে এবং বণিক আপন আপন কার্যের যথার্থ ফললাভ করিতে পারেন। যে প্রকারে জলোকা কথির পান, বৎস দুগ্ধপান ও ভ্রমর মধুপান করে, সেই প্রকারে অল্পে অল্পে রাজ্য বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন, যাহাতে প্রজাদিগের মূলধনের প্রতিকোন ব্যাঘাত না হয়। পশু ও স্তন্যবান সস্কীয় লভ্যের কর পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। ধান্যাংশসম্বন্ধে বিষয়ে কর, ক্ষেত্রের বলাবল বিবেচনায় এবং ভূমি বিশেষে কৃষিকার্যের আবশ্যক পরিশ্রমের হানাদিকা বিবেচনায় ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশের একাংশ রাজ্য লইবেন। রক্ষ, মাংস, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, রক্ষাদির রস, পুষ্পমূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশনির্মিত পাত্র ও মৃণ্ময় পাত্র, প্রস্তুতময় দ্রব্য এই সপ্তদশ প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে, রাজ্য তাহার ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন *। ”

* ক্রয়বিক্রয়মধ্যস্থ ভল্লক সপরি-
বায়ঃ। যোগক্ষেমক সপ্তম্য বণিজো-

এই সকল দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কি রাজ্য কি ব্রাহ্মণ কে-
ই শৃঙ্গের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার ক-
রিতে পারিতেন না। সকলকেই আইনমত
কার্য করিতে হইত। মধ্যযুগের (Middle
"ages") দাসেরা (Slaves) যেরূপ কষ্ট স-
হিত, তাহার তুলনায় আমাদের শৃঙ্গেরা
যে অনেক সুখী ছিল, তাহাতে অণুমাত্র
সংশয় নাই। এদেশে প্রাচীন কালে যতই
কেন বৈষম্য থাকুক না, এক দল প্রভু অপর
দল ভৃত্য হইতেন না, কিন্তু আমরা স্পষ্ট
বলিতে পারি যে, তাঁহাদিগের মধ্যে
হৃদয়বিদারক অত্যাচার কখন প্রচলিত
ছিল না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি-
লাম, যদি কোন দেশে অত্যাচাররূপ
দাপয়েৎ করান্ ॥ মনুসংহিতাঃ ৭ অ,
১২৭ ॥—যথা ফলেন যুজোত রাজ্য
কর্ত্ত্বা চ কর্ম্মণাং। তথাবৈক্ষা মূপোরাষ্ট্রে
কল্পয়েৎ সততং করান্ ॥ ঐ ৭ অ ১২৮ ॥
যথাপ্পাপ্পমদস্তাদ্যং বার্ষ্যাকোবৎ সস্ট-
পদাঃ। তথাপ্পাপ্পো গ্রহীতব্যো রা-
ষ্ট্রোজাজ্ঞাদিকঃ করঃ ॥ ঐ ৭ অ, ১২৯ ॥
পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্য পশুহির-
ণ্যয়োঃ। ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো-
দ্বাদশ এব বা ॥ ৭ অ ১৩০ ॥ আদদীতাত
ষড়্ভাগং ক্রমাৎসমধুসপিষাৎ। গন্ধো-
ষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলম্য চ ॥ ঐ ৭ অ,
১৩১ ॥ পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলম্য চ
চর্ম্মণাং। মৃণ্ময়ানাঞ্চভাণানাং সর্বস্যাম-
য়স্য চ ॥ ঐ ৭ অ, ১৩২ ॥

নিষ্ঠুর বিধি না থাকে, যদি কোন দেশে প্রভু ও ভূতাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ অনাদেশী-দিগের মত না হয়, সেটি আমাদের এই ভারতবর্ষ ।

আমরা আর একপ্রকার প্রভু ভূতের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব ।

আজি কালি স্ত্রী ও পুরুষ মধ্যে ভ্রাতৃ-নক বৈষম্যভাব দৃষ্ট হয় । এভাবে যে পূর্বে ছিল না একথা আমরা বলিতেছি না । কিন্তু প্রাচীন রমণীগণ বর্তমান কামিনীদিগের অপেক্ষা যে সৌভাগ্যালিনী ছিলেন ইহা আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিব । তখন পুরুষ ও স্ত্রী প্রায় একই সোপানারূঢ় ছিলেন । ব্রহ্মা আপন দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে নারী এবং অপরভাগে নর সৃজন করিলেন † । এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক যে সকলের পূজ্যনীরা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি সকলেরই মাননীয়া, তাহা মনু স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন । যেখানে স্ত্রীলোক পূজিত না হয়, সেখানে দেবতারাও প্রসন্ন নহেন । যেখানে স্ত্রীলোক অলঙ্কারে ভূষিত ন হয়, সেখানে কোন মঙ্গল নাই । যেখানে স্ত্রীলোকের মান আছে সেই স্থান যশের আকর ; সেই কুল পবিত্র যেখানে স্ত্রীলোক পূজিতা । যেখানে স্ত্রীলোক অনাদৃত হয়, সেইখানে সকল অমঙ্গল আসিয়া একত্র হয়, ই-

† দ্বিধা কৃত্যনোদেহমর্দেন পুরুষোভবং অর্দ্রেন নারী । মনু ।

তাদি * । এই সকল বাক্যদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাউতেছে যে, পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা অধিকতর আদৃত হইতেন ! কিন্তু তাই বলিয়া যে প্রাচীন কালে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সমান অধিকার ছিল, তাহা কখনই নহে । স্ত্রীলোকদিগকে সকল সময়েই যে পুরুষের বশতায় স্বীকার করিতে হইত, তাহাও মনুর আর একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় । ‘ স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা বৃদ্ধাই হউন, গৃহেতেও কোন কণ্ঠ ভর্তৃপ্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেক না । স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে ও স্বামী মরিয়া গেলে

* পিতৃভিত্তিত্বভিত্তিশৈতন্যঃ পতিভির্দেবৈরনুগা । পূজ্যা ভূষণিত্যাশ্চ ব-
হুকলাগমীপ্সুভিঃ ॥ মনুসংহিতা ৩ অ,
৫৫ ॥ যত্র নারীশ্চ পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দে-
বতাঃ । যত্রৈতান্শ্চ ন পূজ্যন্তে সর্কাস্তত্রাক-
লাঃক্রিয়াঃ ॥ ৩ অ, ৫৬ ॥ শোচন্তি জাময়ো
যত্র বিনশাম্যশ্চ তৎকুলং । ন শোচন্তি
তু যত্রৈতা বর্জ্যতে তচ্ছি সর্কদা ॥ ৩ অ ৫৭ ॥
জাময়ো যানি গোহানি শপশ্চাপ্রতিপু-
জিতাঃ । তানি কৃত্যহতানীব বিনশান্তি-
সমন্ততঃ ॥ ৩ অ, ৫৮ ॥ তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা-
ভূষণচ্ছাদনাশনৈঃ । ভূতিকাটমর্নৈরর্নিজং
সংকারেষু সবেষু চ ॥ ৩ অ, ৫৯ ॥ সন্তুষ্টো
ভার্য্যা ভর্তা ভত্রা ভাৰ্য্যা তথৈব চ । য-
শ্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ
ব্রুং ॥ ৩ অ ৬১ ॥

পুত্রের বশে, পুত্র না থাকিলে স্বামীর স-
পিতৃ, সপিতৃ না থাকিলে স্বাক্ষর বশে
থাকিবেক, স্ত্রীলোক কখন স্বাধীনতা লাভ
করিবেক না । পিতা, স্বামী, পুত্র ইহাদি-
গের হইতে স্ত্রী কখন বিচ্ছিন্ন হইবেক না,
যেহেতু স্ত্রী ইহাদিগের সহিত বিযুক্ত হ-
ইলে পতিকুল, পিতৃকুল, উভয়কুল নিঃশত
হয় * । ' কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন না হই-
লেও যে বর্তমান রমণীদিগের অপেক্ষা
অনেক উচ্চাঙ্গ অধিকার করিয়া ছিলেন,

* বালয়া বা যুবতা বা হস্তয়া বাপি
যোষিতা । ন স্নাতস্ত্রোণ কৰ্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ
কাৰ্য্যং গৃহেষাপি ॥ ৫ম অ, ১৪৭ ॥ বালো
পিতৃকর্মে তিষ্ঠেৎ পানিগ্রাহস্য যৌ-
বনে । পুত্রাণাং ভর্তৃবি প্রেতে ন ভজেৎ
স্ত্রী স্নাতস্ত্রতাং ॥ ৫ম অ, ১৪৮ । পিত্রাভত্ৰা
মুতৈর্ক্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ । এষাং হি
বিরহেণ স্ত্রী গর্হে কুৰ্যাদুভে কুলে ॥ ৫ম
অ, ১৪৯ ॥ .

পুনশ্চ মনুর নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে ।

পিতা রক্ষতি কোমারে ভর্তা রক্ষতি
যৌবনে । রক্ষন্তি স্ত্রাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্না-
তস্ত্রামর্হতি ॥ ৩ ॥ ইমং হি সর্ববর্ণানাং
পুশাস্তো ধর্মমুত্তমঃ । যতন্তে রক্ষিতুং ভা-
র্যাং ভর্তারো দুর্কলা অপি ॥ ৬ ॥

তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি । পূ-
র্বেও পুরুষ প্রভু ছিল, স্ত্রী ভূতা ছিল, এ-
খনও তাহাই ; কিন্তু পূর্বের সমস্ত এখন-
কার সমস্ত হইতে অনেক পৃথক । একগে-
মে সমস্ত ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে ।
পুরুষেরা সর্বসর্ব স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের
দাসী বলিলেই হয় । সাম্যবিধি প্রচারিত
না হইলে সকল প্রকার বৈষম্য এজগৎ হ-
ইতে লুপ্ত হইবে না । যত দিন তাহা না
হয়, তত দিন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র, স্ত্রী এবং
পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত-
মান থাকিবেই থাকিবে । তত দিন ব্রাহ্মণ
শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিবে, পুরুষ
স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে । যত দিন
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
এবিধি প্রচলিত না হয়, তত দিন এদগ্গ জ-
গতের মঙ্গল নাই । তত দিন পরম্প-
রের মধ্যে ভাতৃভাব আমরা দেখিতে পা-
ইব না । তত দিন ছোট বড় জ্ঞান তি-
রোহিত হইবে না । †

শ্রীমঃ—

† এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত অনেক
বিষয়েই আমাদের মতের একতা নাই ।
সাম্য ও বৈষম্য বিষয়ে আমাদের যাহা
বক্তব্য আছে, আমরা কোন সময়ে অন্য
এক প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিব । সং—

জানকীর অগ্নিপরীক্ষা ।

চরিতাখ্যায়কের নয়নে দর্শন করিলে জানকীর সমগ্র জীবনই অগ্নিপরীক্ষা । কৌমাারে ধনুর্ভঙ্গপণ, যৌবনে বনবাসে পতির অনুগমন, অশোকবনে চেড়ীদিগের উৎপীড়ন, অযোধ্যায় রামকৃত নির্বাসন এবং তপোবনে পুত্রকৃত স্বামীর নিধনশ্রবণ এই সমুদয়ই সেই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় । কিন্তু এতদ্বিন্ন একটি বিশেষ ঘটনা শব্দতঃ জানকীর অগ্নিপরীক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে । রাবণ নিহত হইলে যখন জানকীর উদ্ধারসাধন হয়, তখন বহুকাল পরগৃহে বাসজন্ম তাহার সতীত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তন্নিরাকরণার্থই এই পরীক্ষা স্থগীত হইয়াছিল । রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, জানকী অুলদগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তন্মধ্যস্থিতে অক্ষতশরীরে বহির্গতা হইলেন । এই পরীক্ষায় বিজয়লাভই তাহার অক্ষুদ্রসতীত্বের নিঃশংস প্রমাণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পৌরাণিকের নয়নে ইহা ঐশ্বরিক ব্যাপার, অথবা অতিমানুষিক ঘটনা ; পক্ষান্তরে ঐহাদিগের পৌরাণিক ইতিহাসে আত্মা অম্প ; তাহার বলেন যে, ইহা কল্পনার অত্যশ্চর্য্য সৃষ্টি বটে, কিন্তু বস্তুতঃ কবির অতিবর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে । পৌরাণিকদিগকে নমস্কার করিয়া

আমরা দূরে অনস্থান করিতেছি । তাহাদিগকে মর্ম্মস্পর্শী কোন কথা বলা আদ্যদিগের অভিপ্রায় নহে । আমরাও বিশ্বাস করি জানকী সতীত্বের আদর্শ, জানকী পরমা সতী । ঐশ্বরিক ব্যাপার কিংবা কবির অতিবর্ণনা না বলিয়া এই ঘটনা অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয় কি না, বিজ্ঞান এই দুর্নোধ্যবিষয়মধ্যে কোন আলোক প্রদান করে কি না, এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব । আমরা পাঠকবর্গকে অদ্য এই ঘটনার যে ব্যাখ্যা উপহার দিতেছি, তাহাই যে উহার অত্রান্ত ব্যাখ্যা আমরা একরূপ বলি না ; পক্ষান্তরে ঐ ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞান ও সদ্যুক্তির অনুমোদিত তাহাতেও আদ্যদিগের সন্দেহ নাই ।

অগ্নিপরীক্ষা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে । পুরাকালে অন্যান্য দেশেও ইহা প্রচলিত ছিল । সফোক্লিসের এটিগোন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীকেরা কখন কখন অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগের দোষ প্রকাশন করিত । উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে, ক্রিসন এক ব্যক্তির নামে অপবাদ করাতে সে লোহিততপ্ত লৌহ হস্তে ধারণ করিয়া, এবং অগ্নির উপর দিয়া গমন করিয়া আপনাকে নির্দোষী প্রমাণ

করিতে প্রস্তুত ছিল। ইংলণ্ডের এডোয়ার্ডের মাতা রানী এমার সহিত উইন্ডেস্টেরের ধর্ম্যধাক্ক অল্টইনের আত্মীয়তা থাকা বশতঃ সাধারণো তাঁহার সতীত্বের উপর সন্দেহান হয়। রানী এমা লোহিততপ্ত লৌহখণ্ডের উপর দিয়া অক্ষতপদে গমন করিয়া স্বীয় কলঙ্ক দূর করেন*। সিম্প্লিসিয়স্ অটন নগরের ধর্ম্যধাক্ক হওয়ার পরেও স্ত্রীর সহিত এক ভবনে বাস করিতেন। এই জন্ত লোকে তাঁহাকে ভোগ-বিলাসী বলিয়া ঘৃণা করিত। কথিত আছে সিম্প্লিসিয়স্-জায়া বহুজনসমন্বিত তপ্ত অঙ্গার বস্ত্রে ও বক্ষে ধারণ করেন। তাঁহার বস্ত্র অদগ্ধ ও শরীর অক্ষত থাকে। পরে সিম্প্লিসিয়স্ স্বয়ংও ঐরূপ করেন। ইহাতে সর্বসাধারণ তাঁহাদিগকে ভোগ-স্পর্শ-শূন্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করে। এই ঘটনা খ্রীষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল*। পঞ্চম শতাব্দীতে আবার সেন্ট ব্রাইস্ ঐরূপে আপন কলঙ্ক প্রক্ষালন করেন†।

মধ্যযুগে ইউরোপে অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, অন্য কোথাও তদ্রূপ ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্য, কাশ্যাপন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপ্রণোদকেরা অগ্নিপরীক্ষার বিধি করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে অগ্নিপরীক্ষা কেবল পূর্বকালে

* মোসিমের ধর্ম ইতিহাস ২য় খণ্ড।

† ঐ ঐ

প্রচলিত ছিল এমন নহে; ইংরেজাদিকারের পরেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পরীক্ষা হইত। ১৭৮৩ খঃ অব্দে কাশীর প্রধান নিচারক আলি ইব্রাহিম খাঁ দুইটি অগ্নিপরীক্ষার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন‡। তৎকালে নয় প্রকার পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। নিম্নলিখিত নিবরণ তাঁহারই বর্ণনা অনুসারে লিখিত। ১—পরীক্ষার্থী এক দিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিবে। পরে যজ্ঞাস্ত্রে তাহাকে তোলে মাপা হইবে। দোষবাচক একখণ্ড কাগজ তাহার মস্তকে বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্রপাঠান্তর তাহাকে পুনরায় মাপা হইবে, তাহাতে তাহার ভার পূর্বাপেক্ষা অধিক হইলে সে দোষী, এবং হ্রান হইলে সে নির্দোষী সাব্যস্ত হয়; সমান হইলে পুনরায় মাপিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার যোগী বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা পুস্তকে বলেন যে, তৃতীয়বারে অবশ্যই হ্রানাদিক্য হইবে। ২—নয় হস্ত দীর্ঘ, দুই বিতস্তি পরিসর এবং এক বিতস্তি গভীর একটি খাত করিয়া তাহা পিঙ্গল কাষ্ঠের অগ্নিতারা পূর্ণ করিতে হয়। পরে পরীক্ষার্থী নগ্নপদে উহার উপর দিয়া গমন করে। পদ ক্ষত হইলে দোষী এবং অক্ষত থাকিলে নির্দোষী সাব্যস্ত হয়। ৩—নাভীজলে দণ্ডায়মান হইয়া পরীক্ষার্থী ডুব দিয়া একজন ব্রাহ্মণের পদধারণ করিয়া থাকিবে। একটি দৃবনিকিণ্ড তাঁর আনয়ন পর্য্যন্ত ডুব দিয়া থাকিতে পারিলে নি-

‡ এসিয়াটিক রিচার্চ ১ম খণ্ড।

দোষী ; অনাথা দোষী । ৪—আট রত্তি মাখনের সহিত আড়াই রত্তি বিষনাগ ব্রা-ক্ষণহস্তে ভক্ষণ করিতে হয়, ইহাতে প-রীক্ষার্থীর যদি কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহা হইলে সে নির্দোষী । বিষপরীক্ষা অন্য এক প্রকারেও গৃহীত হইয়া থাকে । তা-ওমধ্যে একটি সর্প রাখিয়া তদ্বাধ্য একটি মুদ্রা কিংবা অঙ্গুরীয়ক ফেলিয়া দেওয়া হ-ইত । উহা তুলিয়া লইতে সর্প যদি প-রীক্ষার্থীকে দংশন না করে তাহা হইলে সে নির্দোষী । ৫—শালগ্রাম ধোরাইয়া সেই জল পরীক্ষার্থী পান করিলে যদি দুই সপ্তাহের মধ্যে কোন পীড়া না হয় তাহা হইলে সে নির্দোষী । ৬—শাল-গ্রাম ওজন করিয়া তুল লইতে হইবে । সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে সেই তুল চর্ষণ ক-রিতে দিতে হইবে । যাহার মুখ হইতে শুষ্ক সরস তুল বহির্গত হইবে সেই দোষী । ৭—তপ্ত তৈলে হস্ত প্রদান ক-রিলে যদি অক্ষত থাকে, তাহা হইলে নি-র্দোষী প্রমাণ হয় । ৮—তপ্ত লৌহকন্দুক কিংবা তীরাগ্রস্পর্শে হস্ত অক্ষত থাকিলে সে নির্দোষী । ৯—ধর্মের এবং অধর্মের দুইটি মূর্তি করিয়া জলভাণ্ডে নিক্ষেপ ক-রিতে হয় । পরীক্ষার্থী যদি ধর্মের মূর্তি উত্তোলন করে তাহা হইলে সে নির্দোষী । এই নয়টি পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয়, সপ্তম এবং অষ্টম এই তিনটি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে গণ্য হইতে পারে । আলি ইব্রাহিম খাঁ সপ্তম এবং অষ্টম প্রকারের দুইটি পরীক্ষা

স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন । সপ্তম প্রকা-রের পরীক্ষায় তপ্ততৈলে পরীক্ষার্থীর হস্তদগ্ধ হইয়া যায় এবং সে দোষী সাব্যস্ত হয় । অষ্টম প্রকারের পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী লোহিততপ্ত লৌহকন্দুক অ-ক্ষত হস্তে ধারণ করিয়া নির্দোষী সাব্যস্ত হয় । আলি ইব্রাহিম খাঁ এই পরীক্ষার্থী-দ্বয়কে নিবারণ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু তাহার কোন প্রকারেই তাহার কথায় স-ম্মত হয় না । লৌহকন্দুকধারী হস্তে সাতটি অশ্বপত্র ও সাতটি দুর্কা দিয়ালইয়াছিল ।

যদিও এখন দোষ প্রমাণ কিংবা প্র-ক্ষালন জন্য একরূপ পরীক্ষা প্রচলিত নাই, তথাপি এই শ্রেণীর ঘটনা মধ্যে মধ্যে দেখা যায় । বোধ হয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ লোহিততপ্ত কোদালের উপর সঠি-লপদ স্পর্শ করাইয়া সেই পদদ্বারা রো-গীকে ঝাড়িতে দেখিয়া থাকিবেন । এই-রূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে । বাহুল্য ~~করে~~ তৎসমুদয় ত্যাগ করিয়া আমরা এক্ষণে মূল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে যত্নশীল হইব ।

দক্ষণ লৌহ বা রৌপ্যফলক তপ্ত ক-রিয়া তদুপরি কএক বিন্দু জল নিক্ষেপ করিলে উহা ফলকের তাপানুসারে শীঘ্র বা গোঁগে লুকাইয়া যায় ; অর্থাৎ ফলক যত তপ্ত, তত অল্প সময়ে জলবিন্দু বা-ষ্পাকারে পরিণত হয় । কিন্তু একটি নি-র্দিষ্ট তাপদেখা অতিক্রম করিলে আর এ-রূপ ঘটে না । জলের পক্ষে এই নির্দিষ্ট

রেখা তাপমান যন্ত্রের ১৫০ ডিগ্রি *। ১৫০ ডিগ্রি কি ততোধিক তপ্ত ফলকোপরি কতিপয় কবোক্ষ জলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে উহা সহসা বাষ্পাকারে পরিণত না হইয়া নলিনীদলগত জলবৎ ইত্যন্তঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং প্রায়শঃই জলবিন্দুর পাশ্বে কুঞ্চিত দৃষ্ট হয়। তরল পদার্থের এই অবস্থা গোলকম্প অবস্থা নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলক খানিকে

* এই প্রবন্ধে তাপ নির্দেশ সময়ে তাপমান যন্ত্রের শতকীয় বিভাগ (Centigrade scale) ব্যবহৃত হইয়াছে। তাপমানের এই রূপ বিভাগ করিতে নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ তাপমান যন্ত্র গলৎ বরফের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে পারদ যে স্থানে নামিয়া স্থির হয় তাহা চিহ্নিত করিতে হয়। পরে স্ফুটজ্বলের বাষ্পে নিমগ্ন করিলে পারদ যেস্থানে উঠিয়া স্থির হয় তাহাও চিহ্নিত করিতে হয়। এই দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে শতাংশে বিভক্ত করিতে হয় এবং নিম্ন হইতে ০, ১, ২, ৩, ... ৯৮, ৯৯, ১০০ চিহ্নের সংজ্ঞা দিতে হয়। ১০০ র উর্দ্ধে ঐরূপ সমান অংশ করিয়া ১০১, ১০২, ১০৩ ইত্যাদি চিহ্ন দিতে হয় এবং ০র নীচে ঐরূপ সমান অংশ করিয়া—১,—২,—৩ ইত্যাদি চিহ্ন দিতে হয়। সুতরাং—৩৯ ডিগ্রি বলিলে শূন্য ডিগ্রির ৩৯ ডিগ্রি নিম্নতাপ অর্থাৎ যে তাপে বরফ গলিতে থাকে তাহার ৩৯ ডিগ্রি কম তাপ বুঝায়।

ক্রমে শীতল হইতে দিলে যখন তাহার তাপ ১৫০ ডিগ্রির ন্যূন হয়, তখন সহসা শব্দ করিয়া গোলকম্প জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। অনেক কাল হইতে এই বিষয়টি বিদিত ছিল, কিন্তু শতাধিক বর্ষ হইল লীডনফোর্ড প্রথম উহার গুটানুসন্ধান করেন। সম্প্রতি বুটিনী এতৎসম্বন্ধীয় অনেক গুটতত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন। বুটিনীই ‘গোলকম্প অবস্থা’ এই সংজ্ঞা প্রথম ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ সমুদয় তরল পদার্থই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এযাবৎ জল, সুরাসার, ইথর, তরল গন্ধকীয় অম্ল, তরল যবক্ষারীয় অম্লজান, সোডিয়াম গন্ধক ও যাবক্ষারিক অম্ল এই কএকটি তরল পদার্থটারাই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া গিয়াছে†। সুরাসার দিয়া এই পরীক্ষা করিতে হইলে ফলকের তাপ ১০৪ ডিগ্রি কিংবা তদুর্দ্ধ হওয়া আবশ্যক, ইথরের পক্ষে কেবল ৬১ ডিগ্রি হইলেই হয়।

যে তাপে কোন তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে সে তাপকে সেই পদার্থের স্ফুটন তাপ কহে। পরীক্ষাকালে তাপমানযন্ত্র দ্বারা গোলকম্প তরলের তাপ নিরূপণ করিলে দেখা যায় উহার তৎকালীন তাপ

† আমরা ইংরেজী অস্ ও ইকের পার্থক্য বাঙ্গলায় ঐয় এবং ইক দ্বারা নির্দেশ করিব। যথা সালফিউরিক এসিড গন্ধকীয় অম্ল; সালফিউরস্ এসিড গন্ধকীয় অম্ল।

ক্ষুণ্ণতাপ অপেক্ষা হীন । এতদ্বিষয়ে বুটিনীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ।
পদার্থের বিপরীতে প্রথমতঃ ক্ষুণ্ণ-
তাপ ও তৎপরে গোলকম্পাবস্থার তাপ
লিখিত হইল ।

জল.....১০০ ডিগ্রি ৯৫ ডিগ্রি

সুরাসার ৭৮.....৭৫ "

ইথর.....৩৭.....৩৪ "

গন্ধকীয় অম্ল... ১০.....১১ "

এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বুটিনী
কএকটি আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়জনক প-
রীক্ষা সম্পাদন করিয়াছেন । গন্ধকীয়
অম্ল—১০ ডিগ্রির নীচে এবং যাবক্ষারীয়
অম্ল—৭০ ডিগ্রির নীচে তরল অবস্থায়
থাকে এবং তদুর্দ্ধ তাপে বাষ্পাকার ধারণ
করে । লোহিততপ্ত ক্ষুদ্র রৌপ্য পাত্রে
যদি কএক বিন্দু তরল গন্ধকীয় অম্ল নি-
ক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে উহা গোল-
কম্পাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বুটিনীর পরী-
ক্ষানুসারে উহার তাপ—১১ ডিগ্রি থাকে,
জল ০ ডিগ্রির নীচেই অদ্রব বরফে প-
রিণত হয় । অতএব যদি ঐ লোহিততপ্ত
পাত্রে তরল গন্ধকীয় অম্লের উপরে কএক
বিন্দু জল নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে
জলের তেজঃক্ষয় হইয়া উহা বরফে প-
রিণত হয় * । বুটিনী এই প্রকারে পারদ-

* আমরা Heat হীট এবং Temperature
টেম্পারেচার এই দুইয়ের পার্থক্য রক্ষার জন্য
বান্ধালায় তেজ ও তাপ এই দুইটী শব্দ নির্দেশ
করিব । জীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও

কেও অদ্রবাবস্থ করিয়াছেন ।—৩৯ ডি-
গ্রির নীচে পারদ অদ্রব অবস্থা ধারণ
করে । গোলকম্প তরল যবক্ষারীয় অ-
ম্লের তাপ—৭০ ডিগ্রির নীচে থাকে,
অতএব তদুপরি কএক বিন্দু পারদ নি-

এই দুই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন । কিন্তু
অধুনাতন বিজ্ঞানলেখকদিগের মধ্যে জীযুক্ত
কানাইলাল দে রায় বাহাদুর এবং জীযুক্ত
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই দুইয়ের পা-
র্থক্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উভয়
স্থলেই তাপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ।
হীটকে তাপ বলিয়া থারমমিটারকে তাপ-
মান বলা যে কতদূর অসঙ্গত তাহা যাহারা
বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা মাত্র পাঠ করি-
য়াছেন তাহারাও বুঝিবেন । ইহারা কি
হীট এবং টেম্পারেচারের পার্থক্য স্বীকার
করেন না ? না কেলরিমিটার এবং থার্মমি-
টার উভয়ই ইহাদিগের নিকট এক পদার্থ ।
হীটকে তাপ বলিলে এই কেলরিমিটার-
কেই তাপমান বলা উচিত । বান্ধালায়
বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ইহা-
দিগের এক এক জনের উদাসীনতা
আরও বিস্ময়কর ; ইহারা সমস্ত পুস্তকে
হীটকে তাপ বলিয়া শেষে স্পেসিফিক
হীটকে আপেক্ষিক তেজ নাম দিতে
কুণ্ঠিত হন নাই । আমরা হীটকে তেজ,
টেম্পারেচারকে তাপ, থারমমিটারকে তা-
পমান, কেলরিমিটারকে তেজোমান এবং
স্পেসিফিক হীটকে আপেক্ষিক তেজ
বলিব ।

ক্ষেপ করিলে উহার তেজঃক্ষয় হইয়া উহা অদ্রব্যবস্থ হয়। ফেরাতে এই পরীক্ষাটি প্রকারান্তরে সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি তরল যবক্ষারীর অম্লের পরিবর্তে ইথর এবং অদ্রব আঙ্গারিক অম্লের ব্যবহার করিয়াছেন।

তরল পদার্থের এই গোলকম্প অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি? সামান্যতঃ একটি উষ্ণ এবং একটি শীতল পদার্থ একত্র করিলে উভয়ের তাপসামঞ্জস্য হয়, অর্থাৎ উষ্ণ পদার্থ কিঞ্চিৎ শীতল ও শীতল পদার্থ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া উভয়েরই এক তাপ হয়। আবার তেজের তাপ রুদ্ধি যেরূপ একটি কার্য, অবস্থা পরিবর্তন করাও সেইরূপ আর একটি কার্য, অর্থাৎ তাপরুদ্ধি হইতে যেরূপ তেজঃক্ষয় হয়, অদ্রব পদার্থকে তরল, কিংবা তরল পদার্থকে বাষ্প করিতেও সেইরূপ তেজঃক্ষয় হয়। গোলকম্প অবস্থার পরীক্ষা সমূহে তেজ, ফলক ও তরলের তাপসামঞ্জস্য করিবার পূর্বেই তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্পমণ্ডলে গোলকম্প তরল পদার্থ ভাসমান থাকে অর্থাৎ তরল পদার্থ লোহিতোষ্ণ ফলককে স্পর্শ করে না বাষ্প উহাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধান থাকা বশতঃই তাপসামঞ্জস্য শীঘ্র হইতে পারে না। ফলক ক্রমে ক্রমে শীতল হইলে আর পর্যাপ্ত বাষ্প উৎপাদ হয় না। তখন তরল পদার্থ ফলক স্পর্শ করে এবং স্পর্শমাত্রই তাপসামঞ্জস্য ক-

রিতে লোহিততপ্ত পাত্রের তেজঃ তরল পদার্থকে এককালে বাষ্পাকারে পরিণত করে।

গোলকম্প তরল পদার্থ ও লোহিততপ্ত ফলক যে পরস্পর স্পর্শ করে না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ফলক খানি ঠিক সমান করিয়া বসাইয়া যদি কএক বিন্দু জল তাহার উপরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে জল কোন দিকে গড়াইয়া পড়ে না। উপর হইতে একটি তার জলসংলগ্ন করিয়া ধরিলে জল স্থির থাকিবে। এখন ফলক ও জলের মধ্য দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অপর পার্শ্বস্থ দীপশিখা দেখা যাইবে। জল কালী দ্বারা কাল করিয়া দিলে পরীক্ষাটি আরও স্পষ্ট হয়। তাড়িতালোক সাহায্যে পটে এই পরীক্ষার ছায়া নিক্ষেপ করিলে ফলক ও জলের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। নিম্নতল হইতে অতিমাত্রায় বাষ্প উৎপাদ হওয়াতেই এই ব্যবধান থাকে এবং এই কারণেই গোলকম্প তরল স্থির না থাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। চার্চ সাহেব ভিন্ন প্রকারের গুটিকত পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যবধান সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ সমস্তের একটির মাত্র আমরা এখানে উল্লেখ করিব। রোপ্য সোডিয়ম-গন্ধক-সংলগ্ন হইলে রোপ্য-গন্ধক প্রস্তুত হয় এবং তজ্জন্য রোপ্য একটি কাল দাগ পড়ে। চার্চ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, রোপ্যপাত্র লোহিততপ্ত করিয়া তদুপরি

সোডিয়ম-গন্ধক নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ উই। গোলকম্প অবস্থায় থাকে ততক্ষণ রৌপ্যপাত্রে কোন দাগ লাগে না ।

অতি তপ্ত ধাতু এবং তরল পদার্থ যে পরস্পর সংলগ্ন হয় না, তাহা আরও অন্যান্য উদাহরণদ্বারা দেখান যায় । যদি প্লাটিনমনির্মিত একটি কন্ডুক লোহিততপ্ত করিয়া জলপাত্রে নিমজ্জিত করা যায় তাহা হইলে জলরাশি উহার পার্শ্ব হইতে অপসৃত হয় এবং প্লাটিনম কন্ডুকটি বাষ্পমণ্ডলে আবৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্যান্ত লোহিততপ্তই থাকে ; পরে যখন জনকে বাষ্পে পরিণত করিতে উহার এত তেজঃক্ষয় হয় যে, উহার তাপ ১৫০ ডিগ্রির ন্যূন হইয়া যায়, তখন অন্যান্য সংলগ্ন হইয়া জল কুটিতে থাকে এবং প্রভূত বাষ্পরাশি উদ্গাত হয় । আরও একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । পটাসিয়ম জলে নিক্ষেপ করিলে জলজ্বান ও পটাস প্রস্তুত হয় । জলজ্বান জ্বলিতে থাকে এবং তজ্জন্ম এত অধিক তাপ হয় যে, পটাস জলসংলগ্ন না হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে । জলসংলগ্ন হইলে ভারবশতঃ ডুবিয়া যাইত ।

গলিত সীসকের মধ্যে অথবা গলিত সোহের মধ্যেও কিরূপে হস্ত দেওয়া যাইতে পারে তাহা উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহ বুঝিয়া থাকিলে, সহজেই প্রতিপন্ন হইবে ।*

* সীসকের গলনতাপ ৩৩৫ ডিগ্রি, সোহের ১৫০০ ডিগ্রি ।

হস্ত আর্জবস্ত্রে মুছিয়া পরে গলিত ধাতুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে হয় । অতি তাপজন্য হস্তের জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া হস্তকে ধাতুসংলগ্ন হইতে দেয় না । এই জন্যই হস্ত অক্ষত থাকে । কিন্তু তপ্ত জলে হস্ত দিলে জলসংলগ্ন হওয়াতে দগ্ধ হইয়া যায় ।

একণে দেখা যাউক অগ্নিপরীক্ষা বিখ্যাস করা যায় কি না ? হইতে পারে মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডার পুরাকাল অপেক্ষা একণে প্রশস্ততর হইয়াছে । কিন্তু ইহাও কি সম্ভবপর নহে যে পুরাকালে যে সমস্ত বিস্ময় লোকবিদিত ছিল তাহার মধ্যে দুই চারিটি আমরা জানি না । সম্ভবতঃ এমন কোন পদার্থ পুরাকালে বিদিত ছিল যাহা শরীরে মর্দন করিয়া কিংবা মাখিয়া গেলে তাহার বাষ্প শরীরকে অগ্নিসংলগ্ন হইতে দেয় না । অতএব দেখা যাইতেছে বাষ্পাবধানে অগ্নিপরীক্ষার সুন্দর ব্যাখ্যা রহিয়াছে । আর একটি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তারের উপসংহার করিব ।

সংপ্রতি সুইডেন দেশবাসীরা কাপ্তান আলফ্রেম এক নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন । উহা পরিধান করিয়া স্বচ্ছন্দে অগ্নিমধ্যে অর্জবটী বা তদৃদ্ধ কাল কর্তন করা যায় । সিলিসিয়া নগরে এই পরিচ্ছদের যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে আলফ্রেম, স্বয়ং জ্বলদগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন । চারি সূপ কাষ্ঠ অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠিল । তিনি অনাগ্রাসে অগ্নিশিখার মধ্যে ভ্রমণ

করিতে লাগিলেন কখনও বা কোন জ্বলৎ কাঠখণ্ডের উপর বসিতে লাগিলেন। পর দিবস নিকটস্থ অজারখনির মধ্য পুনরায় এই পরিচ্ছদের পরীক্ষা করা হয়। খনির এক পাশ্বে গ্যাসপূর্ণ করিয়া অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্ করা হয়। একজন ভ্রমলোক স্বেচ্ছাক্রমে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খনিমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং গ্যাসে অগ্নি প্রদান করা হইল। তিনি ২০ মিনিট কাল এই জ্বলৎ গ্যাস মধ্য বিনা কষ্টে থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। আলষ্ট্রম্ এই পরিচ্ছদ প্রসিয়া-ধিপের নিকটে ৫০,০০০ মার্ক মূল্যে বিক্রয়

করিয়াছেন। বিজ্ঞানের কোন নিগূঢ় স্ত্র অবলম্বন করিয়া তিনি এই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। পরিচ্ছদের মূলভাস্ত্রে উহা অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছে। আমরা উপরে বিজ্ঞানের যে একটি তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছি তাহা এবং এই অগ্নিপরিচ্ছদের মূলতত্ত্ব এক কি না বলিতে পারি না। যদি এক না হয় তাহা হইলে জ্ঞানকীর এই ভুবনবিস্তৃত, প্রসিদ্ধ অগ্নিপরিষ্কার আরও একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল—

নিন্দুকের এত নিন্দা কেন ?

এদেশের এক প্রাচীন নীতি-প্রবন্ধ এইরূপ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সকল ভার সহিতে পারেন, নিন্দুকের ভার সহিতে পারেন না। নিন্দুক পর্বত ও সমুদ্র হইতেও দুর্লভ। আবার সকল নীতি-প্রবন্ধকার শিরোমণি মহামনা সেকপিরও নিন্দুকের নিন্দাচ্ছলে অতিমর্য়স্পর্শি বাক্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

“যে আমার ধনরাশি অপহরণ করে, সে আমার কিছুই অপহরণ করে না। উহা অবস্থমধ্যে পরিগণনীয়। উহা আমার ছিল, এইক্ষণ তাহার হইল, এবং পুঙ্কলও উহা সহস্র সহস্র লোকের ভোগে আ-

সিয়াছিল। কিন্তু যে আমি হইতে আমার সুনামটি অপহরণ করে, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমার প্রকৃতিই দরিদ্র করে।”

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজে সকলেই নিন্দুকের উপর খড়াহস্ত; সকলেই নিন্দুককে হৃদয়ের সহিত যুগা করেন। নিন্দুকের জিহ্বার নাম বিষ, নিন্দুকের সাহচর্যের নাম নরক, নিন্দুকের কথোপকথনের নাম ভাষার কলঙ্ক। ইহা কেন? নিন্দা যদি এমনই এক মহাপাতক, তবে এপাণে কে না লিপ্ত? মনুষ্যনিবাসে কে না পরের নিন্দা করে?

ঐহারা বরোরুদ্ধ, বহুদর্শী, তাঁহারা নবামাত্রকেই হিতাহিতবিবেচনাশূন্য, অ-
স্থিরস্বভাব ও উদ্ধত বলিয়া নিন্দা ক-
রেন ;—ঐহারা নবা, তাঁহারাও রুদ্ধদি-
গকে নিষ্ক্রিয়, নিকদাম, অনুরাগশূন্য ও
ক্ষতিলাভ-গণনা-তৎপর বলিয়া নিন্দা ক-
রিতে ভালবাসেন । যেখানে পাঁচটি
প্রাচীনা গৃহিণী একত্র উপবিষ্ট হন, সে-
খানে কেবলই নবীনাদিগের নিন্দা,—ন-
বীনা ফুলবধূরা, বিলাসিনী, বস্ত্রাভরণপ্রিয়া
অলস, লজ্জাহীন, অকর্মণ্য কেবলই এই
আলাপ । আবার যেখানে পাঁচটি স-
ভাভাভিমানিনী নবীনা দৈবযোগে আ-
সিয়া একত্র হন, সেখানেও শুধু প্রাচীনা-
দিগেরই নিন্দাবাদ ।

কি বিচিত্র ! ঐহারা স্বয়ং যার-
পর নাই নিন্দনীয়, তাঁহারাও পরনিন্দায়
বিমুখ নহেন । কোন প্রাচীনা কোন্দলে
এত অনুরক্ত যে, আর কাহাকেও না পা-
ইলে, তিনি বাগানের রুদ্ধ লতার সহিতও
প্রতিদিন কিছুক্ষণ বিবাদ করিয়া থাকেন ।
তাঁহার আশ্ফালনে, হুঙ্কারে, ওর্ডজনে ও গ-
র্জনে, তাঁহার জকুঞ্জে, বাহুতাড়নে
দন্তে দন্তঘর্ষণে, ও চক্ষুদ্বয়ের বিকট আব-
র্তনে বালক বালিকার কথা দূরে থাকুক,
পশু-পক্ষীও ভ্রাহিরবে পলাইয়া যায় ।
তাঁহার গগণ-বিদারী স্বর্ঘর চীৎকারে গ্রা-
মের কুকুর গুলিও ভয়ে চমকিয়া উঠে ।
অথচ তিনি তাঁহার ভাতার পুত্রবধূটিকে,
সর্বদাই মুখরা বলিয়া তিরস্কার করেন,—

আধুনিক যুবতীরা লেখাপড়া শিক্ষিয়া অ-
শিষ্ট হইতেছে এই ভাবিয়া সর্বদা দুঃখিত
রহেন । এদিগে ক্ষীরদা ছয় মাস হ-
ইল ক'খ ছাড়িয়া নাম আর পত্র লি-
খিতে অভ্যাস করিতেছেন ; তিনি পায়ে
একটুকু আলতা মাখিয়া, হাতে একখানি
শিশুশিক্ষা লইয়া, স্বস্ত্র ননান্দ প্রভৃতি
গুরুজনদিগকে মুখ ও অসভ্য বলেন, এবং
তাঁহাদিগের শাস্ত্রালাপবর্জিত কাব্যকথা-
শূন্য, কথোপকথন হইতে দূরে রহিতে
পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা
করেন ।

এই প্রকার পরম্পর নিন্দা সর্বত্রই
প্রচলিত । যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তির
কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিনিপুণ ব্যক্তি-
দিগকে প্রায়ই সেই এক অনির্বচনীয় মা-
নুসাসিক স্বরে পাঁপী ও নাস্তিক বলিয়া
নিন্দা করেন ; ইহারাও পক্ষান্তরে অতি
উদারস্বভাব, বিশুদ্ধচরিত্র ও স্নেহার্জচিত্র
যাজকদিগকেও কপট, ভণ্ড, বকতপন্থী ও
বিশ্ববিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন ।

যেমন প্রভুদিগের মধ্যে ভৃত্যের নিন্দা,
ভৃত্যদিগের মধ্যেও সর্বদাই সেইরূপ প্রভু-
নিন্দা । যত্নর প্রভু বড় কপণ, বড় শঠ ।
তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের প্রতি আগে
নানারূপ সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, কিন্তু
বেতন দিবার সময়ে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে
নানাবিধ কৌশলে বঞ্চনা করিতে যত্নপর
হন । রামেশ্বরের প্রভু পিণ্ডাচের নিক-
টই প্রথম বয়সে পাঠ লইয়া থাকিবেন ।

নহিলে তাঁহার কথা কহিবার রীতি এমন কদর্য কেন যে, শুনিলে ইতরলোকেও লজ্জা অনুভব করে। রমেশের প্রভু কাক কি কোকিল ইহাই সন্দেহের বিষয়। তাঁহার চক্ষু কোকিল-চক্ষুর ন্যায়, সকল সময়েই আরক্ত ; তাঁহার কণ্ঠধনি কাককণ্ঠনিঃসৃত কঠোরধনি হইতেও অধিকতর অতিপীড়ক। মাধব বলে যে, তাঁহার প্রভু এক আশ্চর্য্য বীর। তিনি ঘরের বাজির হইলে সর্বদাই মার্জ্জারভীত মুষিকের ন্যায় ভয়ে জড়সড় থাকেন ; কিন্তু যেই স্বর্গছে প্র-তাগত হন, অমনি ইহাকে পদাঘাত করেন, উহাকে কটু কথা বলেন, এবং আর কাহারও কিছু না পারিলেও মাধবকে আর মাধবের কর্তী ঠাকুরাণীকে অবশ্যই কিঞ্চিৎ বচনগ্রন্থা উপহার দেন। প্রভু-চরিত্রের এইরূপ আলোচনা কোথায় না ক্ষত হয় ?

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত যত বিষয়ে আলাপ হয়, তাঁহার প্রধান এক ভাগই নিন্দা। দুখানি জিহ্বা আর চারিটি কণ্ঠ একখানে হইলেই একজন না একজনের নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে এই বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির পণ্ডিতেরা যেমন দ্বিপাদ, ত্রিভুজ, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন, মনুষ্য জাতিকে নিন্দুকসংজ্ঞা দিলেও দর্শনশাস্ত্রানুসারে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

আর একপ্রকারে দেখিতে গেলে

নিন্দা অপরিহার্য্য। তুমি এই সংসারে যে কোন কার্য্যে লিপ্ত হও, তাহাতেই তোমাকে অল্প কি অধিক পরিমাণে নিন্দুক হইতে হইবে। যাহারা ধর্ম্ম সংস্কারক, কি কোন বিশেষ মতের প্রচারক, তাঁহারা সকলেই নিন্দুকের অগ্রগণ্য। সম্প্রদায় বিশেষের নিগ্রহ বিনা সাম্প্রদায়িক বিজয়পতাকা কোন দেশে উড্ডীন হয় নাই। লোকে লুখরের কতই না প্রশংসা করে। কিন্তু বিচারতঃ তাঁহার প্রধান প্রশংসা এই যে, পোপ এবং পোপের শিষ্যবর্গকে নিন্দা করিবার সময়ে তিনি একাই একমহত্ব জিহ্বা এবং সহস্রাধিক ভেদীর কার্য্য করিতেন। ক্যাথলিকগণ যেখানে তাঁহার এক গুণ নিন্দা করিতেন, তিনি সেখানে অযুতগুণে তাঁহাদিগের নিন্দা করিয়া ঋণপরিশোধে যত্ন পাইতেন। এইরূপ ঐতিহাসিক, এইরূপ চরিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতিবেত্তা এবং এইরূপ সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক ও সাহিত্য সমালোচক। কেহ লোকান্তরবাসী রাজা ও রাজমহিষী এবং মৃত গ্রন্থকারদিগকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহাদিগের উপর নিদাক্ষণ কণাঘাত করিতেছেন ;—কেহ জীবিত রাজপুরুষ, জীবিত গ্রন্থকার অথবা অন্য কোন শ্রেণির জীবিত প্রধান ব্যক্তিদিগকে ক্রীড়া পুতলের মত নিজীব বিবেচনায় যথেষ্ট গালি দিতেছেন। অধিক আর কি, কম্পনা মাত্র যাহাদিগের সম্বল সেই কবিগণও অতি ক্ষম্ম কোশলে

লোকের নিন্দা করিয়া জগতে নিন্দার সাধ-
কতা দেখাইতেছেন । যখন সকলেই এই
প্রকার কাহারও না কাহারও নিন্দা করিতে
বাধ্য হইতেছেন, বল তবে নিন্দকের আর
নিন্দা করিব কেন ?

এই প্রশ্নটি প্রথমে যত সহজ বোধ হয়,
বস্তুতঃ তত সহজ নহে । ইহার প্রত্যুত্তরে
অনেক কুট কথার আন্দোলন হইতে
পারে । আমরা তথাপি সহজপথ অব-
লম্বন করিতেই চেষ্টা করিব ।

আমাদিগের বিবেচনার স্তুতি ও নিন্দা
উভয়েরই সীমারেখা সত্য । সত্যকে উ-
ল্লেখ্যন করিয়া স্তুতি করিবে না, এবং সত্য
উল্লেখ্যন করিয়া কখনও কাহারও নিন্দাও
করিবে না । কিন্তু যদিও এক মাত্র স-
তাই এই উভয়ের শেষ সীমা, কিন্তু এক
মাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতেই উভয়ের প্রবর্তনা
নহে । মনুষ্য প্রণয়ের অধীন হইয়া প্রিয়-
জনের স্তুতিবাদ করিতে পারে, ভক্তিরসে
বিগলিত হইয়া ভক্তিভাজনের গুণানুবাদ
করিতে পারে । তাদৃশ স্থলে সত্যের
মর্যাদা রক্ষা হইলেই হইল । আমরা ত-
খন স্তুতি ও গুণানুবাদের প্রয়োজন ও অ-
প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না ।
উদ্বলহৃদয় অন্যদীর হৃদয়ের প্রতি প্রধা-
বিত হইলে, তাহাতে সংসারের সুখসমষ্টির
হ্রাস হয় না, বরং বৃদ্ধি হয় । কিন্তু
বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বিবেক ও ক-
র্তব্যবুদ্ধির শাসনে মনুষ্য মনুষ্যের নিন্দা
করিতে অধিকারী নহে । নিন্দা গরল ;

চিকিৎসক যেমন শুধু ঔষধার্থেই গরল
ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা
করিতে পারেন না, যাহারা বিশেষ কোন
মনুষ্য কি বিশেষ কোন সমাজের উপকার
করিতে চাহেন, তাহারাও শুদ্ধ সেই এক
প্রয়োজনেই নিন্দার ব্যবহার করিতে পা-
রেন, উহা লইয়া খেলা করিতে তাহাদি-
গের অধিকার নাই । তাহাদিগের কথা
কেবল সত্য হইলেই হইবে না, কিন্তু যে
কথা তাহারা বলিতেছেন তাহাতে প্রয়ো-
জন এবং ন্যায়পরতার শাসনও আছে
কি না, তাহাও প্রগাঢ় দৃষ্টিতে দর্শন ক-
রিতে হইবে । যাহারা নিন্দুক বলিয়া প-
রিচিত, সাধারণ্যে তাহাদিগের যে এত
নিন্দা ইহাই তাহার এক প্রধান হেতু ।
তবে নিন্দারও প্রকার আছে, প্রকৃতি
আছে, এবং যেখানে উহার অন্তর্ভুলে
বিবেক নাই, সেখানে অন্য কোন গুঢ় কা-
রণ আছে । কেহ অজুত নিন্দুক, কেহ
অজুত নিন্দুক, কেহ বা রবাজুত নিন্দুক ।
নিন্দুককে কি পরিমাণে নিন্দা করিতে হ-
ইবে, তাহা অবগারণ করিবার পূর্বে সেই
প্রকার, প্রকৃতি ও কারণের প্রতি দৃষ্টি
করা আবশ্যক ।

নিন্দার এক কারণ সহানুভূতির অ-
ভাব । যাহার সহিত তোমার মতে মিলে
না, হৃদয়ে মিলে না, তুমি তাহার নিন্দা
কর এবং সেও তোমার নিন্দা করে । তা-
হার আত্মা তোমার নিকট এক গভীর
অন্ধকার কূপ, তোমার আত্মাও তাহার

নিকট এক গভীর-অন্ধকার-কূপ। দুইয়েই দুইয়ের বহিরাবরণ মাত্র দেখিয়া থাক, এবং শুদ্ধ বহিরাবরণ দেখ বলিয়াই দুইয়ে দুইয়ের সম্বন্ধে একে আর এক অর্থ কর। সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর নিন্দা এই শ্রেণির, যাহাদিগের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য নিতান্ত রূহৎ, তাহাদিগের পরস্পর নিন্দাও এই শ্রেণির, এবং রক্ত ও যুবজনে যে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে তাহাও প্রধানতঃ এই শ্রেণির। রক্ত যুবার প্রতাপ ও প্রমত্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না—সে কেন হাসে, সে কেন কান্দে, সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হয়, কি হুঃখে হুনিয়া পড়ে, তিনি কোন দিন বুঝিয়া থাকিলেও এখন আর তাহা বুঝেন না। আবার, যুবজনেরা রক্তের শীতসঙ্কুচিত ঘনীভূত প্রাণের মর্মস্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা এক পা অগ্রসর হইবার পূর্বে কেন শতবার চিন্তা করেন, তাহা তাঁহাদিগের তরল বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। সহানুভূতির অভাবে কিরূপে নিন্দার স্রুতি হয়, আমরা তাহার প্রকার মাত্র দেখাইয়া দিলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তির ইহা হইতেই বহুবিধ কথার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিবেন। সহানুভূতির অভাবমূলক নিন্দা কথঞ্চিৎ সহনীয়। কারণ ইহার অভ্যস্তরে খলতার ভাগ অন্তর্গত। ইহা অনাহুত হইলেও ক্ষমাযোগ্য।

নিন্দার আর এক কারণ শক্তির অভাব অথবা অক্ষমতা। অশক্তি ও অধম

ব্যক্তির আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তিদিগের নিকটে পৌঁছিতে পারে না,—তাঁহারা চিন্তার যে গ্রামে অবস্থান করেন, কল্পনার সহায়তায় যেখানে উদ্ভট রহেন, সেখানে উঠিতে সামর্থ্য পায় না এবং সুতরাং তাঁহারা কেন কি করেন, তাহা ইহাদিগের নিকট কার্য ও কার্যের শৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। তাঁহাদিগের অতি সুন্দর কার্যও ইহাদিগের নিকট সুন্দর দেখায় না। ইহারা এই নিমিত্তই রূপাপাত। পৃথিবীর এক অসাধারণ পুরুষ মরণমুহূর্ত্তেও এই শ্রেণির নিন্দুক ও অত্যাচারীদিগকে আশীর্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন।

আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে, যাহারা শক্তির অভাব কি ন্যূনতাহেতু নিন্দুক, তাহাদিগের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রথমতঃ যত কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না, উহা পাবকতুল্য। তৃণরাশি কখনও উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তৃণ আপনিই দগ্ধ হইয়া যায়। শক্তি ও অশক্তিতে, আলোকে ও অন্ধকারে, জ্ঞানে ও অজ্ঞতায়, এবং পুরুষে ও অপুরুষে যেখানে নিরোধ হইয়াছে, ইতিহাসে সেখানেই এই কথা জ্বলদগ্ধরে লিখিত রহিয়াছে।

নিন্দার তৃতীয় কারণ অতৃপ্ত ক্রোধ। ক্রোধ জিহ্বাসার অপক ফল। কাহারও সম্বন্ধে মনে ক্রোধ জন্মিলে স্বভাবতই তা-

হার অনিষ্ট সংসাধনে প্ররতি উন্মোহিত । যে-
খানে সে প্ররতি পরিতৃপ্ত হয়, সেখান-
কর পরিণাম অনুতাপ অথবা দয়া ; যে-
খানে উহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সে-
খানকার পরিণাম নিন্দাবাদ । যদি কা-
হারও আচারে কি ব্যবহারে অথবা কোন
কথার আমাদিগের অভিমান আহত হয়
এবং সেই আহত অভিমান, আহত স-
র্পের ন্যায়, তাহাকে ফিরিয়া দংশন ক-
রিতে না পারে, তাহা হইলেই আমরা
সেই ব্যক্তির নিন্দা করিয়া থাকি । এই
প্রবন্ধে নিন্দার যে সকল উদাহরণ দেওয়া
হইয়াছে, তাহার অনেকটাই এই শ্রেণীতে
স্থান পাইবে । আর, সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন
ব্যক্তির যে হীনাবস্থা ব্যক্তিগণকর্তৃক অ-
নেক সময়ে নিন্দিত হইয়া থাকেন, তাহা-
রও কারণ এই বলিতে হইবে । নীতি-নি-
পুণ পণ্ডিতেরা এই জন্যই উপদেশ করি-
য়াছেন যে, কাহারও অভিমানে অকারণে
আঘাত করিও না, কাহারও ক্রোধাঘি-
তেও বিনা প্রয়োজনে যত্নাঘাত দিও না ।
ইহা ন্যায়ের চক্ষে অসহ্য, ইহা দয়ার চক্ষে
নিষ্ঠুরের কার্য, ইহা বুদ্ধির চক্ষে অশুভকর ।
যাহারা আহত হইয়া নিন্দা করে, তাহা-
রাই আহত নিন্দুক ।

নিন্দার চতুর্থ কারণ জাতীয় বিদ্বেষ ।
ইহার অভ্যন্তরে সহানুভূতির অভাব আছে,
অজ্ঞতা আছে, এবং তদতিরিক্ত বিদ্বেষ
আছে । ইহাও আহত মনোই পরিগণনীয় ।
এই বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়াই ফ-

রাশি প্রশ্লীষানের সর্বোচ্চ কালিয়া দে-
খেন, এবং ইহারই প্রণোদনায় প্রশ্লীষার
পরমধার্মিক ব্যক্তিও ফরাশির নিন্দাবাদে
জিহ্বাকে কলুষিত করেন । ইহার আরও
অনেক দৃষ্টান্ত অঙ্গুলিনির্দেশ সহকারে
প্রদর্শন করিতে পারি । কিন্তু চক্ষুস্থানের
জন্য তাহা অনাবশ্যক ।

নিন্দার পঞ্চম ও শেষ কারণ পরজীকা-
তরতা । ইহাকে স্বজীকাতরতা বলিলেও তা-
হার গুরুতর দোষ ঘটে না । কেননা ইহা
স্বজাতি ও পরজাতির মধ্যে স্বজাতীয় ও
সম্বন্ধিত প্রতিবেশীকেই বিশেষতঃ লক্ষ্য
করে, এবং বলিব কি—ইহা দূরসম্পর্কিত
অপেক্ষা নিকট সম্পর্কিতকে, যথার্থ পর
অপেক্ষা স্বকৃত পর, আপনার জনকেই বরং
অধিকতর স্পর্শ করে । নিন্দার অন্য অন্য
কারণ সম্বন্ধে যে কোন কথাই কেন বল না,
বোধ হয় যুক্তির কোনরূপ আকুলনেই
পরজীকাতরতামূলক জন্য নিন্দাবাদের
পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইবে না । যাহারা
পরজীকাতরতার বিষমজ্বালার দগ্ধ হইয়া
স্বদেশীয় কি স্বজাতীয় উন্নত ব্যক্তিদিগের
অনর্থক নিন্দা করে, যেখানে অমৃতের প্র-
ত্যাশা সেখানে গরল ঢালিয়া দেয়, সম্মুখে
স্তুতিবাদ করিয়া পুরোক্ষে আঘাত করিতে
থাকে, তাহারা যেমন ধল-স্বভাব তেমনই
ক্ষুদ্রপ্রাণ । যদি নিন্দুক শব্দের কিছুমাত্র
অর্থ থাকে, তবে ইহারাই সেই নিন্দুক ।
ইহার জ্যোৎস্না দেখিলেই চক্ষু মুদিয়া
রহে, এবং সমস্ত দিনও যদি ইহার প্রফুল

কুসুমকাননে পরিচারণ করে, তথাপি ই-
হারা করে কতিপয় কটেকমাত্র লইয়াই গৃহে
প্রত্যাগত হয়। ইহারাই প্রকৃত রবাহূত নি-
ন্দুক। অভ্যাসই ইহাদিগের চক্ষু অপরাধ
এবং উন্নতিই ইহাদিগের চক্ষু পাপ।—
ইহারা অভিমানশূন্য,—কারণ, যেখানে
অভিমান আছে, সেখানে বিনা আঘাতে
পরকীয় সমৃদ্ধিতে কাতরতা হয় না। ইহারা
কাপুরুষ;—কারণ যেখানে পৌরুষ ভেজ-
স্বিতার কনিকা মাত্রও বিদ্যমান থাকে,

সেখানে অনাদীয় শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ-
রাশিতে আনন্দ বই কখনও ঈর্ষা ও অত-
র্দাহ জন্মে না।

মনুষ্যসমাজে অদ্যাপি নিন্দায় কর্তব্য-
বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত
হয় নাই। বিবেকের বশবর্তী হইয়াই মনুষ্য
মনুষ্যের নিন্দা করে না। যে দিন তাহা হ-
ইবে, সে দিন এই পৃথিবীতেই স্বর্গের দূর-
শ্রুত দুন্দুভিনাদ শ্রুত হইবে। সে দিন মনুষ্য
সমাজের অর্ধেক দুঃখভার কমিয়া যাইবে।

এই কি সেই অযোধ্যা ?

১

চির আশা ছিল মনে—

দেখিতে অযোধ্যা, যার কীত্তির পতাকা
উড়িয়াছে সূর্য্যবংশ-প্রশংসা-পবনে ;—
ভারতদর্পণে আজো রহিয়াছে আঁকা।
পুরাত্নে যার নাম করেছি অবন;—
ক্ষত্রিয়-গৌরবে ভরা শোভার বাজার—

এই কি সে রাজপুর ?

বিক্রমে বিশাল, শূর—

—সূর্য্যবংশ অবতংশ ইক্ষ্বাকু রাজার ?

এই কি সে প্রকৃতির বিলাস ভবন ?

ছিল একদিন হিন্দু-সুখের সদন ?

২

এই কি সে স্রোতস্বতী

সরযু,—শোভিত যার বিমল মলিলে
পুরাঙ্গনা-মুখ-পদ্ম প্রকাশিত-জ্যোতিঃ

ঈষৎ হুলিয়ে সুখে প্রদোষ অনিলে ?

এই কি পবিত্রা নদী অযোধ্যার মাঝে ;

সুরতরঙ্গিনী যথা স্বর্গে মন্দাকিনী ?

কল কল রব উঠে

হৃদয়ে তরঙ্গ ছুটে

রজতের ধারা যেন সুন্দর বিরাজে।

মাগর উদ্দেশে দ্রুত ধায় প্রবাহিনী।

কলস্বরে নিরন্তর অচল-মন্দিরী !

৩

এতদিন যার মূলে—

করিনাম সলিল সিঞ্চন প্রাণপণে,

সেই আশা-লতা যদি শোভিল মুকুলে,

অমনি কি হোল শেষ নিশার স্বপনে ?

হায় ! এ কি ইতিহাসে বর্ণনাই সার ?

কবির কল্পনা, সে কি আকাশ কুসুমে,

সত্যের স্রবশ দিয়া

মিথ্যা রাখে সাজাইয়া
লুঠে লয় ভাবুকের হৃদয় ভাণ্ডার ।
উথলয় ভান কুপ মিছাধামধূমে ;
অবশেষে, মানুষে কি ফেলায় দিগ্ভ্রমে?

৪

এই কি অযোধ্যাপুরী—
বহে সমীরণ যার যশের সৌরভ
কত দেশে কতস্থানে সাগর উত্তরি
জাগাইয়া ভারতের নিদ্রিত গৌরব ?
এই কি সে অনুপম সুখের আগার ?
ভারতে অলকা সম এই সে নগরী ?
আমি যাছা শুনে কানে
আইলাম প্রাণপণে
কই তার চিহ্ন কিছু নাহি দেখি আর ।
কে নাশিল শোভা তব ভারতসুন্দরি !
কত্রিয় কুলের গর্ব নইলেক হরি ?

৫

কোথা বীররাজ সব
সমরে অটল, সূর্য্যবংশের ভূষণ
মাক্কাভাদি মূপচয় কত্রিয় গৌরব ?
রাবণ-বিজেতা রাম কোথায় এখন ?
দাম্পত্য-প্রণয়-সুখে হইয়া নিরাশ
চিরদিন শোকানলে হৃদয় দহিয়া
যেই রঘুকুল-কেতু
লোকের সম্ভাষণ হেতু
প্রেমসী মহিষী-ধনে দিলা বনবাস —
অকাতরে সীতালোক অন্তরে সহিয়া ;
প্রকৃতিরঞ্জন-ব্রতে জীবন অর্পিয়া ?

৬

অযোধ্যার অলঙ্কার—

কোথা দাশরথি এবে দয়ার সাগর ?
এর প্রতি আজ তব করুণা সঞ্চার
হয় নাকি, রঘুকুল-গৌরব-আকর ?
পরের দেখিয়া সুখ আনন্দে ভাসিতে—
করিয়াছ প্রাণপণে প্রজার মঙ্গল ।

দেখিলে অন্যের দুখ
ফাটিয়া যাইত বুক,
আজ কেন চিত্ত তব না হয় চঞ্চল ?
ভাসে তব রাজপুরী দুর্দশার স্রোতে ।
কেমনে রয়েছ রাম, ধৈর্য্য ধরি চিতে ?

৭

হায় ! কেন দেখিলাম—
তোমারে নগরি ! হেরি বিদরে হৃদয় ।
নয়ন ভাসিয়া ধারা বহে অবিরাম ;
পূর্ব্বের সৌভাগ্য মনে হইলে উদয় !
আহা ! আর্ধ্যভূমি মাঝে শোভার মদন,
আনন্দের সরোবর সুখের আগার ;
পবিত্র পুণ্যের ভূমি ;
বীরপ্রসবিনী ভূমি ।
হইত যশের গান ভারতে তোমার !
ছিলে তুমি আর্ধ্যবংশ উজ্জলি তখন ।
তোমার সে ছবি হায় ! কোথায় এখন ?

৮

কোথা সে সুন্দর বেশ ?
সুদৃঢ় সুরম্য হর্য্য পরশি গগন
বিরাজিত দেহ তব সাজারে অশেষ !
ছিলে তুমি সুবিমল সুখের ভবন !
পরিপাটি রাজবাটী ; সজ্জিত তোরণ
নিরন্তর সুশোভিত কুমুম-শয্যায় ;
রমণীয় উপবনে

• বিহঙ্গ বিহঙ্গী সনে

সুশ্বরে করিত গান বসিয়া বাসায়।

অমৃতের বরিষণে জুড়াত শ্রবণ !

সুখের সে দিন তব গিয়াছে এখন !

৯

কিছুই নাহিক আর !

আছে মাত্র চিহ্ন তার বাড়াইতে দুখ,

ভারতের ভাগ্যে ঘোর যাতনা অপার।

হিন্দুকুলে প্রতিকূল বিধাতা বিমুখ।

অটল-অটল-সম রম্য হর্ম্যমালা,

ভাঙ্গিয়া পড়েছে যেন প্রলয়ের ঝড়ে !

নিবিড়কণ্টকী লতা ;

পূরিয়া রয়েছে তথা।

ভুজঙ্গের বাসা আজি তাহার ভিতরে !

ধিক বিধি বুঝিতে না পারি তব লীলা।

কাহারে ইন্দ্র পদ, কার হাতে খোলা !

১০

কোথা সে অমরাবতী—

—অযোধ্যা নগরী মর্ত্যে ; এবে ভয়প্রায়।

সিংহপুরে শৃগালের রাজত্ব সম্প্রতি ?

গগন-পরশি সৌধ শোভা নাহি পায়,

প্রফুল্ল কমল তুল্য গবাক্ষের দ্বারে

শোভেনা সুন্দরী কুল, নয়ন উজ্জ্বল,

মদন-হিম্মোলে তুলি

কটাক্ষে সকল তুলি

নলিনীর বনমাঝে পুলক অন্তরে—

শোভিত যেরূপে আছা ! নৃপতি চঞ্চল,

বসেনা সেরূপে আর পুরনারীদল !

১১

একদিন এইস্থানে—

—এই রাজপুরে—এই উন্নত প্রাসাদে—

রমুকুল নরপতি সুপ্রশস্ত মনে—

সুনিধি স্থাপন হেতু বাদ অনুবাদে

রত থাকিতেন নিজ পারিষদ লয়ে।

এখন শার্দূল বুক ভীষণ মুরতি—

সহচরী সহ বাস—

করিতেছে বারমাস—

কৃতৃহলে লয়ে নিজ সম্মান সম্মতি।

বিচরণ করে সদা নিঃশব্দ হইরে ॥

১২

এই বিশ্রাম ভবনে—

রাজকার্য অবসানে লভি অবসর,

আসিতেন নরনাথ আরাম কারণে—

অকৃত্রিম প্রণয়ের বাড়িতে আদর—

বিরলে মহিষীসহ আনন্দ অন্তরে।

হায় হায় ! কব কায় দুঃখের কাহিনী।

এহেন সুখের স্থানে,

এবে বন্য জন্তুগণে

পরস্পর নিরন্তর কোলাহল করে।

বীণার বিনোদতান আর নাহি শুনি।

শিবাসব করে রব, দিবস যামিনী !

১৩

ভারত-উজ্জ্বলা এই

অযোধ্যা নগরী আছা ছিল একদিন !

জ্যোতিঃ হীন এবে, হায় ! কিছুমাত্র নেই

পড়িয়া পরের করে হয়েছে জ্বীহীন !

হায় রে দুঃখের ভার সহনীয় নয়

কেমনে বহিবে তবে ; ধিকরে বিধিরে।

কিবলি ব হায় হায় !

দেখে বুক ফেটে যায়।

বানরে খেলেছে সুখে ভানুর মন্দিরে ? *
ধিক্ হে সহস্রকর রুখা তেজোময়,
তব কুলে একলক্ষ একি প্রাণে সয় ?

১৪

এই কি অযোধ্যা সেই ?

তবে কেন চিত্তে ঘোর যাতনা বাড়ায় ?
নাশিতে সন্তাপ হেথা কিছুই কি নেই ?
সকলি কি কাল সহ হয়েছে বিলয় ?
ধিক্‌রে ভারত বাসি, ধিক্ তোমা সবে ।
হুয়াত্মা যবন আসি তোমা সবাংকার

অতুল বিভব কাড়ি

লইল দুর্দশা করি ;

* সূর্য্যবংশীয় হৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত
সূর্য্য দেবের মন্দির এক্ষণে নিবিড় অরণ্যে
পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয় ।

রাজত্ব তেজিয়া শেষে দাসত্ব স্বীকার ?
আর কত কাল সবে অপমান সবে ?
একলক্ষ ভারতের কতদিন হবে ?

১৫

হে অযোধ্যা একা নয় ।

তোমার দুর্দশা ; ঘোর দুঃখের অনলে
জ্বলিয়াছে আর্ষ্যভূমি সুখের আলয় ।
ভাসিছে ভারত লক্ষ্মী নয়নের জলে !
ঘোরতর নাগ পাশে স্রুত বন্ধনে ।
জননী স্নেহময় সন্তান সকল

পড়িয়া মায়ের বুকে

কাঁদিতেছে অধোমুখে,

অরাভাবে শীর্ণতনু গায় নাহি বল ।

ঈশ্বরের জীব তাই বাঁচাতে জীবনে

দাসত্বে উদর পালে অন্যের চরণে ! শ্রীয—

প্রকৃতি ও পশু পক্ষীর সংস্কার ।

মনুষ্য প্রবল বুদ্ধিবলে, বহুযত্নে এবং
অতিপরিশ্রমে বিজ্ঞান এবং গণিত মন্থন
করিয়া যে সমস্ত সত্য উদ্ধার করিয়াছে,
পশুপক্ষীর সংস্কারবলে দৈনিক কার্য-
ব্যবহারে তৎসমুদয়ে কিরূপ আশ্চর্য্য অ-
ভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা চিত্রা
করিলে বিস্ময়রূপে আধুত হইতে হয় ।
পশুপক্ষীর গ্যালিলিওর অগাধমত্বে মেধাও
যাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয় না, মক্ষি-
কূরা প্রতিদিন সেই বিজ্ঞানসূত্র কার্য্যে প-
রিণত করে, এবং মধুমক্ষিকারা চক্র নির্মাণে

যে অপূর্ণ কৌশল প্রকাশ করে, গণিতগুরু
নিউটন্ সমস্ত জীবনের অশেষ পরিশ্রমেও
তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পা-
রেন না। পশুপক্ষীর সংস্কারগত কা-
র্য্যপ্রণালীতে মনুষ্যের আয়াসলব্ধ বিজ্ঞান
এবং গণিত সম্বন্ধীয় জ্ঞান কতদূর লক্ষিত
হয়, এবং তাহাদের শরীরসংস্থানে প্রকৃতির
কিরূপ আশ্চর্য্য কৌশল ও নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়,
তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই কোতু-
হল জন্মে । সেই কোতুহল পরিতর্পনার্থেই
আমরা এই অবস্থে পশুপক্ষীর শরীর সং-

স্থানের এবং তাহাদের সংস্কারগত কার্য-
প্রণালীর কএকটি উদাহরণ প্রদান করিব।

নির্দিষ্ট স্থান মধ্যে যদি সমান এবং একবিধ কুঠরী সমূহ নির্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে স্থান স্থান নষ্ট না করিয়া ত্রিবিধ আকারের কুঠরী হইতে পারে। প্রথম সমবাহু ত্রিভুজ, দ্বিতীয় সমবাহু চতুর্ভুজ এবং তৃতীয় সমবাহু ষড়্ভুজ। অন্যবিধ আকারের কুঠরী নির্মাণ করিলে যে মধ্যে মধ্যে স্থান স্থান নষ্ট হয় তাহা গণিত সাহায্যে অনায়াসে প্রমাণ করা যায়। আবার এই ত্রিবিধ আকারের মধ্যে সমবাহু ষড়্ভুজই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কারণ ইহার কোণ সমূহ স্থূল হওয়াতে কোন গোলা পদার্থ রাখিতে হইলে কোণে অতি অল্প স্থানই স্থান নষ্ট হয়। ষড়্ভুজের আরও একটি সুবিধা আছে। ইহাতে অন্তর্দেশ কিংবা বহির্দেশ হইতে কোন বল প্রযুক্ত হইলে অনিষ্ট হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা। কুঠরী গুলি গোলাকার হইলে এই অনিষ্টের আরও অল্পতর আশঙ্কা হয় সত্য; কিন্তু তাহাতে মধ্যে মধ্যে স্থান স্থান থাকে। মক্ষিকারা মধুচক্র নির্মাণ করিতে কুঠরী গুলি এইরূপ ষড়্ভুজই করিয়া থাকে। ইহাতে স্থান-লাঘবও হয় এবং নির্মাণসামগ্রীও অল্প লাগে। অন্য কোন আকারের কুঠরী করিলে স্থান এবং নির্মাণসামগ্রী উভয়ই অধিকতর লাগিত। কুঠরী সমূহের প্রাচীর নির্মাণ বিষয়েই যে

এইরূপ কৌশল অবলম্বিত হয় তাহা নহে, কুঠরীর ছাদ ও ভিত্তি আশ্চর্য্যতর কৌশলে নির্মিত হয়। গণিতবেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অল্পতম স্থানে দৃঢ়তম সংস্থান করিতে হইলে ছাদ অথবা ভিত্তি এক বিন্দুতে সংলগ্ন তিনটি বর্গক্ষেত্র দ্বারা নির্মিত হওয়া আবশ্যক। বীজগণিতের উচ্চতম শাখা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্র তিনটি যদি একটি নির্দিষ্ট কোণে * পরস্পর সংলগ্ন হয় তাহা হইলে অল্পতম স্থান ও অল্পতম পরিশ্রম লাগে। অর্থাৎ কোন কোণে সংলগ্ন হইলে অধিকতর নির্মাণ সামগ্রী ও পরিশ্রম আবশ্যক করিবে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে মধুমক্ষিকারা কুঠরী সমূহের ছাদ কিংবা ভিত্তি তিনটি বর্গক্ষেত্র দ্বারাই নির্মাণ করে এবং ক্ষেত্র তিনটিও এই নির্দিষ্ট কোণেই পরস্পর সংলগ্ন হয়। গণিত শাস্ত্রের এই সমুদয় তত্ত্ব অগাধ-ধী-সম্পন্ন নিউটনের আশ্চর্য্যতম আবিষ্কারের ফল স্বরূপ; তিনিও জানিতেন না : পরে তাঁহার শিষ্যরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র কীটেরাও যে এসমুদয় জানে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল?

মনে কর কোন পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হইল। বায়ু নিষ্কাশনের পূর্বে বাহিরে এবং অভ্যন্তরে

* স্থূল কোণ ১১০ ডিগ্রি এবং ক্ষুদ্র কোণ ৭০ ডিগ্রি।

বায়ু থাকাবশতঃ পাত্রে বহির্গাতে বা-
য়ুর স্বরূপ চাপ পতিত হয় অন্তর্গাতেও
সেইরূপ চাপ পড়ে * । নিষ্কাশনের পরে
বহির্গাতে বায়ুর চাপ পতিত হয় কিন্তু
ঐ চাপের প্রতিকূলে অভ্যন্তরে আর কোন
চাপ থাকে না । এইজন্য পাত্রে বহি-
র্দেগে সবলে নিষ্পেষিত হয় । কঠিন পাত্র
অত্যন্ত স্থূল না হইলে তাড়িয়া যায় এবং
কোমল পাত্র কুঞ্চিত হইয়া যায় । মধু-
মক্ষিকারা ছোট ছোট ফুলহইতে মধু
আহরণ করিতে ইইলে ফুলের মধ্যে প্র-
বেশ করিতে পারে না ; মধুভাগের মুখে

* এই কথাই আমরা বায়ুর চাপ বু-
ঝিতে পারি না এবং জলে ডুব দিলেও
জলের চাপ বুঝি না । চতুর্দিকে এবং
উপরে ও নীচে বায়ু কিংবা জল থাকিতে
সমুদয় দিক হইতেই চাপ লাগে । জ্বব প-
দার্থের (তরল এবং বায়ব) এই একটি
গুণ যে উহা সকল দিকেই সমান ভাবে
চাপে । উপর হইতেও তড়প, নিম্ন হই-
তেও তড়প এবং চতুর্পাশ্ব হইতেও তড়প,
স্বতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ চাপ থাকিতে এ-
কটি অপরটির প্রতিকূলাচরণ করে এবং
আমরা কোন চাপই বুঝিতে পারি না ।
পক্ষান্তরে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের মুখে হস্ত
স্থাপন করিয়া যদি হস্তের নীচের বায়ু
নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর
উপরের চাপ অপ্রতিহত থাকে (কারণ
হস্তের নীচে আর বায়ু নাই) এবং হস্তে
বায়ুর ভার অনুভূত হয় ।

মস্তক ও শরীর প্রদীপ্ত করিয়া বায়ু চু-
ষিয়া লয় । ইহাতে ফুলের কোমল ব-
হির্দেগে কুঞ্চিত হয় এবং মধু তাহাদিগের
মুখের সন্নিধানে উপস্থিত হয় ।

বায়ুব এই চাপ প্রতি বর্গ বুকলে প্রায়
সাত সের । অতএব যদি দুই হস্ত একত্র ক-
রিয়া হস্তমধ্যের বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত
করা যায়, তাহা হইলে হস্তদ্বয় এই চাপের
দ্বিগুণ বলে পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে ।
কারণ, হস্তের উভয় পৃষ্ঠেই এই চাপ প-
তিত হয় । আবার যদি হস্ত প্রাচীরে
স্থাপন করিয়া হস্তপ্রাচীরমধ্য বায়ু স-
ম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া যায়,
তাহা হইলে হস্ত প্রতি বুকলে সাত সের
পরিমাণে অর্থাৎ দুই মণের অধিক চাপে
প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া থাকিবে । মক্ষিকা,
অষ্টপদ প্রভৃতি কীটসমূহ প্রাচীর এবং
ছাদ বাহিয়া সচ্ছন্দে বাতায়াত করে ;
ছাদে তাহাদের মস্তক ও শরীর নীচে স্থ-
লিয়া থাকে । বাবজেন্দবিদ্যা বিশারদ হোম
সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, কীটস-
মূহ বায়ু নিষ্কাশন দ্বারা এইরূপ অনা-
য়াসে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় । অনু-
বীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এই
সমস্ত কীটের পদ হংসাদির ন্যায় চর্ম্মা-
বৃত্ত । এই চর্ম্ম আকৃষ্টিত করিয়া তাহার
বায়ু টানিয়া লয় । মনে কর একটি ম-
ক্ষিকা ছাদে আছে । একগে তাহার পদ
ও ছাদের মধ্যে যে বায়ু ছিল তাহা টানিয়া
লওয়াতে, উপর হইতে বায়ুর চাপ থাকিল

না, কিন্তু নিম্ন হইতে চাপ থাকিল ; সুতরাং উহা না পড়িয়া ছাদ দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়। টিকটিকী, তৈলপোকা প্রভৃতিও এই কোশলেই গমনাগমন করে এবং সিন্ধুঘোটকও এই কোশলেই ভূধারপর্বতোপরি শীর্ষভাবে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়।

শকটের কোন চক্রের পরিধিকাঠে একটি লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিলে শকট যদি চালিত হয় তাহা হইলে ঐ লৌহশলাকাটি বায়ুতে যে পথনির্দেশ করে, গণিতবেত্তারা উহাকে (Cycloid) চক্রকম্প পথনামে অভিহিত করিয়াছেন। এই চক্রকম্প বক্র রেখার একটি গুণ এই যে, যদি কোন বস্তু, স্বকীয় ভারবলে এবং অন্য একটি শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, একস্থান হইতে ঠিক তমিহ্ন স্থান বাতীত অন্য কোন স্থানে না-মিতে চায়, তাহা হইলে এই চক্রকম্প পথে না-মিলেই অল্পতম সময় লাগিবে। সরল রেখায় কিংবা চক্রকম্প রেখা হইতে কম বা-অধিক বক্র অন্য কোন পথে না-মিলে অধিকতর সময় আবশ্যক করে। পর্যাবেক্ষণ দ্বারা পক্ষিগণের গতির দ্বিগু নির্দেশ করা সম্ভব নহে, কিন্তু যে সমস্ত পক্ষী পর্বতোপরি কুলায় নির্মাণ করে বলিয়া প্রায়শঃই উচ্চতর বা নিম্নতর পর্বতে উঠে কিংবা নামে, তাহাদিগের গতির সহিত এই চক্রকম্প রেখার অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে।

গোলাকার পদার্থের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অল্প অর্থাৎ নির্মাণ সামগ্রী সমান

হইলে গোলাকার পদার্থ যত অল্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে, অন্যবিধ কোন আকারের হইলে তদপেক্ষা অধিকতর স্থানের আবশ্যক হয়। কিন্তু কোন দ্রব (তরল কিংবা বায়ব) পদার্থের মধ্যে অতি সহজে যাতায়াত করিতে অতি ক্ষম্য তারই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। চতুর্পাশ্বে দ্রব পদার্থ ক্ষম্যতম বস্তুর অল্পতম বাধা জন্মায়। আবার যদি এরূপ জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন বস্তু এক হস্ত দীর্ঘ হইলে এবং ক্ষুদ্রতম স্থানে এক বিতস্তি প্রস্থ হইলে দ্রব পদার্থের মধ্যে অতি সহজে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত উহার কিরূপ আকার হওয়া উচিত ? তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গণিতবেত্তারা যাহাকে ‘অল্পতম প্রতিরোধজনক দ্রব’ (Solid of least Resistance) নামে অভিহিত করিয়াছেন উহার সেইরূপ আকারই হওয়া আবশ্যক। বীজগণিতের উচ্চতম শাখার সাহায্যে অতি দূরূহ যুক্তি পরস্পরা অবলম্বন করিয়া এই আকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহার সহিত মৎস্যের মস্তকের অতিশয় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিউটন প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্বেত আলোক নানা বর্ণের কিরণ যোগে উপপন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন আলোককিরণ স্বল্প পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিতে ভিন্ন ভিন্ন রেখায় প্রতিভ্রম হয়; তজ্জন্য প্রতিভ্রম কিরণমালায় গঠিত বিস্তৃত অত্যন্ত অস্পষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতন দূরবীক্ষণদ্বারা পদার্থের

যে বিষয় দেখা যাইত তাহা এইরূপ অসম প্রতিভয় কিরণ মালার গঠিত হইত সুতরাং অত্যন্ত অস্পষ্ট দেখা যাইত । এই কারণে পূর্বে দূরবীক্ষণ অসম্পূর্ণ বস্তু ছিল । পঞ্চাশৎবর্ষ পরে ডোলণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কএক খণ্ড কাচ একত্রিত করিয়া এই দোষের কিঞ্চিৎ সাধব করেন । ইহার ত্রিংশৎ বৎসর পরে ব্লেয়ার দেখাইয়াছেন যে, কএকখণ্ড কাচ একত্রিত না করিয়া কএকটি তরল পদার্থ একত্রিত করিলে এই দোষ প্রায় নিঃশেষিত হয় । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চক্ষুঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাতেও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের তরল পদার্থ দৃষ্ট হয় । যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক কুট পরীক্ষানিচয়ে বৈ নিরম অতি অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, চক্ষুঃগত তরল পদার্থ গুলি স্বভাবতঃই সেই নিরমে কার্য করে ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ গোলক অণুবীক্ষণের কার্য সম্পাদন করে । পক্ষিগণ রক্ষাদির শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া সর্বদা যাতায়াত করে, এইজন্য উহাদিগের চক্ষুঃ শরীর হইতে বাহির না হইয়া শরীরের সমান থাকা নিতান্ত আবশ্যক । অন্যথা শাখা প্রশাখার লাগিয়া চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । আবার উহারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমূহও শীকার করিয়া আহার করে । অতএব তাহাদের চক্ষুঃ সময়ে সময়ে গোলাকার হইয়া অণুবীক্ষণের কার্য করিতে পারে, এমত হওয়াও আব-

শ্যক । ঐ গোলাকার করিতে চক্ষুঃ শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়ে । এই উভয় কার্যেরই সুবিধার জন্য পক্ষিগণের চক্ষুর পাশ্বে কএকটি পেশী আছে ; ঐ পেশীগুলি আকৃষ্টিত বা বিক্ষারিত করিয়া পক্ষিগণ আবশ্যক মত চক্ষুঃ সমান বা গোলাকার করিয়া থাকে ।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে পিপীলিকার অমলীলতা এবং কৌশল মধুমক্ষিকার অপেক্ষাও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয় । উহাদিগের বাসস্থান একটি ক্ষুদ্র নগর । তন্মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ সৌধরাজি এবং গমনাগমনের সৌকার্যার্থ সুন্দর প্রশস্ত পথ ও সেতুসমূহ এরূপ অপূর্ব কৌশলে নির্মিত হয় যে, তাহাতে পিপীলিকাগণের স্থপতি-বিদ্যার গুঢ় তত্ত্বসমূহে আশ্চর্য্য অভিজ্ঞান লক্ষিত হয় । মধু উহাদিগের প্রধান ভক্ষ্য । উহা প্রতিদিন আবশ্যক মত সংগৃহীত হয় । অধুনা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, উহারা শস্য আহার করে না ; মধু এবং মাংসই আহার করিয়া থাকে । উহাদিগের প্রতিবেশী একরূপ কীট আছে, তাহাদিগের নিকট হইতেই মধু আহরিত হয় । কখনও বা এই কীটগণকে নগরের মধ্যে লইয়া আসে এবং মনুষ্য যেরূপ গাভী প্রভৃতি পালন করিয়া তাহাদিগের দুগ্ধ গ্রহণ করে, উহারাও সেইরূপ উক্ত কীটগণকে পালন করিয়া তাহাদিগের নিকট মধু গ্রহণ করে । এমন কি কখন কখন এই কীটের ডিম্বও লইয়া আইসে । তৎপরে

যত্নে ডিম ফুটাইয়া যতদিন পর্য্যন্ত মধুদা-
নোপযোগী না হয়, ততদিন লালন পালন
করিয়া থাকে। আর একটি আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে, পিপীলিকারা যত শীত
সহ্য করিতে পারে, এই কীটেরাও তত
শীত সহ্য করিতে পারে। ইহারা তত
শীত সহ্য করিতে না পারিয়া মরিয়া গেলে
পিপীলিকারাও আহারাভাবে মরিয়া যা-
ইত। আবার শীতাদিক্য প্রযুক্ত পিপী-
লিকাগণ যখন জড়বৎ পড়িয়া থাকে
কীটেরাও তখন তদবস্থ হয়।

পিপীলিকাদিগের নগরের নাম ব-
ল্মীক। মহান্ পদার্থের সহিত ক্ষুদ্র প-
দার্থের তুলনা করিলে ইহাকে পিপীলিকা-
পৰ্ব্বত বলা যাইতে পারে। এই বল্মীকের
মধ্যেই প্রাসাদ, ভাণ্ডার, গৃহ, শয়নাগার,
পথ, সেতু প্রভৃতি নির্মিত হয়। মলু এট
সাহেব বল্মীকের যে রক্তান্ত দিয়াছেন,
তাহা অতীব বিস্ময়কর। অন্যান্য পর্যা-
টকেরাও তদ্রূপ বিবরণ প্রদান না করিলে
উহা অত্যাশ্চর্য্য দোষে দূষিত বলিয়া বিবে-
চিত হইতে পারিত। তিনি যে বল্মীক
দেখিয়াছিলেন, তাহা ১২। ১৪ হস্ত উচ্চ,
২০। ২৫ হস্ত দীর্ঘ ও তদনুরূপ প্রশস্ত এবং
আকারে মন্দিরের ন্যায়। আমরা যে
লম্বুদয় পিপীলিকা দেখি তাহাদিগের ন্যায়
উহারা নিরীহ নহে। বল্মীকের নিকটস্থ
হইলে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিয়া
অনধিকারগামীকে খাইয়া ফেলে। ব-
ল্মীক নষ্ট করিতে হইলে চতুর্দিকে অগ্নি

প্রজ্বলিত করিয়া বল্মীকোপরি কামান
দ্বারা গোলাবর্ষণ করিতে হয়। পিপী-
লিকারা বাহির হইয়া অগ্নিতে পুড়িয়া মরে।
দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকাতেই এই
বল্মীক দৃষ্ট হইয়াছে।

বীবরেরা আবাসভূমি নির্মাণে কিরূপ
নৈপুণ্য প্রকাশ করে তাহা চাকপাঠ প্রথম
ভাগে অনেকে পাঠ করিয়াছেন। বাবুই
প্রভৃতি পক্ষীরা কুলায় নির্মাণে কিরূপ
কৌশল প্রদর্শন করে, তাহাও প্রায় সকলেই
অবগত আছেন। পশুপক্ষীর সংস্কারগত
নৈপুণ্যের বিষয় আর অধিক না বলিয়া তা-
হাদের শরীর সংস্থানের উপযোগিতা বি-
ষয়ে আমরা গুটিকত কথা বলিয়া প্রস্তাবের
উপসংহার করিব। উষ্ট্রেরা মরুদেশের
নমনীয় ভূমিতে সচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে
পারিবে বলিয়া তাহাদের ক্ষুর অত্যন্ত প্রশস্ত।
অপ্রশস্ত হইলে ভারবশতঃ ক্ষুর নমনীয়
ভূমিতে বসিয়া গিয়া যাতায়াতের অত্যন্ত
অসুবিধা ঘটাইত। আবার সুদীর্ঘপথ অ-
তিবাহনেও অধিক ক্লান্তি না হয়, এই জন্য
উহাদিগের পদের অস্থি ও বন্ধনী এবং ক্ষু-
রের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান আছে। এই
ব্যবহিত স্থান অতি কোমল ও স্থিতিস্থা-
পক পদার্থে পূর্ণ। পদনিক্ষেপ ও উৎ-
ক্ষেপে এই কোমল পদার্থ স্বীয় আকার
পরিবর্তন করিয়া থাকে। এই জন্য উ-
ষ্ট্রের শরীর অত্যন্ত ভারী হইলেও উহারা
যুদ্ধিকের ন্যায় কোমল গমনে সক্ষম। অ-
শ্বের পদেও অতি সূক্ষ্মর কৌশল আছে।

ইহাদের পদ শরীরের নিম্নে শীর্ণভাবে স্ফুটন্ত স্তম্ভের ন্যায় অবস্থাপিত হইলে প্রতিপদে শরীর বিকম্পিত হইত । তাহা না হইয়া ইহাদিগের পদ বক্রভাবে নাস্ত এবং নিম্নদেশে স্থিতিস্থাপক বন্ধনী মালায় আবদ্ধ । শকটে স্প্রিং থাকিলে উহা য-
 ৮প আঘাত প্রতিঘাতে অস্পৃ বিকম্পিত হয়, তদ্রূপ অস্ত্রের এই স্থিতিস্থাপক বন্ধনীমালা পাকবশতঃ আঘাত-প্রতিঘাত-ক্রিয়া শরীর বিকম্পনের অনেক লাঘব হয় । রীণ মৃ-
 ৮গের ক্ষুরে আরও আশ্চর্য্যতর কৌশল । ই-
 ৮হারা শীত প্রধান ঘেফুর নিকটেই প্রদে-
 ৮শেই বাস করে এবং বরফের মধ্যে ইহারা
 ৮শকট টানিয়া থাকে । ঐ শকটের চক্র নাই,
 ৮নিম্নতল ভূমিস্পৃষ্ট । ইহাদের ক্ষুর অতি
 ৮প্রশস্ত এই জন্য বরফে বসিয়া যায় না, প-
 ৮কান্তরে বায়ু প্রতিরোধে গমনাগমনের অ-
 ৮সুবিধা না হয়, তজ্জন্য ইহারা ভূমিহইতে
 ৮পদোত্তোলন করিলেই ক্ষুর সঙ্কুচিত করিয়া
 ৮ক্ষুদ্রায়ত্ন করিতে পারে । ইহাদিগের
 ৮ক্ষুরের নিম্নতল ঘন রোমরাজিতে আবৃত ।
 ৮রোম অতি অস্পৃ পরিমাণেই তেজসঞ্চা-
 ৮লন করে, * তজ্জন্য ইহাদিগের পদে বর-

* রোমের এই গুণ থাকাতাই অনেক
 ৮পশুপক্ষী শীতে কষ্ট পায় না । বরফ ক-
 ৮ষল জড়াইয়াও এই জন্য রাখা হয় । বাহি-
 ৮রের তেজ কষল ভেদ করিয়া শীত্রে মধ্যে
 ৮প্রবেশ করিতে পারে না এবং বরফ না
 ৮গুলিয়া অনেককণ অস্রবাবস্থায় থাকিতে
 ৮পারে ।

ফের নিদাক্ষণ নৈতা লাগিতে পারে না ।
 ৮আবার ইহাদিগের ক্ষুর এমনই সূক্ষ্মশীল
 ৮নির্মিত যে, ইহারা তদ্বারা বরফ তুলিয়া
 ৮ফেলিয়া নীচের ঘাস খাইতে সক্ষম হয় ।
 ৮এই ঘাসের নাম 'লিচন্' । যখন শীত-
 ৮প্রভাবে অন্যান্য উদ্ভিদ প্রায় নষ্ট হইয়া
 ৮যায়, তখনই এই ঘাস অধিক জন্মে । এই
 ৮শীতকালেই ইহারা ময়ূষ্যের অভিশয় উপ-
 ৮কারে আসে এবং তৎকালেই প্রকৃতি এই
 ৮ঘাসোৎপাদনে ইহাদিগের প্রাণধারণের উপ-
 ৮পায় করিয়া দেয় । শুক্ল ভষ্মকের পদ-
 ৮তলও রোমে পরিপূর্ণ । ঋদ্যোতিকা
 ৮কীটের পুরুষেরা উড়িতে পারে, তাহাদের
 ৮পাখা আছে । স্ত্রীদিগের পাখা নাই এবং
 ৮উড়িতে পারে না । পুরুষেরা স্ত্রীগণের
 ৮আলোকেই তাহাদিগকেই অন্বেষণ করিয়া
 ৮লইতে সক্ষম হয় । ভূমধ্য সাগরে নাবিক
 ৮(Nautilus) নামে এক প্রকার আশ্চর্য্য
 ৮মৎস্য আছে । ইহারা শস্যুক জাতিয় এবং
 ৮ইহাদিগের বহিরস্থি নৌকার ন্যায় । ত-
 ৮দুপরি শরীর স্থাপন করিয়া ইহারা চর্মচ-
 ৮টিকার পক্ষের ন্যায় দুইটি চর্মের পাল তু-
 ৮লিয়া দেয় এবং পদের দ্বারা ক্ষেপণীর
 ৮কার্য্য সমাধা করে । এই প্রকারে ইহারা
 ৮ইতস্ততঃ গমন করিয়া থাকে । নৌকার
 ৮সমুদয় উপকরণই ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে
 ৮স্থান পাইবে, কে ইহা ভাবিয়াছিল । আর
 ৮ইহারা বিনা শিক্ষায় যে নিপুণনাবিকের
 ৮গুরুস্থানীয় হইবে, কে ইহা কল্পনা ক-
 ৮রিয়াছিল ?

হরগৌরী।

প্রথম প্রস্তাব।

১

“আধ বাঘছান ভাল বিদাড়ে, আধ পাটাস্বর সুন্দর সাজে ;
 আধ মণিময় কিঙ্কণী বাজে, আধ ফণি ফণা ধরি রে।
 আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
 আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে ॥
 এক হাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণি কঙ্কণ,
 আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাহুল পুরি রে।
 ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কঙ্কলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
 আধ ভালে হরিভাল মুশোভন, আধই সিন্দূর পরি রে ॥
 কপাল-লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
 দুই ভাগ অগ্নি এক অবাদে, হইল প্রণয় করি রে।
 দোহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিন বড় মিলিয়া বসি,
 আধ জটাজুট গজা সরসী, আধই চাক কবরী রে ॥”

কনিবর ভারতচন্দ্র পুরাণ হইতে এই চিত্রটি তুলিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কল্পনায় ইহা প্রথম প্রতিভাত হইরাছিল, তাঁহার প্রশংসার সীমা নাই। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক, অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত, অতি পূজনীয় কবি। তাঁহাকে আমরা অভিবাদন করি। তাঁহার এই লীলাময় চিত্রপটে সৌন্দর্যের কি বিচিত্র মাধুরী খেলা করিতেছে, মানব-প্রকৃতির পূর্ণাবয়বতা কি আশ্চর্য্য শোভা পাইয়াছে, সামাজিক সম্পদের কি অপূর্ণ প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং বাস্তবতা-প্রেমের কি অলৌকিক প্রতিমূর্ত্তিই

ইহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে! এই চিত্র জগতে অতুল। ইহা মনস্বী ও ভাবুক, সকলেরই সমান ভোগ্য।

ইহার বহিঃস্থ পরিষ্কৃত অর্থ পূর্ণসৌন্দর্য্য। এই অনন্ত নিসর্গরাজ্য সৌন্দর্য্যের এক অনন্ত সমুদ্র। ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কেবলই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ। নয়নাভিরাম শ্যামল নভোমণ্ডলে, কুমুদকাননে, স্রোতস্বিনীর আবিল বক্ষে, চন্দ্রমার অমৃতময় জ্যোৎস্নায়, সূর্য্যের ধরজ্যোতিতে, সূর্য্যালোকরঞ্জিত মেঘমালায়, সরোবরের নির্মল জলে, শৈবালে, শৈবালবেষ্টিত কুমুদ-কমলে, শস্য-শোভাময় রমণীয় ক্ষেত্রে, তৃণশল্পসম্য-

চ্ছাদিত ভূখণ্ডে, বনে, উপবনে, উন্নত পা-
দপে, হুলিত লতিকায়, তুষারে, তুষারম-
ণ্ডিত পর্কতশৃঙ্গে, জনধির তরল পর্কতময়
অসীম বিস্তারে, সর্বত্রই সৌন্দর্যের উ-
চ্ছ্বাস, এবং সর্বত্রই সৌন্দর্যের অবিরাম-
বাহি অ্যমোদলহরী । হৃদয়বান্ ব্যক্তি
এই সৌন্দর্যসুখা পান করিয়া মনুষ্যদেহেই
দেবজনম্পূহণীর স্বর্গসুখ সম্ভোগ করেন,
এবং ভাষায় তিনি কবি না হইলেও কা-
বোর এই প্রাণগতরস হৃদয়ে পোষণ ক-
রিয়া কৃতার্থ হন । তাঁহার নিকট প্রভাত,
সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন ও গভীর নিশীথিনী সক-
লেই সামবেদী স্বরির ন্যায় সৌন্দর্যের স্তু-
তিগীত গান করে, এবং তদীয় চিত্র সৌ-
ন্দর্য্যমলিলে ভাসিয়া ভাসিয়াই সমস্ত দুঃখ
যজ্ঞগা ভুলিয়া থাকে, এবং সর্বপ্রকার কলুষ-
পঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে বিনা
প্রযত্নেই নির্মুক্ত রহে ।

কিন্তু এই যে সৌন্দর্যের উল্লেখ হইল,
ইহা কি সকল স্থলেই একরূপ ?—না ইহাতে
বিচিত্রতা আছে ? পর্কতে যে সৌন্দর্য,
পর্কতপ্রান্তবাহিনী তরঙ্গিনীতেও কি সেই
সৌন্দর্য ? পাদপের দৃঢ়তা ও দৃকপাতশূন্য
পৌঞ্চসে যে কান্তি, পাদপকণ্ঠশোভিনী
পুষ্পময়ী ব্রতীতেও কি সেই কান্তি ? যা-
হার চক্ষু আছে, তিনিই বলিবেন,—না ।

যেমন কবিতার রসবৈচিত্র্য, তেমন
সৌন্দর্য্যও বিচিত্র প্রভেদ । সৌন্দর্য্য
অনেক প্রকার । উহা কোথাও ভয়ানক,
কোথাও কাকণাব্যঞ্জক,—উহাতে কোথাও

ভক্তির উদ্দীপনা, কোথাও প্রীতির প্রব-
র্তনা । অমাবসার রাত্রি, ঘোরতম অন্ধকার,
আকাশে নিবিড় ঘনগটা, বায়ুর শ্বাস প্র-
শ্বাসে শোকের স্রুগভীর নিঃশ্বাস, মুসলধারে
রুমি, মুহুমুহঃ বিদ্রোহের ক্ষুধা, মুহুমুহঃ
বজ্রপাত, জলে স্থলে এক, শূন্যে অশূন্যে
সমরূপতা, এই এক প্রকারের সৌন্দর্য্য,—
ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষণ, নিকপম । এই প্রকা-
রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে বিলাসের আবেশ
হয় না, হৃদয় সুখসংস্পর্শেও শীতল হয়
না ; উহা ক্রমশঃ কেবল স্তম্ভিত হইতে
থাকে, এবং স্তম্ভিত হইয়াও ক্রমে ক্রমে
ক্ষীত হইয়া উঠে । আবার লতারত বি-
নোদকুঞ্জে কৌমুদীর ক্রীড়াকৌতুক, হৃ-
র্বাদলে শিশির, সুন্দরীর কমনীয় ল-
লাটে চূর্ণকুন্তল, শিশুর সরল হাস্য,
এই সকল আর এক প্রকারের সৌ-
ন্দর্য্য,—প্রাণারাম, প্রিয়দর্শন, প্রীতিপ্রদ ।
হরগৌরীর অপরূপ সম্মিলনে এই উভয়-
বিধ সৌন্দর্য্যেরই আভা রহিয়াছে । এই
জন্যই বলিয়াছি, ইহাতে পূর্ণসৌন্দর্য্য প্র-
তিবিস্তৃত । অণুমাাত্রায় হইলেও ইহাতে
পূর্ণতার কিঞ্চিৎ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে,
—কবির কল্পনা পরম্পর-বিরোধি রি-
চিত্রতার একত্র সমাবেশ করিতে চেষ্টা ক-
রিয়া অতি অল্প পরিমাণে হইলেও ইহাতে
কৃতকার্য্য হইয়াছে । ইহাতে,—

“ আধ গলে শোভে গরল কালা,
আধই সুখা মাধুরী রে । ”

সুতরাং যাহাতে আতঙ্ক, আমরা এই

মূর্তিতে তাহারও প্রতিকৃতি দেখিতে পাই ;
যাহাতে আনন্দ আমরা তাহাও এই ম-
মোহর মূর্তিতে সন্দর্শন করিয়া প্রীত হই।
ইহাতে মধুরিমা ভয়ের সহিত মিশ্রিত হ-
ইয়াছে, ভয় মধুরবেশে গন মোহিত করি-
তেছে। ইহাতে কাঠিন্য কোমল হইয়া
গিয়াছে, কোমলতা কাঠিন্যে পরিণতি
পাইয়াছে। কে এ রূপ একবার দেখিলে
বিস্মৃত হইতে পারে?—যেখানে হৃদয়
যাই যাই বলিয়াও যাইতে সাহস পায়
না, এবং যে অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য হইতে চিত্ত
দূরে যাইতে ইচ্ছুক হইলেও যাইতে পারে
না, কে তাহার মন্ত্রমোহ হইতে মুক্ত
রহিবে?

এই হরগৌরীচিত্রের অন্তঃস্থ অক্ষুট
অর্থ মানবপ্রকৃতির পূর্ণাবয়বতা। মানব-প্র-
কৃতির কোন কোন রুতি ফণীর মত গর্জ্জন
করে, কোন কোন রুতি কিঙ্কিনীর কল-
নাদে হৃদয় মন কাড়িয়া লয়;—কোন
কোন ভাব অগ্নির মত জিহ্বা প্রসারণ ক-
রিয়া পোড়াইতে কি গ্রাস করিতে আসে,
কোন কোন ভাব শরীরে অমৃতদারা ঢা-
লিয়া দেয়। যখন মনুষ্য ক্রোধে প্রজ্বলিত,
তাহাকে তখনও দেখিও ; যখন সে স্নেহে
বিগলিত, তাহার তদানীন্তন মাধুর্য্যও এ-
কবার দেখিয়া লইও। মনুষ্যের অভিমান
সর্বদাই ‘দূরে রহ’ বলিয়া দর্প সহকারে
তোমাকে ইঙ্গিত করিতেছে, মনুষ্যের
মমতা জ্যোৎস্নার হিলোলের ন্যায় তো-
মার তাপিত অঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া

গড়াইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যচক্ষের কোন
রূপ দৃষ্টি বিবাক্ত শলাকার ন্যায় তোমার
মর্গস্থল ভেদ করিয়া যাইতেছে, এবং উহা
যতদূর প্রবিষ্ট হইতেছে, ততদূরই যেন প্রতপ্ত
লৌহ কি প্রতপ্ত গরল স্রোতে বহিতেছে ;
আবার মনুষ্যেরই আলস্যময়, আবেশময়,
প্রাণস্পর্শি নয়নভঙ্গি তোমায় উন্মাদিত
করিয়া তুলিতেছে ;—যে কম্পকানন স্প্রে
বই কেহ দেখিতে পায় না, অন্ততঃ কণ-
কাসের জন্যও তোমায় তাহার সুস্বিক-
শ্যামল জ্যোতি দেখিতে দিতেছে। ক-
নিকম্পিত হরগৌরী মূর্তিতে এই উভয়-
বিধ ভাবেরই একত্র নিবেশ ; ইহাতে
যেমন নানারূপ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব মি-
শ্রণ, তেমন পুরুষকার ও প্রীতিরও অপূর্ব
সম্মিলন। ইহাই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ। ই-
হাতে ব্যাক্রম্য ও পদাশ্রয় আলিঙ্গনবন্ধ,
ইহাতে ফণী ও মণি, জটাঙ্গুট ও চাক-
বরী, ধবল বিভূতি ও গন্ধ কস্তুরী একাধারে
জড়িত গড়িত। অলৌকিক কালিদাস
এই মোহন মূর্তির আভা দর্শন করিয়াই
দিলীপ বর্ণনে বলিয়াছেন যে,—
“ভীমকাঠৈশ্চ মৃপগুণৈঃ সবভুবোপজীবিনাং।
অনুষাশ্চাভিগমাশ্চ যাদোরতৈরিবার্ণবঃ॥”
এবং কালিদাসের আদিগুরু আদিকবি
বাল্মীকিও শোভা ও সামর্থ্যের এই সম্মি-
লন ধ্যান করিয়াই কখনও রামের কোদণ্ড
টঙ্কারে ও জলদ-গন্তীর গর্জ্জনে ত্রিভুবন
কম্পিত করিয়াছেন, কখনও বা রামচন্দ্রের
ককণবিলাপ শু শু শ্রবণে বনের পশু প-

ক্ষীকেও বিলাপ করাইয়াছেন ;—পাশাণে
জবময়ীর লীলা দেখাইয়া, পাশাণে কু-
সুমরাশি প্রস্ফুটিত করিয়া লোককে বি-
স্মিত ও বিমুগ্ধ রাখিয়াছেন ।

বিধাতা মনুষ্যকে দুটি চক্ষু দিয়াছেন ।
কিন্তু সংসারে অধিকাংশ মনুষ্যই কাকের
মত এক চক্ষু দেখিয়া থাকেন, এবং এ-
কার্জ মাত্র দেখিতে পান বলিয়া মানবমহি-
মার একাধিকই উপাসনা করেন । তাঁহা-
দিগের মধ্যে কাহারও নিকট শুধু পৌকষ-
গুণেরই গৌরব ও সম্মাননা । তাদৃশ ব্যক্তি-
দিগের বিবেচনায় যে কোন ভাব, যে
কোন বিষয় এবং যাহা কিছুতে হৃদয়ের
গন্ধ আছে, অবলাপ্রকৃতির সম্পর্ক আছে
এবং অবলাজনমূলত সারল্য, কোমলতা,
পরমুখপ্রেমিতা, ও পরের প্রতি নির্ভরের
ছায়া আছে, তাহাই দুষণীয়, তাহাই
জঘন্য । তাঁহারা আত্মীয়জনের উপকার
করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয়জনকে আ-
দরে পরিতুষ্ট করিতে তাঁহারা লজ্জা অনু-
ভব করেন । তাঁহারা বন্ধুতার অনুরোধে
বিপদসময়ে সাহায্য দান করিতে অসম্মত
নহেন, কিন্তু কোন অনুরোধেই কাহাকেও
স্নেহের সজলনয়নে অভিনন্দন করিতে
তাঁহারা সম্মত হইবেন না । এসকল তাঁ-
হাদিগের চক্ষু যেমন অনাবশ্যক, তেমন
অবজ্ঞের, তেমনই উপহাসনীয় । তাঁহাদি-
গের আদর্শ পুরুষ আপনাতে আপনি দৃঢ়
হইয়া লৌহস্তম্ভের মত দণ্ডায়মান থাকি-
বেন, কখনও পরের কণ্ঠে ভর করিবেন

না ; তিনি শত্রুমর্দনে একে এক সমস্তের
মত কার্য করিবেন, কিন্তু কখনও মুহুৎ-
সমাগমে চলিয়া পড়িবেন না ; তাঁহাতে
মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি থাকিবে, কিন্তু কখনও
চক্ষুয়ার স্নিগ্ধ কান্তি বিলাসিত হইবেন
না ; তিনি মুখে মুখী হইতে পারেন,
কিন্তু মুখে কখনও রক্তজ হইবেন না ;
এবং বিরহ, বিরোগ প্রভৃতি দুঃখ তাঁহার
চরণোপাশ্রে প্রবাহিত হইয়া যাইবে, ক-
খনও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না ।

পক্ষান্তরে, এমনও অনেক ব্যক্তি আ-
ছেন যে, তাঁহারা পৌকষধর্ম পূজার উপ-
যুক্ত সামগ্রী কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু
শ্রীতির মোহিনী মায়া এবং চল চল লা-
বণ্য রাশিকেই সর্বস্ব মনে করেন । তাঁহা-
দিগের অভিধানে বিষয়লিপ্সা ও কার্যকুশ-
লতার নাম কপটতা, পরাক্রমের নাম পাপ,
বীরগর্ব ও অভিমান অধোগতির প্রশস্ত
পথ । যে সকল পুরুষ আঘাতের উত্তরে
প্রতিঘাত করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল কেবল
মলমুদ্ধেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ;
যাঁহারা সূচির ন্যায় কূটচক্ষু ভেদ করিয়া-
ছেন, রিপুকুলের মস্তকে বজ্রের ন্যায় ভীম-
শব্দে নিপতিত হইয়াছেন, এবং কোথাও
বা ঋটিকার ন্যায় সম্মুখস্থ সমস্ত বিষু বাধা
বেগে উড়াইয়া নিগাছেন, তাঁহাদিগের
চক্ষু তাদৃশ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিরও অপদেব-
তার অবতার । এই সম্প্রদায়ের আদর্শ
পুরুষ কুরুমের ন্যায় কোমল হইবেন, কিন্তু
তাঁহাতে কটকের কোন লক্ষণ থাকিবে

না; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে মুখে দুঃখ সকল সময়েই ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইবে, প্রণয় তাঁহার হৃদয়কে একবারে ডুবু ডুবু করিয়া রাখিবে, এবং তাঁহার দৃষ্টি ও কথায় কেবলই মধু ফরিবে। তিনি বিনীত, তিনি শাস্ত, তিনি ক্রোধাদিবিকার-রহিত। তিনি সংসারে নির্লিপ্ত। তিনি শত্রুর নিকটেও পদানত। তিনি মৃত্যুর স-জীব প্রতিমূর্তি।

যাঁহার পূর্ণতার উপাসক, তাঁহার এই উভয় সম্প্রদায়েরই আংশিক অনুসরণ করেন, অথচ এই উভয়ে পৃথক পৃথকরূপে যাঁহা অনুভব করিতে না পান, তাঁহা অনুভব করিয়া, উভয়েরই অগম্য এক উচ্চ-তর গ্রামে আকৃষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় যে পৌরুষে প্রীতি নাই, কেবল স্বার্থ আছে, তাঁহা শ্মশানসদৃশ; এবং যে প্রীতিতে পৌরুষের অবলম্বন নাই, কেবল অস'র সৌরভ আছে, তাঁহা শুষ্ক ও দলিত পুষ্প-দল-সদৃশ। তাঁহ'র' এই নিমিত্ত, পৌ-রুষ ও প্রীতির সম্মিলিত অবস্থাকেই পর-মপুরুষার্থ বলিয়া পূজা করেন, এবং যা-হাতে প্রতিমনুষ্যেই এই উভয় ভাবের সমু-চিত বিকাশ হয়, যাঁহাতে প্রত্যেকেই অংশতঃ পুরুষ ও অংশতঃ অলম্ব্য-স্বভাব হইয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমের ন্যায় এক তীর্থস্বরূপ হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার সর্বোচ্চ করণে কামনা করেন। তাঁহাদিগের আদর্শ এই হর-গৌরীমূর্তি, একাঙ্কে প্রলয়, অপরাঙ্কে প্রা-ণদান—একাঙ্কে সমাধির নিশ্চক্ৰ গাভীরা,

অপরাঙ্কে ঈশকামিত প্রকৃষতার প্রিয় আ-কর্ষণ। তাঁহাদিগের ধর্মনীতি কাপুরুষকে অবজ্ঞা করে; যে ভীক, যে নিরতিমান, যে আঘাতে উত্তেজিত হয় না, অপমানের নিদাক্ষণ দংশনেও জুলিয়া কি জাগিয়া উঠে না, যাঁহার চিত্ত কোনরূপ কঠোর সাধনাতেই সাহস পায় না, যাঁহার মন কার্ষের সময় ফুৎকারেরও ভর সহে না, তাঁহাকে উচ্চ মনুষ্যাগণনারই বাহিরে রাখে। অথচ, যাঁহার ক্রুরকর্ম, যাঁহার নিষ্ঠুর, যাঁহার কিছুতেই আত্ম' হন না, কিছুতেই কাঁহাকেও আত্ম' করিতে পা-রেন না, যাঁহার প্রাণ খুলিয়া ভাল বা-সিতে জানেন না, প্রাণ দিয়া পরের পুজা করিতে ইচ্ছা করেন না,—যাঁহার ঐশ্বর্যের আনন্দ চাহেন, কিন্তু স্নেহের অধীনতার কি অনির্বচনীয় আনন্দ আছে তাঁহা বু-ঝিতে চাহেন না, ঐ প্রশস্ত নীতি তাঁ-হাদিগকেও অধম পুরুষ বলিয়া ঘণার চ-ক্ষেই নিরীক্ষণ করে।

মনুষ্যের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। মনুষ্য আপনার অভাব ও অপূর্ণতাকে আ-চ্ছাদন করিয়া রাখিবার জন্য ভাষাকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং নূতন নূ-তন শব্দের সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত নূতন শ-ব্দের আবরণেই আপনার কষতা ও ক্ষী-ণতা ঢাকিয়া রাখিতে যত্নশীল রহে। আ-মরা উপরে পৌরুষ-বিরোধী ও হৃদয়-বি-রোধী এই দুইটি বিভিন্নশ্রেণিস্থ ব্যক্তিদি-গের মতি ও গতি সম্বন্ধে যাঁহা বলিয়াছি,

তাছাড়াই একথার অতি সুন্দর নিদর্শন আছে । যাঁহারা পৌকষ-বিরোধী, তাঁহাদিগের মুখে আমরা সকল সময়েই শান্তি, ক্ষমা, নির্বেদ, বৈরাগ্য, শত্রুর প্রতি দয়া, বিশ্বজনীন প্রীতি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র শব্দ শুনিতে পাঠিয়া থাকি । তাঁহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেন, এবং এই সকল শব্দের সহায়তা লইয়াই পৃথিবীর রক্তভূমি হইতে পৌকষ ও পরাক্রমের সকল প্রকার ক্রীড়া এবং সঙ্ঘে সঙ্ঘে আপনাদিগের অপবাদ ও কলঙ্ক দূর করিবেন বলিয়া আশান্বিত হন । তাঁহারা যখন আহত হইয়া শয্যাগত থাকেন, তখন উহা পরকাল চিন্তা ; তাঁহারা যখন ভয়ে কণ্টকিত হইয়া অকালের আশ্রয় লন, তখন উহা বিরোধবিমুখকতা । হায় ! এই ধর্মই যদি মনুষ্যজাতির পরিব্রাজকের ধর্ম হইত, তবে ইতিহাস কাহাদিগের কাহিনী শুনাইয়া মনুষ্যের চিত্ত বিমোহিত করিত ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণজ্ঞান, সেকন্দর, সিজর, হানিবাল, ও বোনাপার্ট প্রভৃতি ধুরন্ধর পুরুষদিগের দিগন্তবিস্তৃত নাম কোথায় থাকিত ? ধর্মপোলের অতুল কীর্তি স্মরণ করিয়া কে আনন্দে উচ্ছলিত হইত ? আর, জগতে অদ্যাপি যে সকল অবদান পরম্পরা অহরহ অনুষ্ঠিত হইতেছে, কোথায় তাহার চিহ্ন থাকিত ? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, যাঁহারা পৌকষের নিন্দা করেন, তাঁহারা শব্দের সৃষ্টি করিতে যেমন বিচক্ষণ, মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত-সাধনে তে-

মন সক্ষম নহেন । তাঁহারা তাঁহাদিগের শব্দসম্পদ লইয়া মুখে নিদ্রাভোগ করেন ।
যে শৈশিষ্ণ বাক্তিরা হৃদয়গত উৎকর্ষের বিরোধী, তাঁহাদিগের প্রধান কথা, 'দুর্জলতা' । তাঁহারা সকল করিতে পারেন ও সকল সহিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ের দুর্জলতা প্রদর্শন করিতে পারেন না । তাঁহাদিগের ঘারে ভিখারী রোদন করিতেছে, দিনান্তে মুষ্টি ভিক্ষা পায় নাই বলিয়া কাতবকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতি রূপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না । কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্জলতা । যে তাঁহাদিগের মুখে একটি প্রিয়কথা শুনিলেই আনন্দে অবশ হয়, তাঁহারা তাহাকে প্রাণান্তেও প্রিয় সম্বোধনে সম্বোধন করিবেন না । কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্জলতা । জীবনের চির-সজ্জিনী অশেষ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হইয়া প্রণয়-পিপাসু নয়নে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন ; তাঁহারা তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন না । কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্জলতা । যে সকল কার্যে লোকে প্রীত হয়, পরিতুষ্ট হয়, লোকে অস্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ দেয়, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক তাহাতে পরাজুথ রহিবেন । কেননা, ইহাও হৃদয়ের দুর্জলতা ।
অহো মনুষ্য ! কিছুই তোমার অসাধ্য নহে । যাহা ঘোরতর পাতক, তুমি তাহাতেও পুণ্যের কমণীয়াচ্ছবি প্রদান করিতে পার, এবং যাদৃশ আচরণে দয়া

অশ্রদ্ধা করেন, ধর্ম নিপীড়িত হন, তুমি তাহাও পৌকষের নির্মল নাম লইয়া অনুষ্ঠান কর।

হৃদয়ের দুর্বলতা ? দুর্বলতা এ শব্দ কে কোথা হইতে আনিল ? আর, যদি মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃই দুর্বল হয়, তবে উহা দোষ না গুণ ? হৃদয় বিবেকের অগ্রবর্তী। বিবেক যেখানে পত্নী হিতে পারে না, হৃদয়ের গতি সেখানেও অব্যাহত। হৃদয়ের দুর্বলতাতেই এই অচিন্তনীয় বল। ইহা সত্য যে, মনুষ্য হৃদয়ের দুর্বলতা বশতঃ প্রণয়ে পরতন্ত্র হয়, পরের মুখে হাসে, পরের দুঃখে কাঁদে, পরের বিচ্ছেদ-বেদনায় ক্রিষ্ট হয়, পরচিত্তবিনোদনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই হৃদয়ের দুর্বলতা বশতঃই সে গিরিসাগর লঙ্ঘন করিয়া সাধারণের অসাধ্য কার্য সকল অবহেলায় সাধন করিয়া উঠে ; এই দুর্বলতার সামর্থ্যেই সে বিপদরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ; এই দুর্বলতার মহিমাবলেই সে আপনার অস্থিচর্ম বিক্রয় করিয়া জাতি বিশেষের উদ্ধারের পথ উন্মোচন করিয়া দেয়। হৃদয়ের দুর্বলতা জানে তাহার সহায়, জগতের হিতজনক যশস্কর কার্যে তাহার উদ্দীপনা, সমরাজ্যে তাহার মনোমাদিনী শঙ্খধ্বনি, ধর্ম্যে তাহার বীজ-মন্ত্র, প্রেমে তাহার প্রাণ। মনুষ্য প্রকৃতির সজীবতা রক্ষার জন্য ষতবিধ মদিরা পান করিয়া থাকে, হৃদয়ের দুর্বল-

তাই তদ্ব্যধো তাহার প্রধান মদিরা। সংসার যাহাদিগের নিকট শ্লগী রহিয়াছে, তাহার সকলেই এই মদিরাপানে বিভোর থাকিতেন।

মনুষ্যের প্রকৃতিকে তুমি সুন্দর বল। কিন্তু উহার সৌন্দর্য্য কিমে ?—না! হৃদয়ের দুর্বলতায়। মনুষ্য অনেক কার্যেই দৈতাদানবের উপমাশূল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ; কিন্তু দেবতার সহিত যে তাহার উপমা হয়, তাহা শুধু হৃদয়ের দুর্বলতায়। যখন দেখিব যে, যোদ্ধা ধূমাক্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইয়া, প্রাণ যায় যায় এমন সময়েও কর্ণত বারিপাত্র আপনার মুখের নিকট হইতে অপসারণপূর্ব্বক অধিকতর ভূষাতুর অন্য একজনের মুখে তুলিয়া দিতেছেন, তখন ইহা মনে রাখিও যে, হৃদয়ের দুর্বলতাই সেখানে তাহার বল বিধান করিয়াছে। যখন দেখিব যে, কোন স্থানে অগ্নির জ্বলন্ত জিহ্বা, মৃত্যুর করাল জিহ্বার ন্যায়, চতুর্দিক ব্যাপিয়াই লক্ লক্ ও ধক্ ধক্ করিতেছে, সকলেই আপনাকে মাত্র বাঁচাইয়া সে স্থান হইতে দূরে পলাইতেছে; কিন্তু একটি ক্ষীণাঙ্গী ললনা সেই অগ্নি ও সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ভয় না করিয়া একটি শুকুকার শিশুর জীবন রক্ষার জন্য উহার মধ্যে অগ্নানবদনে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং আপনি অর্জদগ্ধ হইয়াও ক্রোড়স্থ শিশুটিকে আবরিয়া রাখিতেছে, তখন জানিও যে তাহার যাহা কিছু সামর্থ্য, হৃদ-

য়ের দুর্বলতা হইতেই সে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে । যখন দেখিব যে, যাঁহার পদাঘাতে পৃথিবীতে ভূকম্প হইত, যাঁহার অনসিত অস্ত্রচালনে বিদ্রোহাশি খেলা করিত, পর্তুগের মেঘম্পর্শী মস্তকও যাঁহার অভ্যর্থনা ও আত্মপালনের জন্য অবনত হইয়া আসিত, সেই তেজঃপুঞ্জ মহাবীর লোকলীলার অন্তিম ক্ষণেও আপনাকে বিম্বৃত হইয়া স্বজাতির অধোগতি স্মরণেই অশ্রু-জলে পরিপ্লুত হইতেছেন,—যিনি কাতরতা কাহাকে বলে তাহা কখনও বুঝিতেন না, তিনি আজি জননী ও জন্মভূমিকে কাহার হাতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন এই চিন্তাতেই বালিকার মত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন জানিও যে হৃদয়ের দুর্বলতাই তাঁহার রোমে রোমে প্রস্রুত হইতেছে ; হৃদয়ের দুর্বলতাই সেই মহামুহূর্তে তাঁহাকে আত্মহুঃখে অন্ধ রাখিয়া পরহুঃখে দাহন করিতেছে । হৃদয় অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ । একটি বালুকণাকে চঞ্চল সৃষ্টি-শক্তি তুলিয়া দিলে উহা যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিতে না পার, যদি ততক্ষণের জন্যও সমগ্র মনুষ্য জাতির হৃদয়-প্রস্রবণ একবারে শুক রহে, তাহা হইলে এই অবনীর অন্তস্তল হইতে এমন এক অশ্রুত-পূর্ণ হাহাকার ধ্বনি সমুদ্ভূত হয় যে, দূরস্থ গ্রহ নক্ষত্রও তাহাতে চমকিয়া উঠে । হে ধীর ! তুমি ইহার পরও কি হৃদয়ের দুর্বলতার লজ্জিত হইবে ? যিনি এই নিখিল সংসার মধ্যে কেবল আপনাকেই

সার জ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্য হৃদয়ের দুর্বলতার উপহাস কখন ; কিন্তু যিনি আপনার ক্ষুদ্রতাকে পূর্ণতায় প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেন, হৃদয়ের দুর্বলতা তাঁহার চক্ষে লজ্জার নহে । হৃদয়ের দুর্বলতা হেতুই তুমি আমার, আমি তোমার, এই আমার বন্ধু, এই আমার বান্ধব, এই আমার আত্মীয় স্বজন, এই আমার স্বজাতি ও স্বদেশ । হৃদয়ের দুর্বলতা দূরীভূত হইলে, কাহার সহিত আর কাহার কি সম্পর্ক থাকে, বল ।

আমরা হরগৌরী মূর্তির স্ফুট ও অ-স্ফুট দুইটি অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছি, এইক্ষণ ইহার আর একটি অর্থও সংক্ষেপে বিবৃত করিব ; এবং যেমন হৃদয়ের অবমাননায় মনুষ্য মাত্রেরই বিড়ম্বনা হয়, হৃদয়ের অবমাননার সমাজেরও যে সেই-রূপ কি ততোধিক বিড়ম্বনা হইতেছে, তাহা বুঝাইতেই এস্থলে প্রধানতঃ যত্নপর হইব । আমাদিগের বুদ্ধিতে এই হরগৌরী মূর্তিতেই মনুষ্যসমাজের ভাবি সম্পদ প্রতিভাসিত

মনুষ্যসমাজ পৃথিবীর সর্বত্রই নিতান্ত ক্লম, জীর্ণ, ও বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে । সামাজিক জীবনে কোথাও শান্তি নাই, কোথাও সুখ নাই, কোথাও ভবিষ্যতে বিশ্বাস নাই । বাহারা আশা করেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিঃক্ষেপ করেন ; যাঁহারা প্রথম হইতেই নিরাশ, তাঁহারা আশাভঙ্গের তীব্র দুঃখ

অনুভব না করিলেও চিরদিন নিকৃৎসাহ ও মিরানন্দ রহেন। ইহা কেন? সমাজ অবিরত আবর্তিত হইতেছে, অথচ ইহার উন্নতি হয় না;—মনুষ্য সমাজসংস্করণের জন্য, ইতিহাস, অর্থবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সাহায্য, লইতেছে,—কখনও কাবোর সুধারসম্মানে দিবা-শক্তি লাভ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বিবেকের অন্ধশতাড়নে অধীর হইয়া যাহা পুরাতন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু তথাপি মনুষ্যের মনস্তাপ সূচিত হইতেছে না, মনে তৃপ্তি হইতেছে না। ইহার কারণ কি? এই কূটসমস্যা সমাজ-বিজ্ঞানের বীজভূত; আর সাঁহার পণ্ডিত, তাঁহারাই ইহার আলোচনা করিতে সমর্থ, এবং তাঁহারাই ইহার প্রকৃত মীমাংসায় অসমর্থ। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এই প্রশ্ন অবলম্বনে এক এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন; এবং কেহ রাজনীতি, কেহ ধর্মনীতি, কেহ বা সমাজনীতির শত শাখায় বিচরণ করিয়া পরিশেষে যেখান হইতে আরম্ভ সেখানেই অবসরটিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্য-সমাজে যত যত প্রকারের দুরবস্থা ও বিকার পঙ্কিলকৃত হইতেছে, তাহার সমুদয় ওলিই এক-কারণ-সম্ভূত নহে। অতএব, একটি কারণ নির্দেশ করিলেই সমাজের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাধির কারণ-নির্দেশ হইবে, এমন সম্ভব হইতে পারে

না। একদিগে দেখিতেছি আভিজাত্য অভিমান কুমুমকোরকস্ব কীটের মত সমাজের মর্মস্থানে দংশন করিতেছে, সামাজিক-শক্তির বিকাশের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক জন্মাইয়া সমাজ বিশেষকে শতাব্দী পশ্চাৎ রাখিতেছে;—আর একদিগে দেখিতেছি পশুশক্তি ন্যায়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এবং যাহা লজ্জাকর, ঘৃণাকর ও লোকের অহিতকর, তাদৃশ কার্য নিচরকেও অতি মনোহর পরিচ্ছদ দিয়া সমাজে প্রচলিত করিয়া উঠাইতেছে। এখানে দেখিতেছি মনুষ্য, পাপে প্রবর্তনার জন্য, বহুবিধ কটিকর বস্তুর বিপণি সাজাইয়া মনুষ্যকে তাহাতে আহ্বান করিতেছে; স্থানান্তরে দেখিতেছি সাঁহার অপরাধী, তাহার নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের স্বত্ব সকল ভার চাপাইয়া দিয়া আপনারা অম্পৃষ্ট শরীরে সরিয়া পড়িতেছে। সমাজে বিভিন্ন রাজাতীয় ব্যাধির এইরূপ বিভিন্ন কারণ। কিন্তু যদি তথাপি সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া বহু কারণের এক-কারণ নির্দেশ করা আবশ্যক হয়, আমরা অক্ষুণ্ণ মনে বলিব যে, সমাজে হরগৌরীর বিচ্ছেদ, অথবা নর নারীর অসামঞ্জস্যই সমস্ত সামাজিক ব্যাধির মূল। যাবৎ না ইহা তিরোহিত হয়, তাবৎ কি কখনও সমাজ-শক্তির পূর্ণবিকাশ হইবে?

কি উক্ত-ইউরোপ, কি উত্তর-আমেরিকা,

কি গৌরবল্লভ এসিয়া, কি তিমিরানুত আফ্রিকা, ইহার সকল দেশে এবং সকল সমাজেই আমরা মনুষ্যের সমবেত-বুদ্ধি এবং সমবেত-বাহুবলের বিবিধ কার্য দেখিতে পাইতেছি, কোথাও সমবেত-হৃদয়ের কোনরূপ কার্য দেখিতে পাইনা। সুতরাং, যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবলে ও বাহুবলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই জগতের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছে, এবং যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবল ও বাহুবল বিষয়ে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই সবল প্রতিবেশীর পাদপীড়নে দিন দিন অধঃপাতে যাইতেছে। তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, যাহাকে সভ্যতা বল, যে সকল কার্যকে উনবিংশ শতাব্দীর অক্ষয় গৌরব বল, তত্তাবতের অন্তঃপ্রবাহেও কি বুদ্ধিবল এবং বাহুবল ব্যতীত আর কোনরূপ সামাজিক-বল দৃষ্টিগোচর হয়? মনুষ্য উত্তরোত্তর বুদ্ধিবলে বলীয়ান হইয়া সাগরের গর্ভ হইতে মণি, মুক্তা, প্রবাল ও রত্ন আহরণ করিতেছে,—মর্দ্রির পাষাণবন্ধ ভেদ করিয়া আপনার পথ খুলিতেছে; এবং মনুষ্য উত্তরোত্তর বাহুবলে বলীয়ান হইয়া দুর্গ-লের নিষ্পেষণে নিত্য নূতন মহিমা দেখাইতেছে,—যে দরিদ্র তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, যে ধনী তাহার ডাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিতেছে। সমাজে ইহা ছাড়া আর কি হইয়া থাকে? পুরাতত্ত্বের স্তম্ভকে স্তম্ভকে কি এই একই কাহিনীরই নানারূপ ব-

র্ণনা নহে, এবং লোকের কণ্ঠেও কি এই একই কথাই ভ্রমণ করে না? ইংলণ্ড ফ্রান্স, জার্মানী ও রুশিয়া প্রভৃতি সুসভ্যরাজ্যে কোটি কোটি প্রাণী উদরের জ্বালায় অসংখ্য দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অবনীকে কলুষিত করিতেছে; কোন স্থানে গো মহিষের ন্যায় পুত্রকন্যা বিক্রয় হইতেছে; কোন স্থানে গণিকারতির স্রোত ভয়ঙ্করবেগে বহিয়া যাইতেছে; কোথাও আকাশের চন্দ্র তারা জগহতাদি দেখিয়া দেখিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে; এবং কোথাও স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা ও পিতৃহত্যা পাপের অসহ্যভারে পৃথিবী বসিয়া পড়িতেছে; অথচ ঐ সমস্ত রাজ্যের অধিনায়কেরা কেবল নিজ নিজ বাহুবলবুদ্ধি ও অন্যকে বঞ্চিত করিবারই আয়োজন করিতেছেন, সমাজে আর কি হয় না হয় তৎপ্রতি অক্ষিপ করিবারও অরসর পাইতেছেন না। ইহাই কি মনুষ্যসমাজের প্রাকৃত অবস্থা? বিধাতা কি মানব-জাতিকে বুদ্ধি ও বাহু এই দুইটি মাত্র শক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন?—না, মনুষ্যসমাজের সর্বস্বাধীন-বৈভবের জন্য তাহাতে অন্যান্য শক্তিরও অঙ্কুর রোপণ করিয়াছিলেন?

সামাজিক মনুষ্য এ সকল কথার উত্তর দিতে অক্ষম! সে ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রবিকাশের জন্য হৃদয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও, সমগ্রসমাজের জন্য তাহা স্বীকার করে না; সে হৃদয়হীন আটল ও বরজিয়াকে পশু বলিয়া ঘণা

করিতে প্রস্তুত হইলেও, হৃদয়হীন মনুষ্যস-
মাজকে পশুসমাজ বলিতে তাহার ইচ্ছা
হয় না। তাহার এই কামনা যে স্বার্থই প্র-
ত্যেক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে,
বুদ্ধি সেই স্বার্থের অনুসরণ করিবে, এবং
বাহুবল বুদ্ধির সহায় ও সেবক হইয়া ব-
থেষ্ট বিচরণ করিতে রহিবে। সে এই
নিমিত্তই সমাজের একাধিকে সর্ববিধ সা-
মাজিক সম্পদে বঞ্চিত করিয়া গভীরতম
অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছে;—এবং
সে এই নিমিত্তই, যাহারা ক্ষতদেহে প্র-
লেপ, যাহারা রোগে ঔষধ, শোকে শা-
স্ত্রনা, দুঃখে সহানুভূতি, এবং পরার্থ-
চিন্তায় মূর্ত্তিমতী প্রীতি, আজি সমা-
জের হৃদয়স্বরূপ সেই অবলাজাতিতে
কীড়ার পুতুল কি পদসেবার দাসীভাবে
নিয়োজিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।

সমাজের এই অবস্থা কতযুগে পরিব-
র্ত্তিত হইবে তাহা বলিতে পারি না।
সমাজে বর্ণিত্ব ও বর্ণনা দিন দিন যেরূপ
আদির-পাইতেছে, কাব্যে লোকের যেরূপ
অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে, মুদ্রাময়ী মহাদেবতার
প্রভাব ও প্রভুত্ব যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে,
এবং পরস্পরাদি অনুরবাবস্থারে লোকের
অবজ্ঞার ভাব যেরূপ কমিয়া যাইতেছে,
তাহাতে শীঘ্র যে কোন মৌলিক পরিব-

র্ত্তন উপস্থিত হইবে এমনও আশা করি
না। কিন্তু ইহা অকুতোভয়ে নির্দেশ ক-
রিতে পারি যে, যে দিন মনুষ্য, প্রকৃতির
কশাঘাতে উদ্বোধিত হইয়া, সামাজিক-যন্ত্র-
চালনে বুদ্ধিবল ও বাহুবলের সঙ্গে হৃদয়-
বলেরও আবশ্যকতা স্বীকার করিবে, স-
মাজের হরগৌরী সেদিন বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন
না রহিয়া পরস্পর মিলিত হইবে। আর,
যেদিন হইতে এই হরগৌরী-সম্মিলনে স-
মাজের উভয়ার্ধ এক হইয়া, সমাজের স-
ম্পদ-বর্ধনে ও সম্ভাপ-হরণে, সমাজের
শাসনে ও গঠনে সমানরূপে ত্রুতী র-
হিবে, সেদিন হইতে মনুষ্যের শোণিত-
শোষণ অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর-পোষণেই
মানবজাতি অধিকতর মনোযোগ দিবে;—
বিজ্ঞান সেদিন হইতে হত্যাকাণ্ডে সহায়তা
না করিয়া সামাজিক দুঃখ-ভার-মোচনেই
অমুকূলতা করিতে থাকিবে,—বীরের অস্ত্র
অকারণ প্রযুক্ত না হইয়া অনাথ, অনাশ্রয় ও
দীন দুর্ব্বলের বঙ্গ বিধান করিবে;—এবং
সে দিন হইতে শ্বেত কৃষ্ণে তারতম্য, অ-
বস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দা-
রিদ্র্যাপাণের প্রায়শ্চিত্তে কারাবাস, কা-
রাগৃহের নরক, এবং স্বজাতির শ্রীহৃদ্ধির
জন্য পরজাতির অস্থিচর্ষণ প্রভৃতি কলঙ্ক
রাশি পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে।

কবির উপহার ।

(প্রাপ্ত)

রাজন্ !

রত্নগর্ভ পূর্ববঙ্গে তুমি ভাগাবান্

হিন্দুকুলে,

পূর্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;

যে রূপাণ রূপা করি

অর্পিল। ভারতেশ্বরী

তব করে, অক্ষয় তা থাক তব ঘরে,

সমুজ্জ্বল, পূর্ববঙ্গ আশীর্বাদ করে ।

কালের করাল স্রোতে গিরাছে ভাসিয়া

অভাগীর,

কত শত কীর্তিস্তম্ভ,—গৌরব-আধার ;

তাহে পদ্মা বাম পারে,

কে রক্ষিতে পারে তারে,

পূর্ন-ইতিহাস-কথা কহে ধীরে ধীরে

ভগ্নশীলা, বুড়ি গঙ্গা কীর্তিনাশাতীরে ।

এতদিনে অভাগিনী পুছিয়া নরন

সনিশ্বাসে,

বুড়াবে তাপিত প্রাণ, দেখিয়া তোমারে ;

মলিন বদনে আসি,

দেখা দিবে চাক হাসি,

ভগ্নশীলার শি মাঝে দেখিবে এখন,

তব কীর্তি-স্তম্ভ-শোভা নরনন্দন ।

নিম্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে

সমুজ্জ্বল ;

আজি এই আর্ষা ভূমে হায়রে ভেমতি,

ব্রিটিশ-তপন-করে,

শোভিতেছে সুরে সুরে,

চন্দ্রনিভ সংখ্যাতীত নৃপতি মণ্ডল,

ভারতের স্বর্ষ্যবংশ গেছে অস্তাচল ।

আপনি নিম্প্রভ তব প্রভাকর করে

শশধর,

শীতল কিরণজালে যুড়ায় সংসার,

ভেমতি হে নৃপবর,

যুড়াউক নিরন্তর,

আজি হতে বঙ্গভূমি কিরণে তোমার,

হাসুক স্মৃতিতে চির প্রতিবিম্ব তার ।

রচি যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে

ইঙ্গ্রচাপ,

চাতকিনী তুষা তাহে বাড়ায় দ্বিগুণ,

ব্রিটিশ ভাস্কর আজি,

তোমায় ভূষণে সাজি ;—

শুকভার !—বাড়ায়েছে তুষা বাজালার,

যুড়াইবে তুমি বর্ষি দয়ার আসার ।

অন্ধকার অন্তঃপুরে বন্ধ-বিধবার

নয়নাশ্রি,

ঝরে যথা। অনিবার, অদৃশো, আঁধারে,
শোকাতুরা বিহঙ্গিনী,
কাঁদে যথা একাকিনী,

নির্জন কাননে, সেই অরণো রোদন
করে যেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ।

উঠিয়াছে বজ্রে যেই হা অন্ন জ্ঞাতাশ—
হাহাকার!—

না জানি ইহার শেষ হইবে কোথায়,
দরিদ্রতা দাবানলে,
যায় দেশ যায় জ্বলে,
কর এ অনলে দয়া-বারি বরিষণ,
বড় শোভা সমুদ্রের সঙ্গম নয়ন।

কম্পতক হোক ওই হৃদয় তোমার,
মহাভাগ!

দিন দিন দীপ্তি তার হউক বর্দ্ধিত,
প্রসারি তরঙ্গ বজ্রে,
জ্ঞানজ্যোতি পূর্ব বজ্রে ;

শান্তি মুখে পূর্ণ হোক সেই জ্যোতি তল,
লভুক মিরমে অন্ন, তৃষাতুরে জল।

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,
হৃপবর!

রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগর-সমুদ্রা,
হইতেছে দিন, দিন

তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,

দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার
সম্মুখে অতল স্পর্শ রয়েছে তাহার!

বজ্রের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,
দীনাহীনা,

পায় যেন হৃপবর আশ্রয় তোমার,
দিন দিন পল্লবিতা
হয় যেন রসাম্রিতা,

তব যশ পুষ্পে সাজি, কোমল বসরী,
মোহে যেন বঙ্গবাসী, সৌরভ বিতরি।

তুমি রাজা, পুত্রবর 'রাজেন্দ্র' তোমার,
পুণাবান,

মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী ;
মিশি পূর্ব রাজ্যলায়,
যথা পদ্মা মেঘনার

চলেছে অনন্ত মুখে,—বহুক তেমতি
একস্রোতে তব গৃহে মুগ্ধ স্রোতস্বতী।

বঙ্গ ইতিহাস যেন গায় শতমুখে
তবকীর্তি,

লিখে রাখে বঙ্গভাষা অমর অক্ষরে,
বাজালার ঘরে ঘরে,
অনন্ত কালের তরে,

হয় যেন যশোগান—পরম আদরে,
পুনর্ব্বার পূর্ব্ববঙ্গ আশীর্ব্বাদ করে। *

* এই কবিতাটি যশস্বিগণের অগ্রগণ্য, স্বজাতিবৎসল রাজকুমারী কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর তদীয় উপাধিলাভের উৎসব সময়ে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশানুরাগ ও সহৃদয়তা চিরদিনই কাব্যে এইরূপ অভিনন্দিত হইয়া থাকে। (সং)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন

১ । অদ্ভুত রহস্য । কলিকাতা মিত্র এবং কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত । এই রহস্য সপ্তাহে এক ফর্ম্ম করিয়া বাহির হইতেছে । আমরা এপর্যন্ত ইহার যে কয় ফর্ম্ম পাইয়াছি, তাহা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল । ইহার মুদ্রণকার্য্য যেরূপ উৎকৃষ্ট, ইহার লিখনভঙ্গীও সেইরূপ সুন্দর-হারিণী । ভাষা সাধারণতঃ প্রাঞ্জল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সমাসের অমুচিত আড়ম্বর ও অমুচিত অনুপ্রাস একটুকু বিরক্তি জন্মাইয়া থাকে । শব্দ, রসের পরিপুষ্টির জন্য, রসবিষাভের জন্য নহে । এই আখ্যায়িকার এক স্থানে একজনে বিরহবেদনার আকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন,—“ প্রিয়ে ! কোথায় গেলে । তোমার বিরহ আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে । এত কষ্ট সহ্য করা কেবল তোমারই জন্য । হার ! আর কি তোমার সেই অমল-কমল-বিনিমিত-বদন-মণ্ডল দেখিতে পাইব না ! আর কি তোমার সেই কোকিল-কাকলি-সদৃশ কথা শুনিয়া শ্রবণমনের সার্থকতা লাভ করিব না ? আর কি তোমার চন্দ্রাননে সেই আসা-শোভন মধুরহাস্য দেখিয়া নরন চরিতার্থ করিতে পারিব না ? ইত্যাদি—”

আমাদের এরূপ বোধ যে, প্রকৃত দুঃখের সময়ে আস্য ও হাস্য প্রভৃতি রমণীয়

দৃশ্য এবং বেসংসার-অমল-কমল-বিনিমিত-বদন-মণ্ডল-সদৃশ আর্দ্র-করিয়া যাহাতে হৃদয়-মলিন হইতে উছলিয়া উঠে, তাহা গভীরভাবে, সরল ভাষায় পরিব্যক্ত করাই কবিসম্মত ।

অদ্ভুত রহস্যে ঘটনার কিরূপ বৈচিত্র্য আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক । কারণ, গ্রন্থকার আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে ইহা “ কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের উপাখ্যানভাগ অবলম্বনে বিরচিত ” হইয়াছে । কিন্তু একথা বলা নিতান্তই আবশ্যক যে, তিনি অন্তর্দীর কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকিলেও চিত্রনৈপুণ্যে নিন্দনীয় হন নাই । তাহার অনুকৃতি আদরযোগ্য । এই রহস্য বিরতির অবশিষ্ট অংশ কেমন হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম ।

২ । গুপ্তলিপি । কলিকাতা কুপ্রেস হইতে শ্রীযত্ননাথ মণ্ডল দ্বারা প্রকাশিত ।—গুপ্তলিপি পুরাতন গুপ্তকথারই পুনঃসংস্করণ মাত্র । ইহার কচি আমাদিগের নিকট নিতান্ত বিকৃত বোধ হইল । উপম্যাসের লেখা ইদানীং যেরূপ হইয়া থাকে, ইহার লেখা সেইরূপ সরস । কৌতূহলের উদ্দীপন হয় ইহাতে সেইরূপ কাহিনীও অনেক আছে । কিন্তু এক বিকৃতকটির পরিচয়েই আমরা ইহার প্রকাশ-

এই যে কবিতা দোষের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে আমরা মনে মনে কবিতা হইতে দূরীভূত হইতে চাই। দেখিতেছি যে কবিতার এইরূপ সমালোচনা কবিতার পাকবর্ণ সেই কবিতার প্রতিটি বুলিয়া পড়ে। তাহাতে কি মধু আছে, এইরূপ মনে করিয়া অনেকেই একবার তাহার স্বাদ লইতে ইচ্ছা করেন।

৩। পদ্যরঞ্জিনী। প্রথমভাগ। শ্রী-প্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, তিনি ‘এই ক্ষুদ্রপদ্যময় গ্রন্থখানা শিশুগণের উপকার সাধন মানসে বহু যত্ন ও পরিশ্রমে রচনা’ করিয়াছেন, ‘কিন্তু আশানুরূপ ফললাভে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা বলিতে’ পারেন না। আমরা তাহা বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে তিনি কৃতকার্য হন নাই। শিশুদিগের জন্য কিরূপ কবিতা লিখিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না; এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, যাহারা সকল কার্য পরিতাগ করিয়া ইদানীং কেবলই শিশুদিগের জন্য পদ্য লিখিতেছেন, তাহাদিগের অনেকেই তাহা জানেন না। ইহাতে কাল ও অনুতাপ ইত্যাদি শিরোনাম দিয়া যে সকল কবিতা লিখিত হইয়াছে, সেগুলি কোন শ্রেণীর শিশুর জন্য উপযুক্ত হইবে, তাহা আমরা দিগের বুদ্ধির অগম্য। এই পুস্তকখানির মধ্যে আমরা যে কয়টি পংক্তির

প্রশংসা করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহার একটি তুলিয়া দিলাম।

“ছন্দে স্বার্থ সিদ্ধি করা খনের স্বভাব।”

কবিদিগের সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে বিরোধ আছে, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বোধ হয়, কর্তৃপদে আর ক্রিয়া পদে অমর রক্ষা করা তাহাদিগের নিত্য নিন্দাজনক না হইতে পারে। পদ্যরঞ্জিনীর রচয়িতা ঐরূপ নিন্দা ভয়ে ভীত। পাছে তাহার কবিতা কেহ সংশয় করে, এই আশঙ্কায় তিনি অনেকস্থলেই কর্তৃপদে এবং ক্রিয়াপদে অমর রাখেন নাই।

৪। পদ্যসিকান। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বসু। বিরচিত। এখানি শিশুশিক্ষার জন্য রচিত হয় নাই, ইহার এই এক গুণ, ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহার রচয়িতার সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অহি-নকুল-সম্বন্ধ নহে। আমরা ইহার কোন কোন কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু গ্রন্থকারকে আমরা একটি কথা স্মরণ রাখিতে বলিব। তাহার অন্তরে ইহা যেন দৃঢ় অঙ্কিত থাকে যে, ছন্দোবদ্ধ কথা আর কবিতা এক পদার্থ নহে। মুক্তবোধের সূত্রগুলি ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কেহ তৎসমুদয়কে কবিতা বলে না, এবং গদ্যধর ভট্টাচার্যের চৌনচী টীকাকে ছন্দের কোমলবন্ধনে বদ্ধ করিলে তাহাকেও কেহ, ‘অনুমানখণ্ড কাব্য’ কহিবে না। কাব্যের প্রাণ, আর কাব্যের মূলস্থান মনুষ্যের হৃদয়। যে কথা হৃদয় হইতে বাহির না হয়, তাহা আশেষ

শকালকারে অলঙ্কৃত হইলেও কবিতা নহে ।
পদাবিকালে যে কবিতা নাই তাহা নিম্নের
পংক্তি করটি পাঠ করিলেই বিদিত হইবে ।

“ বিষাদ বারতা কহিব কায়,
কলুষ অনলে দহিছে কায় ;
ধরম করমে তুলিয়ে যত,
বিভব সঞ্চয়ে হইনু রত ।
সুখদ-ধরম-রতন তুলি,
লইনু পাপের পদের ধূলি । ”

অমৃদাহ ও উদ্বোধিত বিবেকের ভাষা
এরূপ নহে । যে সকল কবিতায় পাপের
রুচিক দংশন এবং মনের হাহতোন্মি ভাব
বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় মুকুমারমতি প্র-
মুকার এখন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করেন
নাই ; এবং আমরা ভরসা করি তিনি ক-
খনও তাহা অনুভব করেন নাই ।

৫ । চক্রদত্ত অর্থাৎ মহামতি চক্রপাণি
দত্ত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ ;
তত্ত্বসম্বন্ধ নামক টীকা ও বঙ্গানুবাদ স-
হিত । ত্রিকালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্তৃক
সংশোধিত ও প্রকাশিত । বাবু কালীপ্র-
সন্ন সেন যে কার্যের আরম্ভ করিয়াছেন,
যদি তাহা সুসমাপিত হয়, তবে তিনি ব-
ঙ্গীর চিকিৎসকসমাজের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা
ভাজন হইবেন । প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র
আশ্রয় বিবর্তে বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে । ধন-
স্তুরি যে শাস্ত্রের অক্ষর রোপণ করিয়াছি-
সেন, যে শাস্ত্র মুক্তত বাতট প্রভৃতি মন-
স্বিবর্গের উপদেশ বারিতে পরিবর্তিত এবং

চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসা-বিদ্যা-বিদগ-
ণিতবর্গের উৎসাহ ও অধ্যয়নে পল্লবিত
হইয়াছিল,—আজি রামচরণ শীল ও ক-
চরণ শীল প্রভৃতি ‘কবিরাজবর্গের’ ক্ষুরধার
বুদ্ধিতে সেই শাস্ত্র ভুলে খণ্ড খণ্ড হইয়া
পড়িয়াছে, এবং যাহার ইচ্ছা সে ইহাকে
পাদতলে দলন করিতেছে । কবিরাজ ও
চিকিৎসক হইতে আমাদের দেশে এই-
ক্ষণ এক মাস কালও অধ্যয়ন করিতে হয়
না ; ঔষধ সংগ্রহের জন্য একটি কপর্দকও
বায় করিতে হয় না ; ঔষধের পরিচয়
লাভের জন্য কাহারও নিকট কিছুই শিক্ষা
করা আবশ্যক হয় না ; এবং তেমন উৎকট
বাধির লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলেও
ক্ষণকাল ভাবিতে হয় না । কারণ চিকিৎ-
সকেরা এইক্ষণ গুণশীলসম্পন্ন এবং চি-
কিৎসকেরা এইক্ষণ কবিরাজ ! অনেকে
নৈষধের দুই একটি শ্লোক আৱত্তি করিয়াই
চিকিৎসক হন । অনেকে চিকিৎসক হ-
ইবার জন্য একটি পুঁটলিমাত্র সংগ্রহ
করেন । এমন অবস্থায়ও যে আয়ুর্বেদশাস্ত্র
মৃতপ্রায় হইয়াও পৃথিবীতে জীবিত আছে,
ইহা আয়ুর্বেদের সামান্য মহিমা নহে ।

যাঁহারা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষিত হ-
ইতে চাহেন, এই খণ্ডঃ প্রকাশ্য মাসিক
পুস্তকে তাঁহাদিগের প্রভূত উপকার হ-
ইবে । ইহার অনুবাদভাগ এরূপ সরল
হইয়াছে যে, অধ্যাপনা বিনাও তাঁহারা
অনেক কথা বুঝিতে সমর্থ হইবেন ।

আবুল ফজল ।

মুহাম্মদ হাজার লেখনী-প্রভাবে মহারাজ
তোদড়মসের অলৌকিক রাজনীতিজ্ঞতা ;
রাজা মানসিংহ, জরসিংহ, ভগবান দাস
ও বীরবল প্রভৃতি বিখ্যাতমামা নেনানী-
দিগের বীরত্ব এবং সর্বোপরি রাজাধি-
রাজ আকবর সাহের দিগন্তব্যাপিনী কীৰ্ত্তি
অবগত হইতে আমরা সক্ষম হইয়াছি ;
যিনি স্বকাল-প্রচলিত আচার, ব্যবহার,
শাসন প্রভৃতি দর্পণের ন্যায় চিত্র করিয়া-
ছেন ; যিনি একাধারে বিদ্যা, বুদ্ধি, রা-
জনীতি, ধর্মনীতি, সৈনিকনৈপুণ্য প্রভৃতি
বহুগুণের সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন ;
তাঁহার জীবনরত্নাত্ম অতিসংক্ষিপ্ত হইলেও
সাধারণের প্রীতিপ্রদ হইবে এইরূপ আশা
করা অসঙ্গত নহে।—

সিন্ধুদেশে সেখ খিজির নামে এক
জন মুসলিম বাস করিতেন, তিনি কোন কা-
র্য্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক
নাগর নগরে বাস করেন, এই স্থানে সেখ
মবারিক নামে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে ।
মবারিক আরব্য ও পারস্য ভাষাতে এক
জন অতি প্রসিদ্ধ মৌলবি ছিলেন । স-
মগ্র মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন
করাতে, তাঁহার ধর্মমতের এত পরিবর্তন
ঘটে যে, কেহ তাঁহাকে কাফের, কেহ বা
নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল ।

তিনি অচিরেই মুসলিম মত পরিত্যাগ পূর্বক
সিয়া হইলেন ; এবং আগরা নগরীতে
একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্বক দর্শন-
শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে প্ররম্ভ হইলেন । ত-
দীয় বিপক্ষেরা তখন তাঁহার প্রতি এত
নিগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তিনি
বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া সপরিবারে আগরা
হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন ।
এই মবারিকের কয়েকটি পুত্র ছিল, ইহারা
প্রায় সকলেই গুণবান ও কৃতী । কিন্তু স-
র্বজ্যোত্স ফারজি ও তদনুজ আবুল ফজলই
সর্বোপেক্ষা প্রসিদ্ধ ।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তা-
রিখে নাগর নগরে আবুল ফজলের জন্ম
হয় । তাঁহার পিতা মবারিক স্বয়ং এই
পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা দেন । বাল্যকালাবধিই
তিনি নিবিষ্টচিত্ত ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ব-
লিয়া বিখ্যাত । বিশতিবর্ষ বয়ঃক্রমের
পূর্বেই আরব্য ও পারস্য ভাষাতে তাঁহার
একুপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে,
তাঁহাকে লোকে “সেখ আবুল ফজল
এলেমি” * বলিয়া ডাকিত ।

* সংস্কৃতে যেরূপ “বিদ্যাসাগর,”
“বিদ্যাবাগীশ” খ্যাতি, পারস্য ভাষায়
“এলেমি” তদ্রূপ । “এলেম” শব্দের
অর্থ বিদ্যা ।

ফারজি কেবল আরব্য ও পারস্য ভাষায় যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এরূপ নহে; তিনি এক জন প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আকবর সাহের অনুরোধে ইনি সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন করেন; ভাস্করাচার্যের বীজগণিত ও লীলাবতী, এবং মহাভারতভাগবত নলোপাখ্যান স্বয়ং অনুবাদ করেন; এবং বেদ, মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদে অপরাপর পণ্ডিতদিগকে সাহায্য করেন। তিনি নিজেও এক জন প্রধান কবি ছিলেন, এবং পারস্য ভাষায় তৎপ্রণীত অনেক কাব্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহা যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন ফারজির কবিতা-কুশুম্ভের সৌরভে আমোদিত হইয়া, তাঁহাকে “রাজকবির” পদ প্রদান করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফারজির অনুরোধে আবুলফজল সম্রাটের সভায় আহূত হন। তাত্ত্বিক কিছুদিনের মধ্যেই সম্রাটের প্রিয় সহচর ও হৃদয়বন্ধু হইয়া উঠিলেন। আকবর সাহের পৌত্তলিক ধর্মে অবিশ্বাস ও নূতনধর্মমতের আবিষ্কার আপনা হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু এই সহোদরদ্বয়ের সহিত আলাপ ও তর্কবিতর্ক করাতে নবাবিধৃত মত বদ্ধমূল হয়। তদীয় বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণও ইহাদের পরামর্শেই বিকসিত হয়। আকবর ইহাদের সহিত যে কেবল ধর্ম ও বিদ্যা বিষয়েই পরামর্শ করিতেন, এমন নহে। কিন্তু কোন রা-

জাতি ইহাদের প্রাণে বসিয়াছিল। পণ্ডিতের দূতস্বরূপ ফারজি পারস্য প্রেরিত হন। আবুলফজল সম্রাটের নিকট থাকিয়া দিন দিন উন্নতি সাধনে আরোহণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে “চাহার হাজারি মুনসুবদার” (অর্থাৎ চারি সহস্র পত্নাতকের অধ্যক্ষ), ও প্রধান সচিবের পদে আরূঢ় হন। আবুলফজলের প্রতি সম্রাটের অচল বিশ্বাস ছিল। তিনিও অমাত্য ও সৈনিকের কার্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিতেন। প্রভুর কার্য সম্পাদনে তাঁহার এতদূর আগ্রহ ছিল যে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন জইনখাঁ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পরাক্রান্ত ইউসফজি জাতির বিপক্ষে প্রেরিত হন, তখন রাজা বীরবল ও আবুলফজল উভয়েই তদীয় সহকারী হইতে প্রার্থী হন। এবং উভয়ের মধ্যে কে নিযুক্ত হইবেন এই তর্কের মীমাংসা জন্ত সৃষ্টি খেলা হয়, তাহাতে বীরবলই নির্বাচিত হন। তখন প্রভুর কার্য করিয়া যশোভাজন হইতে পারিলেন না বলিয়া আবুলফজলের ক্ষোভের পরিসীমা রহিলনা।

পক্ষান্তরে তাঁহার উপর আকবর সাহেরও কতদূর বিশ্বাস ছিল, তাহারও দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দা-

বুঝাইয়া দিন (ইহাদের মধ্যে কুমার সলি-
মও ছিলেন) যে সেনানী চতুর্দিক কোণ
দুরভিসন্ধিতে একত্র করিতেছেন । সত্ৰাট
এই কথায় ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া প্রধান
সেনাপতি সেখ ফরিদকে ভৎসনা পূর্বক
দুর্গ আক্রমণ করিতে লিখিলেন । তখন
আবুল ফজল সত্ৰ সত্ৰাট সমীপে উপনীত
হইয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন ।
তাহা শুনিয়া সত্ৰাটের ক্রোধ একেবারে
বিস্তারিত হইল, এবং আবুল ফজলের প্রতি
অত্যন্ত সন্তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে সেই দিনই
খান্নেশের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত করি-
লেন । সেখ নবাব আবুল ফজলের প-
দোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি
পাইতে লাগিল । তদীয় আমিরির একটি
উদাহরণ দিলেই, পাঠক তাঁহার ঐশ্বর্য্যের
কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারিবেন । “ম-
রাসিরলুওমরা ” প্রণেতা কহেন “ তিনি
অপর্যাপ্ত আহার করিতেন । প্রতিদিন
স্বপ ও জলবাদে ২২ সের বস্তু ভক্ষণ ক-
রিতেন । আহারের সময় তদীয় তনয় আ-
বদার রহমান ‘ সফরচি ’ স্বরূপ নিকটে
বসিয়া থাকিতেন, এবং প্রধান ‘ বাবু-
রচি ’ ও তথায় উপস্থিত থাকিত । যদি
আবুল ফজল কোন ব্যঞ্জন দুইবার আশ্বাদ
লইতেন, তবে পরদিনও ঐ ব্যঞ্জন পাক
হইত । কোন ব্যঞ্জন ভাল না হইলে তিনি
আবদার রহমানকে আশ্বাদ লইতে পাত্রটি
তাঁহার সম্মুখে দিতেন, তিনি উহার তার
লইয়া প্রধান বাবুরচিকে দিতেন, কিন্তু

আমরা এ বিষয়ের আর একটি উদাহ-
রণ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব । ১৫৯৬
খ্রিষ্টাব্দে সেখ ফরিদ, আবুলফজল প্রভৃতি
চারিজন সেনানীর প্রতি আসির দুর্গ আ-
ক্রমণ করিবার অনুমতি হয় । কিন্তু শত্রু-
পক্ষীয়দিগের সৈন্যসংখ্যা ইহাদের সৈন্য
অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক ছিল বলিয়া,
প্রধান সেনাপতি সহস্রা দুর্গ আক্রমণে
বিরত থাকিয়া, আসির দুর্গের তিনক্রোশ
দূরে শিরিব সংস্থাপন পূর্বক সুর্যোগ অ-
শেষণে রহিলেন । দুই লোকে সত্ৰাটকে

কোম কথাবার্তা হইত না। আবুল ফজল যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন তাঁহার এতদূর ভোজনবিলাসিতা ছিল, যে তাহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না। একটি একাণ্ড স্বপ্নাবারে সহস্র প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রত্যহ আমিরদিগকে বিতরণ করা হইত। তাহার নিকটবর্তী অপর শিবিরে অনাহৃত ও রবাহৃত প্রভৃতিকে খাদ্য দান করিতেন। সমস্ত দিনই খিচরি পাক হইত; এবং তাহার ইচ্ছা সেই খাইত।”

১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কোন গুট মন্ত্রণা করিবার জন্য আকবর সাহা প্রিয়-সচিব আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্য হইতে সত্বর আগরা নগরীতে উপস্থিত হইবার আদেশ করেন। আবুল ফজল তৎক্ষণাৎ আগরাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথি মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের অন্যতর রাজা নরসিংহ দেবের বড়-বজ্রে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। সুবরাজ সলিমের মন্ত্রণায়ই নরসিংহদেব এই নৃশংস কণ্ঠে রতী হন। “ওরাকতে আসদবেগ” * নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে “সেখ মবারকের পুত্র নবাব সেখ আবুল ফজলের আযুতাল যখন পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন সিরঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত সরাইবয়ার নামক স্থানে ১০১০ হিজরী শাকের রবিবরল আওরাল মার্নের সপ্তম তারিখ শু-

* ইহার অপর নাম ‘হালতে আসদবেগ।’

ক্রবার সেই বিখ্যাতিন, ব্যক্তি আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।” “সেই বিধান শ্রেষ্ঠ যখন সিরঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন তদ্দেশের শাসনকর্তা গোপালদাস কহিল ‘আপনার সমভিব্যাহারী সৈন্যেরা পরিক্রান্ত ও পীড়িত, অতএব তাহাদিগকে ইন্দ্রজীত বোন্দেলার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসদবেগের অধীনে রাখিয়া আমার প্রদত্ত সৈন্য লইয়া আগরা গমন করুন।’ গোপাল দাসের সৈন্য সংখ্যা ৩০০ শত ছিল, তাহারা সকলকেই রাজপুত জাতীয় হীন লোক, এবং সকলেই নূতন শিক্ষিত। পরন্তু এই সময়ে নরসিংহদেব দাক্ষিণাত্যে দম্বাতা করিতেছিল; আমরা প্রত্যহ আবুল খাঁর নিকট হইতে তাহার সংবাদ পাইতাম। একপ অবস্থায় অশিক্ষিত, অপদীক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে একাকী যাওয়া কর্তব্য নহে। ইত্যাদি নানারূপ বাক্যে তাঁহাকে নিরুত্তর করিতে আমরা যত্ন করিলাম, কিন্তু তিনি তৎসমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া অখারোহণে গমন করিলেন। আমি সজ্জ যাইতে প্রস্তুত হইলাম; তাহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিরুত্তর হইতে কহিলেন। আমি অগত্যা বিরত হইলাম।” পরিশেষে কিরূপে একজন নীচাশয় রাজপুত-হস্তে আবুল ফজলের প্রাণনাশ হয়, তাহার বিস্তারিত বর্ণন আছে। অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদীয়

এলফিনিষ্টোন সাহেব একস্থানে লিখিয়াছেন, “ এই সময়ে (আকবর সাহেবর সময়ে) ই আবুল ফজলের নৈসর্গিক গুণাবলীর বিকাশ প্রাপ্ত হয় ; এবং এই সময়েই তদীয় চরিত্রের দোষ-নিচয়ও প্রকাশিত হয় । যে কোন কার্যে আকবরের দয়া, জ্ঞান, কিংবা সাহসের অভাব প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা, আবুল ফজল হয়ত তৎসম্বন্ধে নির্দোষ, অথবা তৎস্থানে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন । যে স্থানে পড়, তাহাতেই কেবল আকবরের প্রশংসা ; সুতরাং লেখক ও তদীয় নায়কের চরিত্রে পাঠকের বৈরক্তি উৎপাদন করে । এই অনুচিত চাটুবাদে আকবরের যথার্থ চরিত্র প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে ! তবে তদীয় কার্যকলাপের উদ্দেশ্য, তদীয় বিপদরাশি এবং কি কি উপায়ে তাহা অতিক্রম করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন, এসকল কথা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে অবগত হই । ” অপর একস্থানে কহেন “ প্রিয় পাত্র এবং অভিভাবকদিগকে চাটুকারের ন্যায় অন্তত্বাকো প্রশংসা করা, এবং যে কার্য বিশেষ দোষারূপ নহে, দোষস্পর্শভয়ে তাহাও সত্যের বিকল্পে বর্ণনা করা যে আবুল ফজলের অভ্যাস, ‘আকবরনামা’ পাঠকালে পাঠককে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে । তদীয় আখ্যান ওজোব্বিহীন ; শব্দাঙ্কুরপূর্ণ ও

অপরিষ্কৃত ; স্থানে স্থানে সামান্য চিত্তাশক্তির আভাস আছে ; এবং স্থানে স্থানে নীতিও আছে । কিন্তু উপসংহারে প্রায়ই অভিভাবকের প্রশংসা আছে । ” পরন্তু অপরস্থানে “ আবুলফজল ই আকবরের প্রসিদ্ধ ও প্রিয় সচিব ছিলেন । তদীয় মত উদারতাপূর্ণ ও বুদ্ধিশক্তি অপরিমিত । কিন্তু তিনি একজন আনন্সকারিক ; এবং যেরূপ রচনা ভারতে আদৃত, তদীয় রচনা তদ্রূপ অস্বাভাবিক রচনার আদর্শ । তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং রাজার ও রাজ সচিবদিগের গুণের ব্যাখ্যা, দোষের গোপন, এবং তাঁহাদিগের মহিমা কীর্তন করা তাঁহার স্বার্থ । ”

এলফিনিষ্টোন খান বিলাতি সাহেব ; তিনি বিলাতি কচিকে আদর্শ করিয়া, উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আদর্শ করিয়া, এবং মেজর প্রাইসের সংক্ষিপ্ত অনুবাদিত আকবর নামা সম্মুখে রাখিয়া, আবুলফজলের এত দোষ কীর্তন করিয়াছেন । সুতরাং এ স্থলে বলা অনাবশ্যক যে তিনি বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । নৃপতি ও অন্নদাতার গুণানুবাদ এবং মুহূদের গুণকীর্তন এ দেশী শাস্ত্র সম্মত, এবং রীতি সম্মত ; সুতরাং তাহাতে তাঁহাকে পক্ষপাতী বা চাটুকার বলা যার পর নাই বিদ্বেষিতা । এলফিনিষ্টোন যে বলেন, আবুলফজল জাতিসারে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার ন্যায় ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই । অনুবাদ

আমরা জানি, তাহার অনেক
কিন্তু আকবরের প্রতি প্রতিভাই তাহার
কারণ। তত্তৎ স্থান ভিন্ন যে সকল অ-
ত্যাক্তি আছে, তাহা আবুলফজলের অ-
লঙ্কার-প্রিয়তার ফল, চাঁটুবাদের ফল
নহে। তদীয় রচনা প্রণালীর দিচার ক-
রিবার সময়ে ইয়োৰোপীয় উন্নত ইতিহা-
সের সহিত তাহার তুলনা করা অনুচিত ;
তিনি যে দেশের লেখক, তদেশীয় অপরা-
পর লেখকের সহিত তাঁহার তুলনা করাই
একমাত্র ন্যায্য সঙ্গত। ”

প্রসিদ্ধ পারস্য ভাষাবিদ ত্রীমুকু
বুকম্যান সাহেব স্বীয় অনুবাদিত আইন
আকবরীর উপক্রমণিকায় কহিয়াছেন—
“ ইয়োৰোপীয় পণ্ডিতেরা আবুলফজলকে
চাঁটুকীর ও সত্যের অপলাপকারী বলিয়া
নিন্দা করিয়াছেন। একবার নিবিষ্টচিত্তে
‘আকবরনামা’ অধ্যয়ন করিলেই প্রতিপন্ন
হইবে যে, এরূপ নিন্দাবাদ যারপর নাই
অমূলক। এ দেশস্থ অপরাপর ইতিহাসের
সহিত ইহার তুলনা করিলে দেখা যাইবে
যে, তিনি অপরের অপেক্ষা কম প্রশংসা
করিয়াছেন, এবং যতটুকু প্রশংসা করিয়া-
ছেন, তাহাতেও স্মৃতি ও আত্মগৌরব
বিকল্প কিছুই নাই ; এ বিষয়ে ভারতবর্ষের

অন্যান্য ঐতিহাসিক ও কবি অধিকতর
দোষী। দেশীয় কোন লেখকই তাঁহাকে
চাঁটুকীর বলেন নাই। আবার আমরা
কথা যখন মনে করি, যে রাজার মত
অন্যায় কি ন্যায়ানুমোদিত হইক, এ দে-
শের সমস্ত নীতি ও ধর্মশাস্ত্রমতে তাহা
প্রজার অনুমোদন করা কর্তব্য ; পরন্তু এ-
দেশীয় কাব্য মাঝেই যখন জঘন্য অত্যাক্তি
রহিয়াছে ; তখন আকবরের ন্যায় ন্যায়-
কের প্রশংসা জন্য আবুলফজলকে কোনও
দোষ দেওয়া যায় না। ”

দোষশূন্য লোক নাই ; সুতরাং আ-
বুলফজলও যে দোষগুণ সমস্তিত তাহা
আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তদীয়
গুণের ভাগ এত অধিক যে, এলফিনিষ্টোনও
স্থানে স্থানে তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও অষ্ট
লেখক বলিয়া প্রশংসা না করিয়া পারেন
নাই। ড্রাইডন একস্থানে কহিয়াছেন—
‘ দোষ ভাসে তৃণসম জলের উপরে ।

গুণরত্ন সাগরের গারভে বিহরে । ’

তাই বলিয়াই আকবরনামার প্রাইসকৃত
ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে এলফিনিষ্টোনের
চক্ষে অধিকাংশ দোষই পতিত হইয়াছে।
মূলগ্রন্থরূপ রত্নাকরগড়ে অবতরণ করিতে
অক্ষম বশতঃ গুণ তত দেখিতে পান নাই।

“ মাসিরালওমরা ” প্রণেতা আবুলফ-
জলের ধর্মমত প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লি-
খিয়াছেন। “ কেহ কেহ আবুলফজলকে
বিধর্মী, কেহ হিন্দু, কেহ অগ্নি-উপাসক,
এবং কেহ নাস্তিক বলিয়াছেন। ফলতঃ

তিনি 'সুফি' ধর্মাক্রান্ত ছিলেন, এবং অপরাপর সুফির ন্যায় আপনাকে মহামুদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তিনি যে অতি উন্নত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং সকলের সহিতই সৌখ্যভাবে বাস করিতে যে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কখনও অন্যায় বা ক্যা মুখে আনিতে ন। উৎকোচ গ্রহণ, বেতন প্রদান না করা, অর্থনগু করা প্রভৃতি তাঁহার পরিবার ও ভূতাবর্গ মধ্যে ছিল না। তিনি একবার কাহাকে কোন কর্ণে নিযুক্ত করিলে, সে অকর্মণ্য হইলেও তাহাকে পদচ্যুত করিতেন না। তিনি কহিতেন 'অকর্মণ্য ভূতাকে পদচ্যুত করিলে লোকে প্রভুকেই নৃখ বিবেচনা করে; কারণ কর্মণ্য কি না নিয়োগের পূর্বে তাহা দেখা উচিত ছিল।' বৎসরের প্রথম দিনে তিনি পূর্ব বৎসরের শেষ দিবসে তদীয় পরিবার মধ্যে যে যে বস্তু যে পরিমাণ রহিয়াছে, তাহার তালিকা করিতেন, এবং উহা নিজের নিকট থাকিত। পূর্ববৎসরের কাগজাদি দগ্ধ করিয়া ফেলাইতেন। পাঞ্জামা ব্যতীত সমুদায় পুরাতন বস্ত্র ভূতাদিগকে দান করিতেন; পাঞ্জামা গুলি দগ্ধ করিতেন।"

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুমার সলিমের (জাহাঙ্গীরের) কুমন্ত্রণায় নরসিংহদেব আবুলফজলের বিনাশ সাধন করে। জাহাঙ্গীর স্বপ্রণীত "ওয়ার্ডে

জাহাঙ্গীর" গ্রন্থে স্বয়ং তাহার স্বীকার করিয়াছেন। এবং আকবরের মৃত্যুর পর এই নরহত্যাকারীকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কার ও উচ্চপদ প্রদান করেন। বোখারার রাজা আবদুল্লাহ কহিতেন "আবুলফজলের লেখনীকে আমি যত ভয় করি, আকবরের শাসিত শরকে তত ভয় করি না!" আবুলফজলের ক্ষমতা এইরূপ অসীমই ছিল। এই অসীম ক্ষমতাতে ভীত হইয়াই জাহাঙ্গীর এরূপ নৃশংস কার্যে ব্রতী হন।

পূর্বে বলা হইয়াছে আবুলফজলের প্রতি আকবর সাহেব অকৃত্রিম প্রেম ও অচল বিশ্বাস ছিল। আসদ, এনারতউল্লা প্রভৃতি সকলেই কহিয়াছেন, আবুলফজলের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আকবর শোকে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিন দিবস তাহার নিদ্রা ও শয্যাশুশুন পরিত্যাগ পূর্বক বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। পুত্রকলত্রাদির সহিত পর্যাস্ত সাক্ষাৎ করেন নাই। চতুর্থ দিবসে রায়রায়ান আবুলফজলের প্রিয় সহচর আসদবেগকে সমীপে উপস্থিত করিলে, আবুলফজলের সমস্ত বিবরণ শ্রবণ পূর্বক শোক ভুলিয়া ক্রোধে অধীর হন, এবং হত্যাকারী নরসিংহ দেবের বিরুদ্ধে রায়রায়ান, বিক্রমোজিত সিংহ, ও আবুলফজলের পুত্র আবদুর রহমানকে প্রেরণ করিলেন। নরসিংহ দেবের রাজধানী ভূমসাং হয়, তদীয় রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, এবং তদীয় আত্মীয় বন্ধুবর্গ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত।

হয়। কেবল স্বয়ং চন্দ্রবেশে নানা দেশে
পার্বটন করিয়া প্রণরক্ষা করিতে সমর্থ
হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আবুলফজলের পুত্র

জাভা, সহচর, বন্ধুবান্ধব সকলের প্রতিই স-
ত্রাট সান্তিশর অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।
এবং আসদবেগকে উচ্চপদ প্রদান করেন।

শ্রীজ—

দেবোপাখ্যান।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ।)

সপ্তম প্রস্তাব।

ইন্দ্রাদি দেবগণ।

ইন্দ্র দেবরাজ। সূর্য্য, সোম, যম, কা-
লাদি দেবগণ তাঁহার অধীন। বৈদিক ভা-
রতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিদেব। মিত্র, ব-
রুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-প্র-
লয়-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাই। দে-
বরাজ্যে শান্তিরক্ষার্থ তাঁহাকে সর্ব্বদা পরি-
শ্রম করিতে হইয়াছে। অনুরদিগের উপ-
দ্রব নিবারণার্থ সর্ব্বদাই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে
সমুদায়ী থাকিতে হইয়াছে। আবার যখন
সমরারম্ভে শান্তিস্থখে বিচার করিতে ব-
সিয়াছেন, তখন তিনি মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম। বি-
চারকার্য্য সমাধা হইলে, শচীসহ নন্দনকা-
ননে অবস্থান করিয়া স্নখে কালাতিপাত
করিয়াছেন। ইন্দ্রের এই প্রকৃতিতে গম্ভী-
রতা ও উচ্চতা এত ছিল যে, গ্রীসের সর্ব্ব
প্রধান দেব যিগসও তাঁহার তুল্য নহেন।

যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব, ই-
ন্দ্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া তিন

শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইল। ত্রিমূ-
র্ত্তির আনির্ভাবে তাঁহাকে অধীন হইতে হ-
ইল। কেবল দেবত্রয় নয়, তাঁহাদের সহ-
ধর্ম্মীগণও উপাসনা বাতীত ইন্দ্রের প্রতি
শ্রদ্ধা হইতেন না। একবার ইন্দ্র দেবা-
দিদেব মহাদেবের মায়ায় একস্থানে তাঁ-
হার নিজের নায় পাঁচজন ইন্দ্র দেখিতে
পাইলেন, তাহাতে তাঁহার অভিমান এ-
কেবারে কমিয়া গেল; সম্পূর্ণরূপে মহাদে-
বের অধীন ও আজাবহ হইলেন। তাঁহার
আদিদেবত্ব রহিল না। কিন্তু তথাপি উপা-
সনার সময় ভক্তের চক্ষে তিনি ঈশ্বর এবং

“ বজ্রস্য ভর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা

রত্নস্য হস্তা নমুচের্নিহস্তা,

রুক্ষো বসানো বসনে মহাত্মা

সত্যানুতে যো বিবিনক্তি লোকে।

যো বাজিনঃ গর্ভমপাং পুরাণং

বৈশ্বানরং বাহনমভ্যুপৈতি,

নমোহস্ত তস্মৈ জগদীশ্বরায়
লোকত্রয়েশায় পুরন্দরায় । ” *

ইত্যাদি বাক্যে স্তুয়মান ।

পুরাণ-বর্ণিত ইন্দ্রের শক্তি বিস্তর ধর্ম
হইলেও তাঁহার সহিত গ্রীকদেবগণমধ্যে
মাত্র যিস্ হইতুলনেন। উভয়ের অনেক
বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে । ইন্দ্র দেবরাজ,
যিস্ও দেবরাজ । ইন্দ্র বজ্রধর, যিস্ও
বজ্রধর । দেবশত্রু-দানবদমনে মহর্ষি দধী-
চির পবিত্র অস্থি, দেবশিষ্যী বিশ্বকর্মা ক-
র্তৃক বজ্রনামক অমোঘাত্রে পরিণত হইল ;
সেই অসাধারণ দৈব অস্ত্রের অপ্রমেয় তেজে
দানবকুল নির্মূল হইল ; দানববর্ষত রক্ত স-
বংশে নিহত হইল, দেবগণ নির্ভীকচিত্তে
স্বর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন । হি-
ফেষ্টস্ আপন পিতা যিস্‌য়ের জন্য অশনি-
নামক অমোঘাত্রে প্রস্তুত করিলেন, সেই
অব্যর্থ অস্ত্রে টাইটানকুল নির্মূল হইল, দে-
বগণ নিশ্চিন্ত হইলেন ।

দেবরাজের অনুগ্রহ না হইলে রুষ্টি
হয় না, মেঘ সকল তাঁহার আদেশব্যতীত
স্থান হইতে নড়িতেও পারে না । পৃথিবীর
উৎপাদিকা শক্তি কাজে কাজেই ইন্দ্রের
উপর নির্ভর করে ; এই ণ্ডে ইন্দ্র এ-
পোলো না সূর্যের অনুরূপ । যিস্‌সর্গও
নীরদারিত ।

আকাশে নানাবর্ণে রঞ্জিত বহুস্বরিত
যে ধনু মধ্য মধ্য দেখিতে পাওয়া যায়,

* মহাভারত, আদিপর্ব, তৃতীয় অ-
ধ্যায়, ১৪৮ এবং ১৪৯ শ্লোক ।

সেই ইন্দ্রধনু যে ভয়ঙ্কর শক্তি নিহিত
ওয়া যায়, তাহা শুধুমাত্র নৈমিত্তিক নিতী-
নাদ । ইন্দ্রের শাসনে নিতান্ত অশান্ত
এ সকল বিষয় ইন্দ্র যিস্‌য়ের
আবার ইন্দ্রের উদ্ভাবিত
কনি, কনি, কনি, কনি
ইয়া যে ইন্দ্রের অমর্যাদিত
মেয় নন্দনকানন রচনা করিয়াছেন ; তা-
হাতে উর্ধ্বাণী, মেনকা, রত্না প্রভৃতির অ-
ভাব নাই । অলম্বুধা, মিশ্রকেশী, বিদ্যাৎ-
পর্ণা, তিলোত্তমা, অকণা, রক্ষিতা, রত্না,
মনোরমা, সুরকেশিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ
পুরী আলোকিত করিয়া থাকে । স্বয়ং ক-
ন্দর্প, প্রিয়সখা বসন্তসহ, চিরকাল নন্দনে
বিরাজমান । তাহার পরও শত অহল্যা
ইন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত ! এ বিষয়ে যিস্
হইতে ইন্দ্র হান নহেন । তবে বিশেষ এই
যে, যিস্ দেবাদিদেব, দেবমানবের আ-
দর্শ হইয়া দুর্জয়-প্রকৃতি । ইন্দ্র, ত্রে-
ঈদেবগণের অধীনস্থ বিলাসলোলুপ শা-
সনকর্তা ।

সূর্য উদয় হইয়া গ্রীষ্ম ও ভারতবর্ষ
উভয় দেশেই নিরপেক্ষভাবে আলোক
বিতরণ করেন, সূর্য্যদেব দুই দে-
শেই প্রায় একপ্রকৃতিবিশিষ্ট । উভয়েরই
প্রচণ্ড প্রতাপ, দুর্জয় শক্তি, ও উজ্জ্বল
কবিগণ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন ।
আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই একরূপ ।
তবে বিশেষ এই যে লেটোনা-নন্দন কি-
ঞ্চিৎ সূনদর্শী, আদিত্য সূর্য্যদর্শী । যিনি

বুদ্ধিতে রহস্যময়, শিশু-বিশ্বকর্মা, কলহ-
প্রিয়তার নামে প্রতারণার স্বরূপে চিত্রিত
হইয়াছে। সেই নিকপিত প্রতারণার প্রতীক-
স্বরূপে পদে পদে প্রতারণার কল্পিত
প্রতীকস্বরূপে প্রতারণার সত্যপ্রকাশ-
স্বরূপে গোপন

আদিত্যের নামান্তর ও রূপান্তর ব-
শতঃ জন্মরত্নান্ত নানা প্রকার । তাঁহাকে
আদিত্যের পুত্র বলিয়া উপাসনা করাই প্র-
চলিত রীতি । দ্বিগতাস্রত অকণ্ড সূর্য্য ।
আবার রুহস্তানু, চন্দ্র, আত্মা, বিভাবসু,
সমিতা, সূর্য্যক, অর্ক, ভানু, আশাবহ, রবি,
মহা ; অথবা তাহাদের নামান্তর, দিক,
বাত, অর্ক, প্রচেতা, অগ্নি, বহু, ইন্দ্র, উ-
পেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও রুহস্তাতি, দি-
বের এই এগার পুত্রের প্রত্যেককেই সূর্য্য
দেব বলিয়া বোধ হয় । মহাপুত্র দেবভ্রাট,
তৎপুত্র সূর্য্যভ্রাট । সূর্য্যভ্রাটের তিন পুত্র ;—
দশজ্যোতি (অগ্নি), শতজ্যোতি (চন্দ্র)
এবং সহস্রজ্যোতি (সূর্য্য) * । চন্দ্র ও
সূর্য্য নামে দুইটি দানবও ছিল । এইরূপ
এক প্রকার ও একার্থক নাম-বাহুল্যে সূর্য্য-
দেব-প্রকৃতি কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া উঠিয়াছে ।

আলোচ্য বিষয় দেখা যাউক । আ-
দিত্য ও এপোলো উভয়েই রূপবান্ ও শু-

* বিজ্ঞান জ্ঞান দেখ । মহাভারতের
পূর্বে সূর্য্যের তেজ, অগ্নিহইতে শতগুণ
নির্গম হইয়াছিল । এ তত্ত্ব এত দিনে ই-
য়োয়োপে প্রকাশ হইয়াছে ।

ণবান্ । উভয়েতেই উপাদিকা শক্তি,
সুতরাং কুমারী কৃত্তী কর্ণের জননী এবং
সূর্য্যের প্রণয়িনী ; আর পরী করোনিম্
এপোলোর প্রণয়িনী । কৃত্তী তাহার পর
ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বামীরূপে গ্রহণ ক-
রেন, করোনিম্ এপোলোকে অবজ্ঞা ক-
রিয়া অন্য একজনের প্রণয়পক্ষে নিমজ্জিত
হন । বিশেষ এই যে হিন্দু কবি সাবধা-
নতার সহিত স্বামীর অনুমতি ও দৈব ঘট-
নার বর্ণনা করিয়া মানবীর সতী নাম স্থির
রাখিয়াছেন ।

সূর্য্য উদয় হইয়া জাগতিক অস্ত্রীক্ষে
পরিভ্রমণ করেন, প্রসিক পক্ষধারী হরিত
নামক অশ্ব তাঁহার শকট বহন করিয়া ল-
ইয়া যায় । উষম্ তাঁহার দ্বার উদ্ঘাটন
করিয়া দেয় । এপোলোও উদয় হইয়া
রথারোহণে আকাশ-ক্ষেত্র ভ্রমণ করেন,
তাঁহার কন্যা ইয়ম্ তাঁহার দ্বার উদ্ঘাটন
করিয়া দেয় । সূর্য্য সহোদরা উষম্, এ-
পোলো দুহিতা ইয়ম্ বা অরোরী এক
প্রকৃতি বিশিষ্ট । আবার ইয়মের সহিত
তপন তনয়া তপতীরও বিলক্ষণ সাদৃশ্য
আছে । উভয়েই প্রভাতদেবী, পরমসু-
ন্দরী । উভয়েরই অঙ্গুলি সকল গোলাপবৎ
রক্তিমাত ও মনোহর ।

সূর্য্যপত্নী দুই । অন্তরীক্ষে অগ্নিনী কু-
মারদ্বয় প্রসব করেন, কিন্তু গ্রীসের অ-
গ্নিনী-কুমার ক্যাম্‌টর ওপোলকস্ যিয়-
সের সম্ভান ।

এক সময়ে সূর্য্যও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-

কর্তা রূপে উপাসনা প্রাপ্ত হইতেন ; ক্ষে-
ত্রে এবং গায়ত্ৰীতে তাহা স্পষ্ট বুঝা
যায়। গ্রীকদিগের মূর্তি এত ক্ষমতাশালী না
হইলেও অনেক গুণ বিশিষ্ট। সঙ্গীতশাস্ত্র,
কাব্যশাস্ত্র, কবিত্ব, এবং দেবত্ব তাঁহারই
হস্তে। হার্মেসের নিকট হইতে যে বীণা
প্রাপ্ত হন, তাহাই সঙ্গীত ও কবিত্বের মূল।

দেখা গেল এপোলো ও আদিতা এ-
তদূতয়ের কার্যতায় পার্থক্য থাকিলেও
কাহাকেও বড় অধিক প্রশংসা করিয়া
প্রাধান্য দেওয়া যায় না।

এক্ষণে ডায়োনা ও চন্দ্র চরিত্র আ-
লোচনার বিষয়। কিন্তু ডায়োনা দেবী,
চন্দ্র দেব। ডায়োনা দেবসেনাপতি কুমা-
রের ন্যায় চিরকুমারী, চন্দ্র কলঙ্কী। হিন্দু
কবি অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেব-
বৎ চন্দ্রকেও পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন।
তাঁহার বক্ষঃস্থ কলঙ্ক, সকলকে বুঝাইতে,
চকুপত্নী তারার অবতারণা করিয়াছেন।
চন্দ্র সত্য তারার অভাব নাই, আবার
চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে, কবি এ সুর্যোগ
ছাড়িতে পারেন নাই, কলঙ্ক বাধ্য ক-
রিয়া শশাঙ্ককে কলঙ্কিত করিলেন। তাঁ-
হার মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, শশী প্রভৃতি
নামে যে দোষ গোপন করিয়াছিল, তাহা
প্রকাশ পাইল।

গ্রীক কবি দেখিলেন সুরঙ্গীর বদন-
সুধাকর ব্যতীত পূর্ণসুধাকরসহ উপায়ের
বস্তু জগতে আর নাই। সুরঙ্গীর স্বভাবে
মৃদুতা, সরলতা ও মধুরতা বিরাজ করে ;

সুধাকরের কোমলমুখের মৃদুতা, শৈত্য ও
সুখসেবাতা প্রচুর আছে। সুরঙ্গীর সর-
লতা-পূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে শরীর শীতল
করে, চন্দ্রমার কোমল কোমলমুখের তাপিত
চিত্তে শান্তিলাভ করে। সুরঙ্গী চন্দ্রমা
অবশ্যই দেবী।

দেবী অথচ পবিত্রা। এমন নির্মল,
এমন সরল বস্তুতে পবিত্রতা না থাকিলে
জগতে আর পবিত্রতা কোথায় থাকিবে ?
সুরঙ্গী ডায়োনা কুমারী। নিরপেক্ষভাবে
বিশ্লেষণ করিলে এই মনোহারিনী কল্প-
নার গ্রীক কবিরাই প্রশংসা করিতে হইবে।
পূর্ণশশধরে অন্তঃকরণে যে পবিত্রতা জ-
ন্মায়, বনদেবী স্বরূপা, মেষপালিকা, অ-
থবা শবরী-রূপিণী ডায়োনা দেবীর আকৃতি
ও প্রকৃতিতেও তাহাই করে। আর্টিমিস্
গ্রীসে পবিত্রতার আদর্শ।

ভারতকবি বর্ণিত বিরহবিধুর নায়ক
এবং প্রেমিতভক্তিকা নায়িকা মদনসহচর
ইন্দুকিরণ অসহ্য বিশ্লেষণ করিয়া অন্ধকার-
স্বপ্নে অন্ধকারে বসিয়া থাকেন। • গ্রীক-
কবিবর্ণিত নিরাশাপণয় যুবকযুবতী অবিচ-
লিত পাষণদগ্না ডায়োনা দেবীর শরণ-
পন্ন হন। কিন্তু যাহাদের আশা আছে,
তাঁহারা ডায়োনা প্রকৃতির অজ্ঞেয়তাব দে-
খিয়া ভীত হন এবং দূরে অবস্থান করেন।

ডায়োনা-প্রকৃতি অজ্ঞেয়, সুরঙ্গী আ-
র্টিমিস্ স্ত্রীলোক হইয়াও পুরুষাকার-বি-
শিষ্ট। শশা পুরুষ, কিন্তু এমন দুর্বল ও স্ত্রী
প্রকৃতি যে, বিদ্যাবুদ্ধি গৌরব থাকা সত্ত্বেও

শ্রী হইবার উপযুক্ত। উায়েনা এপোলোর
সহোদরী। যেমন ক্রিরাঙ্কিতনরা লক্ষ্মী
এবং চন্দ্র উভয়েই একস্থান হইতে উৎপন্ন
আর্টিমিস ও এপোলনও তদ্রূপ। আর্টি-
মিসে ও চন্দ্রে বিস্তর সূন্দরতা আছে।
কিন্তু প্রথমোক্তে পবিত্রতা অবিকৃত থা-
কায় এস্থলে গ্রীকদেবীরই শ্রেষ্ঠত্ব অবিসং-
বাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

অতঃপর বকণের সহিত নেপ্চুনের,
পবনের সহিত ইয়োলসের, যমের সহিত
প্লুটোর এবং অগ্নির সহিত ভল্কানের
তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক
নাম সকল বাঙ্গালায় এমনই নীরস শুনায
মে, যাঁহাদের এ সমস্ত বিষয় আলোচনা

কৌতূহল আছে, তাঁহারাও মনোযোগ ক-
রিয়া পড়িতে পারেন না। দীর্ঘকাল হ-
ইল একরূপ প্রস্তাব পাঠে পাঠকগণও
ঈর্ষ্যা অব্যাহত রাখিতে কষ্ট বোধ ক-
রেন। অপিচ উল্লিখিত দেবগণ মধ্যে
কোন কোনটির প্রকৃতি স্থানান্তরে অন্য
দেবসহ উপমিত হওয়ার পুনরুক্তি দোষও
হইতে পারে। অতএব ঐ কয়েকটি তু-
লনা পাঠকগণ আপনা আপনি করিয়া
লইবেন বলিয়া লিখিতে বিরত থাকিলাম।
পারবর্তী প্রস্তাবে দুই দেশের অতি সুদৃশ্য,
দুই একটি চিত্র প্রদর্শন করিয়া, নবম প্রস্তাবে
সাধারণ সমালোচনা এবং দশম প্রস্তাবে
উপসংহারভাগ লিখিতে বাসনা রহিল।

শ্রী ব্র—

নন্দাদার প্রতি।

১

নন্দন মৌরভময়ী নিদাঘ-যামিনী ;

শান্ত বিশ্ব চরাচর

পঙ্কিান্ত কলেবর,

অনন্ত নীলীমা মাখা তারাময় নীলাঙ্গর,

মরি কি যামিনী শ্যামা কমলীয় মনোহর ;

২

নীরব প্রকৃতি-বালা, নীরব যামিনী,

নীরবে গগনতলে

শশধর ঝলমলে,

শশাঙ্ক চুসনে মহী মূহ হেঁসে পাগলিনী,

পরিয়া শ্যামল-কণ্ঠে সুবিমল কোমুদিনী।

৩

সচন্দ্র যামিনী বসি ; নন্দা বেলার

নিরখি নন্দন ভরে

উছলি তরঙ্গ-থরে,

কল কল মূহু শ্বনে নীরময়ী তরঙ্গিনী

বহিতেছে অবিরাম নীল-অম্বু-উদ্দেশিনী।

৪

চুসিয়া দোলন চম্পা অনিল সঞ্চরে,

বেল-যুই-পরিমল

করে প্রাণ সুশীতল,

সমীরণে তরঙ্গিরে মর মরে নব দল,

উন্মাদিনী তরঙ্গিনী সিহরিছে অবিরল।

৫

প্রক্ষুটিত চন্দ্রকরে কল-নির্নাদিনী,
নর্ঘদার নীল জলে
চন্দ্র কৌমুদিনী জ্বলে ;
নীলাশ্রুঙ্গীর কোলে শশ শত শশধর,
প্রেমে তরলিত হয়ে, চঞ্চলিছে নিরন্তর ।

৬

চঞ্চলা নর্ঘদা অয়ি ভুবন সুন্দরি !
সলিল অলকে মরি,
মালতীর মালা পরি,
মৃদুল ককণ গীতে দিশ বিমোহিত করি,
কোথা যাও নেচে নেচে তরঙ্গিণী-কুলেশ্বরী,

৭

এমন অমৃতমুখী মধু নিশীথে,
বিনাইয়া মৃদু স্বরে,
কাঁপাইয়া নীলাশ্বরে,
কেন আজি কমলিনী কাঁদিতেছে অবিরাম,
কোন দুঃখে বল নদি, বিদরে তোমার প্রাণ।

৮

হেরিয়া কি ভারতের মলিন বদন,
তরঙ্গের রব সনে,
মিলায়ে, ব্যথিত মনে,
অভাগিনী ভারতের অনন্ত বিষাদ-গান,
মাগর-সদনে নদি, বহিতেছে অবিরাম ।

৯

সেই দিন সেই দিন, আছে কি স্মরণ,
যেই দিন তুমি নদি,
কলনাদে নিরবধি,
ভারতের বশোগীতি মনের অনন্ত স্মৃতি,
মাগর-সদনে মরি বহিলে সহস্র মুখে ;—

১০

সেই দিন কোথা আজি বল তরঙ্গিণী ;
সেই তুমি প্রেম আশে,
বও মাগরের পাশে ;
সেই অই পূর্ণ শশী, প্রকৃতির নীল ভালে,
সেই এই নিশীথিনী খচিত কুমুমজালে ;

১১

শোভার ভারত সেই নীলাশ্রু-চুড়িতা,
সেই ফুলময়ী উষা,
কুন্তলে কুমুম ভূষা,
সেই কোকিলের কণ্ঠে কুল-স্বর মধুময়,
সেই অরবিন্দ-বনে গুঞ্জরে ভ্রমরীচর ;

১২

সুখের শরদে সেই ভারত মন্দিরে,
জুড়াতে তাপিত প্রাণ,
তাজিয়া কৈলাস ধাম,
আবিভূতা হুম মাতা মৃত্যুঞ্জর-বিমোহিনী
অনন্ত-পাবনী উষা অন্নপূর্ণা নিস্তারিণী ;

১৩

এই সেই আর্ধ্য ভূমি, শোভার নিলয়,
সেই নদী তরু জল
বিদ্যমান অবিরল,
সেই ভারতের কোলে চন্দ্র তমসিনী লীন ;
সব বিদ্যমান কিন্তু কোথা আজি সেই দিন !

১৪

প্রবাহিত সময়ের তরঙ্গিণী-তলে,
অমূল্য রত্নের প্রায়,
সকলি রয়েছে হার !
কালের অনন্ত স্রোত তাহার উপরে বয় ;
যাবে দিন, যাবে যুগ, কখন কি হবে লয় ?

১৫

বল তুমি তরঙ্গিণি, বল কত দিনে,—

কত দিনে পুনরায়,

সেই রক্ত-রাশি ছায় !

ডুবিয়া কালের অই অনন্ত নদীর জলে,

ভারত সম্মান কবে উত্তোলিবে কুতূহলে।

১৬

এক দিন দেখিয়াছ তুমি তরঙ্গিণি,

ভারত সম্মানগণে,

পশিতে দুর্বার রণে,

বীরমর্দে রক্ত-তেজে টলমলি ধরাতল,

বিজয় আরাবে পুনঃ বিদারিতে অভিস্রল।

১৭

একদিন নদি, তব অই শ্যাম তটে,

চমকিয়া ত্রিভুবন,

ঘটিল ভীষণ রণ,

এক দিন তরঙ্গিণি, তোমার সুনীল জল

যবন-শোণিতে হল রক্ত-বর্ণ অবিরল।

১৮

এক দিন তুমি সেই অচল-নন্দিণি,

গরজি গম্ভীর স্বনে,

উৎসাহ-পূর্ণিত মনে,

রক্ত কলঙ্কিত অই তোমার বিনোদ বেল।

প্রক্ষালিলে জল দিয়ে প্রসারি লহরীমালা।

(১৯)

প্রক্ষালিলে রক্তশ্রোত, পুনঃ তব তীরে,

সেই শ্যাম স্নকোমল

জনমিল দুর্বাদল,

পুনঃ সেই বনলতা হুলিল তরুর গলে,

নাচিল দিনেশ-হ্রাতি তব নিরমল জলে।

২০

কিন্তু বল তরঙ্গিণি, স্মৃতির প্রান্তরে,

কোটি যুগ তপসায়,

পারিবে কি কভু ছায় !

প্রক্ষালিতে সেই রক্ত করি চির প্রক্ষালন?

পারিবেনা—পারিবেনা—রথা তব আকিঞ্চন।

২১

ফিরিবে কপাল কবে বল নো নন্দদে,

ভারতের ভাগ্যে ছায় !

বল কবে পুনরায়,

দাসীত্বের শত জ্বালা হবে চির বিমোচন,

হেরিব প্রফুল্ল কবে ভারতের সুবদন।

২২

সুখাইবে কবে মার নরনের জল ?

কবে এই অনাধিনী,

হবে পুনঃ আত্মাদিনী ?—

হবেনাকি কোন দিন? সৌভাগ্যের শশধর,

অতান্ত-সাগর-গর্ভে ডুবিল কি নিরন্তর ?

২৩

যাও তুমি ক্রতপদে সাগর-রঙ্গিণি ;

নীল জল প্রসারিয়ে,

নীলাশু মন্দিরে গিয়ে,

নীলাশু গরভে যথা রক্তরাজি অগণন।

ভারতের সুখ-শানী কর তথা অন্বেষণ।

২৪

তাজিয়া ভারত-ভূমি অনন্ত বিরাগে,

অসীম পয়োদি তলে,

কনক রাজীব দলে

রচিত বিনোদাসমে, মনোহুঃখে বিবাদিনী,

ভারতের লক্ষ্মী আজি বিরাজেন একাকিনী।

২৫

মাগর গরতে বুঝি অগ্নি প্রবাহিনী,
পদতলে কমলার,
চিরদুঃখে অনিবার,
গড়াইছে ভারতের সোভাগ্যের শশধর,
কিরণ-বিহীন বিশ্ব মান ভাতি কলোর ।

২৬

যাও লো নর্যদে সেই ইন্দিরা-মন্দিরে ;
ইন্দিরা-চরণ ধরি,
সহস্র মিনতি করি,
বলিও রাজীব-পদে মৃদু স্বরে অবিরত,
অনাথিনী ভারতের দুঃখের কাহিনী যত ।

২৭

কি বলিব আদি হতে তুমি তরঙ্গিণি,
আছ তুমি চির দিন
ভারতের বক্ষে লীন,
রহিবে অনন্ত দিন তুমি নদী পুনর্বার,
ভারতের কণ্ঠে যেন নীলমণি-ময় হার ।

২৮

পুরাকালে তুমি সেই দেখেছ রঙ্গিণি,
ভারতের সিংহাসনে,
বসিতে রাজেন্দ্রগণে ;

দেখিলে আবার সেই হ'ল ভস্মে পরিণত,
তব পৃণামব তীরে রাজ ইন্দ্র শত শত ।

২৯

আবার দেখিলে তুমি, কালের প্রভানে,
না জানি কি পাপ ফলে,
কোন কুগ্রহের বলে,
ভারতের রঙ্গ-ভূমে যবনের অভিনয় ;
আবার কালের করে ফুরাইল সমুদয় ।

৩০

দেখ আজি পুনরায় দেখ তরঙ্গিণি,
সেই সিংহাসনপরে
কোন জাতি রাজ্য করে,
কাঞ্চালিনী বেশে আজি কাহার চরণতলে
লুটায় ভারত ভূমি, ভাসিয়া নয়ন-জলে ।

৩১

নিরখিলে যুগাস্তর, দেখিলে সকল ;
এই আর্ষ্য সিংহাসন,
আর্ষ্য নরপতিগণ,
উজ্জলিবে কবে পুনঃ বল অগ্নি তরঙ্গিণি !
আশার আকাশে আর ঝলে কিলো মো-
দামিনী ?

শ্রীঃ—

ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন। *

— ৫৫২ —

ভারতবর্ষ একসময়ে কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ভূতি অনেক বিষয়েই ভারতের জ্ঞান, ভারতের গাভীরা, এক দিন পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া ভারতীয় মহিমাকে শতগুণে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছিল। যে দিন আৰ্য্য মহা-পুরুষগণ মানবমণ্ডলীর সৃষ্টিগৃহ মধ্য আসিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রেতে হস্তক্ষেপে গোধন-সঙ্গে হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম পূর্বক পঞ্চনদে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই ভারতীয় মহিমার সূত্রপাত হয়, সেই দিন হইতেই ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার জননী বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করে। যে উজ্জয়িনী-জ্ঞানিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া অদ্যাপি পৃথিবী আমোদিত করিতেছে, সেই দিনেই তাহার বীজ ভারতভূমিতে রোপিত হয়; যে প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যা অদ্যাপি রোগার্ত জনগণের প্রতীকার বিধান করিয়া আসিতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতভূমিতে স্থান পরিগ্রহ করে; যে প্রচণ্ড তেজ হস্তিঘাট প্র-

ভূতি রণক্ষেত্রে বিকসিত হইয়া অতীত-সাক্ষী ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে; এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহার একটি ক্ষুদ্র চিনিয়ানওয়ারালার অতুল পরাক্রম শিখ-জাতির হৃদয়-চুল্লীহইতে উদ্গত হইয়া দুর্ব্বার ব্রিটিস তেজকেও বিধাস্ত করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন হলদিঘাট ও চিনিয়ানওয়ারালার গ্রীসের ধর্ম্মাপলী ও মারাথন্ বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতভূমিতে অনুপ্রবেশিত হয়। আৰ্য্যগণ এই পবিত্র দিনে, পবিত্র সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়া অলৌকিক বুদ্ধিবলে, অলৌকিক পাণ্ডিত্যবলে সভ্যতা প্রসারিত করেন, তাহাদিগের নিমিত্ত ভারত অচিরে মুমুভা হয়, এবং তাহাদিগের নিমিত্ত ভারতীয় মহিমা অতীতসাক্ষী ইতিহাসের পূজনীয় হইয়া উঠে।

এক্ষণে ভারতের সে মহত্ত্ব বিগত হইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম্ম, সে নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চ-

* ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শ জুন শনিবার কলিকাতায় “ যুব-জন-সম্মিলনী ” নামক সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত “ ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন ” নামক প্রবন্ধ।

নদবাহিনী সিন্ধু সরস্বতীর তীরে বসিয়া
 আৰ্য্যমহর্ষিগণ জনদগন্তীর মধুরস্বরে সাম
 গান করিতেন, সে গিন্ধু সরস্বতী আজও
 পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে,
 যে অত্রংলিহ হিমাদ্রির নির্জল গহ্বরে স-
 মামীন হইয়া যোগরত আৰ্য্যতাপসগণ সৃ-
 ষ্টির প্রাণরূপিণী অনন্ত-শক্তির ধ্যানে নি-
 বিষ্টচিত্ত থাকিতেন, সে গিরিশ্রেষ্ঠ গিরি-
 গহ্বর আজও বর্তমান রহিয়াছে, যে হন-
 দিঘাটে প্রচণ্ড আৰ্য্যভেজ, আৰ্য্যসাহস বি-
 কশিত হইয়া শত্রুর মর্মভেদ করিয়াছিল,
 সে হনদিঘাট আজও ভারতমানচিত্রে
 শোভা পাইতেছে । যে পশ্চিম শৈলের
 শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া অদীনপরাক্রম
 শিবজী বিজয়ভেরী বিজয়দ্রুমুভির গভীর
 নির্দোষ মেদিনী বিকম্পিত করিয়াছিলেন,
 সে পশ্চিম শৈল আজও বিস্তৃত রহিয়াছে ।
 কিন্তু ভারতের সে জ্ঞান ধর্ম নাই, সে জী-
 বনী শক্তি নাই, সে একতা নাই, সে আ-
 স্রভ্যাগ নাই । প্রাচীন ভারতের সভা-
 তার অষ্টা আৰ্য্য মহর্ষিগণের বিলাসভূমি
 গিরিকন্দর অবিকৃত রহিয়াছে, পুণ্যসলিলা
 সিন্ধুসরস্বতী যথাগতি প্রবাহিত হইতেছে,
 কিন্তু অদ্য ভারত শ্মশান । ভারতের সে
 গৌরব-সূর্য্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে নিমগ্ন
 হইয়াছে । সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে
 রণোন্মাদ, সে একতা, সে আস্রভ্যাগ এ-
 ক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত
 হইয়াছে । অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরব-
 স্থার পতিত ।

অদ্যতন ভারতীয় সম্মানগণ এ-
 ইরূপ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিম্পূহ
 হইয়া জড়তার সমাজ্বর । যে ভারত এক
 সময়ে জগতের শিক্ষা ভূমি ছিল, সেই
 ভারত এক্ষণে একটি সামান্য বিষয়ের
 জন্ম অন্যের দ্বারে লালায়িত ! এইরূপ
 এক সময়ে ভিক্ষাদাতা অন্য সময়ে ভি-
 ক্ষাপ্রার্থী, এক সময়ে লোকারণোর হৃদ-
 রোক্ষীপক কোলাহলপূর্ণ, অন্য সময়ে বি-
 কট শ্মশানের বিকট যুষ্টির প্রতিক্রম ভার-
 তের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার
 উপায় নাই । ভারতের একখানি প্রকৃত
 ইতিহাস অদ্যাপি লোকসমাজে প্রচারিত
 থাকিয়া এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আ-
 লোকবর্তী হয় নাই । ভারতের ইতিহাসের
 অভাব দেখিয়া এক্ষণে অনেকে ভারতীয়
 ব্যক্তিদিকে কুহকিনী কল্পনার কুপোষা
 বলিয়া দিকার দিয়া থাকেন । তাঁহাদি-
 গের মতে, ভারতের কেহ ইতিহাস লি-
 খিতে জানিত না, ভারতে ইতিহাসের
 ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ কোন বিষয় কোন
 সময়ে বিরচিত হয় নাই, মঁকলেই কেবল
 কল্পনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিয়া
 স্বীয় এতদ্ অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনায় প-
 রিপূর্ণ করিত । যে ভারতীয় ব্যক্তিগণ
 এক সময়ে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে জ্ঞা-
 তের পুঙ্জনীয় ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা ই-
 অর্নৈতিহাসিক ও অসত্যবাদী বলিয়া সা-
 ধারণ্যে অপদম্ব হইতেছেন ।

আমরা আক্লাদিত হইলাম, আমাদি-

গের অঙ্কশাস্ত্র বন্ধু শ্রীযুক্তবাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি মনোহর মৌখিক বক্তৃতা করিয়া ভারতীয় বাল্‌কিদিগকে এই অপমানের হস্তহইতে বিমুক্ত করিতে যথোচিত প্রয়াস পাঠিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। বক্তৃতার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি পংক্তিতে বন্ধুর সত্যপ্রিয়তা, উদারভাব ও স্বদেশ-হিতৈষণা জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রের মধ্যে কেবল রাজতরঙ্গিণী নামক একখানি কাশ্মীর দেশের ইতিহাস বর্তমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কল্লন পণ্ডিত এই ইতিহাস আরম্ভ করেন। পরে অপরাপর লেখককর্তৃক ইহার পরিসমাপ্তি হয়। এই কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের ত্রিভুজ ইতিহাস। তবে কি সমগ্র ভারতবর্ষে ইতিহাসস্থানীয় আর কিছু লিখিত হয় নাই? আর্য্যঐতিহাসিকের সত্যপ্রিয়তা ও কর্তব্যজ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে সমুদিত হইয়া কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে? সুরেন্দ্র বাবু বিশিষ্ট সমীচীনতাসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মতে কল্পনাসহচরী কবিতার নাগ প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাস-স্থানীয় বিষয় লিখিবার পদ্ধতিও প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। এই লিখিত বিষয়গুলি কালক্রমে বিপ্লবপ-

রম্পরায় অথবা কীট ও ক্ষতুবিশেষের সাংঘাতিক আক্রমণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সুরেন্দ্র বাবু এই মতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন :—আকবরের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুল ফাজেল প্রাচীন ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। মমুর আবে রেমসেট্‌ এসম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আবুল ফাজেল কোথাহইতে স্বপ্রণীত ইতিহাসের বিষয় সংগ্রহ করিলেন? ইহা কি তাঁহার মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা? না ইতিহাসস্থানীয় পূর্ববর্তী বিষয়পরম্পরার সংগ্রহ? যদি আবুল ফাজেলের ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাসপদে বাচ্য হয়; তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আবুল ফাজেল পূর্বতন হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে স্বীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্বতন ভারতে ইতিহাসলেখার পদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে আবুল ফাজেলের ইতিহাস প্রণীত হইত না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে জৈনিক সুপ্রসিদ্ধ জৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরিব্রাজকের নাম হোয়েন্‌ সাং, ধর্ম বোধক। পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থদর্শন, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহ এবং পবিত্র সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন প্রভৃতিই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ ভারতবর্ষে অতিবাহিত

করেন। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযু ভ্রমণরত্নাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়-দিগের অতীতজ্ঞানের পথ অনেকাংশে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণরত্নাস্ত্র ফ্রান্সিস্ জুলিয়ান কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত ভ্রমণকারীর বিখ্যাত ভ্রমণরত্নাস্ত্রে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের নিদর্শন দেখিতে পাই। হোয়েন্সু নাম লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কেবল দৈনন্দিন ঘটনা লিখিবার ভার সমর্পিত ছিল। এই দৈনন্দিক বিবরণ নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাস বাতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নীলপীঠ যে ইতিহাসের সম্মানিত পদে অধিকৃত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হোয়েন্সু নাম লিখিত নীলপীঠের বিবরণে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি, ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আখ্যায়িক কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ প্রমাণ, চাঁদ কবির “পৃথ্বীরায় রাগো”। যিনি দুর্দান্ত যবনকবল হইতে জন্মভূমির রক্ষার জন্য পূণ্যক্ষেত্র ত্রিপুরারিতে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিচলিত উদারভাব ও অবিচলিত দেশ-হিতৈষিতার জন্য মহাদয় সমাজে হৃদয়গত প্রজ্ঞা, হৃদয়গত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাই-

তেছিলেন, যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন পানীপথ অতুলপরাক্রম হিন্দুজাতির বিজয়ভেরীনির্নাদিত সমরলীলাভূমি বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইতেছে, চাঁদ কবি সেই হিন্দুকুল-গৌরব, হিন্দুরাজচক্রবর্তী পৃথ্বীরায়ের বিবরণ লইয়া “পৃথ্বীরায় রাগো” প্রণয়ন করিয়াছেন। চাঁদ, কবির মধ্যে পরিগণিত, এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কাব্য বলিয়া চাঁদ কবির গ্রন্থ ইতিহাস-সংজ্ঞার বহিষ্কৃত নহে। ব্যক্তিবিশেষের অবদান-পরম্পরা যাহাতে ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত থাকে, তাহা তদানীন্তন সময়-প্রসিদ্ধ ইতিহাসের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং চাঁদ কবির “পৃথ্বীরায় রাগো” কাব্য হইলেও যে অপরিপক্ব ও অসম্পূর্ণ ইতিহাসের অঙ্গস্থানীয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই “পৃথ্বীরায় রাগো” এবং পূর্বকথিত আবুল ফাজলের ইতিহাস ও নীলপীঠের বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আখ্যায়িক কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাস-স্থানীয় বিষয়গুলি ইতিমধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অনেকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুরেন্দ্র বাবু বলেন, এই ইতিহাস-স্থানীয় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ভার রাজ্যশাসন সং-

ক্রান্ত কৰ্মচারীর উপর ছিল এবং উক্ত
লিখিত বিষয়গুলি রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয়
কাগজ পত্রের মধ্যে সংরক্ষিত থাকিত।
সময়ের পরিবর্তনশীল লহরীলীলার সহিত
এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য সংগঠিত
হইয়াছে, এক আক্রমণের পর অন্য আক্র-
মণে সমুদয় বিষয় পর্য্যুদন্ত করিয়াছে, এইরূপ
পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবে ও বৈদেশিক জা-
তির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাজ্যশাসন সং-
ক্রান্ত অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিতও
উক্ত লিখিত ঘটনাবলীও বিনষ্ট হইয়াছে।

যদি কেহ এই যুক্তিতে অনাস্থা প্রদর্শন
করেন, তাহা হইলেও বক্তার তাদৃশ
ক্ষোভ নাই। বক্তা অন্যস্থলে গর্ভসহ-
কারে বলিয়াছেন, আৰ্য্য পূৰ্ব্বপুরুষগণের
লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও তাঁহাদি-
গের সুনাম অপকৃত হইবে না। কারণ
যে ইউরোপ এক্ষণে আপনাকে সভ্যতা-
ভিম্বানী ও পাণ্ডিত্যভিম্বানী বলিয়া স-
র্বত্র পরিচয় দিতেছে, কয়েক শতাব্দী
পূৰ্বে সেই ইউরোপে ইতিহাসের অবস্থা
কিরূপ ছিল? যাহা প্রকৃত ইতিহাসপদে
বাচ্য, তাহা কেবল গত শতাব্দী হইতে
ইউরোপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

মুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সংঘাতে
ইউরোপীয় জনগণের মানসিক রুতির উ-
ৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষ হইতেই
ইউরোপে প্রকৃত ইতিহাসের উৎপত্তি।
যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সভ্যতাম্পর্কী ই-
উরোপে ইতিহাস বাসালীলাতরঙ্গ দো-

লাগিত, তখন বহু প্রাচীন আৰ্য্যগণের ত-
দ্বিষয়ক অনভিজ্ঞতা বড় অপমানের কথা
নাহ। স্বদেশবৎসল বক্তার তেজস্বিনী
বক্তৃতা নিবন্ধ এইরূপ সর্গর্ভ জ্বলন্ত বাক্য
কি মনোহর! হৃদয়ের স্তরে স্তরে যাহার
স্বদেশ বাৎসল্য, স্বদেশ মমতা লীলা ক-
রিয়া বেড়াইতেছে, তিনি বক্তার এইরূপ
গর্ভ ক্রিতে অবশ্যই আনন্দে উৎফুল্ল
হইবেন।

আৰ্য্য-পূৰ্ব্ব-পুরুষগণ ঐতিহাসিক ব-
লিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, এক্ষণে
তদ্বিষয়ের অনুশীলন অপেক্ষা আমাদের
স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলনেরই অধিক-
তর আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে। যদি
কেহ স্বদেশের ব্যথায় ব্যথিত-চিত্ত হইয়া
নির্জ্বল প্রদেশে নীরবে বসিয়া এক বিন্দু
অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, যদি কেহ অ-
ত্যাচার-পীড়িত জন্মভূমিকে মুখ শান্তির
ক্রোড়ে লালিত করিতে কায়মনোবাক্যে য-
ত্নপর হইবেন, যদি কেহ মহাজন মুখ বিনিঃ-
শ্রুত “জননী জন্মভূমি চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”
বাক্যের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ হইয়া স্বদেশের হি-
তের তরে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহা
হইলে সর্ব্বত্রো তাঁহার স্বদেশের ইতিহাস
অধ্যয়ন করা বিধেয়। স্বদেশের ইতিহাস
না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত
কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না। বেদ-
নার প্রকৃত কারণ না বুঝিলে ঔষধপ্রয়োগ
ব্যর্থ হইবে। স্বদেশের অতীত বিষয়ক
জ্ঞান ও তাহার সহিত বর্তমান বিষয়ক

জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই ঈদৃশ শোকস-
হাপ প্রতীকার করিবার অমেষ উপায় ।
এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হইলে
স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অ-
বশ্য কর্তব্য ।

দ্বিতীয়তঃ স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়নের
অন্যরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইয়া থাকে ।
এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজনীতির স-
হিত স্বদেশের মঙ্গলমঙ্গল সম্পূর্ণরূপে অ-
নুশ্রুত রহিয়াছে । সুতরাং বর্তমান সময়ে
স্বদেশের হিতকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে
হইলে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি ক্রমে ব্রিটিশ রাজনী-
তির সহিত পরিচিত হওয়া বিধেয় । ম-
নোযোগ সহকারে স্বদেশের ইতিহাস অ-
ধ্যয়ন না করিলে ব্রিটিশ রাজনীতির কৌ-
শল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই ।

স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন কর্তব্য
বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক জাতির
হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অ-
নুশীলন করিয়া মনোমালিন্যের উৎপাদন
বিধেয় নহে । ইংরেজ চিত্রকরের হস্তে
ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র কোথাও অর-
ঞ্জিত, কোথাও বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠি-
য়াছে । অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত চিত্র দ্বারা
যে রূপ আলেখ্যের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম হয়
না, সে রূপে অতিবর্ণিত বা অবর্ণিত ইতি-
হাস পড়িয়া ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিষ্কৃত
হয় না । ইংরেজ ঐতিহাসিকের হস্তে
ভারতীয় ইতিহাসের যে যে ঘটনা বিপ-
র্যস্ত হইয়াছে বলা এইস্থলে তাহার করে-

কটির উল্লেখ করিয়াছেন । যথাক্রমে ত-
দ্বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে ।

মরে, সুরেন প্রভৃতি ইংরেজ লেখক-
গণ সিরাজউদ্দৌলাকে অন্ধকূপ-হত্যার
প্রধান অধিনায়ক বলেন । সিরাজ উদ্দৌলা
শত অপরাধে অপরাধী হউন, জন সমাজে
প্রজাপীড়ক প্রজাগাতক বলিয়া দ্বিকৃত হ-
উন, ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীর সং-
ঘাতে তাঁহার চারিত্রপট ক্ষত বিক্ষত হউক,
কিন্তু সিরাজ অন্ধকূপ হত্যার পাপে পাপী
নহেন । ন্যায়ের পক্ষপাত বিবজ্জিত বি-
চার এই আরোপিত অপরাধহইতে তাঁ-
হাকে বিমুক্ত করিবে সমুদয় বিষয়েই ন্যায়-
বিতরণ বিধের । সিরাজ এক বিষয়ে ঘো-
রতর অপরাধী বলিয়া যে রূপে ন্যায়ের ক-
ঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য, অপর
বিষয়ে দোষ-শূন্য বলিয়া সেইরূপ ন্যায়ের
পক্ষপাতশূন্যবিচারে বিমুক্ত হইবার পাত্র ।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুন ইংরেজ-
হস্তহইতে ফোর্ট উইলিয়মের পতন হয় ।
দুর্গ অধিকৃত হইলে হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬
জন ইংরেজ বন্দী শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া সিরাজ
উদ্দৌলার সমক্ষে সমানীত হইলেন । সি-
রাজ, হলওয়েল প্রভৃতিকে শৃঙ্খল-বিমুক্ত
করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, কেহ
তাঁহাদিগের কেশাও স্পর্শ করিবে না ।
রাত্রিতে নবাব বিশ্রাম-ভবনে গমন ক-
রিলে জর্নৈক সেনাপতি এই ইংরেজ বন্দি-
দিগকে প্রায় ১৮ ফীট বর্গ পরিমিত একটি
ক্ষুদ্রারতন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন ।

যাঁহার অন্ধকূপ-হত্যার ইতিহাস পড়িয়া-
ছেন, তাঁহার এই কারাকরু ব্রিটিস বন্দিদি-
গের দুঃবস্থা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে
পারিবেন। প্রচণ্ড নিদাঘ-সমুপ্ত রাত্রিতে
স্বপ্নপরিসর নির্ঝাঁত গৃহে ষড়্চহারিংশা-
ধিক একশত মনুষ্যের মন-সন্নিবেশ, কি
ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!!

কাল-রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণ-
সহচরী উষা ধীরে ধীরে জগতীতল আশ্রয়
করিল। নবাবসেনাপতি কারা গৃহের
দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তখন কি ভয়ঙ্কর
দৃশ্য! সুপীড়িত ১২৩ জন মৃত দেহের
মধ্যহইতে ২৩ জন বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কাল-
বশিক্ত জীবিত শরীর বাহিরে আসিল।
নবাব এই সাংঘাতিক ব্যাপারের কিছুই
অবগত ছিলেন না। তিনি সেনাপতি-
দিগের হস্তে দুর্গ-রক্ষার ভার দিয়া বিশ্রাম-
ভবনে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, সুতরাং
দোষভার বন্দিরক্ষক সেনাপতির ক্ষুদ্রেই
অর্পিত হইতেছে। একপাশে সিরাজ-
উদ্দৌলাকে দোষী করা ন্যায়সঙ্গত নহে।
তবে সিরাজি অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান
করেন নাই। এ অংশে অবশ্য তাঁহার
ক্রটি লক্ষিত হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলা
সর্বদা তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্র-
দায়ে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। অতিচা-
টুবচনে তাঁহার গর্ব উত্তরোত্তর স্ফীত হ-
ইয়া উঠিয়াছিল। অমিতাচার ও অতিবি-
লাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া এইরূপ চাটু-
কারগণের সংসর্গে থাকিতে সিরাজের

হৃদয় নিতান্ত মহানুভূতি-শূন্য হইয়া পড়িয়া
ছিল। বলা বাহুল্য, এই মহানুভূতির অ-
ভাব বশতঃই তিনি বন্দিষাতক অপরাধীর
প্রতি দণ্ডবিধান করেন নাই।

বন্ধু এইস্থলে ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয়
উইলিয়মের রাজাকালীন গ্লেনকোর হ-
ত্যার সহিত অন্ধকূপ হত্যার ভারতমা ক-
রিয়াছেন। সিরাজের প্রায় পঞ্চাশৎ বৎ-
সর পূর্বে এই হত্যাকাণ্ড সম্ভটিত হয়।
যে ইংলণ্ড সভ্যতাভিমান ও পাণ্ডিত্যভি-
মানে স্ফীত হইয়া প্রাচ্য বিবরের সমা-
লোচন করিয়া থাকে, সেই ইংলণ্ডের অ-
ধিপতিই যখন এই লোমহর্ষণ নরহত্যার
পাপে পাপী, তখন সিরাজ যদিও অন্ধকূ-
পহত্যার অপরাধে অপরাধী হয়েন, তাহা
হইলেও তাঁহাকে তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা
অধিকতর নৃশংস বলা সর্বথা অসঙ্গত।

দ্বিতীয় ঘটনা; দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ও
পঞ্জাব অধিকার। ইংরেজ লেখকগণের
অনেকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দেশ
করেন নাই। অনেকে কেবল মুলতানের
শাসন-কর্তা মুসরাজের অত্যাচারকেই উ-
হ'র প্রধান হেতু বলিয়া নীরব হইয়াছেন।
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের
কারণ নির্দেশ করিতে এই কয়েকটি পরিতে
হয়, ১ম মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিদগ্ধ
মহিষী মহারানী বিন্দনের নির্ভাসন, ২য়
দলীপ সিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে
ব্রিটিস রেসিডেন্টের অমত, এবং ৩য় হা-
জরার শাসন-কর্তা সর্দার ছত্রসিংহের

প্রতি দুর্জয়নকার । এই কারণত্রয় হ-
ইতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের উৎপত্তি । ব্রি-
টিশ জাতি ইহার প্রত্যেকটিতেই যথেষ্টা-
চারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে ।
এই শিখযুদ্ধের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে সন্ধির
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ ক-
রেন । ইহাতে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ দুর্জয়
শিখ জাতির অন্যান্যপদতার ফল ও পঞ্জাব
অধিকার ন্যায়-সম্মত বলিয়া নির্দেশ পূ-
র্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলম্প
করা নিতান্ত বিগর্হিত ।

তৃতীয় ঘটনা অযোধ্যা অধিকার । অ-
ন্ধকূপ হত্যা ও- দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের ন্যায়
ইহাও অধিকাংশ ইংরেজ লেখকের পক্ষ-
পাতিনী লেখনীর সংঘাতে বিকৃত হইয়া
ভারত ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে ।
এই লেখকদিগের মতে অযোধ্যা অত্যা-
চার ও অবিচারের বিলাসভূমি ছিল ।
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে ইহার প্রতীকার বিধা-
নার্থ নবাব ওয়াজিদ আলীকে পদচ্যুত
করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু
বিসপ হেবার, হারমান্ সেরিডেন প্রভৃতি
অযোধ্যাকে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আধার
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যে রাজ্য
সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত, সে রাজ্যে
অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সম্ভাবিত নহে । *

* বর্তমান প্রস্তানলেখক প্রণীত সিপাহি-
যুদ্ধের ইতিহাসের অবতারণিকায় পঞ্জাব ও
অযোধ্যা অধিকারের আনুপূর্বিক ঘটনা ব-
র্ণিত হইয়াছে । উক্ত পুস্তক এক্ষণে যন্ত্রস্থ ।

সকল ইংরেজ লেখকই যে ভারতীয়
ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপ বিপর্যাস্ত করি-
য়াছেন, তাহা নহে । অনেকানেক লেখক
পক্ষপাতশূন্য হইয়া এ বিষয়ে ন্যায়ানুযো-
দিত পক্ষ অবলম্বন করিতে ক্রটি করেন
নাই । ভারতবর্ষ এই মহাপুরুষদিগের নি-
কট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ।

যাহাইউক ; সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও প্রমাদ-
রহিত স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করা স্বদে-
শীর ব্যক্তি যাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । স্বদে-
শের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে স্বদেশের
প্রতি গভীর হিতৈষণার উৎপত্তি হয়,
গভীর উদাত্ত ভাবের সঞ্চার হয় এবং
গভীর সহৃদয়তায় হৃদয় আধুত হইয়া
থাকে । বাল্মীকি, বাসের ন্যায় কবি,
পানিনি, পতঞ্জলির ন্যায় বৈরাগ্যরত ও
গৌতম, শঙ্করাচার্যের ন্যায় ধর্ম প্রচার-
কের নাম মনোমধ্যে উদিত হইলে কোন্
সহৃদয় ভারতবাসীর হৃদয় হিতৈষিতা ও
উদাত্ত ভাবে উন্নত না হয় ? কেনা এই ম-
হাপুরুষদিগের ইতিহাস পাঠে সমুদ্রাত
হয়েন ? মহামনাঃ আৰ্য্য পূর্বপুরুষগণ
এক সময়ে জগতের পূজনীয় ছিলেন ।
তাহারা কোমল বিষয়ের কোমল সৌন্দ-
র্যের সম্ভোগেই ব্যাসক্ত থাকিতেন না,
তাহারা কেবল ভ্রমরচুষিত প্রভাতকমলের
অঙ্গবিলাস দেখিয়া অথবা কাব্য নাটকের
অনুশীলন করিয়াই কালাতিপাত করি-
তেন না । তাহারা গভীর বিষয়ের গভীর
চিন্তায় সর্বদা সংযত থাকিতেন, তাহাদি-

গের হৃদয় সূত্রে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে
অভ্রংশিষ্ট গিরিবহুর ন্যায় সদা উন্নত থা-
কিত। তাঁহার সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে
অদ্বিতীয়, সমরকোশলে অদ্বিতীয় এবং ধর্ম-
নীতিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এক সময়ে
ভারতভূমি এইরূপ মহাতেজস্বী, মহাসম-
র্থ আর্ষা পুরুষগণের লীলাস্থল ছিল, এক স-
ময়ে এইরূপ আর্ষাতেজ, আর্ষাসাহস, আর্ষা
জ্ঞানের মহিমার ভারতবর্ষ মহীয়ান্ হইয়া
উঠিয়াছিল।

আর্ষা হিন্দুগণ দশগুণোত্তর সংখ্যা নি-
য়মের অষ্ট।। আর্ষা হিন্দুগণ ক্ষেত্রতত্ত্ব,
ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতের উৎকর্ষ-কা-
রক। আর্ষা হিন্দুগণ প্রভাববতী চিকিৎসা
বিদ্যার প্রধান অনুশীলনকারী। আরব,
গ্রীস দেশীয়গণ আর্ষা হিন্দুদিগের নিকট-
হইতেই গণিতাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে।
সে গ্রীস হইতে ইউরোপের ইয়তী ক্রীষ্টি,
সেই গ্রীসই প্রাচীন ভারতের মজ্জা-শিষ্য।

আর্ষা হিন্দুগণ গণিতাদি শাস্ত্রের ন্যায়
যুদ্ধ বিদ্যাতেও পারদর্শী। এক সময়ে
হিন্দুদিগের সমর-কোশলে সমস্ত পৃথিবী
চমকিত হইয়াছিল। বক্তা বক্তৃতার এ-
স্থলে আয়েয়াস্ত্র সম্বন্ধে মত প্রকাশ ক-
রিয়াছেন, আমরা এক্ষণে এ বিষয়ে ভূমী-
স্তীব অবলম্বন করিলাম। প্রাচীন ভারত
ও আয়েয়াস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি স্ম-
তন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার বাসনা রহিল। সা-
হিত্য, দর্শন, যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতিতে আর্ষা
হিন্দুগণ যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম নীতিতে তাহা

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। শাক্য সিংহের ধ-
র্মভাব অদ্যাপি সমস্ত পৃথিবীর বরণীয় হ-
ইয়া রহিয়াছে। রাজোদ্যমের স্নেহাম্পদ
পুত্র ও অজ্ঞান মোভাগ্য সম্পত্তির ক্রোড়ে
লালিত হইয়াও শাক্য সিংহ কেবল ধর্মের
জন্য সমস্ত পরিভাগ করিয়াছিলেন। স-
র্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্বপ্রকার বিষয়-
নিরুত্তি তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল।
তিনি “নলিনীদলগত” জলের ন্যায় জী-
বনের ক্ষণস্থায়িত্ব, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায়
মৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চলতা, এবং চক্রনেমির
ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্তনশীলতা জানিয়া
সংসার-পাশচ্ছেদন পূর্বক নির্জ্ঞন গিরিক-
ন্দরে বা নির্জ্ঞন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অ-
ন্তিম অনন্তপদ প্রাপ্তির আশায় অনন্ত-
শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত ছিলেন। এই-
রূপ ধর্মভাব জগতে অতুল্য ও অমূল্য।
শাক্য সিংহের প্রচারিত ধর্ম এক্ষণে মধ্য-
আসিয়া অতিক্রম করিয়া চীনে লক্ষ প্রসর
হইয়াছে, অতুল্য হিমগিরির অভ্রংশিহ
শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ ক-
রিয়াছে। সংক্ষেপতঃ সুবিস্তীর্ণ ভূমার-
ক্ষেত্রশালী কামরূট্কার উপকূল হইতে
জলধি-হৃদয়-বিলসিত সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত
ছাঁইয়া পড়িয়াছে। ঈদৃশ অলৌকিক ধ-
র্মভাবসম্পন্ন শাক্যসিংহ ভারতের স্নে-
হাম্পদ সন্তান।

প্রাচীন আর্ষা-ঐশ্বের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ
কর, তাহাতেও আর্ষগণের ধর্মভাব দেদী-
প্যমান দেখিবে। রামায়ণ ও মহাভার-

তের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির ধর্মভয়ের জন্য
অদ্যাপি সকলের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভ-
ক্তির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন।
অধিক কি, আর্ষ্য হিন্দুগণের ধর্মনীতি বৈ-
দেশিক গণকেও বিস্মিত করিয়া তুলি-
য়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিয়ান্
এবং বিখ্যাত পরিব্রাজক হোয়েন্সু সাদ্-
উভয়েই মুক্তকণ্ঠে হিন্দুদিগকে সত্যবাদী,
উদার-স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।
ভারতভূমি এইরূপ বিদ্যাবত্তা, তেজোবত্তা
ও ধর্মনীতির বিলাসক্ষেত্র।

আইস ভাতৃগণ ! আমরা একবার
সেই মহানন্দস্বী আর্ষ্য পূর্বপুরুষগণের চ-
রণে প্রণত হই ; আইস একবার সেই পূর্ব
পুরুষগণের ধর্মনীতির আলোচনা করিয়া
চিত্তের উদারতা, হৃদয়ের সরলতা সাধন
করি ; যতদিন পবিত্র আর্ষ্য শোণিতের
শেষবিন্দু আমাদের ধর্মনীতে প্রবাহিত
থাকিবে, আইস, ততদিন আমরা পূর্বপু-

রুষগণের ন্যায় কাগমনোবাক্যে জীবনের
শান্তিময় উৎকৃষ্টতম পথে অগ্রসর হ-
ইতে থাকি।

বক্তা এইরূপ অবনত-মস্তকে পূর্ব
পুরুষগণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া স্বীয় ব-
ক্তৃতার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বক্তৃ-
তার প্রারম্ভে যে রূপ হৃদয়োদ্দীপক স্বদেশ
বৎসলতা, উপসংহারেও সেইরূপ হৃদয়ো-
দ্দীপক স্বজাতি-প্রিয়তা। বক্তার হৃদয়
যে স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বজাতি-প্রেমে
পরিপূর্ণ, এই বক্তৃতাটি তাহার পরি-
চায়ক।

উপসংহার সময়ে আমরা সুরেন্দ্রনা-
থকে ভারতের একখানি সর্বোচ্চ সম্পূর্ণ
ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুবোধ করি।
যাঁহার বক্তৃতার প্রতিবাক্যে গভীর সঙ্ক-
দরতা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, তাঁহার নিকট
এ বিষয়ে কেন আশা না করিব ?

স্মারকঃ—

পার্সিজাতি ।।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবাসী পারস্য-
জাতি রূপে, গুণে, কার্যদক্ষতা ও অপরা-
জিত উৎসাহশালিতার ইদানীং অনেকেরই
লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই
প্রবন্ধে তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে বি-
বৃত্ত করিব।

এই জাতি পার্সি, গুইবার বা ঘিবার
এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে।
প্রাচীন পারস্যজাতিহইতে এই জাতির
উৎপত্তি হইয়াছে। অষ্টম খৃষ্টাব্দে মু-
সলমানেরা তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে সং-
গ্রামে তাড়াইয়া দেয়। সুতরাং পার্সিরাও

তাহাদিগের সহিত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারা মুসলমানদিগের ক্রমিক উৎপীড়নে পারস্য দেশের কোন অঞ্চলে নিৰ্ব্বাসিত অবস্থান করিতে না পারিয়া সপ্তদশ শৃষ্ঠাব্দে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাটে আগমন পূর্বক আশ্রয় গ্রহণ করে। যে সময়ে ইহারা কথিত প্রদেশে আগমন করে, তখন ইহাদের সংখ্যা তত অধিক ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সন্তান সন্ততি দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ইহাদের মধ্যে অনেকে সুরাট, বোম্বাই, বরোচ ও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার অন্যান্য স্থলে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহারা প্রথমতঃ পারস্য হইতে তাড়িত হইয়া পারস্যখাড়ির অন্তর্গত অরমস দ্বীপে ১৫ বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিল। কিন্তু একদিকে জীবিকা নিৰ্ব্বাহের নিকপায় দেখিয়া ও অন্যদিকে শত্রুবর্গের উৎপীড়নে ক্লান্ত হইয়া, কতিপয় ক্ষুদ্র জলপোতারোহণে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আগমন করিল। আসিবার সময় ইহারা ইহাদিগের ধর্মের বীজস্বরূপ “পুতায়ি” সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। প্রাচীন রোমকদিগের ভেল্লাল (দেবমন্দির)স্থ চিরপ্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নির ন্যায় এই অগ্নিও নিৰ্ব্বাণ করা নিষিদ্ধ। এই অগ্নি নিৰ্ব্বাপিত হইলে পার্সিদিগের ধর্মের একেবারে অঙ্গহানি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য বহুযুগের পুতায়ি এখনো ইহাদিগের দেবমন্দিরে সমভাবে প্রজ্বলিত হ-

ইয়া আসিতেছে। সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জ্ঞানেন; কিন্তু ইহাদিগের যেরূপ অগ্নির প্রতি ভক্তি ও যত্ন তাহাতে এরূপ হইলেও হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় প্রাচীন রোমানদিগের দেবমন্দিরে চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিপূজার প্রথা এই পার্সিদিগের পূর্বপুরুষগণের অগ্নিপূজার অনুকরণেই প্রচলিত হইয়াছিল। যেহেতু রোমের বহুকাল পূর্বে পারস্যের ধর্ম, সমাজ, ও অন্যান্য বিষয়ের যে উন্নতি হইয়াছিল, পুরাতন আমাদিগকে সে কথা বলিয়া দিতেছে। সুতরাং পূর্ববর্তীদিগের অনুকরণ করিয়া পরবর্তীরা অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্বিবরে সন্দেহ নাই।

পার্সিরা গুজরাটে উত্তীর্ণ হইয়া কাশ্মে খাড়ির তীরস্থ ডিউ নামক নগরে প্রথমতঃ অবস্থান করিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে পর্তুগিজেরা এস্থান অনেক দিন পর্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। পার্সিরা কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করতঃ খাড়ি পার হইয়া সুরাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গিয়া অবস্থিতি করিল। তদঞ্চলের হিন্দুরাজা তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন ও সমরনিপুণ ছিলেন না, সুতরাং অপরিচিত আগন্তুকদিগকে কোন মতে দূরীকৃত করিতে না পারিয়া অগত্যা বসবাস ও অগ্নিদেবতার মন্দির নির্মাণ করিবার অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

অষ্ট শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে কেবল বোম্বাইতে পার্সি জাতির সংখ্যা

২০০০০ সহস্র হইয়াছিল। এক্ষণ উক্ত স্থানে ইহাদের সংখ্যা অপরিণাম পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর প্রদেশেও এই জাতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। পূর্বে যে জাতি খ্রীষ্টকালের শীঘ্র আত্মতের ন্যায় ভারতবর্ষে আগমন করে, সেই জাতি এক্ষণে বর্ষাকালীন আত্মতের আকার ধারণ করিয়াছে। অধুনা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাসম্বন্ধে এই জাতি অনেকটা পুষ্টিসাধন করিতেছে।

পার্সিগণ নিরতিশয় পরিশ্রমী, কার্যদক্ষ ও সূচতুর। ইহারা অর্থার্জনের জন্য দেশ দেশান্তরে অনায়াসে যাতায়াত ও বসবাস করিয়া থাকে। এক্ষণে কথিত আছে যে, যেখানে অন্য কেহই আহাৰ্য্যাহরণ করিতে পারেনা, সেখানে একজন পার্সি অনায়াসে উহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ফল কথা, পরিশ্রম, কার্যদক্ষতা-প্রভৃতির গুণে পার্সি যেখানে যাউক না কেন, কিছু না কিছু অর্থলাভ করিতে অশক্ত হয় না। ইহারা দীর্ঘ ও শক্তিবিশিষ্ট অবয়বসম্পন্ন। সৌন্দর্য্য বিষয়েও ইহাদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু পার্সিজাতীয়া বালিকাগণ শৈশবকালে যাদৃশী রূপবতী ও মাধুর্য্যশালিনী থাকে, বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্বেই সে রূপ ও মধুরতা হইতে বঞ্চিত হয়। তখন পুরুষজাতির ন্যায় অনেকাংশে তাহাদের আবয়বিক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। সুতরাং বিংশতিবর্ষীয়া একটি পার্সিরমণী

অপেক্ষা একজন ঐরূপ বয়ঃস্থা হিন্দু বা মুসলমান কামিনী যে অধিকতর সুন্দরী, তাহা বলা বাহুল্য।

হিন্দুজাতির বেদ, মুসলমান জাতির কোরাণ, খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বিগণের বাইবেল যে-রূপ মৌলিক ও সর্বপ্রধান ধর্মগ্রন্থ, সেইরূপ পার্সিদিগের “জেন্দ আভেস্তা” আদি ধর্মপুস্তক। প্রাচীন পারস্য জাতীয় জোরোস্তর নামক জনৈক মহর্ষিকর্তৃক সেই ধর্মগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্সিরা অগ্নিপাসক। এতদ্ব্যতীত ইহারা সূর্য্যেরও আরাধনা করিয়া থাকে। জোরোস্তর প্রণীত ধর্মগ্রন্থে যে সকল ধর্মসম্বন্ধীয় বিধি আছে, পার্সিরা তাহার কতক কতক স্বেচ্ছানুসারে পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। প্রাচীন পারস্যবাসী অগ্নিপুস্তকদিগের সহিত অধুনাতন পার্সি অগ্নিসেবকগণের ধর্মশাসন দেখিলেই তাহা এক প্রকার প্রতীয়মান হয়। গ্রোস্ নামক একজন ভ্রমণকারী বলেন যে, প্রাচীন পারস্যবাসীরা সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের পূজা করিত, কিন্তু অগ্নি ও সূর্য্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখনই সেবা করিত না। কেবল ঐ দুই তেজস্কর জড়পদার্থ ঈশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া বর্ণিত এই যাত্র, তাহার মতে জোরোস্তরের “জেন্দ আভেস্তা” এইরূপ শাসনে রচিত; কিন্তু পরবর্তী পার্সিগণে অজ্ঞতা ও স্বকল্পনাদোষে সূর্য্য ও অগ্নিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। এই জড় প-

দার্থব্রের পূজাপ্রচলনবিধি বড় আধুনিক নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতে, ইহা চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে, যখন দেবায়ুস্ সেকেন্দর মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন তাহার সম্মুখে রোপা বেনীতে করিয়া এই “অনন্ত অগ্নি” লইয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মেগাইগন (পুরোহিত মণ্ডলী) অগ্নির স্তব গান করিতে করিতে সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং বৎসরের দিন-সংখ্যা সূচনার্থ ৩৬৫ জন যুবা রক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। পাঠক, শেযোক্ত ঘটনাটির নিগূঢ় তত্ত্ব কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? আমিতো পারিলাম না। যাহা হউক, বৈদিক সময়ের পরবর্তী হিন্দুধর্মিগণ যেমন স্বেচ্ছানুসারে পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ জেন্দ আভেস্তিক সময়ের উত্তরবর্তী প্রাচীন পার্সিরা জোরোস্তরের ধর্মবিধির উপর স্ব স্ব অভিমতে ঈশ্বরের পরিবর্তে অগ্নি ও সূর্য্যকে পরমদেবতা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন-পারস্য-বংশীয় আধুনিক পার্সিরা যে সেই পথের অনুসরণ করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

গ্রীসদেশীয় প্রাচীনইতিহাসবেত্তা হিরোদটস্ বলেন যে, পূর্বতন পারস্যের ঈশ্বরজ্ঞানে অগ্নির পূজা করিত। তৎকালিক মেগাইগন অন্যান্য দেবমূর্তিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত না, কেবল

অগ্নিই তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের দ্বিতীয় মূর্তি বলিয়া তাহারা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিত। মেগাইগন দুইটি মূল সূত্র সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই দুইটির মধ্যে একটি মঙ্গল ও অপরটি অমঙ্গলের কাবণ। প্রথমটির নাম ‘অরস্মাদিস্’ ও দ্বিতীয়টির নাম ‘অহমান’। আলোক ও অন্ধকারকে লক্ষ্য করিয়া এই দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাঠক, বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন মেগাইগন মানবজগতের উপকারার্থ কেমন কোণে এই দুইটি সূত্র বা মূল বাক্য শিখাইয়া গিয়াছেন। এখানে আলোক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস, দয়া, হিতৈষিতা, পরোপকার প্রভৃতি এবং অন্ধকার অর্থাৎ নাস্তিকতা, পাপাচারিতা ইত্যাদি এই সূত্রদ্বয়ের মধ্যে কোণল সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি জোরোস্তর-কৃত নীতিগুলি অতি উৎকৃষ্ট। সেগুলি এক একটি করিয়া দেখাইতে গেলে বাক্রমে স্থান হইবে না, সুতরাং তাহার কএকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

১। “যে ব্যক্তি মানস-ক্ষেত্রে পরিশ্রম-রূপ বীজ বপন করে, সে দশ সহস্র মৌখিক প্রার্থনা অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মরূপ শস্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।”

২। “যে ব্যক্তি একমাত্র সত্য-রত্নকে চিন্তাধারে রাখিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকট অচিরস্থায়ী মণি মুক্তাদি ভাস্কর শ্রাঙ্গ প্রতীয়মান হয়।”

৩। “যে ব্যক্তি আশ্রিত্য-রূপ আলোকে অবস্থান করে, তাহাকে অমাবসার অন্ধকার ভীত করিতে পারে না।”

৪। “যাহার চিত্ত নাস্তিকতা অনলম্বন করে, সে বিদ্রাতালোকের পরক্ষণ-জাত গাঢ়তর তমসে পড়িয়া মরে।”

৫। “আহার্য যেমন শরীরকে জীবিত রাখে, সেইরূপ ধর্ম চিত্তকে তেজস্বি করে।”

৬। “ধর্ম অবিস্থাস করা আর অস্বহতা করা উভয়ই সমান।”

৭। “যে পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সে ঈশ্বরের দর্শন পায়।”

৮। “পরোপকারই জীবন ও পরাপকারই মরণ।”

৯। “অর্থের বশীভূত হইয়া পরমার্থ ভাগ করা আর নক্ষত্রালোক প্রিয় জ্ঞান করিয়া চন্দ্রালোকে অবহেলা প্রদর্শন করা উভয়ই তুলা।

১০। “পরিনিন্দা করিলে আপনায় নিন্দা করা হয়। এ জগতে আত্মপর কে-হই নহে।” ইত্যাদি।

জ্যোতিষের এইরূপ বিবিধ প্রকার ধর্মনীতি ও সমাজনীতি আছে।

পার্সিরা প্রভাতে পূর্বমুখ এবং সন্ধ্যার পূর্বে পশ্চিম মুখ হইয়া সূর্যের আরাধনা করে। ইহাদিগের ধর্মসম্বন্ধীয় কোন কার্য উপস্থিত হইলে চিরপ্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নির সম্মুখে বসিতে হয়। হিন্দুদিগের

পুরোহিত যেমন ‘অপবিত্রঃ পবিত্রোবা’ ইত্যাদি মন্ত্রে যজ্ঞমানের চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকেন, ইহাদিগের পুরোহিত সেরূপ কোন মন্ত্র না বলিয়া যজ্ঞমানদিগকে অহস্তে কিঞ্চিৎ জলপান এবং তৎসঙ্গে দাড়িষের পর চর্চন করিতে দেন। এইরূপ করিলে চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। পার্সিদিগের মতে উপবাস করা নিষিদ্ধ।

এই জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা যেমন প্রচলিত নাই, সেইরূপ আবার অবিবাহিত অবস্থায় অবস্থান করাও ব্যবহার বি-কল্প। পূর্বে পার্সিদিগের উরাহ প্রথা স্বতন্ত্ররূপ ছিল, এক্ষণে কিয়দংশ হিন্দুপ্র-থার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে দেখা যায়।—কিন্তু ইহাদিগের শব-সংকার-প্রণালী হিন্দুদিগের সঙ্গে কোন রূপেই মিলে না। পাঠকের পক্ষে হৃদনবোধে উক্ত জাতির শবদাহপ্রথা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

সাংঘাতিক পীড়ায় বা আকস্মিক ঘটনায় প্রাণবিয়োগ হইবামাত্রই প্রায় ই-হারায় মৃতব্যক্তিকে সমাধিস্থলে লইয়া যায়। এই জাতির শববহনের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট লোক নিযুক্ত আছে। তাহারায় মৃতদেহ বহনকালে বাক্য উচ্চারণ বা কাষ্ঠ স্পর্শ করে না। মৃতরাং লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুময় আধারে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাইতে হয়। যদি সমাধিস্থলে যা-ইবার সময় কোন কাষ্ঠনির্মিত সেতু উ-ত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহাইলে তাহার উপর

তাত্পর্য বা মৃত্তিকা বিশেষরূপে বিছাইয়া দিতে হয়। শববহনাধারে শ্বেতবস্ত্র বিছাইয়া, শ্বেতবস্ত্রে মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে স্থাপন করিতে হয়। শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ছয় ব্যক্তি সেই শবসমেত শবাধার বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাদিগের পশ্চাতে দুই দুই জন পার্শ্বপার্শ্ব করিয়া অনেকগুলি আত্মীয় ব্যক্তি ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকে। পার্সিজাতির সমাধিভূমি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া গোলাকারে নির্মিত। প্রাচীরের মূল হইতে সমাধিভূমির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঢালুভাবে নির্মিত। ঠিক মধ্যস্থলে একটা গভীর কূপ আছে। ঢালুভাগ এত মন্থণ যে, মৃতদেহ গড়াইয়া দিলে একেবারে সেই কূপের ভিতর গিয়া পতিত হয়। শব নিক্ষেপের সময় ইহার শবকে উলঙ্গ করিয়া ফেলে। ইহাদিগের একরূপ বিশ্বাস যে, শকুনি, গৃধ্রিনী প্রভৃতি শবখাদক পক্ষিগণ শবের সমুদয় মাংস খাইয়া ফেলিলে মৃত ব্যক্তির পরলোকে যথেষ্ট মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এতদ্বারা মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হউক আর না হউক, সমাজের কতকটা মঙ্গল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জাতির সমাধি ভূমি তিনভাগে বিভক্ত। মৃত স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য একরূপ করা হইয়াছে। সমাধি কার্য সমাধা হইবার পর সকলে চলিয়া গেলে কেবল একজন মৃতব্যক্তির আত্মীয় সমাধিস্থলের কিঞ্চিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া

নিষ্কিপ্ত শবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। একরূপ করিবার মর্ম্ম এই যে, শবখাদক পক্ষী নিষ্কিপ্ত শবের কোন চক্ষু অগ্রে উৎপাটন করে। দক্ষিণ চক্ষু অগ্রে উৎপাটন করিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা সুখী, কিন্তু বাম নেত্র প্রথমে ঐরূপ করিলে উহার আত্মা দুঃখী। পক্ষিদিগের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শবরাশির মাংস ভক্ষিত হইয়া অস্থিস্থূপে সমাধিকূপ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সুতরাং মধ্য মধ্য অস্থিরাশি অপসারণ করিবার জন্য ঐ কূপ হইতে একটা স্বতন্ত্র খুড়ঙ্গ আছে, তাহাতেই ঐ কার্য সমাধা হইয়া থাকে। পার্সিদিগের সমাধিভূমি ও সমাধিক্রিয়া সম্বন্ধে টম্‌সন্ হার্বার্ট বলেন যে, “পার্সিদিগের এই অপরিষ্কৃত ও বিভীষণ সমাধিভূমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করা অপেক্ষা কর্ণে শ্রবণ করাই ভাল। ইহার শব সমাধিস্থ করিবার পর আর সেখানে গমন বা তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করে না, কেবল গৃহেতেই অনবরত বিনাপ করিয়া থাকে। কাষ্ঠদ্বারা ইহাদিগের পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত হয় বলিয়া ইহার মৃতদেহ লৌহাধারে করিয়া লইয়া যায়।” অস্ত্রোচ্চিক্রিয়ার সময় পার্সিরা কোন ইউরোপীয়কে সমাধিস্থলের মটনা দেখিতে দেয় না; এমন কি, (এলফিনিষ্টোন বলেন) যদি তাহাদিগের ধর্ম্মবাহিত অন্য কোন ব্যক্তিকেও সমাধি কার্যের সময়ে তথায় দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার তাহাকে

যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে। পূর্বে প্রাচীন পারস্যবাসী মেগাইগন এই প্রণালীতে অস্ত্রোষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিত। আধুনিক পার্সিগন তাহাদিগের সেই প্রথা ও পুতায়ি প্রভৃতি ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছে।

বোসে দ্বীপের মধ্যে মালানার নামক

একটা ক্ষুদ্র পর্বত আছে। সেইখানেই উক্ত দ্বীপস্থ পার্সিদের সমাধি ভূমি, ইউরোপীয় ও মুসলমানদিগের সমাধি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সে স্থলে হিন্দুজাতিরও শবদাহ হইয়া থাকে। দেখিতে গেলে মালানার পর্বত একটা ভীষণ শ্মশান !

শ্রীরাজ—

কল ব্রীটানিয়া ।

১

প্রমোদ-কানন, শোভার আধার,
বীরহের খনি, বিদ্যার ভাণ্ডার,
রত্ন-আভরণা রাজেন্দ্রাণীপ্রায়
শোভে শ্বেতদ্বীপ সলিল-শয্যায় ;
রাজন্যে বহে বাণিজ্যের স্রোত,
পোতাশ্রমে শোভে শত শত পোত ;
শাল-রক্ষ-সম গুণ-রক্ষ-চূড়
সারি সারি কেতু ধীরে ধীরে উড়ে ;
চতুর্দিকে বায়ু ভরিছে গাইয়া,—
' সাগর-বাসিনী কল ব্রীটানিয়া ! '

২

শত-স্বর্ণ-মৌদ-মালিনী লগুন
টেমন-সলিলে হেরিছে আপন
বিচিত্র চিত্রিত সুন্দর মুরতি,
যেন রূপবতী ষোড়শী যুবতী
হীরা, মুক্তা, মণি, মানিক্য আদরে
সাজাইয়া দেহ, গরবের ভরে,

স্বচ্ছ দরপণে হেরিছে বদন ;
বক্ষে সেই ছায়া করিয়া ধারণ
স্রোতঃ ছলে যেন নাচিয়া নাচিয়া
গায় স্রোতস্বতী,—'কল ব্রীটানিয়া !'

৩

শ্বেত-দ্বীপ, তব মহিমা অপার !
দুর্জয় জলপি পরিখা তোমার,
ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তব আচ্ছাদিত,
বিদ্রোহ তোমার দূতী অহরহ ;
চতুর্দিকে তব নীল বারি-রাশি
মধ্যে ভুমি,—যেন পূর্ণিমার শশী
শারদ অন্বরে—কিবা মনোহর !
তব পদ সদা চুম্বিছে সাগর ;
আপনি বকণ তরঙ্গ তুলিয়া
গায় প্রতি দিন,—'কল ব্রীটানিয়া !'

৪

ক্রতগতি তরী করি আরোহণ,
হেলার তরঙ্গে করিয়া দলন

নির্ভীক নাবিক দূর দেশে যায়,
 ত্রীটেনের নামে দিগন্ত জাগায় ;
 প্রকাশিত মুরতি রণতরী ভরি
 • ত্রীটন-তনয় যুদ্ধ সজ্জা করি
 চলে শত শত, অম্ অন্ অম্
 • ‘কল ত্রীটানিয়া’ বাজে অনুপম ;
 দূরশৈলমালা আকাশে মিশিয়া
 করে প্রতিধ্বনি,—‘কল ত্রীটানিয়া !’

৫

বীর অবতার ত্রীটন তনয়,
 মহা বীর্যবান, কেশরি-হৃদয় ;
 তেরাগিয়া মুখ, সংসারের মায়া,
 পিতা, পুত্র, ভাই, প্রাণাধিকা জায়া,
 অরি জন্মভূমি, অরি শেষবার
 প্রিয়জনমুখ,—বাজে বারংবার
 ভীষণ বাজনা—প্রবেশে সমরে,
 পদভরে ধরা টলমল করে ;
 বীরবক্ষে যেন বিদ্যুৎ ঢালিয়া
 বাজে ঘোর রোলে—‘কল ত্রীটানিয়া !’

৬

রত্নগর্ভা, শত-বীর-প্রসবিনী,
 ওরেলিংটন, ব্লেক, নেলসন-জননী !
 নীলের সমরে যে দিন নেলসন
 ভীম প্রসরণে করিল বেফটন
 ফরাসীর সেনা ; কাপারে মিশর,
 কাপারে জলধি, মহাভরস্কর
 শত শত তোপ গরজি উঠিল,
 গন্ধকের ধূমে জগত আঁসিল ;
 সেই অন্ধকারে রহিয়া রহিয়া
 বাজিল গম্ভীরে—‘কল ত্রীটানিয়া !’

৭

হৃতাশে বিষাদে আকুল হৃদয়,
 যে কুলমে নেপোলিয়ান দুর্জয়,
 —(যেন যুছিবারে ললাট-লিখন)
 ওয়াটলুর ক্ষেত্রে আরম্ভিল রণ ;
 দুই মৈনো মোর সংগ্রাম বাধিল,—
 মিংহে মিংহে যেন বুঝিতে লাগিল ;
 মোর ঋণাত্মক হেবা হোরা হবে
 বরসল-বাসী সশঙ্কিত যবে,
 প্রণীর সংগীত সহিত মিশিয়া
 বাজিল সে দিন,—‘কল ত্রীটানিয়া !’

৮

হৈমবতী চাক উষার কিরণে
 যে দিন শোভিল পলাসি-প্রাঙ্গণে
 সিঁদ্রাজ সমক্ষে ইংরেজের বল ;
 ঘন ঘন করি ঘোর কোলাহল
 বাজিল দামামা, শিঙ্গা, ঢাক, ঢোল,
 উঠিল চৌদিকে ভয়ঙ্কর রোল ;
 পড়িল মদন ; কামান ধনিল,
 ইংরেজের জয় ঘোষণা করিল ;
 গভীর উচ্ছ্বাসে উঠিল বাজিয়া
 বিজয়ী সংগাত,—‘কল ত্রীটানিয়া !’

৯

শুনি প্রতিদিন শুইয়া শয্যায়
 ‘কল ত্রীটানিয়া’ মৈনিকেরা গায় ;
 কল ত্রীটানিয়া ?—কোথায় ?—ভারতে ?
 আর্থ্যের নিবাস এ আর্থ্যাবরতে ?
 ভাবি মনে মনে, বুঝি ঘুম ঘোরে
 স্বপন সুন্দরী প্রতারিছে মোরে ;
 পরক্ষণে, হার, গরজিয়া ওঠে

প্রাকালিক তোপ ; প্রতিধনি ছোটে,
ত্রিগুণ দাপটে দিক্ ডুবায়ে
বাজে ঘন ঘন,—‘ কল ত্রীটানিয়া ! ’

১০

মেলিয়া নয়ন অপরূপ হেরি,—
হাসে কলিকাতা সোণার নগরী ;
সৌধমালা-শিরে মৌরুর খেল ;
দুর্গ-চূড়ে কেতু ধীরে ধীরে দোলে ;
ফিটে পরিচ্ছদ পরিধান করি,
অঙ্গের মৌরভে চতুর্দিক ভরি,
ফেটিঙ্গে চড়িয়া চলেছে ইংরাজ.
বামে বিধুমুখী করেন বিরাজ,
বৈতালিক গীত সহিত মিশিয়া
বাজয়ে ইউনে,—‘ কল ত্রীটানিয়া । ’

১১

সূর্য্যবংশীর সিংহাসনে আজ
ত্রীটানিয়া, তুমি করিছ বিরাজ ;
আজি অযোধ্যায় কি শুনিছি হার !
কোথা রঘুবীর ! সৌমিত্রী কোথায় !
রাজরাজপুরী আজ অন্ধকার !
মুছি নয়নের, হার, শতধার,
চারিদিকে চাই, শূন্য সব ঠাই !
‘ কোথায় এলাম’—স্মৃতিরে—সুধাই ;
অমনি শুনিয়া উঠি চমকিয়া,

দূর দুর্গে বাজে ‘ কল ত্রীটানিয়া ! ’

১২

কৈদনা লেখনি ! ফেল দুঃখসাজ,
হস্তিনায় মহারাজহুয় আজ ;
ভিক্টোরিয়া আজ ভারত-ঈশ্বরী !
রত্ন সিংহাসনে, আহা মরি মরি,
চেয়ে দেখ দেখ, আসীন লিটন !
মহা মহিমায় উজ্জ্বল বদন !
চতুর্দিকে বসি রাজন্যমণ্ডল,—
আখণ্ডে বেড়ি যেন দেবদল !
আর্য্যহুতে যেন স্তম্ভিত করিয়া
দণ্ডে বাজিতেছে,—‘ কল ত্রীটানিয়া ! ’

১৩

দ্রুত প্রতাপ ত্রীটন তোমার !
তব নামে যেন কাঁপে চারিধার !
হিন্দু রাজত্বের ভগ্নশেষোপরি
মোগলের যেই অর্ধ-শশী মরি
বর্ষ পঞ্চশত করিল বিরাজ,
অস্ত্রচলশারী সেই শশী আজ !
সীক, রাজপুত, সবে ত্রীরমাণ,
পাদ্য অর্পা দেয় নেপাল ভোঁটান,
নিরতির গতি কে রাখে রৈখিয়া ?
আর্য্য-ভূমে বাজে—‘ কল ত্রীটানিয়া !! ’

শ্রীদী—

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। জীবনালেখ্য। জীবন হুগো-মোহন দাসের পরলোকগত। সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী সংক্ষেপ জীবন রক্তান্ত। আমরা এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত আদরসহকারে পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠসময়ে অনেক স্থলেই অশ্রুজলে আধুত হইয়াছি। গ্রন্থকার একজন প্রশস্তমনা সহদয় মনুষ্য। তাঁহার লেখাতেও সেই সহদয়তা প্রতি পংক্তি-তেই প্রতিফলিত হইয়াছে।

চরিতাখ্যায়কেরা সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণির ব্যক্তি। তাঁহারা প্রায়শঃ যশোহিনি-রই পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া থাকেন। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তির সত্য লোক-কোলাহলে অভিনন্দিত রহেন, উদ্ভানে ও উপবেশনে স্তুতির অভ্যর্থনা পান, এবং ইঙ্গিতমাত্রেই লোকের মুখদুঃখ-সম্পর্কে প্রভুহস্তারে সমর্থ হন, চরিতাখ্যায়কদিগের ধূমাকু চক্ষু তাঁহাদিগের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে। তাঁহারা ঐ সকল আপাতমনোরম উজ্জ্বলদৃশ্য পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত মণিমুক্তার মলিন প্রভাস মোহিত হন না। কিন্তু যিনি যথার্থরূপে মানবজীবন পাঠ করিতে পারিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, সিংহাসনের প্রান্তদেশেও যে প্রবাহ, পর্ণকুটীরের অভ্যন্তরেও সেই

প্রবাহ;—কীর্ষির কাককার্ষ্যময় ঝল ঝল দীপালোকেও যে জ্যোতিঃ, কীর্ষিবিরহিত অজ্ঞাতজীবনের অকৃত্রিম আলোকেও সেই জ্যোতিঃ। জীবনালেখ্যের রচয়িতাকে আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণির একজন নিপুণ ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিলাম। একটি সাধুহৃদয়া সরলপ্রাণা অবলা, সংসারে অপরিচিত রহিয়াও, অনক্ষিত দেবতার মত কত লোকের দুঃখভার মোচনে কৃতকার্ষ হইতে পারেন, তিনি এই অযত্নসম্পন্ন আলোখে তাহা অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি।—

২। সতীপরিণয়ম্। ময়মনসিংহ, সেরপুরাধিবাসি জীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রণীতম্।—ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, যে বঙ্গীয় সমাজে ইদানীং কাব্যের এত আদর, এত অনুশীলন, সতীপরিণয়ের মত উপাদেয় ও মনোহর বস্তু অদ্যাপি সেখানে লোকের নিকট অপরিচিত। আমাদের বিবেচনায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, এবং ইহার রচয়িতা সর্বথা যশস্বী হওয়ার উপযুক্ত। এইক্ষণে তাঁহারা সংকুত লিখন, তাঁহাদিগের অনেকেই ব্যাকরণশাস্ত্রের সহায়তার শব্দে সহিত

শব্দমাত্র গ্রাহন করিয়া থাকেন; কিন্তু কো-
থায় কিরূপ শব্দবিন্যাসে কিরূপ রসের উ-
চ্ছ্বাস হয়, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ
হন না। আধুনিক অনেক সংস্কৃতকবিতায়
শুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এই জন্যই অবজ্ঞা।
সতীপরিণয়ের সংস্কৃত প্রায় প্রাচীন সং-
স্কৃতের ন্যায়,—প্রাঞ্জল, মধুর, মদালস;
পাঠমাত্রেই অর্থ প্রতিতি হয়, এবং পাঠ-
মাত্রেই পাঠকের প্রাণ কবির প্রাণের সূ-
ক্ষ্ম সংস্পর্শে শীতল হইতে থাকে। ইহার
লেখা বাঙ্গালিজাতির গোহবদ্ধর। কারণ
ব্রটিশ-ইণ্ডিয়ানসী বর্তমান বাঙ্গালির
দ্বারা এইরূপ সম্ভাবিত্বিত শুল্ললিত সংস্কৃত
কাব্য রচিত হওয়া সামান্য আশ্চর্য্য এবং
সামান্য অভিমানের বিষয় নহে।—আ-
মরা পাঠকবর্গের তৃপ্তির জন্য সতীপরিণ-
য়ের দুই একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া
দিলাম। আমাদের ভরসা আছে, বাঁহারা
সংস্কৃতে অনুরাগী, তাঁহারা ইহার আন্দো-
পান্ত পাঠ করিবেন। এই কাব্যের অনেক
স্থলেই কুমারসম্ভবের অনুকৃতি দৃষ্ট হইবে;
কিন্তু কালিদাসের এইরূপ অনুকরণ-চেষ্টা
যশেরই কথা, অপযশের কথা নহে।—

“বামেন, বামাক্ষি ! বিলোকরোষ্টকঃ
কৈলাসমালোকয়িতুং দিগন্তম্ ।
শৃঙ্গরেনৈকককভিক্ষরোক !
ক্রবৎ দ্বিতং যন্তকমুরমযা ।”

* * *

“অস্মিন্ শশকোপলভিত্তিভাগে
নিশাসু মূর্ছপ্রযুকৌমুদীকে ।

সিদ্ধাঙ্গনানামতিসারিকাণাং ।

চলন্তি পাদাঃ কলশিঞ্জিতানাম্ ॥

নিশাসু তারানিকরসা শব্দং

সমস্ততোহসৌ প্রতিবিস্তিতাঙ্গঃ

শাখীব মংলম্ভুসারগৌরঃ,

খন্দোতমালা খচিতো বিভাতি ॥ ”

৩। রামের দ্বিগে। প্রহসন। শ্রীকৃষ্ণ-
প্রসাদ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা-
শিত। এইরূপ কদম্ব পুস্তক বাঙ্গালী য-
জ্ঞালয়সমূহ কর্তৃক অদ্যাপি উদ্ধারিত হই-
তেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।
কিছু দিন হইল, বাঙ্গালকাব্যালয়ের একজন
কর্মচারী কর্তৃক ‘কলির নৌ ঘরভাঙ্গানী’
নামে একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়া-
ছিল। সে খানি যেমন নাটক, রামের
দ্বিগে তেমনই প্রহসন। পাঠকবর্গের কো-
তুহল নিবারণার্থে এই একটি কথা বলিয়া
দেওয়া অপ্রযোজ্য যে, এই প্রহসনের রাম
সৌভাগ্য দশতঃ অযোধ্যার রামচন্দ্র ন-
হেন। ইহার নাম রামতারণ মুখোপা-
ধ্যায়; নিবাস কলিকাতা।

৪। এর উপায় কি। শ্রীমীর মশা-
ররফ হোসেন প্রণীত। ইহাও আর এক
খানি প্রহসন। এদেশের মুসলমান ভজ-
লোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে দীতম্পূহ;
বাঙ্গালী সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের
কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যাতি হয়
না। সুতরাং বখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ
কদাপি সম্বন্ধ করিয়া বাঙ্গালী লিখিতে ইচ্ছা
করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই,

এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেই প্রা-
ণপণে যত্ন করি। কিন্তু যদি তাঁহারা, য-
শোলাভের এমন সহস্র পথ থাকিতেও,
কুপ্পনার ও ভাষায় যার পর নাই জননা
কটির পরিচর্য্য দেন,—অলীল পদাবলীর
ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে
করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায়
আমরাও বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা
করি,—এর উপায় কি?

৫। রত্নাবতী। পতিব্রতা-উপাখ্যান।
বেনারসনিবাসিনী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী
দেবী প্রণীত। এই ছন্দোবদ্ধ উপাখ্যানটি
পাঠ করিয়া আমরা অপ্রীত হই নাই; প্রীত
হইয়াছি, এমনও বলিতে পারি না। ইহার
কোথাও কবিত্বের ক্রীড়া নাই, কিন্তু লেখা
বালিকার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় নহে।

৬। সরলা। প্রথমভাগ। শিশু-
দিগের উপযোগি কবিতা। শ্রীহরিদাস
গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক। ইহাতে উষা,
মহাকাল, শরতের শশী, মৌমাছি ইত্যাদি
শীর্ষক কতক গুলি অসংযুক্ত বর্ণে রচিত
মূললিত কবিতা আছে, আর কবিতাপাঠে
শিশুদিগের উপকার হয়, এমন অনেক সু-
মধুর উপদেশ আছে। আমরা শিশুশি-
কার উপযোগিনী কবিতা না দেখিয়া স-
র্বদা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। সরলার
রচয়িতা বহুপরিমাণে আমাদিগের সেই
দুঃখ অপনোদন করিয়াছেন। এই পুস্তক
খানি এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের নিম্নতম
শ্রেণির বালকদিগের নিতান্তই উপযুক্ত।

৭। শিশুপ্রবেশ। অর্থীৎ অম্প-
বরূপ বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত প্রচ-
লিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ। শ্রীপ্রসন্ন
চন্দ্র চক্রবর্তি প্রণীত।—আমরা বাঙ্গালার
শিশুশিক্ষার ব্যাকরণ যতখানি দেখিয়াছি,
এখানি তদ্ব্যতীত সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার
রচনাপ্রণালীতে গ্রন্থকারের বিশিষ্ট
বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতা প্রদর্শিত হইয়াছে।
সাধারণের সংস্কার এই যে, বালকদিগকে
যে সে ব্যক্তিই শিক্ষা দিতে পারে, এবং
যে কোন পুস্তক হইতেই তাহাদিগের বি-
দ্যালাভ সম্ভব। ইহা ভ্রম। সরলমতি
বালকদিগের শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া তা-
হার সমতলবর্তী হওয়া নিতান্তই কঠিন।
এসব বাবু এই ব্যাকরণ রচনার সেই কা-
ঠিন্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং
সেই হেতুই এত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

৮। হেলেনাকাব্য। প্রথমখণ্ড।
সটীক। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। যে সকল
আধুনিক কাব্য বাঙ্গালাভাষার কণ্ঠমালায়
অভরণ স্বরূপে গ্রথিত হইয়াছে, এখানি
নিশ্চয়ই তদ্ব্যতীত স্থান পাইবার যোগ্য।
ইহার দ্বিতীয়খণ্ড যখন প্রকাশিত হইবে,
তখন আমরা ইহার নিম্নতম সমালোচনা
করিব, এবং সেই সমালোচনার কাব্যের
আদর্শে উৎখান করিয়া অনুকৃতিতে অবতরণ
করিতে যত্নপর হইব। এইক্ষণ এইমাত্র
বলিতে পারি যে, যাহারা অভিনিবেশ-
সহকারে ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করি-
বেন, তাঁহারা স্থানে স্থানে কুপ্পনার কম-

নীল লীলাচাতুরী দেখিয়া যেমন পুলকিত হইবেন, সেইরূপ প্রতিশ্রুতিবাহ পদবিন্যাস দর্শনেও নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন।

ইহার ভাষা মেঘনাদবধের ভাষা অপেক্ষা অনেক গুণে তরঙ্গ। এইজন্যই ইহার রচনায় রসগত গাভীরোর কিছু অভাব দৃষ্ট হয়, এবং এইজন্যই আবার ইহাতে মাধুর্যের ভাগ কোথাও কিঞ্চিৎ অধিক। নিম্নোক্ত পংক্তিগুলির তুলনা করিলে, একথার অর্থগ্রহ হইতে পারে।

মেঘনাদবধে,—

“একাকিনী শৌকাকুলা, অশোককাননে,
কাদেন রাগবাপু আধার কুটীরে
নীরবে ! দুঃস্থ চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাধিনী
নির্ভয়হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে !
মলিনবদনা দেবী, হাসরে, যেমতি
ধনির তিমির গর্ভে, (না পারে পশিতে
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি,
কিস্বা বিশ্বাধরা রমা অমুরাশি-তলে ! ”

হেলেনা কাব্যে,—

“ * * একাকিনী ধনী—
মানিনী ফণিনী যথা !—কাদেন নীরবে ।
বিমুক্ত কবরী, কটি ; কুঞ্চিত বিষাদে
সে কচির মুখচ্ছবি ! হাসরে যেমতি
বিক্রাচসে মহাদাসা, পঞ্চবটীবনে
জনম-দুখিনী সীতা ; ইন্দ্রাণী সুনন্দরী
নৈমিষ কাননে কিস্বা একাকিনী যথা
অমুরের অত্যাচারে ইন্দ্রাসয় ছাড়ি । ”

পুনশ্চ মেঘনাদবধে,—

“ * * হাসি, কহিল ললনা ;
ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে ।
অবহেলি শরানলে ; বিরহ-অনলে
(দুঃস্থ) ডরাই সদা ; তেঁই সে আইনু,
নিতা নিতা মনযারে চাহে, তাঁর কাছে । ”

হেলেনা কাব্যে,—

“ উত্তরিল ইন্দুমুখী পূর্ণেন্দুবদনা
প্রিয়দমা ;—প্রাণেশ্বর ! কাতর কি দাসী
সংগ্রামে ? নিমুখ কবে নবীন যুবতী
উদ্বাহ-উৎসব-রঙ্গে ? বীর কুলাজনা
আমরা, আজন্ম দেব বীরধর্মের রত । ”

৯। মিত্রকাব্য । এখানিও হেলেনা কাব্যের রচয়িতা জীযুক্তবাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র কর্তৃত্ব প্রণীত। জীযুক্তবাবু জীনাথ চন্দ্র ইহার এক ভূমিকা লিখিয়াছেন, এবং সেই ভূমিকায় হেলেনা কাব্যকে কবির ডমকধনি বলিয়া এখানিকে কবির বংশী-ধনিক্রমে নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা দিগের বিবেচনায় হেলেনা কাব্যে ডমকধনির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যদিও মিত্রকাব্য অন্যাত্মে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ,—কবির যশস্বর এবং ভাষার পুষ্টিবর্ধক, তথাপি বংশীধনিতে হৃদয় যেরূপ ঔদাস্য ও আবেশে লগ্ন ও অবশ হইয়া পড়ে, ইহার কোন কবিতাতেই হৃদয়ে তেমন এক ঔদাস্য ও আবেশ জন্মে না। মিত্রকাব্যের একটি গীত এইরূপ,—

“ ওরে মন তুমি গৃহে ফিরে চলে যাও ।

কেন আশার ছলে সকল ভুলে,

ও মন! গুণগোলে কাল কাটাও ॥

শোন শোনেরে অজ্ঞান,

তোর কি নাইরে কাণ্ডজ্ঞান

দেশে দেশে ঘুরে কেন হচ্ছ অপমান ;

এরা ধূর্ত অতি অশ্ল মতি

ওরে দেখে কি না দেখতে পাও।”

যাঁহার কবিতার প্রকৃত বংশীধ্বনি শ্রবণ
করিতে চান, তাঁহার ইহার সহিত মাধবী
বংশীর নিম্নোক্ত পদ কয়টির তুলনা
করুন।

“আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিবু হায়!

তাই ভাবি মনে।

জীবন প্রবাহ বহি, কাল-সিন্ধু প'নে যায়,

ফিরাব কেমনে?

দিন দিন আসু হীন; হীনবন দিন দিন,

তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? একি দায়!

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাত্তি?

জাগিবিরে কবে?

জীবন উদ্যানে তোর যৌবন কুসুম ভাতি

কতকাল রবে?

নীরবিন্দু হৃদয়াদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে?

কেনা জানে অশ্রুযুগ্মে অশ্রুবিশ্ব সদাঃপাতি।”

মিত্রকাব্যের বিজয়া দশমী ও লুক্রেশিয়া অতি সুন্দর কবিতা। ইহার শরৎ-
গর্ভা এবং কমলে কামিনী আরও সুন্দর ;

—পড়িবার সময়ে মনে আনন্দ সঞ্চার

হয়।

১০। বঙ্গজনা কাব্য। প্রথমখণ্ড।

শ্রীরজনীনাত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা

অমিত্রাকর চন্দ্র রচিত কতিপয় স্তুতিপ-

ত্রিকার গ্রন্থিত। গ্রন্থকার যাঁহাদিগকে

বঙ্গদেশের ভূষণস্বরূপ মনে করিয়াছেন,

ঐ সকল পাত্র অবলা-মুখে তাঁহাদিগের

স্তুতিপাঠ হইয়াছে। অমিত্রাকর চন্দ্র গ্র-

ন্থকারের অভ্যাস হইয়াছে এমন বোধ হ-

ইল না। তিনি হেলেনা কাব্যের কোন

অংশের সহিত তাঁহার লেখার কোন এক

অংশ মিলাইয়া পড়িলেই ইহা বুঝিতে পাই-

বেন। আর, স্তুতিবাদের জন্য যেরূপ সাব-

ধানবিন্যাস প্রমার্জিত শব্দের আবশ্যকতা,

তাহাও তাঁহার এই কাব্যে দৃষ্ট হইল না।

পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের স্তোত্র

হইতে আমরা দ্বাদশটি পংক্তি উদ্ধৃত ক-

রিলাম। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা

পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি

লজ্জিত হইয়াছেন।

“একটি রতন যাত্র এবঙ্গ-গোকুলে—

তুমিহে দ্বারকানাথ! উজ্জ্বল চৌদিগ—

তব কীর্তি—সৈমন্তক—মঞ্জুল-ময়ূখে।

মধুর মলয়ানিলে দোলরে মাধবী—

বসন্ত-ভসন্তে যথা; কিম্বা ভূজঙ্গিনী—

ডমকর ধনি শুনি করিয়া যেমতি—

উর্দ্ধফণ; দোলিছে মোদের হিয়া দেব,

তোমার সোমপ্রকাশ বাশরী সুস্বরে।

বিরক্ত প্রকাশি—কিন্তু নব্য দল তাহে,

শুনিতোছে স্বাধীনতা—কাল-বিশ্ব-ধরী—

গরজন! মাতিতেছে—মাতঙ্গিনী যথা—

মধুপানে! কি ভাবিছ বসি গুণ নিধি!”

বঙ্গদেশকে গ্রন্থকার কি অর্থে এবং কোন্ ভাবের আবেশে গোকুল বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, এবং বসন্ত শব্দের সহিত 'ভসন্ত' কি ইমন্ত, কি অসন্ত অথবা লসন্ত শব্দের একত্র বিম্বাস হইলে কিরূপ মধুর অনুপ্রাস হয়, তাহাও আমরা দিগের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না । দ্বারকানাথ-স্তোত্রের আর একস্থলে রুক্মিণী-বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কিরূপ সম্মাননা অথবা বিড়ম্বনা হইয়াছে, তাহাও পাঠক দেখুন । গ্রন্থকারের কল্পিত অবলা বলিতেছেন ।—

“কে না জানে,—এ অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে—
রসিক দ্বারকানাথ—কুঞ্জবন-প্রিয়” ।

হা ! বিদ্যাভূষণ ! আপনার কপালে কি এই ছিল ! আপনি কি এই জন্য এত দিন বঙ্গভাষার সেবা এবং বঙ্গীয় নব্য কবিসম্প্রদায়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন ! আর সোমপ্রকাশ ! তুমিও কি এতদিনের পর ব্রজের 'বাণরী' হইলে ?

১১ । নীতিশিক্ষা ; প্রথমভাগ । শ্রী-দেবানন্দ চন্দ্র রায় প্রণীত ।—আমরা ইহার ত্রিতীয়াভাগের সমালোচনার গ্রন্থকারের বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি নাই ; কিন্তু নীতিশিক্ষা প্রথমভাগের জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি । বালকদিগের জন্ত সরল ভাষায় সুপাঠ্য পদাবলীতে ভাল ভাল পুস্তক রচিত হইলে, আমরা দিগের বড়ই আহ্লাদ

জন্মে । নীতিশিক্ষা প্রথম ভাগ বালকদিগের যে উপকারে আসিবে, তাহাতে আমরা দিগের অন্তর সন্দেহ নাই ।

১২ । বঙ্গসংগীত । শ্রীবিব্রিক্সিলাল শর্মা কর্তৃক প্রণীত ।—হই হই বাবুর ভারত সংগীত কিংবা ভারতশিক্ষার সামান্য একখানি অনুরূতি । গ্রন্থকারের সরস-শব্দ-গ্রন্থনে ক্ষমতা আছে । কিন্তু তাঁহার বঙ্গসংগীতের এক অংশের সহিত আর এক অংশের ভাবে ও পদবিন্যাসে বড়ই বিচিত্র বিরোধ । সংগীতের আরম্ভ এইরূপ ।—

“মরি কি সুন্দর ! স্তিমিত নক্ষত্র
মিশিছে উষার তিমির বাসে,
অকণ তপন,—কোমল কিরণে
হাসিছে মধুর তাহার পাশে ।
নিশির শিশিরে ফুলবধূগণ
ফোট ফোট ভাব ধরেছে সবে,
তা দেখি ভ্রমর অধর চুম্বিতে
ছুটিছে ঝঙ্কারি মধুর রবে ॥

সংগীতের আর এক স্থলে আছে,—

“খাজানা, করজ, সেলামি, নজর,
তার পরে আছে পথের কর,—
আগে ধান গরু, পরে ভিটা বেচে
তপাচ উদ্ধার নাহিক তার ।
সর্বস্বান্ত হয়,—পেটে অন্ন নাই
তখন মামলা বিপাকে ফেলে,
কৈদে কৈদে মরে,—কেহ না শুধায়,
অগত্যা শেষেতে যায় হে জেলে ॥”

জীর্ণোদ্ধার ।

অর্থাৎ

প্রাচীন আর্ষাদিগের জ্ঞান সমালোচনা ।

সলিল ।

জল, বায়ু, তেজঃ, পৃথিবী, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যমণ্ডল, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য পদার্থে আর্ষাদিগের জ্ঞান কি পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মনন শক্তিই বা কিরূপ ছিল—এই সকল প্রকট করাই এই ‘জীর্ণোদ্ধার’ শীর্ষক প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

সকলেই অবগত আছেন যে, আর্ষাদিগের জ্ঞানে জল একটি প্রধান ভূত অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ । আর, নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জল একটি যোগোৎপন্ন মিশ্র পদার্থ । এই মতে দুই প্রকার গ্যাস্ সংযুক্ত হইলে জল উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহা ভূত বা মূল বস্তু নহে । এই মতদ্বয়ের তারতম্য সর্বমুখ্য সর্বপের তুল্য । যদিও প্রথমোক্ত-ধিত মতটি পর-মতের নিকট ভ্রম-কলুবিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি আমরা একবার ঐ মতের সমালোচনা করিব । কাকদন্ত পরীক্ষা অর্থাৎ কাকের দাঁত আছে কি না ? জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যে ব্যক্তির গালে হাসি ধরে না, তাঁহাকে

এ প্রস্তাব সুখী করিতে পারিবে না । তাঁহারা পুরাতন তত্ত্বের প্রেমিক—ভরসা করি তাঁহারা এই প্রস্তাবে সুখী হইবেন । উল্লিনীষু অথচ বালবৎ নিতান্ত সরল-সুদয় আদিম পিতামহগণের জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচ্য না থাকিলেও প্রথমতঃ সলিল বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হওয়া গেল । তাঁহারা এই সলিল সম্বন্ধে কি কি বিষয় কি কি রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে ।

অনেক আর্ষাজ্ঞানে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ প্রকারই ভূত, “নাহ্যনং নাতিরিক্তম্” ন্যূনও নহে, অতিরিক্তও নহে । কিন্তু কোন কোন আর্ষের মতে আকাশের বস্তু নাই, “আবরণাভাবোহি আকাশঃ” আবরণ অর্থাৎ কিছু না থাকিলেই তাহা আকাশ নামে ব্যবহৃত হয় ; সুতরাং এমতে ভূত চারি প্রকার মাত্র । ভূত ও পরমাণু নামান্তর মাত্র, পদার্থান্তর নহে । এই চতুর্বিধ পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ নাই—ইহাদের সংযোগ বি-

যোগে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত । ইহা ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত ; কিন্তু বেদ ও বেদান্তগত উত্তর-মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের মতে পরমাণু সকলের সৃজনকর্তা ঈশ্বর । সুতরাং উহার সাংসিক্রিক বা চিরনিত্য নহে, কম্পান্ত সময়ে পরমাণুও বিনষ্ট হইবে । পরমাণু সকল উৎপন্ন জব্য হইলেও প্রকৃষ্ট বদরমুষ্টির ন্যায় যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই । ক্রমশঃ হইয়াছে । সে ক্রম এইরূপ—অগ্নি আকাশ, তৎপরে বায়ু, তৎপরে তেজঃ, তৎপরে জল, অবশেষে পৃথিবী । ইহা পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন হয় নাই—পরস্পরের সংযোগেই হইয়াছে । যথা, আকাশসংযুক্ত-বায়ু হইতে তেজঃ—তদ্রিত্যয়ের পরিণাম জল—তদুত্তরের পরিণামে পৃথিবী । এই সকল ভূত, উৎপত্তিকালে পরমাণুরূপেই উৎপন্ন হইয়াছিল—পরে তাহা ভাগে ভাগে সংহত বা সম্বন্ধ হইয়া স্থূল হইয়াছে এবং ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে ।

উপাদান বা কারণ-দ্রব্যের গুণ কার্য-দ্রব্যে সংক্রান্ত হয়—এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্র বৃত্তন গুণও জন্মে । এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ জন্মিলে তাহা কথিত নিরমের অধীন হয় । অতএব কথিত নিয়মানুসারে জল, আকাশ, বায়ু ও তেজের অনন্তরোৎপত্তি বলিয়া উহাতে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ কিছু কিছু আছে এবং নিজেদের সাংসিক্রিক গুণও আছে । এই সাংসিক্রিক বা বিশেষ গুণটি রস বা আশ্বাদ নামে বিখ্যাত । এতাবত আর্ধ্যদিগের

সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জলের প্রধানতঃ শব্দকারিত্ব, স্পর্শ, রূপ ও আশ্বাদ গুণ আছে । এতদ্বিধ বেগ প্রভৃতি যে সকল অবান্তর গুণ আছে তাহা পশ্চৎ বিবেচ্য ।

অপিচ, শব্দ যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ক, স্পর্শ হকের, রূপ চক্ষুর, সেইরূপ রস রসনার বা জিহ্বার বিষয় । ঈশ্বরই হউন, আর ঈশ্বরীই (প্রকৃতি) হউন, যিনি এই জগতের স্রষ্টাবেশ কর্তা, তাঁহার সমাবেশশক্তি অত্যাশ্চর্য্য । জীবকে শ্রোত্র, হৃৎ, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা প্রদান করিয়া এবং বাহিরে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অধিকরণীভূত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া যে ঐ সকলকে মদন বা মপ্রয়োজন করিয়াছেন—এতদপেক্ষা স্রষ্টাবেশ আর কি হইতে পারে ? এই সিদ্ধান্ত দ্বারা আর্ধ্যদিগের আর একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইতেছে যে যেমন বস্তু গ্রাহক ইন্দ্রিয় পাঁচটির অতিরিক্ত নাই—তেমনি মূল বস্তুও পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত নাই । সুতরাং পাঁচটিই ভূত, চতুষ্টকি বা পঞ্চষষ্টি ভূত ভূত নহে, তাহা ভৌতিক ।

ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি সম্পন্ন, ভূতগুলিও তেমনি বিশেষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন । এই বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারাই পদার্থ সকল পরিচিত হয় । যে সকল গুণ অনন্তসাধারণ, সেই সকল গুণই বিশেষ গুণ । আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ

স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, আর জলের বিশেষ গুণ রস বা আশ্বাদ ও পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। আকাশ, বায়ু, তেজঃ, এই তিন ভূতের কোন প্রকার আশ্বাদ নাই, কিন্তু তাহা জলের আছে। এই জলই আশ্বাদ গুণটি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া পরিচিত। কার্যপদার্থ কারণে অতিসামান্য আকারে অবস্থিতি করে, এই নিয়ম অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে যে জলে নীলপীতাদি পার্শ্ব গুণও অতিসামান্যাকারে (অবাক্তভাবে) আছে, এবং কটু তিক্তাদি নানা প্রকার পার্শ্ব ধর্ম তৎকারণীভূত সলিলে অতিসামান্যাকারে লুক্কায়িত আছে।

“রূপমাত্রাদিকুর্বাণাঐতজ্জসো দৈবচোদিতাৎ।

রসমাত্রমভূতশ্বাদস্তোজিহ্বারসগ্রহঃ ॥

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুঃ ইতি নৈকধা।

ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিন্দাতে ॥”

(শ্রীভাগবত)

অর্থাৎ বায়ু-সংযুক্ত বিক্রিয়া-প্রাপ্ত রূপতমাত্র বা তেজ বিশেষ হইতে রস-তমাত্র বা জল ভূতের উৎপত্তি হয়। রস গ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বা। প্রথমোক্ত রস এক প্রকার কিন্তু ঐ এক প্রকার রস নানা বিধ ভৌতিক বিকারের সংযোগে কটু, তিক্ত, কষায়াদি ভাব প্রাপ্ত হয়।

বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জলের কারণীভূত বায়বীয় অংশ সম্বলিত

তৈজস অংশের রূপ বা আশ্বাদ কিছুই নাই। কিন্তু তদুৎপন্ন জলের রূপও আছে, আশ্বাদও আছে, আশ্বাদটি মধুর এবং রূপটি ভাস্বরশুক্ল। তৈজন ও বায়বীয় অংশ থাকিতে জল রূপ, রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়াছে। বায়ুর স্পর্শ অনুক্ষাণীত কিন্তু জলের স্পর্শ শীত।

আর্যাদিগের এই সিদ্ধান্ত অপর শ্বেত-দ্বীপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস জলের উপাদান, ঐ দুই গ্যাসের কোন বর্ণ নাই এবং আশ্বাদ নাই) প্রায় একরূপ হইতেছে। তবে ধ্যাননিম্নলিখিতনেত্রে দেখা আর বিকসিত নেত্রে যন্ত্র সংযোগে দেখার যেরূপ প্রভেদ হওয়া উচিত—সেইরূপ প্রভেদ থাকিতে পারে। জল মিশ্রপদার্থ এবং সংযোগোৎপন্ন জানিয়াও স্থিতি যে জলকে ভূত বলিয়াছেন তাহার ভাব এই,—জল আপনার কারণীভূত বায়বীয় অংশ-সংযুক্ত তৈজস অংশ হইতে সম্পূর্ণ তত্ত্বান্তর এবং জলের পরিণামেও অপর এক তত্ত্বান্তর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের কারণ, তাহাই ভূত “ভবন্তাহম্যাং তত্ত্বান্তরানি”। জল যে আপনার কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহার পরিচায়ক আশ্বাদ। এই আশ্বাদ নামক গুণ জল-স্রষ্টির পূর্বে ছিল না এবং ইহার গ্রাহক জিহ্বা ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ান্তর নাই। এই হেতুক, এবং উহা হইতে পৃথিবী নামক তত্ত্বান্তরের জন্ম হইয়াছে এই হেতুক, জল

চতুর্থ স্থানের ভূত । আমরা এখন জল জমাইয়া মৃত্তিকা করিতে পারি না, কিংবা জল হইতে পার্থিব পরমাণু নিষ্কাশিত করিতে পারি না বলিয়া “জলের পরিণামে পৃথিবী” এই কথায় অবিশ্বাস হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কতদূর যোগ্য ন-হসা বলা মুকঠিন । যাহা হউক আর্থা-দিগের মতে ভূতের লক্ষণ “অমিশ্র মৌলিক পদার্থ ভূত” এরূপ নহে । তাঁহারা বলেন এরূপ লক্ষণে অনেক দোষ আছে । অতএব যে তত্ত্বান্তরের জনক, তাহাই ভূত । পৃথিবী কি জল হইতে যাহা অতঃ পদার্থ, অর্থাৎ ঘট, পট, পতঙ্গ, কীট, তৃণ, গুল্ম, রক্ষ প্রভৃতি পদার্থ জন্মে—তাহা সেই পৃথিব্যা-দি হইতে তত্ত্বান্তর নহে । কেননা, তাহাতে পৃথিব্যা-দির বিশেষ গুণ ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র বিশেষ বা অসাধারণ গুণ নাই, এবং তাহার গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়-ান্তরও নাই । যে যে পদার্থ দ্বারা এই জগৎ পিণ্ড নির্মিত হইয়াছে—সেই সেই পদার্থ নির্বাচন আরম্ভ করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ পদার্থ পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহার অতিরিক্ত পদার্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই ।

তিষ্ঠতু । এই জলের যে অবতাব দৃষ্ট হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক “জলে সাংসিদ্ধিকো জবঃ” । সাংসিদ্ধিক শব্দের অর্থ স্বাভাবিক । যিনি জলের পিতা, তিনিই পুত্রের ঐ সাংসিদ্ধিক রক্ষা করিতেছেন । তাঁহার অনুগ্রহের ক্রটি হইলে জল বিকৃত-

ভাব ধারণ করে [অর্থাৎ উচ্চাংশযুক্ত বায়ুর সংসর্গ রহিত হইলে জল বিকৃতভাব (কাঠিন্য) প্রাপ্ত হয়, ।] এই সকল বিকৃত জল করকা (বরফোপল), হিমালী (বরফ) নামে প্রসিদ্ধ ।

“উচ্চাংশযুক্ত বায়ু জলের অবতাব রক্ষা করিতেছে, এবং সেই উচ্চাংশযুক্ত বায়ুর সংসর্গ রহিত হইলে জল জমিয়া যায়।” আর্থা-দিগের এই সিদ্ধান্তকে শ্বেত দ্বীপীয় সিদ্ধান্ত বড় অতিক্রম করিতে পারিতেছে না । তবে কি না আর্থা-দিগের জ্ঞান না জানা সমস্তই বহিঃ-স্রোত-নিরুদ্ধ হৃদয়ের অধীন, সে জন্য তাঁহারা “যেখানে ৩২ তাপাংশ বা তরুণ সংখ্যাত গ্রীষ্ম হয়, সেখানকার জল জমিয়া যায়, এ কারণ যে সকল দেশে সূর্য্য কিরণ সরলভাবে পতিত না হয় সেই সকল দেশে গ্রীষ্মের বা তাপের অস্পত্তা প্রযুক্ত সর্বদাই জল সকল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে এবং পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীর উর্দ্ধের অধিক শীতলতা নিবন্ধন উর্দ্ধস্থিত মেঘের জল কখন কখন কঠিন হইয়া শিলা রূপের উৎপাদন করে-” এইরূপ কল্পিত ব্যক্ত করিতে পারেন নাই । অহিফেন-ভোজীর মতন, চক্ষু মুদিত করিয়া, বলিয়া গেলেন “জলে সাংসিদ্ধিকো জবঃ ।” “অবতাব প্রতিরোধস্ত বৈজাত্যা দুপপদ্যতে ।”

অপিচ, “উদ্যমসংযোগেন দিব্যতেজঃ সংযোগবিগমে পুনর্জবত্বমুৎপদ্যতে” ।

(পদার্থতত্ত্ব)

এস্থলে ‘দিব্যতেজঃ’ শব্দের অর্থ পার্থিব উ-

অতীত বিপরীত শৈত্যবিকার বায়ু বিশেষ।
এই সিন্যতেজের সংসর্গে জলের অবস্থা প্রতি-
রোধ হয়—আবার উষ্ণতা সংযোগ হইলে
তাহা দূরীভূত হয় অর্থাৎ পুনশ্চ জল হয়।

কথিত নিয়মানুসারে উষ্ণতা বা তাপ,
পিণ্ডীভূত বস্তু যাত্রেয়ই লঘুতা ও ক্ষীণতা
বা প্রসারিত হইবার কারণ হইতেছে। প-
রন্তু সাংস্কৃতিক জল বা স্বভাব তরল প-
দার্থ তাপসংযোগে যে পরিমাণে ক্ষীণ
হয়, সংহত কঠিন বস্তু সে পরিমাণে ক্ষীণ
হয় না। অপিচ, কোন কোন বস্তুর একরূপ
বিশেষ স্বধর্ম আছে যে, যাহা থাকায় ত-
বস্তুর উপরিভাগস্থ পরমাণুসমূহ অন্তর্ভা-
গস্থ পরমাণুর তাপাংশ সমাহরণ এবং নি-
কট বায়ুর তাপাংশ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং
বাষ্পভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে
কপূর প্রভৃতি কতিপয় জল তাপসংযোগ-
বশতঃ সর্বদাই বাষ্প হইয়া থাকে। জলও
একরূপ কারণে অবলম্বন করিয়া বাষ্পীভূত
হয়। জলের বাষ্পীভূত হইবার প্রধান
কারণ সূর্য। সৌর উষ্ণতা সংযোগে জ-
লের বাষ্পভাব প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় আর্ষ্য
শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সৃষ্টি-
কালে যে জল জন্মিয়াছিল তাহাই আব-
হমান চলিয়া আসিতেছে। এখন আর নূ-
তন জলের সৃষ্টি হয় না। সমুদ্রাদির জল
ও পার্থিব রস সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পতা
প্রাপ্ত হইয়া বায়ুকর্তৃক উর্দ্ধে উদ্ধাত ও প্র-
সারিত হয়—আবার তাহাই উপরিস্থিত
অম্ল বায়ুর দ্বারা শীতল ও উপযুক্ত ঘনতা

প্রাপ্ত হইয়া বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে
নিপতিত হয়। এই নিমিত্তই বেদে এবং মনু
প্রভৃতি স্মার্তগ্রন্থে সূর্য্য হইতে বৃষ্টি হও-
য়ার কথা উল্লেখ আছে। যথা:—

“আদিত্যাজ্জাগতে বৃষ্টির্নৈঃসরং ততঃ
প্রজাঃ।” (ঋগ্বেদ ও মনু)

“গত্বোত্তরারণ্যং তেছোরসানুকৃতা বশ্মিভিঃ।
দক্ষিণারণ্যমারুতৈঃ মহীং নিবিশতে বনিঃ॥
ক্ষেত্রভূতে ততস্তস্মিন্ ওষধীরোনদীপতিঃ।
দিবশ্চক্ষুঃ সমুকৃতা জনরামাস দারিণা॥”

(বনপর্ব, ৩ অধ্যায়)

“ঐরাবত হস্তিকর্তৃক শুণ্ডদ্বারা স-
মুদ্র হইতে জল উত্তোলিত হইয়া বৃষ্টি হয়”
এই জন-প্রবাদ যে কিং-মূলক, তাহা জা-
নিয়া। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, কোথাও
একথা লেখা নাই। বরং সর্বত্রই পূর্ব
প্রণালী ক্রমেই বৃষ্টির কারণ বর্ণিত আছে।
“অষ্টোমাসান্নিপীতং যচ্চূয়া উদময়ং বনু।
স্বগোভিমৌক্তুমারেভে পর্য্যণাঃ কাল-
আগতে॥”

(জীভাগবত)

অর্থাৎ যেরূপ ভূপতি এক সময়ে প্র-
জাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া
অন্য সময়ে আবার তাহাই তাদের প্রতি
বিতরণ করেন, সেইরূপ সূর্য্যদেবও আট মাস
ব্যাপিয়া আপন বশ্মি দ্বারা পৃথিবী হইতে
জলময় ধন আহরণ করিয়া কালে তাহাই
আবার পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে বিতরণ করেন।
যদিচ সকল মাসেই সূর্য্যের কিরণ আছে
এবং সকল সময়েই জল বাষ্প হইয়া থাকে,

তথাপি শীত ও উষ্ণকালে যেরূপ ও যে পরিমাণে বাষ্প হয় এবং তাহা উর্দ্ধে উদ্গত হয়, বর্ষাকালে তদ্রূপ ও সে পরিমাণে হইতে পারে না । কারণ, উদ্ভাপ দ্বারা যে বাষ্প জন্মে তাহা বায়ুর দ্বারা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । অতএব বায়ু যে সময়ে সিক্ত থাকে, সে সময়ে বায়ু অধিকতর বাষ্প উদ্গহন করিতে পারে না । শীত সময়ের বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে সুতরাং উক্ত কালে সূর্যের লঘুতাপ-জন্য উদ্ভূত বাষ্প সকল যত অধিক উৎক্ষিপ্ত হয়, গ্রীষ্মাদিকালে আদিতোর প্রখর কর দ্বারা ততোধিক বাষ্প জন্মিলেও তত্কাবৎ সম্পূর্ণ উৎক্ষিপ্ত হয় না । তাহার প্রধান হেতু এই যে, শীতকালের সঞ্চিত বাষ্প দ্বারা সিক্ত থাকায় বায়ুর উদ্গহন শক্তি তৎকালে হ্রাস থাকে । অতএব শীতকালে সরোবরাদির জল যেরূপ শুষ্ক হয়, গ্রীষ্মকালে তত হয় না । বর্ষাকালের ত কথাই নাই । এই জন্য প্রস্তাবিত ভাগবত পুরাণের বচনে আট মাস পর্য্যন্ত বাষ্প সঞ্চিত হও-

য়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে এবং চারি মাস বর্ষার কথা বলা হইয়াছে । বর্ষা যদিও চারিমাস বাষ্পক নিয়মিত নহে, তথাপি প্রায়িক অথবা বর্ষার মুখ্যকাল বলিয়া ঐরূপ বলা হইয়াছে । অতএব ঐরাবত হস্তীর জলবর্ষণ-কর্তৃত্ব প্রবাদ কোথা হইতে উদ্ভিত হইল নির্ধারণ করিয়া বলা যায় না । বোধ হয়

“ মেঘসোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচাতে, ” (মল্লিনাথধ্বত বচন)

এই অংশ হইতে ঐ জনপ্রবাদ উদ্ভিত হইয়াছে । এই শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মেঘ সকল স্তরে স্তরে উদয় না হইলে ফাঁফা মেঘে জল হয় না । মেঘ যখন বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া স্তরে স্তরে জমিয়া যায়, সেই সময়েই উপরিস্থিত মেঘের সৃষ্টি-জন্য উষ্ণ-বলে নিম্ন স্তরের মেঘ গুলি গুলিয়া গিয়া রুক্ষিরূপে পতিত হয় । অতএব উপরিস্থিত মেঘের নাম ঐরাবত এবং ঐ ঐরাবতই রুক্ষির কারণ ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ ।

বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত।

বোপদেবকে সংস্কৃত-বিদ্যা-নিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরির (দেওঘর বা দৌলতাবাদের) অধীশ্বর হেমাস্ত্রির সভাসদ স্থির করিয়াছেন * এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনা করি নহি। কিন্তু সেটি এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। আমরা অদ্য এক্ষণে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা, বোপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উইলসন সাহেবের ন্যায়, পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবকে হেমাস্ত্রির দানখণ্ডের ভূমিকায়, হেমাস্ত্রির পার্শ্বদ বলিয়াছেন। যথা “ হেমাস্ত্রিরপি-
শ্রয়ঃ নৃপতিঃ, যস্য সভাপণ্ডিতো, মহা-ম-
হোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অনুমী-
য়তে - পক্ষবসুধরেন্দুমিতে শকসম্বৎসরে
দ্বিত্বাদিবৎসর ব্রাহ্মণিকোন সমজনিষ্ঠ। ”
শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন
“ সাম্প্রতং বিজ্ঞাপাতে হেমাস্ত্রিস্ত, দে-
বগিরিস্থ-যাদববংশ-মহারাজাদিরাজ-মহা-
দেবচক্রবর্তিনো রাজোপাধ্যায়িকরণ-পণ্ডিত
আসীৎ। ” ইহাতে হেমাস্ত্রিকে যাদববংশ-
বতংশ মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্যধ্যক্ষ বলা

হইয়াছে এবং ইহা চতুর্ভুজ চিন্তামণি মদ্যো
হেমাস্ত্রি যে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার
সহিত ঐক্য আছে; হেমাস্ত্রি কোন স্থলেই
আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান
করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত
ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নৃ-
পতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার
সভাসদ বলিয়াছেন, এবিষয় কোন প্রামা-
ণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাউলাম না ;
সুতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র ঐতিহা-
সিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাস্ত্রি
দানখণ্ডের প্রারম্ভে, তাঁহাকে মহারাজ ম-
হাদেবের ধর্ম্যধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া-
ছেন, এবং চতুর্ভুজ চিন্তামণি প্রতি অধ্যা-
য়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন ; যথা
“ ইতি শ্রীমহারাজাদিরাজ শ্রীমহাদেবস্য
সমস্ত-করণাধীশ্বর-সকল-বিদ্যা-নিশারদ-শ্রী-
হেমাস্ত্রি-বিরচিতো চতুর্ভুজ চিন্তামণৌদান-
খণ্ডে ” ইত্যাদি হেমাস্ত্রি স্বীয় পরিচয়
এই পর্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে
বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। বো-
পদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থের টীকা নির্মাণ-
কালে হেমাস্ত্রি প্রথমতঃ বোপদেবকৃত
গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা,

“ যস্য ব্যাকরণেবরেন্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ

প্রবন্ধাদশ,

* Vide Wilson's Vishnu Purana vol.
1. Preface, page L (Trubner & Co.)

প্রখ্যাতানব বৈদ্যকেহগতিপি নির্ধারার্থ
মেকোই-

সুতঃ । সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবতভোক্তৃ
ভূরন্তবানী শিরোমণে রিহত্ত্বাঃ কে কে ন
লোকোত্তরাঃ ॥

অর্থাৎ যাহার বাক্যরূপের কীর্তি অসুত,
বাক্যরূপ বিষয়ে যাহার ১০ টি প্রবন্ধ,—
বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯ টি প্রবন্ধ, তিনি নি-
র্ণয় নামক ধর্মশাস্ত্র সাহিত্যে ওখান, ভাগ-
বতের উপর ৩ টি প্রবন্ধ—সেই অন্তবানী ম-
হামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন্ গুণ না
অলৌকিক ? বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ
করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন “ আমি হে-
মাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাখ্য ভা-
গবতব্যাখ্যা করিলাম । ” যথা,

“ঐমদ্ভাগবত স্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিকপাতে ।
বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুস্তরে ॥

(বোপদে-কৃত হরিলীলা টীকা)

হেমাদ্রি বোপদেবকৃত হরিলীলা টীকার
টীকা লিখিয়াছেন । হেমাদ্রি ও বোপদেব
সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণা-
তোর দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছি-
লেন । মহারাজ মহাদেবের আশ্রয়ে
হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে
বাস করিতেন ।

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ
বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকার
“ মন্ত্রি-হেমাদ্রি-তুস্তরে ” এরূপ লিখিয়া-
ছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ হ-
ইলে কিঞ্চিৎ নত হইয়াই বলিতেন ।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপবল্লভাচার্য্য
বলেন বিটমভক্ত-কৃত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত
আছে—“ সচাঃ হেমাদ্রিঃ দ্বাদশাধিক
দ্বাদশ শত (১২১২) শকোত্তর-দাক্ষিণা-
তালন্দী-গ্রামস্থ-জ্ঞানেশ্বর সংজ্ঞক-ভগবদ্ভ-
ক্ত-কৃত-গীতা-ব্যাখ্যানোত্তর-কালিকঃ, “ অ-
র্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাব্দে দাক্ষিণা-
তোর অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতা
ব্যাখ্যানের পরভাবিক ” এবং তদাশ্রিত-
তৎসমকালিক-বোপদেব-প্রাকালিক-একা-
দশ-শতে শাকে বিংশতাব্দ-মুয়ে সতে অব-
তীর্ণ-মধ্বমুনিঃ সদা বন্দে মহাশুকম্, ইতি
স্মৃতার্থ-সাগরা-মহানিবন্ধ-মহিত-শ্রীসদাশ-
নদীর্থভগবৎপাদাচার্য্যঃ—” অর্থাৎ হে-
মাদ্রির আশ্রিত এবং সমসাময়িক বো-
পদেবের পূর্বে ১১২৫ শকে মধ্বাচার্য্য
জন্মিয়াছিলেন । ইত্যাদি, পুনরায় বোপদেব
সম্বন্ধে নন্দমিশ্রকছেন “ শঙ্করাচার্য্য-সময়া-
দ্বতরে বৎসরশতমুয়ে ব্যতীতে বোপদে-
বোইভূৎ ” অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়হইতে
২০০ শত বৎসর অতীত হইলে বোপদেবের
জন্ম হয় । পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি
বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল
অনুমান করেন । উইল্‌সন অফেক্ট *
ওএন্টারগার্ড† কর্ণেল কেনিডি, কোলক্ক,
গোল্ডকুক ও বর্নেস সকলেই বোপদেব
কে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক স্থির করি

* Aufrecht, " Catalogus " p. 174 b etc.

† Radices Linguae Sanskritae.

গাছেন, কেবল বনুকের মতে তিনি ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন ।

মুক্তাফল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় বাঁহা দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ্বরের শিষ্য । যথা ;—

“ নিম্বন্ধনেশ-শিষ্যেণ ভিস্ককেশব-মুনা ।
হেমাস্তি বোপদেবেন মুক্তাফল মটীকরং ॥”

বোপদেব ভিস্ক-নন্দন বসিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেক তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যাত্মীর মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন । যথা ;—“বোপদেব-বশ্চকারেদং নিপ্রোবেদপদাম্পদং” পূর্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন । বঙ্গদেশেও অত্রের গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা একাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে ।

গ্রাজ্য ভট্টরূপ ২য় রাজতরঙ্গীণিতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাম্বীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহার ভ্রাতার নাম জম্বদেব । এই বোপদেব আমাদের আলোচ্য মুক্তবোধ-বাকরণ-প্রণেতা বোপদেবইহঁতে পৃথক ব্যক্তি ।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধ ত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, ও পরমহংস-প্রিয়া,) শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুক্তবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম ও ৩৯ টীকা, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন ।

তাহার মধ্যে মুক্তবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ । পাণ্ডু পাঠের আরম্ভে তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশ্যরক্ষ, আপিশামী, শাকটায়ন, পানিনি, অমর ও জৈনন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাস্ত্রিকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন ।

মুক্তবোধ ব্যাকরণ এতসংক্ষেপে নির্মিত যে, বোপদেব পানিনির সমুদয় সূত্রের মধ্য ইহার ১১১ শত সূত্রে নিহিত করিয়াছেন । বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পরিভাষার অক্ষর পর্যন্ত কর্তন করিয়াছেন । যথা ; বন্ধির--ব্রী, গুণের--গু, দীর্ঘের--ঘ, সমাসের--স ইত্যাদি ; লট-লোটে, লুঙ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, খি, গি, ঘি ইত্যাদি । এক অক্ষরে নামের সংক্ষেপ করিয়াছেন, দ্ব্যক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই ।

“ আদিগোচোব্রী ” এই সূত্র দ্বারা বোপদেব পানিনির দুইটি সূত্র সংকলন করিয়াছেন । “ যস্যায়ন্যাবোহ্চীচঃ ” এই সূত্রে পানিনির দুইটি সূত্র নিবিষ্ট আছে । এইরূপ কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্যন্ত সূত্রের কার্য বোপদেবের এক সূত্রে নির্বাহ হয় । এইরূপ সংক্ষেপে করতে মুক্তবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে ; তাহাতে টীকা ব্যতীত সংস্কারলাভের আশা নাই । মুক্তবোধের সূত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ক্লেশজনক । তাহার কারণ, ২৩৮৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, এক প্রযুক্তে উচ্চারণ করিতে হয় । যথা ; “ বনচ্চযীকোথো ঘাঙ্কুর্ছুরোহ্থেঃ ”

“ যুগ্মোদ্যোদ্যেনোহব কুপস্বরেইপ্যাতদাত্ত-
পকস্ববাক্যঃ । সমেপ্সাদেনৈকাচকোস্ত
বা । ” ইত্যাদি ।

বোপদেব বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী ছিলেন
এজন্য উদাহরণসমস্ত বিষ্ণু নামটি ক-
রিয়াছেন । সংস্কৃতশিক্ষা এবং হরিনাম-
কীর্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সুদুল্লভ ।
যুক্তবোধ ব্যতীত উহা লাভ হয় না, এজন্য
যুক্তবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য । যথা—

“ গীর্জাণ বাণী বদন্ত মুকুন্দ-
সকীর্তনশ্চৈতুভয়ং হি লোকে ।
সুদুল্লভং তচ্চন যুক্তবোধ-
ব্রলভ্যতেহতঃ পঠনীয় মেতৎ ॥ ”

বোপদেব “ যস্মৈদিংসাম্ভয়া— ” ই-
ত্যাদি সূত্রের উদাহরণ কেবল হরিনাম ঘ-
টিত করিয়াছেন ; ‘দদাতু সন্তাঃ’ ইত্যাদি ।

যুক্তবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই । যে
সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ ক-
রেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক সূত্র,
যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা
যুক্তবোধে প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে । এমন
কতক গুলিপদ আছে যাহা বৈকল্পিক অ-
র্থ ১৭ একবার হয়, একবার হয় না ; এমন
দুই একটি পদনিষ্পাদক সূত্র একবারে নাই
বলিলেও অত্যাতি হয় না ।

সুপদ্য, পাণিনি, সংক্ষিপ্তসার প্রভৃতি
ব্যাকরণের দ্বারা (ঔজ্জডৎ) পদ সিদ্ধ হয়,
যুক্তবোধ মতে হয় না, (ঔড়িটৎ) হয় ।
দধি দধি, মধু মধু ইত্যাদি দ্বিবিধ প্রয়োগ
অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু যুক্তবো-

ধের মতে হয় না । এইরূপ অনেক প্রকার
প্রয়োগ যুক্তবোধ মতে হয় না ; সুতরাং
তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে ।
গ্রন্থকার স্বয়ং উহার রচনা করিয়াছেন ।

যুক্তবোধের দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ,
রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভট্ট,
রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, জীবলভাচার্য্য, দয়-
রাম বাচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্তিক
সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দ-
রাম প্রভৃতির টীকা আছে । এই সকল
টীকার মধ্যে দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের
টীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত । কাশীশ্বর
ও নন্দকিশোর যুক্তবোধের পরিশিষ্ট
লিখিয়াছেন ।

প্রস্তাবের শীর্ষ দেশে “ বোপদেব ও
শ্রীমদ্ভাগবত ” লিখিয়াছি । কিন্তু এতক্ষণ
শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই
এং বোপদেবের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত
গ্রন্থের নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি,
তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান
করি নাই । উপসংহারকালে তাহার বি-
বরণ লিখিতেছি । ভাগবতের স্তোত্র-
কল্পে গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই । ন্যায়,
সাংখ্য, পাণ্ডুলিপি সমস্ত দর্শনের সার ই-
হাতে গৃহীত হইয়াছে । এই গ্রন্থ এত গা-
ভীর্ণ্যপূর্ণ যে, অনাগাসেই উহার মর্মোদ্বেদ
করা যায় না । এজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া
থাকেন “ বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা ”
বিদ্বান্ ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত
গ্রন্থদ্বারা হয় । এতাদৃশ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের

প্রতি অনেকে সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ইহা বোপদেব প্রণীত বলিয়া হতাদর করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করত ভাগবত বাস-প্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য ভাগবত বাস-প্রণীত সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাই-তেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যা-সের দ্বারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজ্যশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা আমাদের বলা উ-দ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব প্রণীত নহে এবং তাহা অতি-প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ ক-রিতে যত্ন পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত বাসদেব রুত নহে, উহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদি-গের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা;—

শঙ্কাপঞ্চবলিগুহ নিবন্ধানুদাহৃতবৃন্দবন্ধ
পদলালিত্যাহেতুকপ্রামাণ্যানধিকারণমেতৎ

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী কথনকালে কতক-গুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্য সংগ্রহকারেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্ষ গ্র-ন্থের ন্যায় ভাগবতের রচনা প্রাঞ্জল নহে, অত্যন্ত আধুনিক স্লীষ্ট শব্দের দ্বারা এই গ্রন্থের নির্মাণ এবং যেরূপ পদলা-লিত্য ও পদবিন্যাসচ্ছটা দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিন্যাস ও লালিত্য আর্ষ সময়ে ছিল

না। এই সকল কারণে ভাগবত বাস-রুত নহে, উহা বোপদেব রুত, কারণ বোপ-দেবের রচনা প্রণালী এইরূপ দেখা যায়।

“ভাগবতভূষণ” কায় এই সকল আ-পত্তির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন;—

১ম—কাঠক, কালাপক, মৌহন, মৌগল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকি-লেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্ত্বংশমিকৃত শঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন— অপরোক্ষেয় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্য গু-ন্থকারেরা ভাগবতের প্রমাণ একবারে ধ-রেন নাই, এমত নহে; আবশ্যকমতে বো-পদেবের পূর্বভাবিক চিৎসুখ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্র-মাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যাঁহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবল মাত্র বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে জ্ঞানমার্গ প্রকাশক গ্রন্থ ব-লিয়া তাঁহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থমধ্যে আনয়ন করেন নাই। ৩য়—যদি ছান্দোগ্য উপনিষৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ভা-গবতীয় অষ্টাবক্রাখ্যান, সনৎসুজাত প্র-ভৃতি যখন সম্পূর্ণ কঠিন, গম্ভীরার্থ, পদলা-লিত্য ও বিন্যাসপরিপাটীযুক্ত হইলেও তাহা আর্ষ হয়, তবে ভাগবত আর্ষ না হ-ইবে কেন? অনন্ত সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষা-

ভিক্ষা ত্রিকালদর্শী ভগবান বেদব্যাসের নিকটে সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নহে । তিনি অম্বাদির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন। বিশেষ তিনি এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই--কখন সমভেদ আছে, তখন লিপির প্রকার ভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরম্পর লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন প্রকার হইবে । ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবত-ভূষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেব কৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন ।

শঙ্করাচার্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য বিষ্ণুসহস্র নাম ভাষ্য ও চতুর্দশ মত বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন । পুনরায় শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী হনুমৎ ও চিৎসুখ মুনি ভাগবতের টীকা করিয়াছেন । তাহা হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বল্য কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে--
“ বোপদেবকৃতঃ চ বোপদেবপুরাণতৈঃ ।
কথং টীকাঃ কৃতং বৈষ্ণবহনুমৎ চিৎসুখাদিতৈঃ । ”
অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ববর্তী চিৎসুখাচার্য প্রভৃতি মহাত্মারা তাহার কি জন্য টীকা করিবেন? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন । ইনি শঙ্করাচার্যের পূর্বে বর্তমান ছিলেন । কেন না বৈদ্যাস্তিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্তকগণের

নমস্কার করিয়া থাকেন । তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পরপর শঙ্কর শিষ্য পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে । যথা--

“নারায়ণঃ পদ্মভরঃ বশিষ্ঠঃ শঙ্করঃ ত-
ত্পুত্র পরাশরকঃ ।

বাঃগং শুকঃ গৌড়পদঃ মহাত্মঃ গোবিন্দ-
যোগেন্দ্রমথাস্য শিষ্যম্ ।

শ্রীশঙ্করাচার্যঃ মথাস্য শিষ্যঃ * * * * ।

রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।—স্মৃতি কালভরঞ্জের মতে রামানুজ ১০৪৯ শকাব্দে বর্তমান ছিলেন । সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ববর্তী ।

কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেন্দ্র-প্রকণে, ক্ষেমেন্দ্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন । এই ক্ষেমেন্দ্র রাজতরঙ্গিনীকার অপেক্ষা প্রাচীন, কেন না তিনি “ক্ষেমেন্দ্রনা নৃপাবলৌ” এই কথা বলিয়া ক্ষেমেন্দ্রকৃত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । ভাগবত বোপদেবের বহুকাল পূর্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাস্ত্রি বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাদরে চতুর্বর্গচিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন? তিনি যদি ভাগবত বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জ্ঞানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না । ভাগবত বোপদেব প্রণীত আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতন্যদেব, রূপ, সনাতনজীব গোস্বামীর দ্বারা আদৃত হইত

না ? ভাগবত বোপদেব প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেখক গণ কি জন্য চীকা করিলেন ? নিম্নে ভাগবতের চীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব কৃত ৩ খানি চীকা আছে।—

ঐধরীর, বিষ্ণু-ধ্বজ, হরিলীলা মুক্তা-ফল, পরম হংসপ্রিয়, বিদ্যুৎ কামধেনু, সম্ব-কোক্তি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়, সুদর্শনী, মুনি প্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, যাদুপতী, রূহ-তোষিণী, চক্রবর্তীয়া সন্দর্ভ, বোধিনীসার, মাধবীর, বামনী, একনাথী, পুরুষোত্তমী, মধুসূদনী ইত্যাদি ।

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ আছে, তাহার নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গজ-পুরাণ, নারদ-পুরাণ, স্কন্ধ-পুরাণ, তত্ত্ব-প্রকাশিকা, তাৎপর্য চন্দ্রিকা, দিনত্রয় মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচার বৃহস্পতি বাখ্যা, স্মৃতি-কৌস্তভ, স্মৃত্যর্থ-সাগর, নির্ণয়রত্ন, বিদ্যারণ্যমুনিকৃত জীবমুক্তি প্রকরণ, হেমাক্ষিকৃত ব্রতখণ্ড ওদানখণ্ড, নির্ণয়-সিন্ধু, ভট্টোজ্জীদীক্ষিত কৃত পূজা প্রকরণ, নাগোজি ভট্টকৃত আত্মিক শেখর, সংস্কার কৌস্তভ, মথুরাসেতু, শাকময়ূখ, বাবহার যুগ্ম, কালদিনকর, নিধানপারিজাত, ভোজন প্রকরণ, প্রয়োগ পারিজাত, আচার-রত্ন, সংবৎসর প্রদীপ, কলিধর্ম প্রকরণ, অষ্টৈতানন্দ সাগর, কালনির্ণয়, কালনির্ণয়-দীপিকা, কালনির্ণয় বিবরণ, শঙ্করাচার্য্য

কৃত বিষ্ণু সহস্র নামভাষ্য, ও তৎকৃত চতুর্দশ মত বিবেক, মহারাঙ্গীর গোড়পাদকৃত পঞ্জীকরণ বাখ্যা, নন্দমিশ্র কৃত গোবিন্দা-ষ্টক, রামায়ণ চন্দ্রিকা, রামতাপনী বাখ্যা, বসুভাচার্য্য নিবন্ধ, উৎসব প্রতান, শুদ্ধা-দৈত্য মার্ভণ্ড, বিদ্যমণ্ডল, পুরুষোত্তম মহা-রাজকৃত সুবর্ণহৃদয়, নিম্বাকীর স্বমত নির্ণয়-সিন্ধু, হরিভক্তি বিলাস, রামানুজীয়, ও তৎকৃত সারসংগ্রহ, অপারদীক্ষিত কৃত শিব-তত্ত্ব বিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তি প্রকাশ, অষ্টৈতমিক্তিকার কৃত ভক্তিরসায়ন, নাম-কৌমুদী সচ্চরিত মীমাংসা, ভক্তি-ত্ৰাবলী, ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ, ভাস্কর-রাজকৃত ললিতা চীকা, নীলকণ্ঠকৃত দেবী ভাগবত চীকা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি। এক্ষণে সুবিদ্বৎ পাঠক-গণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপ-দেব প্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এত-গুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ কখনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ মান্য ও প্রাচীন গ্রন্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অনেকগুলি বোপদেবের পূর্বের রচিত গ্রন্থ আছে। এই সকল আলোচনায় ভাগবত কখনই বোপদেব প্রণীত বলিতে সাহস হয় না। “প্রবাদো বোপদেবী তু বক্ষ্য। পু-ত্রায়তে তরাং” ভাগবত বোপদেব প্রণীত একথা বলা আর বক্ষ্যার পুত্র সমান। আ-মরা গোঁড়ামীর পক্ষপাতী নহি, কতক-গুলি লেখক কেবল বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি

নিঃস্বপ্ন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য আমার
ও অর্থোক্তিক তর্ক উপস্থাপন করিয়া ভাগ-
বত পুণ্যেণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী
হইয়াছেন । আমরা ভাগবত সম্বন্ধে অ-

ন্যান্য বিচার সতত প্রস্তাবে স্থিতি ।
এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গ ক্রমে
ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য তাহাই ব-
লিলাম ।

শ্রীরামদাস সেন

বগবদ্র প্রলাপ ।

৩। পরিতাপ ও পরিণাম ;—দোষ কাহার ?

মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছি ; দুঃখে,
হুণায়, লজ্জায় আর ইচ্ছা হয় না যে সং-
সারে কাহাকেও মুখ দেখাই । বস্তুতঃ
আমার মত অপদার্থ অকর্মণ্য জীব বোধ
হয় ভারতে আর নাই । “সাধিলেই সিদ্ধি”
বলিয়া, সমর্পে আশ্রয় লইয়া প্রকৃত
কর্মণীল কত পুরুষ অসাধ্য সাধন করি-
তেছেন ; আর আমি ?—দূর হউক, সে
কথা মুখে আনিতেও কষ্ট বোধ হয় ।

কষ্ট বোধ হয় বটে ; কিন্তু না বলি-
য়াই বা থাকিতে পারি কৈ ? বলিলেও
কাহারও ক্ষতি দেখিতেছি না, বরং মঙ্গ-
লের সম্ভাবনা । তবে, লোকে দৃষ্টিবে,
দৃষ্টক । লোকে যেমন বুকে তেমনি বলে,
তাহাতে লোকের ত দোষ নাই । আমি
কেন হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তাহাতে
অশাস্ত্রব আলোক সম্পাত করিয়া, তা-
হার গূঢ়তম গুহার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখাই
না । তখনও যদি লোকে আমার দোষ
দেয়, মস্তক অবনত করিয়া দোষ স্বীকার

করিন, দ্বিতীয় বার বাক্যব্যয় করিব না,
স্থির নিশ্চিত জানিব, কোথায়ও না
কোথায়ও আমার ত্রুটি আছেই আছে ।
এখন যে আমার ত্রুটি নাই মনে করি,
তাহা নয় ; কিন্তু আত্মচক্ষে আত্মদোষ
দেখিতে পাই নাই, তাই সময়ে সময়ে স্ব-
ভাব-মূলভ বা শিক্ষা-মূলভ ভ্রান্তি যেন
আপনা আপনি আসিয়া চিত্তকে উদ্বেল
করিয়া তুলে, নিজদোষের অস্তিত্বের সম্ব-
ন্ধেও সন্দেহ জন্মাইয়া দেয় । তখন প্রাণ
ব্যাকুল হয়, হৃদয় উৎক্লিষ্ট হয়, —জ্ঞান
মোহাজ্বর ছইয়া যায়, উদারতা আত্মাভি-
মানে মিশাইয়া যায় । তখন ভাবিতে ইচ্ছা
হয়, অন্ততঃ ভাবিতে কুণ্ডা বোধ হয় না
যে দোষ আমার নহে, দোষ বধূরই । মনে
হয়, বুঝি ঈর্ষা প্রণোদিত—

ধিক আমার ! এমন গরলও আমার
হৃৎশোণিতে মিশ্রিত রাখিয়াছি ! অবসাদে
এতদূর আত্ম বিভ্রম জগিতে দিয়াছি !
কাহাকে বুঝাইতে যত্ন করি নাই, কাহার

কার্য্য পরম্পরা আমি বুঝিতে সমর্থ হই
নাই, স্বীয় অজ্ঞতার নির্ভর করিয়া সেই
বধূচাকুরাণীর সম্বন্ধে এমন ভয়ঙ্করী কল্পনা
একবারের তরেও আমি করিতে সাহসী
হইয়াছি! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত
নাই, আমার আত্মপাতী হওয়া উচিত।

আত্মপাতী হওয়া উচিত, কিন্তু, আত্ম-
হত্যা করি নাই, করিব না। যাহা উচিত,
তাহাই কি কর্তব্য? যাহা প্রতিদান ক-
রিতে আমার সামর্থ্য নাই, আমি তাহা
লইবার কে? যাহা গড়িতে পারি না,
আমি তাহা ভাঙ্গিবার কে? জরায়ুতে
আমি যখন প্রথম প্রাণ পরিগ্রহ করি,
তখন ত তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব
ছিল না। ভূমিষ্ঠ হইলে আমার সজীবতায়
ত আমার কৃতিত্ব ছিল না। জননী আমার
সুখ দিয়াছিলেন; মাত্রী আমার অঙ্গ সং-
স্কার করিয়া আমার সেই উচ্ছলিতানন্দ
নয়নে কজ্জল রেখা পরাইয়া ক্ষণে পীঠে-
পরি, ক্ষণে সেই পরম-সুখ-শয্যা মাতৃ-
অঙ্কে প্রহরে প্রহরে, দিনে দিনে, মাসে
মাসে, অতি যত্নে, অতি আদরে সাবধানে
রাখিয়া দিয়াছিল; গোপ-তনয় আমার
জন্য গাভী দোহন করিয়াছিল; গোপ-
বালা আমার জন্য গাভী-বৎস পৃথক
রাখিয়াছিল; পিতা আমার ক্রীড়নকের
নিমিত্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন; স্বর্ণকার,
সময়ে আমার শোভা সম্বর্দ্ধন করিয়া উ-
ঠিতে পারে নাই বলিয়া, তিরস্কার সহিয়া-
ছিল; শুকবায় আমার জন্য ভাবিয়া ব্যস্ত

হইয়াছিল; কৃষক আমার জন্য টৈশাথের
রৌদ্র, শ্রাবণের স্রষ্টি, মাঘের শীত সম-
ভাবে, অকাতরে সহ্য করিয়াছিল; শুক
আমার জন্য সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের সহিত অভেদ
জ্ঞান করিয়া, কাব্য-বাকরণে সমান কচি
দেখাইয়া সটীক হযবরল কঠিন করিতে
কষ্ট বোধ করেন নাই; বসন্ত কুমার অ-
মাকে ভালবাসা শিখাইয়াছিল; দাদা
আমাকে সমাজ শাসনের মূলমন্ত্র বুঝাইয়া
দিয়াছিলেন; আর, বধূচাকুরাণী আমাকে
সংসার চিনাইয়াছিলেন;—এতগুলি ব্যা-
পারের মধ্যে, কবে, কোন্টীতে আমি
কৃতী? এই যে এত কাল লোক হাসাই-
লাম, এই যে এতবার প্রণয়ী কঁাদাইলাম,
ইহা কি আমার কৃতিত্ব গুণে? এত যে
কাব্যে আনন্দ ভোগ করিলাম, বিজ্ঞানে
বিমোহিত হইলাম, গণিতে চিন্তা করিলাম,
ইতিহাসে জীবন্ত হইলাম; আমার আ-
লস্যে আত্ম-বিস্মৃত হইলাম, দিল্যে বি-
ভোর হইলাম, রাগে টলিলাম, মত্ততায়
টলিলাম,—ইহাতে আমার কৃতিত্ব-বল
কোথার? দেহ আমার; প্রাণ আমার;
কিন্তু আমি কাহার? কোটি কোটি মানবে
কোটি কোটি যুগ আমার মঙ্গল কামনা
তদগত চিত্ত থাকিয়া আমার অণুকার
অবস্থায় আমাকে উপস্থাপিত করিয়াছে।
অতএব আমি আমার নহি, আমি সংসা-
রের। এতজনের যত্নে, এতজনের লালন
পালনের ফল আমার এই দেহ প্রাণ হে-

লাগে হারাতে আমার অধিকার নাই ।
 “ যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ” ।
 আমি আপনা আপনি মরিব না, আত্ম-
 হত্যা করিতে পারিব না । আমার, সর্বো-
 পরি গরীবসী কথা, আমি মরিলে, লোকে
 বুঝে না, কিন্তু বলিলে, বধু আমার মৃত্যুর
 কারণ । বধুর ইহাতে নিন্দা হইবে, আ-
 মার দোষে আমার জন্য নিন্দা হইবে ;
 আমি মরিব না । মরিব কেন ? আমি যা-
 হার চক্ষুশূল, সে মরুক !

মরিব না ; কিন্তু মনে বড় বাগা পা-
 ইরাছি ; এত করিয়াও বধুর মনজুষ্টি, আ-
 মার কর্তব্য সাধন করিতে পারিলাম না,
 এই দুঃখ আমার মর্মভেদ করিতেছে ।
 বধুকে আমার ব্যবহার বুঝাইতে পারিলাম
 না, বধুও দয়া প্রকাশিয়া তাঁহার মনের
 কথা আমার ভাঙ্গিয়া বলিলেন না । আমি
 অন্ধকারে যত পাদবিক্ষেপ করিতেছি, ত-
 তই স্থলিতপদ হইতেছি । এখন ইহার
 উপায় ? না বুঝিয়াও যেন মানিলাম যে
 দোষ আমারই ; বিশ্বাস না করিয়াও যেন
 স্বীকার করিলাম আমার ঐটি নজর ।
 কিন্তু সে ত এখনকার কথা, এখনি ফুরা-
 ইবে ; তাহার পর ভবিষ্যতের পস্থা কি ?

বাগী হউক, যে জন্য আমার দুঃখ,
 তাহা আমি বলি ; যে গুলি মূল ঘটনা,
 আমি তাহা যে ভাবে দেখিয়াছি, যথাবৎ
 প্রকাশ করি । আমার সাধ যে বধুও সব
 ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, গড়িয়া পিটিয়া, যেমন
 হউক, মনের কথা একবার মুখে বলুন ।

লোকে শুনুক, আমার কথা তাঁহাকে বু-
 জাইয়া বলুক, বধু প্রসন্ন হউন, আমি সুখী
 হই । কিন্তু বধু কি তাহা বলিবেন ?
 বধুই যদি বলিবেন, তবে আমার এত দুঃখ
 কেন ? ফলে বধু বলুন আর নাই বলুন,
 আমি বলি । লোকে তাহাতে আমার
 দোষ আমার দেখাইয়া দিলে, আমি সং-
 শোধন করিব, বধুর চরণে ধরিয়া ক্ষমা
 চাহিব, তথাপি সুখী হইব । আমি
 বলি ।—

উপর্যুপরি বধুচাকুরাণীর দুইটি সন্তান
 জন্মিয়া, প্রথমটি তিন দিন পরে, অপরটি
 দশমাস পরে মরিয়া যায় । ইহাতে বধুর
 ও দাদার বিষম মনোবেদনা ; আমিও
 তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত ।

আমি যে দুঃখিত, বধুচাকুরাণী তাহা
 বিশ্বাস করেন না, আমি ইহার চাক্ষুষ প্র-
 মাণ দিরাছি, তথাপি তিনি বিশ্বাস করেন
 না । আমাদের প্রতিবেশিনীদের মধ্যে
 কেহ কেহ আমাকে একাধিক বার বলি-
 রাছিলেন—“ ছি ! রণরঘু, এমন করাটা
 তোমার উচিত নয়, ভাল দেখায় না ।
 তোমার বিবাহ হয় নাই ; তাহা বলিয়া
 বাহার হইরাছে, তাহার হিংসা করাটা
 কি ভাল ? প্রজাপতির নিকরক, যখন
 ঘটিবার তখন ঘটবে ; তোমার দাদার
 ত ইহাতে দোষ নাই । আর দাদার অ-
 মনোযোগ, অমত্বই যদি ভাব, সে ভাল
 মানুষের মেয়ে ত কোন কিছুতেই নাই ;
 তাহার মনে কেন কষ্ট দেও ? আর বি-

বেচনা করিয়া দেখ, তোমার দাদার ছেলে-
ও ত পর নয়; সে বাঁচিলে তোমাদেরই
বংশ থাকিবে, তোমাদেরই নাম থাকিবে।”
ইত্যাদি অনেক কথা, অনেক বার, স্থির
ভাবে আমি শুনিয়াছি। কিন্তু কখনই বাঙ-
লি সম্পত্তি করি নাই। যিনি যখন বলিয়া-
ছেন, তাঁহার কথা না ফুরাইতেই হাসিতে
আরম্ভ করিয়াছি, শেষে অট হাসি হা-
সিয়াছি। তখন যে তাঁহার মুখ ফিরা-
ইয়া চলিয়া যাইতেন, এখন, এত দিনে
বুঝিতেছি, যে আমার সেই হাসি তাঁহার
অনুদার দৃষ্টিতে দেখিতেম, তাহার দোষ
ভাব গ্রহণ করিতেন; করিয়া বিরক্ত হইয়া
শেষে হয় ত বধুর নিকট গিয়া বধুর প্রতি
তাঁহাদের ভালবাসা জানাইতেন। সংসারে
এ ভালবাসার সৃষ্টি কে করিল? তোমার
আমোদে যে আমার সর্বনাশ হয়, লোকে
ইহা কবে শিখিলে?

যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা ক-
রিয়াছে, সে তাহা বলিয়াছে। কিন্তু ব-
ধুর দৃষ্টে যে আমি দুঃখ পাইরাছি, তা-
হার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি দিতে ক্রটি করি-
নাই। তাঁহার সেই প্রথম সন্তান নষ্ট হ-
ইলে, সেই মাঘ মাসে, সেই অমানিশিতে,
সেই সুলভাকার-বিদারি ঘন ঘন বিদুতের
বিকট কুটিল হাসি উপেক্ষিয়া, সেই শূন্যতা
বাহি পবনের ভীতিসঞ্চারী গুরুধামে ক-
ণপাত না করিয়া, সেই প্রাণশূন্য জ্ঞান-
শূন্য বিকলাঙ্ক একমাত্র নরদেহের অঙ্গ-
ভেদী দুর্গন্ধ পরির্ভ্রম করিতে গিয়া সেই

বীভৎস ককাল-রাশির প্রতিধাতে সেই
শবদেহোপরি পতিত হইয়া, আবার সেই
সখা-শূন্য, প্রেমশূন্য, অশ্রুশূন্য সেই পর-
কাল প্রতিবিশ্ব প্রেতভূমি অতিক্রম করিয়া,
অজ্ঞবস্ত্রে, কম্পিত-কলেবরে বধুর জন্য
কেও যথ আনিয়া দিয়াছিল? দূরে, নিকটে,
গ্রামে, নগরে, একক অপরিচিত, এ দেব-
তার পুষ্প, ও দেবতার স্বাতোদক, বধুর
জন্ম কে আহরণ করিয়াছিল? অগণিত
অমানুষের তোষামোদ, চণ্ডালের পরিচর্যা
বধুর জন্ম কে করিয়াছিল? এত করিয়াও
দ্বিতীয়বার সন্তান নষ্ট হইল বটে, কিন্তু
সে কি আমারই দোষে? বধু বলিয়া ছি-
লেন “ভক্তি করিয়া আনে নাই”—তিনি
আমার নাম করেন নাই, কিন্তু এই কথা
গুলি বলিয়াছিলেন, আর অকপটে কাঁদিয়া
ছিলেন। পুত্রশোকে তিনি কাঁদিতেন, তাঁহার
চিত্ত তখন উৎক্লিষ্ট, আমি তাঁহার
কথা গ্রাহ্য করি নাই, বরং নির্জনে, নী-
রবে দুই বিন্দু অশ্রুমার্জ্জন করিয়াছি।
যাহা হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি,
আমার যাহা সহিতে হয়, তাহা সহিয়াছি।
আমি না করিলে কে করিবে? আমি না
সহিলে কে সহিবে? এবারেও তাহাই
ভাবিয়া করিলাম এবং সহিলাম; তথাপি
হা নৈব! বধুর মন পাইলাম না।

এবারে আয়ুধান্ পুত্রকামনার বধুর
সঙ্কল্পমতে দাদা মহাশয় যজ্ঞ করিয়াছেন।
অদা সেই যজ্ঞ ক্রিয়া; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের
পরিচর্যা, অতিথির সংকার, আগন্তকের

অভ্যর্থনা, এই সকল ব্যাপারে আজি সকলেই ব্যস্ত । আমিও বসিয়া নাই ।

সপ্তাহ ব্যাপিরা এই ব্যাপারের অয়োজন হইতেছে । বিষয় কার্যে অমনোযোগ করিলে সকল দিকেই ক্ষতি, সুতরাং অগ্রজ মহাশয় তাহাতেই ব্যাপ্ত ; আমাদের ভূতা ও কৃষাণ সংপ্রতি বহুলীকৃত গৃহ কার্যে ব্যস্ত, আর আমি নানা স্থান হইতে নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংযোগ করিতেছি । এই সাত দিন, দিনমানের মধ্যে বাটীতে আহাৰ করি নাই ; প্রভাতে বাহির হইয়াছি, হাটে বাজারে যাহা পাইয়াছি, কিনিয়া লইয়া ক্ষুধিবারণ করিয়াছি, সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছি । কেবল গত কল্য একবার মধ্যাহ্নে বাটী আসিয়া ছিলাম, কার্যসমাপ্তি করিয়া আসিয়া ছিলাম । ভাবিয়াছিলাম, স্নানাহার সমাপন করিয়া একবার বসন্তকুমারকে দেখিয়া আসিব । স্নানাহার করিলাম, আমার সেই চতুর্মণ্ডপের কুঠরী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে দাদার দৃষ্টি পথে পতিত হইলাম । দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন “ কোথায় যাইতেছ ? ” কি জন্য বলিতে পারি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম “ কোথায়ও না ” । সুতরাং আর যাওয়া ঘটিল না ; ক্ষণকাল পরেই দাদা মহাশয় আমাকে কার্যাস্তরে, আমাস্তরে পাঠাইয়া দিলেন । দূরে যাইতে হইয়াছিল, কল্য প্রত্যাবর্তন করিতে পারি নাই ; অদ্য বেল্য এক প্রহর না হইতেই আসিয়াছি ।

তখন আমাদের বহির্বাটীতে লোক সন্নাগম হইরাছে, সুতরাং বাহিরেই রহিলাম, তাড়া তাড়ি স্নান করিয়া গেলাম, তাহার পর সেইখানেই উপস্থিত মন্ত, কার্য করিতে লাগিলাম । মধ্যাহ্নে একবার বাটীর মধ্যে গেলাম, বধুর নিকটে যাহা আবশ্যক হইয়াছিল, চাহিলাম । যাহা চাহিলাম, তাহা তিনি দিলেন না, কিছু বলিলেন । তখন বুঝিয়াছিলাম যে তিনি বলিতেছেন “ তোমায় আজি কিছু করিতে হইবে না । ” এখন বুঝিতেছি তিনি বলিয়াছিলেন “ তোমায় ‘আমার’ কিছু করিতে হইবে না ! ”

তখন ভাবিয়াছিলাম, কয় দিন আমার কষ্ট হইরাছে মনে করিয়া বধু আমার বিশ্রাম করিতে বলিতেছেন । সেই ভাবে, আনন্দে অ'প্লুত হইয়া, আমার শরীর মনের ক্লেশাবসান হইল বিবেচনা করিয়া সত্য সত্যই বিরাম করিতে আমার সেই ঘরে গেলাম ।

আমার তৎকালের সেই আত্মার গৌরব অনির্বচনীয়; অপরে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না । তামাক সাজিলাম, সকল ডুলিয়া সেল্কার্কের কথা লইয়া বলিলাম, আমিই সর্কে সর্কা, আমি মহারাজ চক্রবর্তী, আমি অনুপম, আমি শরীর-বদ্ধ মুখ । আমার মুখ-বিনির্গত ধূমপুঞ্জ যেমন উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, আমার অন্তর তেমনি লঘু, ততোধিক লঘুভাবে উৎফুল্ল হইতে লাগিল । তখন আমার মনে কত

ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। মনে হইল যে কতকাল পরে আজি আমার সাধের মুখ পাইলাম; তখনই আবার মনে হইল প্রকৃত মুখের এই নিয়ম, প্রকৃতি আমা-
দিগকে দেখাইতেছেন। ভাবিলাম যাহা মুখ, তাহা এমনি দুর্লভ বটে! বর্ষে কয়টি পৌর্ণমাসী রজনী? আবার পূর্ণিমাতিথি সন্তোষ বৎসর মধ্যে যামিনী সুন্দরী কত বার সুধা-নিসান্দিনী কৌমুদীতে অভিষিক্ত হয়? কিন্তু হায়! আমারই মুখচন্দ্র যে মেঘাচ্ছন্ন হইবে, তখন আমি তাহা ভাবি নাই। মুখের দিনে কে কবে দেব দু-
র্যোগের কল্পনা করিয়া থাকে? ভ্রান্তিই মুখ, নহিলে সংসারে হাসি কান্না থাকিত না; এ সংসার এমন সংসার হইত না।

বসিয়া ধূমপান করিতেছি, বাহির হইতে এক ব্যক্তি অপরিচিত স্বরে আ-
মার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি বাহিবে আসিলে, এক ব্যক্তি আমার হস্তে এক খানি পত্র দিল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অঁপক, এবং আমার অপরিচিত; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কিন্তু কাহার লেখা, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করি, মনে করি-
লাম; কিন্তু চাহিয়া দেখি সে ব্যক্তি সেখানে নাই। কাহার লেখা, ভাবিতে আমার কতক্ষণ লাগিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

পত্র পাঠ করিতে উৎসুক হইল;

কিন্তু যেই পত্র খুলিতে যাইব, অমনি দাদা ডাকিলেন। আমি প্রায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দাদার মুখ গম্ভীর; আর যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মস্তকে বজ্রা-
ঘাত হইল। শুনিলাম বধু বলিতেছেন “আমার ছেলে বাঁচে আর না বাঁচে, তা-
হার কি? তোমার ভাই—” আর শুনি-
লাম না, বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দাদাও বাহিরে আসিলেন। আসিয়া সেই লোকসমারোহের মধ্যে আমাকে ব-
লিলেন “রণরঘু, তুমি মহোদর, ভাল বাসিবার বস্তু; কিন্তু আর বুঝি ভালবাসা রাখিতে পারি না। আমার সম্ভান হউক না উহক, বাঁচুক না বাঁচুক, আমার তাহাতে ক্ষতি নাই। বরং তুমি বাঁচিয়া থাকি-
লেই আমার পরম মুখের বিষয়। কিন্তু স্ত্রী-
লোকে তাহা বুঝে না; বিশেষতঃ তাহার এত কষ্টে তাহার না বুঝাতেও আমি দোষ দিতে পারি না। তথাপি তুমি অজ্ঞানের মত, মুখের মত, বর্ষের মত, নিষ্ঠুরের মত, তাহার সেই দুঃখের জ্বালা দ্বিগুণিত করি-
তেছ।”

আমি নিকন্তর, অবাৎ। অবসর দেখিয়া দাদার অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

এখন আমি একাকী, একবস্ত্র, কপর্দ-
কহীন, মহারহীন, নিরাশ্রয়, নিকদ্দেশ্য। কোথায় চলিলাম, আমিই জানি না। আমার এই পরিণাম; দোষ কাহার?

এই রাত্তিকালে, এই প্রাণিশূন্য প্রান্তরে
প্রতিধ্বনি বলিবে—“কাহার?”

আমি এখন কি করিব? জোৎস্না

আছে, একবার সেই পত্র খানি পড়িবার
চেষ্টা করি।

শ্রীরঘু গোশ্বামী

অধ্যয়ন বিষয়ে ক একটি উপদেশ।

“ভালর অল্পও ভাল,”—কতিপয়
বৎসর পূর্বে অধ্যয়ন বিষয়েও এই প্রবাদ
খাটিত। কদর্যা আমার গ্রন্থাদি বহুল প-
রিমাণে অধ্যয়ন করা অপেক্ষা দুই একখানি
সঙ্গ্রহ পাঠ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়; এ-
খন একখানি নাটক, তখন একখানা ইতি-
হাস, অপর সময়ে একখানা সংবাদ-পত্র
এরূপ পাঠে কোন ফল নাই; ভাল এক
খানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়া স্মরণ
রাখ, তবেই কাজ চলিবে; অধিক কিছু
পড়িবার প্রয়োজন নাই। যখন মুদ্রায়ন্ত্র
প্রচলিত ছিল না; যখন সাধারণ-পুস্তকা-
লয় স্থাপিত হয় নাই; যখন মাসে মাসে
দিনে দিনে নূতন নূতন গ্রন্থ, মাসিক, পা-
ক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্র,
সাহিত্যিক পত্রিকা ও সমালোচনা প্রভৃতি
প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় নাই; তখন “ভা-
লর অল্পও ভাল” একথা শোভা পাইত এবং
এই প্রবাদানুসারে চলিলে ক্ষতি ছিল না।
কিন্তু আজি কালি সে দিন নাই; এখন
নিতান্ত মূর্খ ও অসম ভিন্ন এরূপ উপদে-
শের বশবর্তী হইয়া কেহই চলিতে পারে

না। কাল-ধর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে; কাল-
স্রোত উন্নতি-বর্জ্য ক্রমে অগ্রসর হইতেছে,
কালচক্র নিয়ত ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরি-
তেছে, গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, সকলেই
উন্নতির পথে অগ্রসর। কালের তাড়নে অগ্র-
সর—তুমি কেনন করিয়া “অল্প” সন্তুষ্ট
হইয়া বসিয়া থাকিব? যদি পশ্চাতে প-
ড়িয়া থাকিতে নিতান্ত প্রতিজ্ঞাকৃত না হ-
ইয়া থাক, তবে তোমাকেও কাল-স্রোতের
সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে, হয় অ-
গ্রসর হইবে, নতুবা তুমি ক্ষুদ্রভরতের মত
পড়িয়া থাকিব, পৃথিবী তোমার উদ্দেশ্য
লইবে না—কারণ কালের সঙ্গে যোগ না
দিলে তুমি পৃথিবীর কেহ নও, পৃথিবীও
তোমার কেহ নয়। মোট কথা, তোমাকে
অল্প সময়ে নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে
হইবে, এক সময়ে নানাবিধ বিষয়ে তোমার
মনঃসংযোগ করিতে হইবে, অন্যথা সমাজ
তোমাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র পদার্থবৎ মনে ক-
রিবে,—লোকের নিকট নিতান্ত ছেয় হইয়া
তোমাকে থাকিতে হইবে। এরূপ যখন
হইল, তখন কি কি বিষয় পড়িতে হইবে,

এবং কি প্রকারে পড়িতে হইবে, এসম্বন্ধে যদি আমরা কএকটি নিয়ম নির্ধারণ করি, তবে বোধ হয় পাঠকের নিকটে “বাক্স-বের” অকর্তব্য কার্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

আমরা উপরে যে কর্তব্যের উল্লেখ করিলাম, তাহা আপাততঃ যেরূপ সহজ বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। সর্ব-শ্রেণীর পাঠকের প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা অসাধ্য ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন স্পৃহা, ভিন্ন ভিন্ন কৃতি, ভিন্ন ভিন্ন শ্রুযোগ ইত্যাদি। সুতরাং পাঠবিষয়ে সাধারণ নিয়ম কেমন করিয়া হইতে পারে? পাঠের নিয়ম পাঠকের হাতে। ফলতঃ যে পাঠক স্পৃহা, কৃতি, শ্রুযোগ প্রভৃতি অনুসারে আপনার জন্য স্বয়ং অধ্যয়ন বিষয়ে নিয়ম নির্ধারণ করিতে অসমর্থ, তিনি পাঠকনামের যোগাই নহেন, এবং তাঁহার অধ্যয়ন বালাকীড়া মাত্র। সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব হইলেও, আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

১মতঃ। তুমি এক সময়ে নানা বিষয় ঘটিত নানা পুস্তক পত্রিকা ইত্যাদি পড়িতে চাও ক্ষতি নাই—বরং না পড়িলে চলিবে না। কিন্তু একখানি সঙ্গ্রহ নির্বাচন করিয়া লইবে। উক্ত গ্রন্থ তোমার অধ্যয়নের প্রধান সামগ্রী হইবে। অপরাপর ক্ষুদ্র গ্রন্থ পত্রিকাদি তাহার আনুসঙ্গিক মাত্র। নিবিষ্টচিত্তে কোন সঙ্গ্রহ

অধ্যয়ন করিলে মনের ভাব ক্রমশঃ সংকৃত ও উন্নত হইবে; বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে; জ্ঞান প্রশস্ত হইবে; বিচার শক্তি দৃঢ়ীভূত হইবে; এবং গ্রন্থ অধ্যয়নে যে ফল তাহা সম্পূর্ণ রূপে ফলিবে। কিন্তু কোন বৃহৎ গ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট ও জ্ঞান-বর্ধক হইক না কেন, এক বিষয়ে অনেককাল অভিনিবেশ থাকে না। বহুকাল কোন এক বিষয় পাঠ করিলে মনে এক প্রকার বৈরক্তি জন্মে। প্রত্যহ এক প্রকার আহার করিলে যেরূপ ভাল লাগে না এবং স্বাস্থ্যের বাধা জন্মে; এক প্রকার পুস্তক পাঠেও তদ্রূপ বৈরক্তির উৎপাদন করে, এবং মনের স্বাস্থ্য ক্ষয় হয়। যিনি প্রত্যহ পল্লব ভোজন করেন, তাঁহার যেমন কখন কখন লুচি, কটী, ভাত খাওয়া আবশ্যক; যিনি কোম্বু, মিল, বা বেকন অধ্যয়নে নিয়ত নিযুক্ত, তাঁহার পক্ষে তেমনি উপন্যাস, নাটক সংবাদ পত্র ও সাহিত্যিক পত্রিকা মধ্যে মধ্যে পাঠ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে নিয়ত শাকার ভোজনে যেরূপ শরীর কষ্ট ও ভয় হয়; নিয়ত উপন্যাস নাটকাদি পাঠে মনও তেমনি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএবই বলি কোন চিন্তা সাধ্য সঙ্গ্রহ প্রধান পাঠ্য স্বরূপ নির্দিষ্ট করিবে; অন্যবিধ চিত্ততা ও বৈরক্তি অপনয়নের জন্য কেবল সহজ বোধ্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিবে। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য সহজ একটি উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তুমি এলিসন

কৃত “ফরাসিবিপ্লব” পাঠ করিয়াছ। সংপ্রতি যে ফরাসিয়ার ভারত-আক্রমণ আশঙ্কা হইতেছে, তাহা সত্য কিনা; তাহা সম্ভব কিনা, সম্ভব হইলে তাহার কি কি কারণ আছে; আক্রমণ করিলে তাহার ভাবি ফল কি হইবে? ইত্যাদি বিষয় তুমি যেরূপ অনুমান করিতে পারিবে; যে সকল পাঠক শুদ্ধ দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রাজ-নীতি, সৈনিক বিদ্যা, বা বার্তাশাস্ত্রের আভাস মাত্র অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহারা এবিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশে আদৌ সক্ষমই হইবেন না। বালক যেমন উপকথা শুনিতে “তার পর কি?” বলিয়া উৎসুক হয়, সংবাদ পত্র পাঠকেরা তেমনি “আজিকার কাগজে যেন কি খবর আছে” বলিয়া ডাকের হরকরার জন্ত পথ পানে তাকাইয়া থাকেন। যে পাঠক নেপোলি-রান বোনাপার্টির পতনের আনুপূর্বিক ঘটনা অবগত আছেন, বিগত ফরাসী প্র-সৌর যুদ্ধে কাহার পতন হইবে, তিনি অ-এই জানিতেন। কিন্তু সংবাদ পত্র মাত্র পাঠ করিয়া বাহারা উক্ত যুদ্ধের বিবরণ অবগত হইতেছিলেন, তাঁহারা শেষ ফলের বিষয় বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিগত সিপাহী যুদ্ধে সামান্য ইংরেজেরা ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়িয়াছিলেন, লর্ডক্যানিং ইংরেজের ভাবিজয় নিশ্চয় রূপে বুঝিতে পারিয়া অচলবৎ অটল ছিলেন।

২য়তঃ। যেপ্রশ্ন তোমার প্রধান পা-

ঠারূপে নির্বাচন করিয়াছ, তদ্ব্যবহার-মত বা বক্তব্য সমর্থন জন্ত যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, বা যে সকল লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সত্য কি না সে বিষয় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক লেখকের রোগ আছে, তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মতকে অন্যের মত বলিয়া উল্লেখ করেন; অথবা কখন কখন এমন এক একটি বচন বা, বাক্য উদ্ধৃত করেন যাহার একাংশমাত্র তাঁহার বাক্যের প্রতিপোষকে, কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্যটির ভাব অন্যরূপ; আবার অনেকে অন্যের মত, বা বাক্য চুরি করিয়া আপনার বলিয়া প্রকাশ করেন। এ সকল বিষয় ধরা সকল পাঠকের পক্ষে সহজ নহে; কিন্তু দুই-চারিটি স্থান পরিয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়, আমরা যে প্রশ্ন পড়ি-তেছি, তাহার মত ও বাক্য কতদূর বিশ্বস-নীয়, যদি শতেকের মধ্যে একটি স্থানেও এইরূপ জুয়াচুরি ধরিতে পারি, তবে নির-নন্দই স্থানেও যে ঐরূপ জুয়াচুরি আছে, তাহা একরূপ অনুমান করিয়া লওঁয়া যায়। এরূপ প্রশ্ন যত কেন উৎকৃষ্ট হউক না, একমাত্র এরূপ “অসাধুতার” জন্য উহা সর্বথা অপাঠ্যও পরিবর্জনীয়। মনে কর কোন প্রশ্নকার বলিতেছেন “গালিলিও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছে, তাহার হেতু এই এই”। হেতু গুলি ন্যায় সঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে, কিন্তু নিউটনের স্থলে গালিলিওর নামের উল্লেখ

করাতেই গ্রন্থকারের বিদ্যাব্রজাও প্রকাশ পাইয়াছে । পুনশ্চ, মনে কর, কোন ধর্মো-পদেশে। বলিয়া গিয়াছেন “যত তীর্থ-পরি-ভ্রম, সকলি মনের ভ্রম, সারকর শ্রীশুক-চরণ ।” এতলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শুকরূপী ভগবানের পাদ পদ্ম যিনি সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহার তীর্থ পর্যটনাদি-বাহ্য ধর্মকর্মের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা ব-লাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, অন্যথা তীর্থপর্য-টন নিষিদ্ধ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে । কিন্তু যিনি তীর্থ পর্যটনাদির বিপক্ষ, তিনি স্বীয়-মতসমর্থন করিবার জন্য, শেষ চরণটি বাদ দিয়া প্রথম দুটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া আ-পনার মনোমত মীমাংসা করিয়াছেন । আর উদাহরণের প্রয়োজন নাই ; পাঠ-ককে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে এরূপ গ্রন্থ পাঠে ক্ষতি বাতীত লাভ নাই । এই উপদেশ মত চলিলে শীঘ্রই পাঠকের “সমালোচনশক্তির” বিকাশ হইবে ।

স্মরণ্যতঃ । পাঠ্য বিষয়ানুসারে ক্রম না ধীরে পড়িতে হইবে । যে বিষয় বুঝিতে অধিক চিন্তার প্রয়োজন করে না, তাহা শীঘ্র শীঘ্র পড়িবে ; যাহা বুঝিতে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চিন্তা ও বিচার শক্তির আবশ্যক, তাহা যত ধীরে হয় পড়িবে, কেবল পাত উন্টাইয়া গেলে হইবে না । গত কল্যা ৫০ পৃষ্ঠা পড়িয়াছ বলিয়া অদ্যও যে ৫০ পৃষ্ঠাই পড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই । কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ নিয়মের

কোন আবশ্যকতাই নাই ; কারণ, প্রত্যেক পাঠক স্বতঃই এ নিয়মানুসারে চলিয়া থা-কেন । যদি যথার্থই পাঠকমাত্রের এরূপ নিয়মে চলিতেন, তাহা হইলে এতপ নিয়-মের যে প্রয়োজন ছিল না, তাহা কে অস্বী-কার করে ? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অতি অল্প পাঠকই এ নিয়মে পড়েন ; তা-তেই আমাদের এ উপদেশ । পড়িতে প-ড়িতে অনেকের এক প্রকার বৈরক্তি জন্মে, তখন তাড়াতাড়ি পাত উন্টাইয়া গেলেই তাঁহার রক্ষা পাইলেন মনে করেন । অ-নেকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ বড় এ-কটা না দিয়া জলস্রোতের ন্যায় এক নি-শ্বাসে এক এক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলেন । এরূপ করায় অনায়াস তাহা বলাই বাহুল্য । লেখক যে বিষয়টি চিন্তা করিয়া লিখিয়া-ছেন, তাহা চিন্তাশীলের ন্যায় না পড়িলে বুঝা যাইবে কেন ? আর না বুঝিয়া প-ড়িলেই বা ফল কি ? অন্ন ব্যঞ্জনাদি যেরূপ শরীর রক্ষার সামগ্রী, মনের আহাৰ তে-মনি জ্ঞান । মন্দাগ্রিসত্ত্বে আহাৰ করিলে যেমন জীর্ণ হয় না, অনিচ্ছাসত্ত্বে পড়িলেও তরূপ ভুলিয়া যাইতে হয় । পঠিত বিষয় কার্যোপযোগী করিতে হইলে, তাহা অ-ভিনিবেশপূর্বক পড়িতে হইবে ; এবং প-ড়িয়া স্মরণ রাখিতে হইবে । লর্ড বেকন কহেন “কোন কোন গ্রন্থের আশ্বাদমাত্র লইতে হইবে ; কোন কোন গ্রন্থের রস পান করিতে হইবে ; কোন কোন গ্রন্থ গ্রাস করিয়া জীর্ণ করিতে হইবে ।” শে-

ষটি করিবার ইচ্ছা না হইলে, প্রথম দুটি করিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সময় অধ্যয়নে একেবারে অভিনিবেশ না থাকে, তখন “স্বাদগুহ পর্ষাদ” নিষিদ্ধ। জ্বর হইলে গুরু আহার না করিয়া সপ্ত, এরা-কট খাওয়া বিচিত্র; কিন্তু প্রবল নূতন জ্বরে “লঙ্ঘনং পথ্যং”। আমরা তৃতীয় নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নিয়মেরও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব দুইটি নিয়ম সংক্ষেপে পৃথক করিয়া বলিতেছি। (১) বিষয় বিশেষে ক্রম বা দীর্ঘে পড়িতে হইবে। (২) টেক্সট জীবনমাত্র পুস্তক বন্ধ করিয়া অন্য বিষয়ে ক্ষণকাল মনঃ-সংযোগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়টি আমাদের চতুর্থ উপদেশ। সংপ্রতি আমরা প্রথম নিয়মের উল্লেখ করিতেছি।

সংক্ষেপঃ। পাঠাগৃহে যে সকল নূতন শব্দ, নূতন ভাব, অথবা ঐতিহাসিক রূপান্তরের উল্লেখ থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নিকটে একটি পেন্সিল, শাদা কাগজ বা নোটবুক এবং একখানি অভিধান রাখা প্রয়োজন। অপরিজ্ঞাত শব্দের অর্থ এইরূপে লিখিলে ক্রমে ভাবান্তে অধিকার জন্মে। নূতন ভাব লিখিয়া রাখিয়া অবসরক্ৰমে লিখিলে ক্রমে মন প্রশান্ত হয়। এবং ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রভৃতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলে পাঠ্যবিষয়ও সুন্দররূপে বুঝা যায়; ও চিত্রপটে উক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে। লর্ড মেকলে কত পুস্তক

পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; স্মরণ্য তদীয় রচনার ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যত্র বিষয়ের যত উল্লেখ আছে, অন্য কোন গ্রন্থকারের রচনায়ই তত দেখা যায় না। তিনি যে স্বীয় বিদ্যাপ্রকাশের জন্য একুপ করিতেন তাহা নহে; লিখিতে লিখিতে স্বতঃই সে গুলি তদীয় লেখনীমুখে উপস্থিত হইত। গ্লারগ হেষ্টিংসের বি-বক্ষে যে বিচার হয়, তাহার সমালোচনা করার উপলক্ষে, লর্ড মেকলে এক স্থানে কহিয়াছেন “বার্ক ভারতবর্ষের বিবরণ একুপ অবগত ছিলেন যে, জর্জ গার্ডনের বিদ্রোহের আর বারানসীর বিদ্রোহ, এবং ডাক্তর ডডের প্রাণদণ্ডের আর রাজা নন্দ-কুমারের প্রাণদণ্ড বিবরণ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল।” জীবনচরিত-ষটিত একখানি অভিধান খুলিলেই পাঠক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জর্জ গার্ডনকৃত কেশলিক-যুক্তি সম্বন্ধীয় বিদ্রোহের বিবরণ জানিতে পারিবেন। এবং যিনি বসোএলকৃত জঙ্গনের চরিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে জাল করা অপরাধে ডড নামক একজন যাজকের উপরোক্ত সময়ে ফাঁসি হইয়াছিল, এবং জঙ্গন তাহার প্রাণরক্ষার্থে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এই দুটি বিবরণ অবগত হওয়াতে যে বিশেষ ফল আছে, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু এই দুটি বিষয় জানা থাকিলে যেমন লর্ড মেকলের উল্লিখিত বাক্যের উপমের উপমানের সাদৃশ্য দেখিয়া

মনে পুঙ্ক উপস্থিত হইবে, তেমনি এই ঘটনা চতুষ্টয় চিরদিনের তরে মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে । বিশেষতঃ এইরূপ ভাবে পড়িলে, বৎসরান্তে পাঠক যত জ্ঞান লাভ করিবেন, অন্যথা পঞ্চাশৎ বৎসরও তাহা করিতে সমর্থ হইবেন না ।

৬ ষষ্ঠঃ । এক বিষয়ে যতগুলি গ্রন্থ আছে, তদ্ব্যমো যেখান সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই পাঠ করা উচিত । হইতে পারে কোন গ্রন্থকারের প্রতি কোন কারণে তোমার বিদ্বেষ আছে ; অথবা কোন বিষয়ে তোমার কোনরূপ স্থির মত আছে ; কিন্তু গ্রন্থকার বিশেষের গুণবিশেষ পাঠ করিলে সে মত আর বজায় রাখিতে পার না । এসকল সত্ত্বেও তদীয় গুণ যদি উপস্থিত বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ মধ্যে উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহাই পাঠ করিবে । মনে কর, তুমি অ'দ্যোপাস্ত ইংরাজদিগের ভারতাদিকারের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাও ; মরে, মার্সমেন ও মিল এই তিন জনের ইতিহাসই তোমার সম্মুখে বর্তমান । এই তিন জনের মধ্যে মিলের ইতিহাসের প্রতিপক্ষাতিতা ও জাতিবিদ্বেষিতা দোষের জন্য তোমার হৃদয় আছে ; অথচ মিল না পড়িলে সকল রূপান্তর বিস্তারিতরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই ; এমত স্থলে বিদ্বেষ সত্ত্বেও মিল পড়াই তোমার উচিত ।

৭মতঃ । কেবল সমাজে আলাপ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া পড়িও না । অমেকের ভ্রম আছে যে,যে কোন বিষয় উ-

পস্থিতহউক, তাহাতে দুই চারি কথা কহিতে পারিলেই বিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইল । সর্ববিষয়ে বিশেষতঃ বর্তমান সময়প্রচলিত সাধারণ আলোচ্য বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানটুকুই একমাত্র জ্ঞান নহে । অনেক কোন গৃহস্থই পড়েন না, কেবল দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পড়িয়া লোকসমাজে দিবান্ বলিয়া পরিচিত হইতে গাধ করেন । ইহাদের মধ্যে অনেক আবার সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভ পর্যন্ত পাঠ করেন না ; সংবাদ-স্তুই তাঁহাদের একমাত্র পাঠ্য । এরূপ পাঠক নিতান্ত অহঃসার-বিহীন । বর্তমান ঘটনাবলী পত্রিকাপাঠে জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কোথা ? আইভানহোর কএক পৃষ্ঠা পড়িয়া বলিতে পারিবে বটে যে, অ'রেন্সা রিবেকার ছায়া ও বজাধিপ-পরাজয়ের “সৈনিক প্রদর্শন” টুর্নেমেন্টের অনুকরণ ; কিন্তু তাহাতে ফল কি ? কোন দৈনিকপত্র পড়িয়া বলিতে পারিবে বটে “ইনস্পেক্টর—সাহেব আত্মহত্যা করিয়াছেন” এবং পরদিন অন্য একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িয়া সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তেমন খবরে জগতের বা তোমার নিজের কিছু উপকার কি আছে ? উপকার দূরে থাকুক যথেষ্ট অপকারই সাধিত হইবে । এরূপ পল্লব-গ্রাসী অভ্যাস হইলে চিন্তা-সাধ্য কোন বিষয়ে মন আর যাইবে না, ক্রমে

মন অসার ও নিষ্প্রভ হইবে। বর্তমান শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গুরুদ্বার * বলিয়াছেন “সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বটে, কিন্তু কোন এক বিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তি থাকা আবশ্যিক।” একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ। প্রায় সকলেই দুই চারিটি ভাল কথা জানেন; দুই একটি খোস গম্প জানেন; দুই একটি ভাল বাজাইতে পারে; দুই একটি গান করিতে পারে; একটুকু নাচিতে—অমৃতঃ লক্ষ্য সম্পাদিতে সমর্থ; একটুকু চিত্র—অমৃতঃ একটা পেঁচা আঁকিতে জানেন; দুই একটা আঁক কসিতে পারে; এবং একটুকু ব্যায়াম—অমৃতঃ এক খান লাঠী ঘুরাইতে জানেন। কিন্তু কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে? অপর পক্ষে, এই সকল বিষয়ে সার উইলিয়ম জোন্সের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। তাহার সঙ্গে ভাষা বিষয়েও প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। সুতরাং এই শেষ কারণে তাহার নাম দিগন্ত-ব্যাপী। তাই বলি কেবল বহুভাষিক লাভের জন্য অধ্যয়ন করিও না। শত শত নাটক পড়িলে সমাজে আলাপ করিবার অনেক কথা পাইবে। কিন্তু তাহাতে ফল যত না হইবে, সেস্বপিতার একখানি নাটকে তাহার সম

* সার আর্থর হেম্পস্।

হস্ত গুণ ফল পাইবে—নাটক কি বুঝিতে পারিবে—মানবচরিত্র বুঝিতে পারিবে—ঘটনা বৈচিত্র্য বুঝিতে সমর্থ হইবে—নাটকীর জ্ঞানের সহিত অপর সহস্রবিধ জ্ঞান লাভ হইবে।

চমতঃ। এইটি আমাদের শেষ উপদেশ। কোন গ্রন্থপাঠ শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থে, বা প্রতি অধ্যায়ে গ্রন্থকার কি বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, যত দূর পার, গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে, গ্রন্থকার যে সকল হেতু দর্শাইয়াছেন তাহার সমর্থন বা প্রতিবাদ করিতে অথবা গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ করিলে উক্ত গ্রন্থপাঠে যে উপকার তাহা সম্যক প্রকারে লাভ করিবে। অধ্যয়ন কোন উদ্দেশ্যে নহে, অনুরূপ উদ্দেশ্য লাভের সোপান মাত্র। লিপিবদ্ধ সেই জ্ঞান কার্যে পরিণত করিতে পারিলে, তোমারও উপকার, জগতেরও উপকার। চিন্তা ও বিচার শক্তির উন্নতি সাধনই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায়ই অধ্যয়ন। যত বড় বড় জ্ঞানী বা বাগ্মী অপার্যন্ত জগিয়াছেন, তাহারা প্রথমে এই শোনোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।—প্রমাণ বার্ক এবং জনফ্রুয়ার্ডমিল। শ্রীঃ—

পরিত্যক্ত-পল্লী।

অন্ত্যায় দিনমণি পশ্চিম গগনে,
জলদের গিরিরাজি রঞ্জি থরে থরে,
সোহাগে রঞ্জিত করি তরল কিরণে
নীল কিশলয় দাম তরুর শিখরে।

২

ভানুর কিরণে গঙ্গা সুরণ-বসনা
কলকল রবে বয় মৃদু কলোহিনী,
সলিল অলকে মরি! চঞ্চল-চরণা,
কনক-কুমুদ-দাম পরি সুরাসিনী।

৩

ধীরে ধীরে শ্যাম সন্ধ্যা ভুবন-মোহিনী
উত্তরে মরত ভূমে কানন বাসরে,
ফুটিছে মলিকা যুই সন্ধ্যা-সুশোভিনী,
ফুটিছে নীরবে তারা বিকচ অশ্বরে।

৪

ফুলময়ী বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে
জোনাকির মালা বাঁধে শ্যাম লতিকায়,
ফুটিছে কলকলি টাদ নীল জলধরে,
তালতরু-শ্যামনিরে সমীর খেলায়।

৫

মরি কিবা শ্যাম সন্ধ্যা অশ্বরে ভূতলে,
রঞ্জিত সন্ধ্যার শ্যাম কাণ্ডি মনোরম,
দিবি উজ্জ্বলিনী তারা গগনে বিজলে,
প্রফুল্ল কুমুদ জালে শোভিত ভুবন।

৬

অক্ষুট তিমির জালে এই সন্ধ্যা কালে
অই যে সম্মুখে পল্লী পরি-দৃশ্যমান,
মনোহর শ্যাম-রুচি রূক্ষ অনুরালে,
প্রকৃতির কমনীয় লাবণ্য নিদান।

৭

কেম আজি অই পল্লী বিষম বদনে,
প্রকাশিছে প্রকৃতির মূর্তি বিলীষণ?
মিশ্রক নিশীথে মান চন্দ্রের কিরণে,
অনন্ত বিষাদ বেশ করিছে কীর্তন!

৮

সকলি নীরব মৃদু প্রান্তরে প্রান্তরে
হুহু করে অবিরল অনিল-নিশ্বাস,
সকলি নীরব মৃদু তরুর শিখরে।
পাতার পাতার নিশি-নীহার পতন!

৯

যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল
অনন্ত-অনন্ত বন তরলতা মর,
কোথা আজি হায় নেই শোভা নিরমল,
আরণ্য শোভার এ যে পূর্ণ সমুদয়!

১০

অই যে সম্মুখে শত ভগ্ন নিকেতন,
অন্ধকার পরিত্যক্ত বিষাদ ভাণ্ডার,
কেন আজি জনহীন করি দরশন,
কে নাশিল হায় তার সুসমার হার!

১১

এই ত হাসিছে মরি ! নক্ষত্র-কুণ্ডলা
সলজ্জ কুসুমময়ী সজ্জা সুহানিনী,
বক্ষিম বজ্রত টিপ ধূসর-অঞ্চলা,
কোমল নীলাভ ভালৈ পরিয়া রঞ্জিনী ।

১২

নেহারিয়া এই সজ্জা, প্রমোদে মাতিয়া,
এক দিন অই শত ভগ্ন নিকেতনে,
সুকোমল করে শংখ যতনে পরিয়া,
কত শত কুল-বধু সহাসা বদনে

১৩

বাজাইত, জিনি নব কমলিনী-দল
বিকচ কাপোল দুটি উৎকল্ল নয়নে,
করিয়া মূহল ক্ষীত পুনঃ অবিরল
চম্পক বরণ রঞ্জি রক্তিম রঞ্জে ।

১৪

এই ত রে সেই চাক সজ্জা সুকোমল,
দাঁড়াইয়া এই আমি অনাকৃ বদনে,
কোথা আজি সেই সদ—হায় রে কেবল
গুটী কত শংখ ধনি পশিছে শবনে ।

১৫

জনহীন আজি পল্লী দিনেকের তরে,—
হাসিল যথায় মরি নন্দন কানন ;
নিরখিয়া সেই পল্লী হৃদয় বিদরে,
আজি হায় সেই পল্লী অরণ্য বিচ্ছন !

১৬

সরল অন্তর সেই গ্রামবাসিগণ,
চিরলজ্জাশীলা সেই পল্লী-নিবাসিনী,
সরলতা প্রতিকৃতি কোথায় এখন,
কোথা সেই পল্লী শোভা নরনরঞ্জিনী ?

১৭

সকলি যুমায় অই তরঙ্গিনী তীরে—
কালের অনন্ত অঙ্গে জগের মতন,
পার্থিব পিঞ্জর সবে তাজিয়া অঁচরে,
সুখময় পুণা লোকে করছে গমন ।

১৮

হাসিলে হেমাজী উষা পূরব অন্তরে,
প্রভাতের সুকোমল অনিল নিশ্বনে
কুজিলে কাননে পাখী সমধুর স্বরে,
ঝঙ্কারিলে পিকেছরী ললিত পঞ্চমে,

১৯

শুনি সেই মধুময় বিহঙ্গ-কূজন,
পরশিয়া প্রভাতের অমৃত আসার,
কোন দিন পুনঃ তারা পাবে না জীবন,
দুহুর্ভেক তরে কিম্বা জাগিবে না আর ।

২০

অশ্রু গেলে দিনমণি গোধূলি-চুষনে,
পল্লী-দিনোদিনী-মালা যাইবে না আর,
কলসী ধরিয়া কক্ষে বারি অশ্রুস্রবণে,
বদনে মধুর হাসি মাখি অনিবার ।

২১

সারাদিন পরে অই কুটীর প্রাঙ্গণে
নাচিয়া নাচিয়া আর ফুলশিশুগণ,
যাবেনা জনকে হেরি চঞ্চল চরণে,
লভিবারে জনকের সম্মুখে চূষন ।

২২

চাক সজ্জা কালে ক্রান্ত বিশুদ্ধ অন্তরে
পরিশ্রম-জীবী কিম্বা ভেটাবে না আর,
শ্যামাজিনী প্রেমসীরে, কুটীরের দ্বারে,
চুরি মুখ খুলিবে না স্বর্গের দুয়ার ।

২৩

দরিদ্র যুবক কিম্বা দেখিবেন না আর
বসি সুখময় পর্ণকুটীর সদনে,
কুম্মীশ্বরপিনী কাম্বা,—শত সুখাধার,
পবিত্র-সরল-প্রেম-পূর্ণিত নয়নে।

২৪

অইত কুটীর সেই শুষ্ক-পত্রময়,
এই সেই মনোহরা সঙ্কা মধুমতী,
কিন্তু আজি কোথা সেই অভিন্ন-হৃদয়—
যুগল প্রণয়-পদ্য—দরিদ্র দম্পতী?

২৫

কালের সাগরে আজি হার রে নকল
ডুবিল অনন্ত জলে ;—ভগ্ন নিকেতন,
আর অই পর্ণগৃহ, সমীরে চঞ্চল,
রহিয়াছে তাহাদের চিত্তের মতন।

২৬

একদিন এই স্থানে কত অভাগার
খুলিল স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র অন্তর,
ক্ষণ অভিনয় পুনঃ ফুরাল আবার,
মাটিতে নোণার অঙ্গ মিশিল সত্তর।

২৭

বিজন বিপ্লিন বন কুম্মের প্রায়—
কত শত কালিদাস জন্মিল এখানে,
হল না বিকাশ কিন্তু ধীরে ধীরে হায়!
হল ভস্মে পরিণত কৃতান্ত-রূপাণে।

২৮

কত শত মহামতি উন্নত-জীবন,
স্বদেশমঙ্গল যার চির ইচ্ছা হায়!
কত শত দেব-আত্মা শ্রীমধুসূদন
সুমাইছে হায় এই পল্লীমৃতিকায়!

২৯

জীব জন্তু তরু গিরি সকলি নশ্বর!
মাটির স্পর্শে চির অসারতাময়!
সকলি কালের করে ঘোর নিরন্তর,
একদিন হবে পৃথী তিমির-নিময়।

৩০

সাধের মানব জন্ম, এই কলেবর
মৃত্তিকার অঙ্গ মাথা চন্দ্রের কিরণ;
অংশুমালী রবি কিম্বা তার শশধর,
সকলি কালের করে হবে নিপতন।

৩১

হার আজি কোথা মম নৈশব সরল,
বোধ হয় যেন আজি সূদূর স্বপন!
স্মৃতির রূপায় সেই দিন নিরমল,
দূর নক্ষত্রের প্রায় হতেছে স্মরণ।

৩২

আজি এই জীবনের প্রথম যৌবন,
উন্নত জীবন মম নাহি বাহ্য জ্ঞান,
চরণের তলে বিশ্ব করি দরশন,
অতুল ঐশ্বর্যে আমি রাজেন্দ্রসমান।

৩৩

কিন্তু যবে সেই দিন, আসিবে আমার,—
কোথায় রহিবে এই চরু নিকেতন,
কনিষ্ঠ-রূপিনী প্রিয়া প্রেম পারাবার,
কিম্বা সেই সুখময় বিলাস কানন।

৩৪

পার্থিব জনমে যেরূপ প্রমোদ কানন
একপ্রাণে একমনে উন্নত জীবনে,
বিশ্বের বিলাস দ্রব্য করি আহরণ
নন্দন-কানন-সম সাজানু ঘটনে।

৩৫

৩৬

আমিও আমার এই পরীবাসী সম
বসুমতী জননী অঙ্কে অনিবার্য,
যুগাইব একদিন জন্মের মতন,—
যেই নিদ্রা কোনকালে ভাঙিবে না আর।

লো প্রকৃতি, কহ মোরে কহ লুহাসিনি
এই কি মানব লীলা ? এই পরিণাম ?
সৌদামিনী-সম ক্ষণ বিকাশি বজ্রিনী
লভিল, লভিবে সব অনন্ত বিরাম !! ক্রীহঃ--

সম্বন্ধ নির্ণয় ।

বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সাংগাজিক বৃত্তান্ত । *

‘সম্বন্ধ নির্ণয়’ বঙ্গভাষায় একখানা উ-
ৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং ইহাতে লিখিত বিষয়গুলি
বঙ্গবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্য
জ্ঞাতব্য। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে রাঢ়ীয়, বা-
হেঙ্গ, বৈদিক, মধ্যশ্রেণী ও উপনিবেশিক
ব্রাহ্মণের এবং কারস্থ ও বৈদ্য জাতির বি-
বরণ বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। গ্রন্থখানা
বহুদিন যাবৎ আমাদের নিকট সমালোচ-
নার উত্ত প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থাক্ত
বিষয়গুলিতে আমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা না
থাকায় আমরা এপর্যন্ত ইহার সমালোচনে
হস্তক্ষেপ করি নাই। এত দিন নানাবিধ
কুলশাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং কুলজ্ঞ
পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অদ্য
সম্বন্ধনির্ণয়ের সমালোচনার প্রবৃত্তি হইল।
এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কুলশাস্ত্রের প্র-
সিদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমপুরের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র
বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয়ের নিকট আমরা

অনেকগুলি অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি।

আমাদের বিবেচনায় সকলগুলি বি-
ষয়ের সমালোচন একবারে করিতে গেলে
বহু বিস্তৃত হইয়া উঠে, তাহাতে পাঠকের
বিরক্তি হওয়াও অসম্ভব নহে, অতএব অদ্য
কেবল আমরা গ্রন্থের আদিভাগ সহিত
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বিষয়েই মতামত প্রকাশ
করিব। কোন কোন স্থলে বিদ্যানিধি ম-
হাশয়ের মতের সঙ্গে আমাদের মতের অ-
নৈক্য ঘটিলেও বহু গবেষণার জন্য আমরা
তাহাকে ধন্যবাদ দিব।

যিনি বাল্যালার বর্তমান জাতিসমূহের
আদিম বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,
তিনি অবশ্যই নাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন।
গ্রন্থ লিখিবার উদ্দীপ্তা প্রবৃত্তি এইরূপ সহ-
দেশো পরিচালিতা হইতে দেখিলে সন্দেহ
পাঠকমাত্রই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ
নাই; কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিবরণে পু-

* কৃষ্ণনগর নর্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

রাণাদি-গ্রন্থসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা যোগ করা কিয়ৎপরিমাণে হইলেও অনুচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোকের উপনামগত বংশাবলী অমাবশ্যিক। “ঈশ, বানর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি জাতি পুলস্ত্য ঋষির সন্তান।” “শলভ, সিংহ, কিম্বিক, ব্যাস্র, ঋক্ষ, ইহা-মৃগ পুলহ-ঋষির সন্তান।” “অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্র দক্ষের কন্যা।” এই কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া ইতিহাসে সন্নিবেশ করা আমাদের বিবেচনার বড় ভাল দেখায় না; এখন আর ন-দ্বীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অলৌকিক বিবরণে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বাস্তবিক আমাদের পূর্বাণ সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে; উহার মধ্যে গুঢ় ভাবার্থ সংযুক্ত অনেক কথা সংযোজিত রহিয়াছে। কীর্তি, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, লক্ষ্মী, ইহাদিগকে দক্ষের কন্যা ও ঋষিপত্নী বলিবার কি কোন গুঢ়ার্থ নাই? যদি থাকে তবে তাহা ভাঙ্গিয়া ব-লাই কর্তব্য; ঐতিহাসিক বংশাবলীতে উহাদিগকে দক্ষমুখা বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

• বিদ্যানিধি মহাশয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ বিভাগের যে সকল কা-রণ নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাতেও সন্শোধ লাভ করিতে পারিলাম না; কারণ ইহাতেও তিনি পৌরাণিক কবিকল্পনারই

অনুগমন করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি এই পথ পরিভাগ করিয়া যুক্তি অ-বলম্বন করিলেই ভাল হইত; অন্যথা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতে লেখকেরও ভ্রম জন্মাইতে পারে। যথা;—লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন “প্রজাপতিদিগের দুহিতৃ-সন্তান দৌহিতৃগুলিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য হইলেন, পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজ্যনা আখ্যা ধারণ করিলেন।” (৭৯ পৃ-স)। আবার অন্যত্র ক্ষত্রিয়জাতি শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন “ইহারা ব্রাহ্মণ বাহু হইতে জন্ম-পরিগ্রহ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরিভাগে আসন লাভ হন। (৮৭ পৃ-স)। পরস্পর বিরোধি এই উভয় বাক্য কখনই অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না।

সম্বন্ধনির্ণয়ে গোত্রপ্রবরগুলি অতি নি-শদরূপে লিখিত হইয়াছে। গোত্র কি? তাহার সংখ্যা কত? প্রবর কাহাকে বলে? প্রবরের আবশ্যিকতা কি? কোন গোত্রে কত প্রবর? ইত্যাদি অবশ্যজ্ঞাত বিষয়-গুলি পাঠকালে আমরা গ্রন্থকারকে ধনা-বাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থের এই অংশে এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, অস্পষ্টবাক্য বালক বালিকারাও পাঠমাত্র সমস্ত বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কর্তব্য হইলেও আমরা এই অংশের কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকগণ একবার গ্রন্থখানা ক্রয় করিয়া পাঠ করুন।

এখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কথা কিছু বলিব । সম্বন্ধনির্ণয় রচয়িতা অনুসন্ধানে যতদূর পারিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন । এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্ররতির প্রশংসা করিম, কিন্তু সংকলিত বিষয়গুলি একেবারে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না । তবে সংসারের কেহই অজান্তে নহেন, এই সূত্রানুসারে বিচার করিলে ইহা যুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারের কিছু কিছু ভ্রম থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ হিন্দুসমাজে আদরণীয় । আমরা রাঢ়ী শ্রেণীর কথা অতি সংক্ষেপে ভিন্ন একটি প্রবন্ধে লিখিয়া যে যে স্থলে আমাদের মতের সঙ্গে গ্রন্থকারের মতের অনৈক্য ঘটে, তাহাই দেখাইয়া দিব ।

এরূপ প্রবাদ যে বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নামক স্থানে মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল । যথাকালে তাঁহার পুত্র সম্ভান না হওয়ার তিনি পুত্রক্ৰিষ্ট যত্ন করিতে সংকল্প করেন । ঐ সময়ে বঙ্গ ৭০০ বর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল । বর্তমান সময়ে উহাদের সম্ভানগণই সাতশতী নামে পরিচিত । উহাদের অষ্টগোত্র এবং সপ্তবিংশতি গাঁই প্রসিদ্ধ । যথা—

গোত্র ।

শনকঃ শুনকঃ কামো গোতমশ্চ পরাশরো ।

বশিষ্ঠো হারিসো বসিষ্ঠাচ্যৌ গোত্রাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । ”

গাঁই ।

১	২	৩	৪	৫
সাগাঁই	সুরাই	নানসী	জগাই	হাসাই
৬	৭	৮	৯	১০
কালাই	ধাই	বানসী	বাটুরী	ধানসী
১১	১২	১৩	১৪	
কাটানী	কুশলো	জুলোগাঁই	কাশাপকাঞ্জারী	
১৫	১৬	১৭	১৮	
বাতারি	পীতারি	নাতারি	যার, বেক	
১৯	২০	২১	২২	২৩
বাগরাই	উলুক	ঝরঝর	মুলুক	ফরফর
২৪	২৫	২৬	২৭	
কন্দু	কড়ন	চেরচেরি	বালখোপি	গাঁই ।

(কুলচাঁচ্যের কারিক।)

কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন “ সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটি পৃথক্ (গ্রামীন) গাঁই বলিয়া বিভক্ত ছিলেন । প্রত্যেকের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসমুহ । ”

“ লোকের কোতুল নিবারণ জন্য কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল । পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন । ”

১	২	৩	৪
নগড়ি	দহড়ি	হামু	বাপি কাশাপকাঞ্জিকা
৫	৬	৭	৮
বাগাড়ি	শুমিকা	কেয়ু	গাঁইচ সুখদাসিকঃ
ইত্যাদি । “ মিজীগ্রন্থ । ”			

বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্ত এই মোকাবলী মিজীগ্রন্থে অপ্রাপ্য, অন্য কোন

এম্বে আছে কি না তাহাও জানি না। সু-
তরাং আমরা মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম
না। “অপিচ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁও
পৃথক পৃথক গোত্র সম্বৃত” এই কথাও
কোন সম্ভাষ জনক প্রমাণ পাউলাম না।
যাহা হউক উক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের
মধ্যে তৎকালে কেহই এমন বেদজ্ঞ ও প-
রিশুদ্ধ ছিলেন না, যে তাঁহারা মহারাজ অ-
দিশ্বরের সংকল্পিত পুত্রেরি যজ্ঞ নির্মাণ
করিতে পারেন। অগত্যা মহারাজ উপযুক্ত
ব্রাহ্মণের জ্ঞান কান্যকুজাদিপের নিকট
পত্র লিখিলেন। তদনুসারে কান্যকুজ-
েশ্বর পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন ব্রাহ্মণ এদেশে
পাঠা যান। (১২৯ সংবৎ)

“ভট্টনারায়ণোদক্ষো বেদগর্ভোহু চান্দড়ঃ।
অথ জীহ্বনায়াচ কান কুজাঃ সমাগতাঃ॥”
ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, চান্দড়, জীহ্ব, এই
পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান কুজহইতে আগমন করেন।
“শাণ্ডিনাগোত্রজশ্চেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যাপশ্চেষ্ঠো বাৎসাজ্জেষ্ঠোপি
চান্দড়ঃ ॥

ভরদ্বাজৈকগোত্রজী জীহ্বো হর্ষবর্ধনঃ।
বেদগর্ভোপি সার্বণে যথাবেদ ইতি স্মৃতঃ ॥”
উহঁদের মধ্যে ভট্টন রায়ণ শাণ্ডিনা
গোত্র, দক্ষ কাশ্যাপ গোত্র, চান্দড় বাৎসা
গোত্র, জীহ্ব ভরদ্বাজ, গোত্র এবং বেদগর্ভ
সার্বণ গোত্র।

কামকোটি ত্র্যমকোটি হরিকোটি ভট্টবচ।
কক্কাগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি
পঞ্চচ ॥” (কুলরমা)

বঙ্গাধিপ আদিশ্বর যজ্ঞ সমাপনান্তে
উহঁদের পাঁচজনের বাসের নিমিত্ত কাম-
কোটি, ত্র্যমকোটি, হরিকোটি, কক্কাগ্রাম,
বটগ্রাম, এই পাঁচ খানা গ্রাম দান ক-
রেন। এই সকল গ্রামের আধুনিক নাম
পরিভ্রম্য নহে, এই বিষয়ে সম্বন্ধ-নির্ণয়ে
নিম্ন লিখিত বচনটি উদ্ধৃত আছে।

“পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি
সুগৈবচ।

কক্কাগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি
পঞ্চচ ॥” (১৮ পৃ)

আমরা কুলরমা এম্বে পঞ্চকোটির
পরিবর্তে ত্র্যমকোটি দেখিলাম।

কালক্রমে উক্ত দ্বিজপঞ্চকের উনষষ্টি
সন্তান জন্মে।—

“ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি
ষোড়শাঃ।

চত্বারঃ জীহ্বাজ্জাতা ভরদ্বাজকু-
লোদ্ভবঃ।

দ্বাদশ বেদগর্ভাজ্জ চান্দড়ৈকাদশ
স্মৃতাঃ ॥” (কুলরমা)

ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ,
জীহ্বের চারি, বেদগর্ভের দ্বাদশ এবং চান্দ-
ড়ের একাদশ।

বিদ্যানিধি মহাশয় কান্যকুজাগত প-
ঞ্চবিধের বট পঞ্চাশৎ সন্তান স্বীকার ক-
রিয়। প্রমাণার্থ নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া-
ছেন।

“ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি
ষোড়শাঃ।

চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা দ্বাদশ বেদগভঃ ।
অষ্টাবথ পরিভ্রোতা উদ্ভূতা শ্চান্দভানুনেঃ ॥

(মিশ্রিত্রায়ুঃ প্রবানন্দকৃত ।)

আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে ব-
লিতে পারি প্রবানন্দ মিশ্রে এই শ্লোক
অদৃশ্য ।

ভট্টনারায়ণ বংশ ।

“আদৌ বন্দো বরাহঃস্যাৎ রামো গড়্গ-
ড়িকোমন্তঃ ।

নৃপঃস্যাৎ কেশরশ্চৈব নানোঃ কুমুম কু-
লিকো-

বাটুঃস্যাৎ পারীহালোসৌ কুলডিঃ গুরি-
নামকো ।

গণো ঘোষলিতাঃ প্রাপ্তঃ সেয়ুঃ শাণ্ডেশ্বর-
স্তথা ॥

বুড়ো মাষ্টরকষ্টৈব বটব্যালো বিকর্তনঃ ।

বসুরারি স্তথানীলোঃ কয়ডালো মধুহৃদনঃ ॥

কুশীচ কোরনামা চ কুলিসাষ্টৈব বাসুকঃ ।

আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীষ্টৈবমহামতিঃ ॥

এতে ষোড়শশাণ্ডিনাঃ কথিতা রাজপু-
ঞ্জিতাঃ ॥”

নাম

গাঁই

১ বরাহ

বন্দ্য

২ রাম

গড়্গড়ি

৩ নৃপ

কেশরকুলী

৪ নানো

কুমুমকুলি

৫ বাটু

পারীহাল

৬ গুরি

কুলডি

৭ গণ

ঘোষাল

৮ শাণ্ডেশ্বর

সেয়ু

৯ বুড়ো

মাষ্টরক

১০ বিকর্তন

বটব্যাল

১১ নীলো

বসুরারি

১২ মধুহৃদন

কয়ডাল

১৩ কোয়

কুশারি

১৪ বাসু

কুলিসা(কুলকুলী)

১৫ আকাশ

আকাশ

১৬ মাধব

দীর্ঘগ্রামী(দীঘাল)

দক্ষ বংশ ।

“ধীরোভবৎ গুড়িগ্রামী নীরঃ সাদামক-
লিকঃ ।

ভূরিগ্রামী শ্রুভশ্চৈব শম্বুঃস্যাৎ তৈলবা-
টিকঃ ॥

কৌতুকঃ পীতমুণ্ডীস্যাৎ চটগ্রামী শ্রুলো-
চনঃ ।

পলশায়ী পালুনামা হড়ঃ কাকোমন্তস্তথা ॥

পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোসৌ পালধী রামনা-
মকঃ ।

কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটি বর্ণমালিকঃ

সিমলায়ী শ্রীহরিঃস্যাৎ জটোপুষলিকস্তথা ।

ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামীচকেশবঃ ॥

এতে ষোড়শ ভূদেবা জেয়াঃ কাশ্যপ-সং-

জকঃ ॥

নাম

গাঁই

১ ধীর

গুড়িগ্রামী

২ নীর

আমলী

৩ শ্রুভ

ভূরিগ্রামী

৪ শম্বু

তৈলবাটী

৫ কৌতুক

পীতমুণ্ডী

৬ শ্রুলোচন

চটগ্রামী

৭ পাল্ল	পালশায়ী
৮ কাক	চড়
৯ কৃষ্ণ	পোড়ারি
১০ রাম	পালবি
১১ জন	কোণারি
১২ বনমালী	পাকড়াসী
১৩ শ্রীহরি	সিমলায়ী
১৪ জট	পুষলি (পুষিলাল)
১৫ শশিধর	ডটটআমী
১৬ কেশব	মুনআমী

শ্রীহর্ষ বংশ।

“ধাতু নামা মূঠেটিঃ স্যাৎ জমঃ স্যাৎ দীন-
শায়িকাঃ।

মানোঃ সাহরিকো জেয়ো রায়ীচ রামনা-
মিকঃ ॥

শ্রীহর্ষস্য স্মৃতা এতে ভরতাজকুলোদ্ভবাঃ।”

নাম	গাঁই
১ ধাতু (শ্রীগর্ভ)	মূঠেটি
২ জন	দীনশায়ী (ডিংসাই)
৩ মানো	সাহরী
৪ রাম	রায়ী (রাইগাঁই)

বেঙ্গগভ বংশ।

“হলনামাচ গাজলী কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।

বশিষ্ঠঃ সিক্কলো জেয়ো দায়ীচ মদনোভবৎ ॥

বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালী গ্রামকঃ।

যোগী সিরারিকো জেয়ঃ পুংসিকো রাম-

নামিকঃ ॥

দক্ষঃ শাটকঃ সঃ জোসো পারীচ মধুহৃদনঃ।

ঘণ্টেশ্বরী মাধবশ্চঃ নায়ারীচ গুণাকরঃ ॥

এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সার্বগাদ্ভাদশস্মৃতাঃ।”

নাম	গাঁই।
১ হল	গাজলী
২ রাজ্যধর	কুন্দ
৩ বশিষ্ঠ	সিক্কল
৪ মদন	দায়ী
৫ বিশ্বরূপ	নন্দী
৬ কুমার	বালী
৭ যোগী	সিরারিক
৮ রাম	পুংসিক
৯ দক্ষ	শাট
১০ মধুহৃদন	পারীহাল
১১ মাধব	ঘণ্টেশ্বরী
১২ গুণাকর	নায়ারী

ছান্দড় বংশ।

“রনির্মহিত্তাঃ সুরভিষ্ঠ ঘোষঃ।

কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিশ্বলালঃ ॥

মহাযশো বাপুলিঃ পিপ্পলিষ্ঠ।

ধীরশ্চ পুতি ননু শঙ্করাখাঃ ॥

বিশ্বস্তরোভূৎ খলু পূর্বগ্রামী।

বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ-নিবাস-দেশাঃ ॥

শ্রীশ্রীধরোভূৎ খলু কাঞ্জিবিম্বী।

নারায়ণো নামচ কাঞ্জিয়ারী ॥

চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃ স্যাৎ।

মনো দীবাশো ভুবি কজ্জতুলাঃ ॥

বাৎসাসা এতে কথিতাশ্চ পুত্রাঃ ॥”

(কুলরমা)

নাম	গাঁই
১ রবি	মহিত্তা
২ সুরভি	ঘোষ
৩ কবি	শিশ্বলাল (শিমলাই)

৪	মহাশয়	বাপুলী
৫	ধীর	পিপ্পলী(পিপলাই)
৬	শকর	পুতিতুণ্ড
৭	বিশ্বস্তর	পূৰ্বগ্রামী
৮	জিহর	কাঞ্জিবিম্বী(কাঞ্জিলাস)
৯	নারায়ণ	কাঞ্জিরারী
১০	গুণাকর	চৌৎখতি
১১	মন	দীঘাল ।

এতদ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, পঞ্চ-
গোত্রে উনষষ্টি গাঁই নির্দিষ্ট আছে । কিন্তু
বহুদিন পরে লুণাপাঠান নামক জনৈক
ঘটক বাৎস্য গোত্র হইতে পূৰ্বগ্রামী, দী-
ঘাল আর চৌৎখতি পরিভাগ করিয়া
ছান্দড়ের অর্চ্যপুত্র এবং তাঁহাদের আটটি
গাঁই কল্পনা করেন । তদবধিই সাধারণ
লোকে বলিয়া থাকে যে “পঞ্চগোত্র
ছাপ্পান গাঁই, তা ছাড়া বায়ুন নাই ।”
কিন্তু বিজয়গুণীতে এই কথা গ্রাহ্য নহে ।
আমাদের বিদ্যানিধি মহাশয় এই অকা-
রনসম্মত মতের পরিপোষণ করিয়া কুল-
দীপিকা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উ-
দ্ধৃত করিয়াছেন ।—

“কাঞ্জিবিম্বী মহিস্তাচ পুতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
যেঘাল বাপুলিষ্ঠেব কাঞ্জারীচ তথৈবচ ॥
সিমসালশ্চ বিজ্ঞেয়ো ইমে বাৎস্যক সং-
জ্ঞকাঃ ॥” (স—২৫ পৃ।)

আমরা বুঝিতে পারিলাম না লুণা-
পাঠানদের মত রক্ষা অর্থাৎ ছাপ্পান গাঁই
ঠিক রাখিবার জন্য এই শ্লোকের একটি
চরণ পরিভাগ করিবার প্রয়োজন কি ?

তবে ইহাই দেখা যায় যে, এই শ্লোকে অর্চ্য-
ধিক গাঁই স্বীকার করিলে “অর্চ্যবগ প-
রিজ্ঞেয়ো উম্মুতা শ্চান্দড়াম্মুনে ;” এই বাক্য
রক্ষা পায় না, যাহা হউক আমাদের বি-
বেচনার একটা অমূলক কথার সত্যতা
দেখাইতে এত গণ্ডগোল করা ভালবোধ
হইল না । আমরা কুলদীপিকা পাঠ ক-
রিয়া উপরোক্ত শ্লোকটি এইরূপ দেখিলাম ।
“কাঞ্জিবিম্বী মহিস্তাচ পুতিতুণ্ডশ্চ

পিপ্পলী ।

যেঘালে বাপুলিষ্ঠেব কাঞ্জারীচ তথৈবচ ॥
পূৰ্বগ্রামী দীঘালশ্চ চৌৎখতি শিমসালকঃ
বাৎস্যগোত্রজাতা ইমে বিখ্যাতাঃ পৃথি-
বী-সে ॥”

আদিশূরের দেহিত্র বংশীয় সন্তান
সন্তান বঙ্গালসেন, উক্ত মহাত্মা গণের
বংশধর দিগের গুণ বিচার করিয়া, আচার
বিনয়াদি নবগুণাবিত দিগকে কুলীন এবং
অটুগুণবিশিষ্ট দিগকে শ্রোত্রিয় আখ্যা
প্রদান করেন । ১০৬৬ হইতে ১১০১ খঃ
পর্যন্ত ৩৬ বৎসর বঙ্গালের রাজত্বকাল নি-
র্গীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে যে
তিনি কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ করিয়াছিলেন,
তাহা নিশ্চয় করা মুকঠিন। তবে অনুমানের
উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই অনেক কথা
বলেন বটে, কিন্তু আমরা ওরূপ আনুমা-
নিক কথা লিখিতে ইচ্ছা করিনা ।

বঙ্গালসেন, উক্ত উনষষ্টি ব্যক্তির স-
ন্তানগণের মধ্যে ৩৭ ঘর মুসিক শ্রোত্রিয়,
আর ২২ ঘর কুলীন করেন ।

মুসিক শোত্রিয়।

১ ২ ৩ ৪ ৫

“পূর্ব পালধি সিদ্ধলো কুশারি বাপুলি-

৬ ৭ ৮ ৯ ১০

কাঞ্জারিকাঃ। মাষ সাহিয়াল নন্দি কুমারঃ

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

ডুরি বটবালকো ॥ অমুলী কুলিনা সিরারী

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

কড়লা সিমুলীসী পকটঃ। পোড়া তৈলকঃ

২১ ২২ ২৩ ২৪

পোশলাশচ পলশো নাইসারিদীর্ঘাজিকো ॥

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯

মুলগ্রাহিকঃ পারী বালী শিমলা শাণ্ডেশ্বরী-

৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

ভট্টকঃ ॥ সেমুঃ পুংসিকিমূর্বসুন্দপরে

৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭

নাইসারিকো ঘোষলী। আকাশশচ কোরাতি-

কোপি গণনাং ত্রিংশজ্জনঃ সপ্তচ ॥”

কুলীন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

বন্দ্য চট্ট মূঠেটি ঘোষ পুতিকা গাজ্জাপ

৭ ৮ ৯ ১০ ১১

কাঞ্জিভায়ঃ। কুন্দ্য রারী গুড়ো মহিন্তা

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

কুলডি শোত্রাধিকঃ পিপ্পলী ॥ ঘটে পারী

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

হড়ো গড়োপি পীতমো দী কেশ দীর্ঘা-

জিকাঃ। জীবলাল হুপেণ হি পুরা দ্বাবিংশ-

শাতহাপিতাঃ।

কাঞ্জিভায়=কাঞ্জিলাল; ঘটে=ঘটে-

ধরি; পীতম=পীতমুণ্ডো; দী=ডিংসাঃ;

কেশ=কেশবকুলি; রারী=রাই গাঁই।

উক্ত দ্বাবিংশৎ কুলীনের মধ্যে ৮ বর মুখা-

কুলীন আর ১৪ বর গোণ কুলীন।

“—————বন্দ্য মুং ঘোষ চট্টকঃ।

পুতিচ গাজলী কাঞ্জী কুন্দেন সহ চাষ্টমঃ॥”

বন্দ্য, মূঠেটি, ঘোষাল, চট্ট, পুতিতুণ,

গাজলী, কাঞ্জিলাল, কুন্দ, এই আট বর

মুখা; অবশিষ্ট ১৪ বর গোণ।

পরে বন্দ্যালের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ

লক্ষ্মণ সেন, আবার তদ্বংশীরদের দোষ-

গুণ নির্বাচন সময়ে, আটের মুখাকুলীনের

মধ্যে ১৯ জনকে কৌলিন্য মর্যাদা প্রদান

করেন।

“বহুরূপঃ স্রুচো নান্না অববিদ্ম্য ইলামুখঃ।

বাজুলশচসমাখাতঃ পক্টেতেচট্টবংশজাঃ॥

পুতিগোবর্দ্ধনাচার্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।

গাজুলীঃ শিশোনান্না কুন্দ্য রে'ষাক-

রোপিচ ॥

জাহ্নন'খা স্তথা বন্দ্য মহেশ্বর উদারদীঃ।

দেবলো বামনশৈচব ঈশানো মকরন্দকঃ॥

উৎসাহ গজডাখাতো মুখবংশসমুদ্ভবো।

কানু কতুহলাবেতো কাঞ্জিকুল প্রতিষ্ঠিতো

উনবিংশতি সংখ্যাতা মহারাঞ্জন পুত্রিতঃ॥”

(ক্রানন্দ মিশ্রাকৃত।)

স—১৬৩ পৃ।

চট্টবংশজ—বহুরূপ, স্রুচ, অববিদ্ম্য

ইলামুখ, বাজাল।

পুতিতুণ—গোবর্দ্ধনাচার্য। ঘোষাল

—শির। গাজলী—শিশো।

কুম্ভ—রাধাকর ।

বন্দ্য—ভাল্লভ, মহেশ্বর, দেবল, বা-
মন, জৈগনি, মকরন্দ ।

মুঠেটি—উৎসাহ, গরুড় । কাজি-
লাল—কানু, কুতূহল ।

এই সময়েই তিনি গোঁণ কুলীনদিগকে
শ্রোত্রিয় সংজ্ঞাদিয়া সিদ্ধ, সাধা, অরি এই
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ।

১ ২ ৩

“ পিপ্পলী দিঘারী চৈব দীনশায়ি স্তুথৈবচ
এতে সিদ্ধাঃ । ”

১ ২ ৩ ৪

“ মহিন্দ্রা হৃদ গুড় পারীহাল। এতে
সাধাঃ । ”

১ ২ ৩

“ কেশবঃ পীতমুণ্ডীচ রাগী গারিষ্ঠ
৪
গড়্গড়িঃ ।

৫ ৬ ৭

যণ্টেশ্বর শ্ৰেণীঃখণ্ডিষ্ঠ কুলডিরস্তুমৈ
যৎকন্যা লাভ মাত্রেণ সমুলন্তু বিন-
শাতি । ” (কুলদ্রমা)

স্বয়ংক্র নিৰ্ণয় রচয়িতা প্রমাণ করেন
“ লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্রাটে হইবার কিছু পূ-
র্বেই কুলীনদিগের মর্যাদার সমীকরণ হয় ।
অর্থাৎ ১২০৩ খ্রিস্টাব্দের অন্যবহিত পূর্বে
এইরূপ বিভাগকরা হইয়াছিল । ” পাঠক-
গণ উক্ত গ্রন্থের (১৬৪ পৃ) পাঠ করিয়া
দেখিবেন ।

এখন আমরা বংশজের কথা বলিব ।

বর্তমান সময়ে কোন কুলীন, বংশজের
কন্যা বিবাহ করিলেই ভজ হয় এবং
৭।৮ পুরুষান্ত্রে এই ভজ কুলীনের
বংশধর গণই বংশজত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ;
কিন্তু আদিতে বংশজ না থাকিলে
বংশজ কন্যাই সম্ভবে না । তবে আদি
বংশজ কিরূপে হইল এখন তাহাই নি-
র্ণয় করিতে হইবে । আমাদের কাছে নিতান্ত
কোভের সহিত বলিতে হইল যে, এ-
শ্বের এই অংশে বিদ্যানিধি মহাশয় যে
সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার একটিও
আমাদের মনঃপূত হইল না ; সুতরাং আ-
মরা ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়া “কুলগণ”
গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক পাঠকগণের নি-
টক উপস্থিত করিব ।—

“ধেনুঃ স্বর্ণময়ীঃ কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় ধার্মিকঃ ।
সাঁচ স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে প্রজগৌ মুহঃ ॥
ছিন্না বহিষ্কৃত্য রাজ্ঞা স্বর্ণানাতঃ বণিকোভবৎ ।
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজ্ঞাতাঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃত্যঃ ॥”

মহারাজ বলাল স্বর্ণ ধেনু নির্মাণ ক-
রিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং উহা
ছেদন করিতে অনুমতি দেন । তদনুসারে
যাহারা ছেদন করিয়াছিল, তাহারা স্বর্ণ
বণিক আর দানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ সর্ব-ধর্ম
বহিষ্কৃত প্রতিগ্রহ সংজ্ঞাক্রান্ত হইলেন ।

প্রতিগ্রহ নির্ণয় ।

“শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োপিচ দিবাकरः ।
গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িষ্টৈচবপিপ্পলী ॥
বন্দ্যো মার্তণ্ডনামাচ ভপোনিষ্ঠ-দৃঢ়ব্রতঃ ।
আনারিষ্টগণাগিষ্ট ছাড়ে গোপীচবন্দ্যজাঃ ॥

মাধো দৈকড়িনামাচ রাগীচ মধুসূদনঃ ॥
 কুশিকো যবনামাচ হড়ো নারায়ণোপিচ ।
 মহিষ্ঠা ত্রিবিধনামা দায়ারিষ্টৈচব কেশঃ ॥
 চট্টঃ শকুনো নানাচ তৈলবাটী নরারিকঃ ॥
 কুম্ভো বিশেষ্বরো জ্যেয়ো বন্দাজা বিঠু-
 সংজ্ঞকঃ ॥

যোবজ্যো ভাতরাবের্তো মদনবিশ্বরূপাবো ।
 গ'জ্যোস্তবোহাসানামা পু'তিগৌতমসঃ-
 জ্ঞকঃ ॥

শিম্ভী পরাশরো খাতঃ শঙ্করো ডিগ্ভি
 সংজ্ঞকঃ ।

অমীকুলোস্তব শৈচব গোদানঃ জগ্ভু'জ্যোঃ ॥
 তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পক্ষে গৌরীব সীদতি ।
 সম্বন্ধে ভোক্তনৈচব দানে যজ্ঞে তথৈবচ ॥
 বিবৃষ্টিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বজ্জ্যা এতে পুনঃপুনঃ ।”

নাম	গাঁই
১ শঙ্কর	পীতমুখী
২ দিবাকর	গড়্গড়ি
৩ ডাউক	ওড়
৪ দোকড়ি	পিপ্পলী

৫ মার্ত্তণ্ড	}
৬ আ'নারি	
৭ গণায়ি	
৮ হাড়	
৯ গোপা	
১০ বিঠু	}
১১ দোকড়ি	
১২ মধুসূদন	
১৩ যব	
১৪ নারায়ণ	

বন্দা

মাশ্চরক

রাগী

কুণারি

হড়

১৫ দায়ারি

১৬ কেশব

মহিষ্ঠা

১৭ শকুনি		চট্ট
১৮ নরারী		তৈলবাটী
১৯ বিশেষ্বর		কুম্ভ
২০ মদন	}	যোব'ল
২১ বিশ্বরূপ		
২২ হা'সা		গাজলী
২৩ গৌতম		পুতিভূগু
২৪ পরাশর		শিমলাই
২৫ শঙ্কর		ডিংসাই

সংকুলজাত এই সকল বিজগণ গো-
 দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের স-
 ম্বন্ধ মাত্রই কলঙ্কিত। সম্বন্ধে, ভোক্তনে,
 দানে, যজ্ঞে, এমন কি শ্রাদ্ধকালেও উ-
 হারা বজ্জনীয়।

“গণোকন্যা বশিষ্ঠেন চৈ'ঠেন শকুনি-সুত।
 হাড়ো কন্যাদায়িকেন কুবেরোহাসাজাপতিঃ ॥
 চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ ।
 বিঠুসুতা পতিভূ'হা চট্টকঃ কুলভূষণঃ ॥
 প্রতিগ্রহ সূতোদ্বাহাত্ যজ্ঞেতে বংশজাঃ
 স্মৃতাঃ ॥”

বশিষ্ঠ গণায়ির কন্যা, চৈ'ঠ শকুনির
 কন্যা, দায়িক হাড়োর কন্যা, কুবের ও
 চক্রপাণি হাসোর কন্যা, এবং কুলভূষণ
 বিঠুর কন্যা। বিবাহ করিয়া প্রথম বংশজত্ব
 প্রাপ্ত হন; যে হেতুক গণায়ি ও ভূতি
 প্রতিগ্রহ হইয়াছিলেন। অতএব—
 “প্রতিগ্রহ-সূতোদ্বাহী বংশজঃ ।”

কুসুমার এই বাক্যও যুক্তি-মূলক হইল।

এখন দেখাযাউক ঘটক কি? ঘট-
 কের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যানিধি

মহাশয় বলিয়াছেন “ ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব
বে'ধহন, এই আদি বংশভেদে বংশের
নিকটে নিকটে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ”
(২২৮ পৃ—স) । আরও বলেন “ যাঁহা-
দিগের কোনরূপ ক-ক্ষয় হইয়াছিল, তাঁ-
হারা বংশভেদ পাইলেন । কালক্রমে ইহা-
দিগের মধ্যে যাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ
লক্ষণ স্ফুর্তি পাইতে লাগিল তাঁহারা ঘ-
টক বা কুলচাৰ্য্য হইলেন । ”

আমরা যতদূর জানি তাহাতে বলিতে
পারি, সকল ঘটকই বংশভেদ নহেন ; ঘট-
কের মধ্যেও অনেক কুলীন শ্রোত্রিয় আছে ।
ক'চা'দিগের ঘটক রামগঙ্গা বিশাখদের
সন্তান, পাটীহাল মেসের কুলীন । উহাদের
মধ্যে অনেকই অপৰ্য্যন্ত ভজ্জ হয় না ।
উহাদের আদি পুরুষ হনগাঙ্গুলী । আবার
কোলা, বাইশারি ও সন্দরদিগের ঘটকগণ
মাশ্চর্য্যক শ্রোত্রিয়, উহারাও অপৰ্য্যন্ত শ্রো-
ত্রিয় সমাজে উচ্চ আসনে অ'সীন অ'ছেন ।
এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবশ্যই স্বীকার
করিতে হইবে যে, কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশভেদ
এই তিনই ঘটক হইতে পারে । বাস্তবিক
মহারাজ বসন্ত, উক্ত তিন শ্রেণী হইতেই
কয়েক জনকে মনোনীত করিয়া ঘটকাখ্যা-
প্রদান করেন । ঘটকদিগের প্রতি শ্রোত্রিয়
কুলীনের দোষগুণ বিচারের ভার অর্পিত
হয় । যথা—

“ বংশভেদভাবগুণদোষবিচারকর্তা,
ন্যূনাতিরিক্তপরিমাণযথার্থবক্তা,
পর্য্যাবিপৰ্য্যাব-গণনকরোতি যশচ,

শশ্বরূপেণ গমিতো ঘটকঃ স এব । ”

অংশ সমুদয়ে পঞ্চদশ । “ আর্তিত্ৰিধা
ত্রিধাঃ ক্ষেমা মধ্যাংশো নবধাঃ স্মৃতাঃ, ”—
ত্রিধা আর্তি যথা—আর্তি, সমা'র্তি, পূর্ণা'র্তি ।
ত্রিধা ক্ষেমা, যথা—ক্ষেমা, সংক্ষেমা, পূ-
র্ণক্ষেমা ।

নবধা মধ্যাংশ যথা—কিঞ্চিৎক্ষেমা,
কিঞ্চিনা'র্তি, লভা, অতিলভা, কিঞ্চিলভা,
কিঞ্চিরূ'ন, গ্রহ, নৃ'ন, তুলা ।

এই সকল বিষয়ে বিশেষ পরিজ্ঞাত
বাক্তিগণই ঘটক উপাধি লাভ করিয়া-
ছিলেন । আমরা এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক
লিখিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে বাসনা করি
না । যাঁহার অংশ, বংশ, পর্য্যাব এবং বি-
পর্য্যাব জানিতে ইচ্ছা হয়, তিনি “ কুবানন্দ-
মিশ্র ” পাঠ করিবেন ।

ঘটকের মধ্যে দেবীবর অতি প্রসিদ্ধ ।
দেবীবরই মেলনকন করিয়া রাঢ়ীয় কুলীন
কন্যাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত জ্বলন্ত অ-
নলে আহুতি প্রদান করেন ; দেবীবরই কু-
লীন সমাজ রসাতলে নিক্ষেপ করেন ;
দেবীবরই ভীষণ পাপপ্রবাহে সমস্ত বজ্র
ভাসাইয়াছেন ; দেবীবরই মূৰ্খ কুলীন সম্ভ্র-
দায়ের জন্ত ঘোরতর নরক প্রাপ্ত করিয়া
রাখিয়াছেন এবং দেবীবরই কুলীনদের
ইহ পরকাল ধাইয়াছেন । এমন গুণের
সাগর দেবীবরের পরিচয় শুনিতে কেনা
উৎসুক হইবেন ? কেনা অনন্য মনে তা-
হার কথায় কাণ পাতিবেন ? যদিচ মান-
বীয় বিদ্যানিধি মহাশয় দেবীবরের বিবরণ

বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন, তথাপি পাঠকের
উপরকার নিবারণার্থ আমরা এইস্থলে উহার
বংশাবলী উল্লেখ করিলাম।

• দেবীবরের পূর্বপুরুষদের
পুরুষাবৃত্তিক নাম।

ভট্টনারায়ণ, বরাহ, নৈনতেয়, শুবুক্ষি,
বিবুপেন, গাভি, গজাধর, পদ্ম, শকুনি,
মহেশ্বর, মহাদেব, দুর্জয়ী, সঙ্কট, অনন্ত,
লক্ষ্মীনাথ, সর্বানন্দ, দেবীবর।

দেবীবর বন্যবংশজ ; পিতা সর্বানন্দ
হইতে ঘটকাখা প্রাপ্ত হন। ইহার উক্তন
নবম পুরুষ শকুনির ভাতা দিঠু প্রতিগ্রহ
ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার সঙ্গে শকুনির
কোনরূপ সংস্রব থাকাতাই তদংশীয় দে-
বীবর কুলগৌরবহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। দে-
বীবর কুলীন দিগের দোষ নির্বাচন করিয়া
উহাদগকে ৩৬ মেলে বিভাগ করেন।

১ গজানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলিয়া মেল ;
২ বেগেশ্বর পাণ্ডিতে খড়্গদহ মেল ;
৩ বন্দ্য বসুভাচার্য্য বঙ্গভী ; ৪ বন্দ্য স-
র্বানন্দে সর্বানন্দী ; ৫ মুঠেখটি দেবকীনন্দনে
পণ্ডিতরত্নী ; ৬ চট্টখুন্সে বাঙ্গাল ; ৭ পু-
তিতুগু সুরাই ঘটকসিংহে সুরাই ; ৮ বন্দ্য
ত্রিলোচনাচার্য্য শেখরে অচর্য্য, শেখরী ;
৯ মুখ গোপাল ঘটকে গোপালঘটকী ;
১০ চট্টরাঘবে চট্টরাঘবী ; ১১ বিজয়
পাণ্ডিতে বিজয়পাণ্ডিতী ; ১২ বন্দ্যমাধবে
মাধাই ; ১৩ চট্ট অবসতি বিদ্যাধরে বিদ্যা-
ধরী ; ১৪ অবসতি চট্টরাঘবে পারীহাল ;
১৫ পুতিতুগু শ্রীমঙ্গভটে শ্রীমঙ্গভট্টী ;

১৬ মুখ জিতামিত্রে প্রমোদিনী ; ১৭ অব-
সতি চট্টকেশবে বালী ; ১৮ মুখ চন্দ্রপতিতে
চন্দ্রাপতি ; ১৯ মুখ শ্রীধর্মে শ্রীধর্মী ;
২০ মুখ শতানন্দখানে শতানন্দখানী ;
২২ খুইনার চট্টছকিতে ছকী ; ২২ মুখ
চন্দ্রপাণ্ডিতে অচরিতা ; ২৩ মুখ দ-
শরথ ঘটকে দশরথ ঘটকী ; ২৪ অখ-
ণ্ডনবংশ মাধবশুভরাকখানে শুভরা-
জখানী ; ২৫ মুখ মালধর খানে
মালধর খানী ; ২৬ ঘোষ রাঘবে রা-
ঘব ঘোষলী ; ২৭ চট্টদেহাটা শ্রীপতিতে
দেহাটী ; ২৮ গাঙ্গ গঙ্গাধরে নৈড়া ;
২৯ চৈতল কাকুন্সে কাকুন্সী ; ৩০ ঘোষ
ধরাধরে ধরাধরী ; ৩১ কাকিলাল শতা-
নন্দে রায় ; ৩২ বন্দ্য টৈরব ঘটকে টৈরব
ঘটকী ; ৩৩ বন্দ্য পরমানন্দ মিশ্রে পরমা-
নন্দ মিশি ; ৩৪ মুখ সুরোবংশীয় সর্ব-
ানন্দে সুরোবংশীয় সর্বানন্দী ; ৩৫ চট্ট
হুনিংহ বংশীয় হরি মজুমদারে হরি মজুমদারী ;
এবং ৩৬ টাদাই মেল।

এই ৩৬ মেলের মধ্যে যে যে মেলে
হানদোষ দৃষ্ট হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠত্রে গণ্য ;
তদনুসারে কুলিয়া ও খড়্গদহ সর্বশ্রেষ্ঠ।
কোন মেলে কত দোষ, কাহারও জা-
নিবার হইল : ইহা “মেলবালী” দেখুন।

এই মেল বন্ধনে এক মেলীয় কুলীন
কন্যা, অন্য মেলীয় পাণ্ড্রে দেওয়া নিষিদ্ধ
হইল। তদবধিই কুলীন কন্যাগণের বি-
বাহের ‘বর’ দুর্গত হইয়াছে এবং অহরহ
অপাত্রে কন্যাদান ঘটতেছে। বিদ্যানিধি

মহাশয় বহু যুক্তিতে প্রমাণ করেন যে মেল-
বন্ধন সম্ভবতঃ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে হইরাছিল ।
এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তি ওলি নিতান্ত সার-
গভ ও অনুদান যুক্ত । বাস্তবিক সম্বন্ধ
নির্ণয় যে একখানা প্রশংসার্ক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে
সন্দেহ নাই । তবে মধ্যো মধ্যো কিয়ৎ প-
রিমাণে দোষ থাকিলেও তাহা ধর্তব্য নহে ।

আমরা ভরসা করি পুনর্গুণাক্ষণ গুণ্ধখানী
সর্বাংশে শুদ্ধি লাভ করিবে, আর. কায়-
স্থাদির অতীত ইতিহাস ও বর্তমান সামা-
জিক বিনয়ণ সম্বন্ধে লিপিতে গিয়া গুণ্ধ-
কার যে সকল ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইরা-
ছেন, তাহা পরিত্যক্ত হইবে ।

—

ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য ।

(বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী সময়)

বঙ্গভাষা ভারত ভূমি সাগরমেখলা স-
ম্বিতা পৃথিবীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পৃ-
থিবী । ভারতভূমির উর্ধ্ব গর্ভে প্রসূত
না হয়, এমন পদার্থই প্রায় দৃষ্টিগোচর বা
অতিমূল্যবান হইতে হয় নাই । এদেশীয়দি-
গের কথা দূরে থাকুক, দেশদেশান্তরের
মানবগণ ইহার প্রসাদে জীবনযাপনোপ-
যোগী অপরিখ্যাপ্ত সামগ্রী প্রাপ্ত হয় । ব-
নিষ্ঠ মুনির কামদুহা নন্দিনীর স্নান, স্বর্গীয়
কম্পতরুর স্নান ভারতভূমি অবস্থানকাল
উদ্ভিজ্জ, ধনিষ্ঠ, প্রাণিষ্ঠ প্রভৃতি প্রভূত
দ্রব্য নিচর উৎপাদন করিয়া জগতীতলে
সুপ্রসিদ্ধ হইরাছে ; একথা কেহই অসঙ্গত
বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিবে না । জ-
গতের সৃষ্টি হইতে আজি পর্যন্ত প্রকৃতি
দেবী ভারতের প্রতি স্রষ্টার ও মুক্তহস্ত
রহিয়াছেন, এবং উত্তরকালেও যে এইরূপ

থাকিবেন, তাহা অমুভূতি দ্বারা আশা-
গের বিশেষরূপ ক্ষয়ক্ষম হইতেছে । যদিও
কালের অপ্রতিহতপ্রভাবে ভারতভূমি প্রা-
কৃতন সৌভাগ্যমুখে বঞ্চিত হইয়াছে; যদিও
স্বাধীনতা রত্ন হারায়েয়া আজি সপ্তশত ব-
র্ষাবধি পরাধীনতার চিরক্লেশসম্মত উৎ-
পীড়নে শক্তিহীন হইয়াছে ; এবং যদিও
মুখশশাক্রান্ত অমৃতময়ী, বিশ্বশোভিনী,
ভোজ্যস্বামী রজনীর সহবাস পরিবর্তে
চিরদুর্জিহ্বা অমুখময়ী অমাবস্যাভাসময়ী
অতি প্রগাঢ় তমিস্রাজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে ;
তথাপি বহুদ্রুপ্রসবিনী । ঈদৃশী অবস্থাতে-
ও যখন “যা চাই, তাই পাই”; তখন সাত
শত বৎসরের পূর্বে ভারতভূমি যে কত
রত্ন, কত জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য
এবং কত অমৃতময় ভোজ্য প্রদান করিত,
তাহা অভিনিবিষ্টচিত্তে একবার চিন্তা

করিলেই চূড়ান্তরূপে সীমাসিদ্ধ হইয়া যায়।

প্রতীচ্য মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতিই, প্রথমে ভারতবর্ষজাত জীবানিচয় বিদেশে লইয়া যায় * ; তাহাদিগের জৈদৃশী ব্যবহারের পূর্বে ভারতের ধন ভারতেই থাকিত—সুখসোভাগোরও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে ভারতভূমিজাত অপরিমিত উৎকৃষ্টতর সামগ্রীসমূহ পর-রাজ্যে নীত হওয়াতে, বিদেশীয়দিগের নেত্রোন্মীলিত হইল। সেই সময় হইতে তাহারা ক্রমে ক্রমে ইহার সহিত স্থায়ি বাণিজ্য আরম্ভ করিল। মিসরীয় ও ফিনিসীয়দিগের পরে, পারস, গ্রীক এবং রোমানেরা পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আগমন করে। রোমানেরা এদেশ হইতে নানাবিধ

* পুরাতত্ত্বোল্লিখিত অতি প্রাচীন মিসরীয় এবং ফিনিসীয় নাবিকদিগের ভূমধ্যসাগরেই প্রথম সমুদ্রযাত্রা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল মাত্র ভূমধ্যসাগরের তটস্থিত প্রদেশসমূহেই তাহাদিগের বাণিজ্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আরব সাগরের উপকূলস্থিত বন্দর সকল অধিকার করিয়া প্রথমেই তাহারা বাণিজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিল। এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে তাহারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য স্থাপন করিয়াছিল, উহারা তাহাদিগের সর্ব প্রথম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

(রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। প্রথম অধ্যায়, ৫ম পৃষ্ঠা)

বহুমূল্য রত্ন, উৎকৃষ্ট রেশম, সুগন্ধি জবা প্রভৃতি অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের স্বদেশের বহুল উন্নতি সংসাধন করিয়াছিল। † এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, রোম সভ্যতা ভূষণে ভূষিত হইবার বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ সভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে যে, রোম সভ্যতা সম্বন্ধে গ্রীকরাতির নিকট অনেকাংশে শূণ্য ; সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল বর্ণ মালারই আবার গ্রীকরাতি ঐ বিষয়ে ভারতবর্ষ ও মিসরের সমীপে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় ; ভারতবর্ষে আসিয়া পিতাগোরনের দর্শন শাস্ত্র এবং গণিতবিজ্ঞান শিক্ষা করাও তাহার অন্যতর নিদর্শন দেখা যাইতেছে ; সুতরাং এতৎসম্বন্ধে অনুমানও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। যে সকল রাজ্যকে আমরা প্রাচীনকালে সভ্যতাসোপানাক্রুত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাদিগের মধ্যে সকলেই কোন না কোনপ্রকারে আমাদিগের ভারতবর্ষের নিকট বহুল শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতভূমি কাহারও নিকট তৎকালে কোন বিষয়েই কিছু গৃহণ করে নাই। রোমের বহুকাল পূর্বে মিসরই যখন বাণিজ্য স্রোতের সহিত মিশাইয়া এদেশ হইতে কি গণিতাদি বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা, কি রাজ-

† রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৫ পৃষ্ঠা।

নীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়েই কিছু কিছু অংশ লইয়া গিয়াছিল, তখন পরবর্তী সভ্যতাকৃত যে যে কণা প্রয়োজন কি ? যাহা হউক, রোম বাণিজ্য সম্বন্ধে তৎকালিক অন্যান্য সভ্য দেশা-পেক্ষা ভারতবর্ষের নিকটে বিশেষরূপে উপকৃত ইহা অংশা বলিতে হইবে । যখন ভারতবর্ষের বাণিজ্যজাত দ্রব্য দ্বারা রোমই উন্নত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তখন অপর কোন দেশই যে সেরূপ হইতে সক্ষম হয় নাই, তাহা আর বক্তব্য কি ?

একণে একটি কথা উল্লেখিত হই-
তছে, রোম কি কেবল ভারতবর্ষের প্র-
সানেই সুসভ্য হইয়াছিল ? অন্যান্য দে-
শের সহিত কি তাহার উন্নতি সম্বন্ধে বা-
নিয়া বিষয়ী ঘনিষ্ঠতা ছিল না ? উত্তর,
— হইল ; কিন্তু ভারতবর্ষই রোমের প্রতি
সর্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে যুক্তহস্ততা
প্রদর্শন করিয়াছিল । *

পাশ্চাত্য প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিৎ এন্ট্রি-
য়াম (Antiquary) বলেন, প্রাক্-রোমীয় প্র-
চুত প্রাচীন ইউরোপীয়েরা তৎকালিক
ভারতীয়দিগের কতকগুলি অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গ
মূল্য বিশিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে নানাবিধ উৎ-
কৃষ্ট নীলকান্ত মণি, অরক্ষণ মণি, পদ্মরাগ
মণি, হীরক প্রভৃতি রত্ন : বিবিধ স্নগন্ধি
দ্রব্য ; নানাবিধ চিত্রিত কৌশিক ও সূত্র
বস্ত্র : রসময়ী সূত্র ; হস্তদত্ত প্রভৃতি দ্রব্য

* । রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের
ইতিহাস । ২ অ, ৫৮ এবং ৫৯ পৃষ্ঠা ।

সমূহ লইয়া গিয়াছিল । † ফলে তা-
রতবর্ষের প্রসানেই রোমের জুলিয়াস সি-
জার, কতাসের মাতা সাভিনিয়াকে
৪৮১৫৭০) টাকা মূল্যের একটি বহু-
যুক্তা উপঢৌকন দিয়াছিলেন । রাজী ক্রিও-
পেট্রের প্রসিদ্ধ মৌক্তিক কণভূষণের মূল্য
১৫১৪৫৮০) টাকা লইয়াছিল । ‡ সু-
তরাং যে ভারত ভূমির রূপায় পাশ্চাত্য
জাতীয়েরা এতদূর মূল্যবান রত্ন সমূহ লাভ
করিয় ছিল, সে ভারত ভূমি যে কত দূর
ঐশ্বর্যশালিনী, তাহা আর বাহুল্য রূপে
বলিবার প্রয়োজন নাই । ভারত ভূমির
ঐশ্বর্য প্রাচীনকালবদি আজি পর্যন্ত স্বা-
র্থপর প্রতীচ্যজাতিরা ক্রমাগত দেখন ক-
রিতেছে, তথাপি নিঃশেষ করিতে সমর্থ
হয় নাই ; শত শত বিদেশীয় ভূপতি ভা-
রতের অতুল ঐশ্বর্য দর্শনে ইহার প্রতি
বিষমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং এখনও
করিতেছেন, তথাপি ভারত ভূমি রত্ন প্র-
সানে বিরত নহে । যে ভারত পুরাকালে
মিসর, গ্রীস, পারস্য, রোম প্রভৃতির সম-
যুক্তি ও গোপন রক্ষ করিয়াছিল, সেই রত্ন-
প্রসবিনী ভারত ভূমি অধুনা ক্ষুদ্রোদরা অ-
থচ সর্বগ্রাসিনী ইংলণ্ড ভূমির দেহ, পুষ্টি
সংসাধন করিতেছে । এক ভারতের স-
হিত প্রথমসূত্রে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধন ক-
রিয়া ইংলণ্ড ভূমি সর্বাপেক্ষা অতুল ঐশ্ব-

† রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ই-
তিহাস । ২ অ, ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠা ।

‡ এই ইতিহাস ২ অ, ৫৮ পৃষ্ঠা ।

যেখানেই ইহা আছে, ইহা কে না মুকুটের
স্বীকার করিবে? কোন আধুনিক ইতিহাস
না ইহা দেখে ইয়া দেন?

এক্ষণ দেখা যাউক, পাশ্চাত্য জা-
তীয়েরা বাণিজ্য বলে যে ভারতবর্ষের ঐ-
শ্বর্ষ্যে স্ব স্ব দেশের মহতী উন্নতি বর্ধন ক-
রিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ভারতের
প্রাচীন বাণিজ্য কিরূপ ছিল। বাণিজ্য
দুই প্রকার;—বহির্বাণিজ্য এবং আভ্যন্ত-
রীণ বাণিজ্য। এতদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীন
ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই লিপ্ত
ছিল। ভারত কেন যে বহির্বাণিজ্য পরি-
তাগ করিয়া অন্তর্বাণিজ্য করিত, অসুবিধা
করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হ-
ওয়া যায়। বকাল প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগ-
ণের মতে যে দেশে প্রকৃতি মুক্তহস্ত, যে
দেশে প্রকৃতির প্রসাদে অনতি ক্রেশে আ-
শানুরূপ প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সামগ্রী
ইচ্ছাগত হয়, সে দেশের আধিনাসী বিদেশ-
জাত দ্রব্যের আশা করে না। * সু-
তরাং এই কারণেই প্রভূত রত্ন প্রসবিনী
ভারত ভূমির বহির্বাণিজ্যে যনিষ্ঠতা না
থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই জন্যই
এদেশে প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধে
যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা কেবল আ-
ভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। যে দেশে “এক
আছে আর নাই” সেই দেশ, দেশ দে-
শান্তর হইতে আশানুরূপ প্রয়োজনীয়
দ্রব্যসামগ্রীর জন্য স্থলপথেই হউক, বা

স্থলপথেই হউক বাণিজ্য বাণীরে সং-
শ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষেরা স্বদেশ
ভিন্ন বিদেশে গাত কিছুই উপায়ে গিতা না
আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। বিশে-
ষতঃ, স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্য বাতীত এ দেশীর
শিল্পিমণ্ডলী লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত এত
উৎকৃষ্ট শিল্পকাজ দ্রব্য প্রস্তুত করিত *
যে, তদ্রূপ দ্রব্য পৃথিবীর অন্য কোন
দেশে পাওয়া মুকঠিন হইত। কোন দেশই
প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষীয় শিল্পনৈপুণ্যের
অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রা-
চীন ভারত বাসিগণ এইরূপে আপনাদের
অপর্যাপ্ত দ্রব্যে আপনারাষ্ট্র অনায়াসে
কালান্তিপাত করিতে সমর্থ হইরাছিলেন।
কেবল কয়েক প্রকার ধাতু, রৌপ্যপাত্র,
সজ্জিত যন্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য অপর দেশ হইতে

* ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ শিল্পকাজ
দ্রব্যসমূহে যে সর্বব্যব সম্পন্নতা প্রত্যক্ষী-
ভূত হয়, তাহা এতৎ সংঘটিত। যদিও
পৌরাণিক অভ্যন্ত কার্যের সম্মান নাই,
এতদেশীয়দিগের আনিক্রিয়াকৃতির প্রতি-
রোদক, তথাপি নিবিচলিত তৎপ্রতি নি-
যুক্ত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে আশ্চর্য
কার্যদক্ষতা ও চতুর্থা সমুৎপন্ন হইতেছে।
এমন কি, ইউরোপীয়েরা সর্বত্র বি-
জ্ঞান এবং যন্ত্রাদির সাহায্যেও কার্যক্ষেত্রে
তাহাদের তুল্য ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ
হয় নাই।

(রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতি-
হাস। পরিশিষ্ট ২০১ পৃষ্ঠা।)

প্রাপ্ত হইতেন । কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিদেশীয়েরা স্বয়ং আনিয়া যোগাইত, ভারত বাসিগণকে তজ্জনা কোন স্থানে যাইতে হইত না । কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, অ'লেক্সেজান্দ্রিয়ার বণিকসমূহে মিসর দেশ হইতে রক্তপাত্র, সাইপ্রস্ দ্বীপ হইতে একপ্রকার সূতা এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশ হইতে সূতাগীত নিপুণা সুন্দরী যুবতীদিগকে ভারতবর্ষে আনিয়ন করিয়া বিক্রয় করিত । * কিন্তু কোথাও এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বদেশজাত কোন দ্রব্য সামগ্রী স্বয়ং ভারতবর্ষ বাতীত অন্য কোন দেশে বিক্রয় করিয়া আসিতেন । বিদেশীয়েরা এইরূপ কএক প্রকার স্বল্প মূল্যের দ্রব্য বিনিময়ে ভারতবর্ষে স্তুত বহু মূল্যের অপৰ্যাপ্ত দ্রব্য লইয়া যাইত । এই বাপারটি দেখিলে কবির কবি কঙ্কণের কবিতার্কি “ জীরার বদলে হীরা ” সহস্র মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হয় । বাহা হউক, ফল কথা এই যে, তৎকালিক ভারতবর্ষ-বাসিগণের সাধারণতঃ যাহা কিছু আবশ্যক হইত, তাহা “ পারের উপর পা দিয়া ” ঘরে বসিয়াই অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেন ; সুতরাং কোন মতেই বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না ।

বাহাহউক এক্ষণে ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য এতদ্ব্যতিরিক্ত মনো কেবল

* বোহানকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ।
৪৭ পৃষ্ঠা ।

মাত্র শেষোক্ত বাণিজ্যই যে কেন আসক ছিল, তাহারই সমালোচনা করা কর্তব্য বোধ হইতেছে । পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, কোন অত্যাশাঙ্কীর সামগ্রীর প্রয়োজন হইলেও, ভারতবর্ষকে পরদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না ; প্রকৃতিই তত্তাবতের পূরণ করিয়া দিতেন । সুতরাং ভারতবাসিগণের সুদূরবর্তী প্রদেশে যাইয়া বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার আবশ্যক হইত না । আবার “ জননী জন্ম ভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীয়সী ” এই অমূল্য কবিতার্কি প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়-ফলকে স্বর্ণাকরে অঙ্কিত ছিল । আমাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম মাতা এবং জন্মভূমির প্রতি বিশুদ্ধ ও অটল ভক্তি, অন্ধা, মমতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রক্তির দৃঢ়ীভূত ও চিরস্থায়ী করিবার জন্যই এইরূপ অপূর্ব কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই কবিতার মাহাত্ম্যই প্রাচীন ভারতবাসী অর্ধগণ স্বদেশের প্রভূত পরিমাণে উন্নতি ও গৌরব সংবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন । বোধ হয় তৎকালে এইরূপ না করিলে, ভারতে যে প্রাচীন গৌরব আজি পর্যন্ত দেদীপমান এবং যাহার প্রতিবিম্ব অধুনাতন ইউরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মানস-মুহুরে প্রতিফলিত হইয়া অশেষ বিধ উপকার সাধন করিতেছে, তাহা এত অধিক পরিমাণে হইতে পারিত না । কেহ হয়ত বলিবেন যে, প্রাচীন মৈসর, গ্রীক ও রোমীয়েরা তবে কিরূপে দূর দেশে গমন করিয়া স্ব স্ব দেশের ভূ-

যসী উন্নতি বর্ধন করিয়াছিলেন? তত্ত্বের ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তত্ত্ব দেশে যে যে বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইত, তাহারা সেইগুলির পরিপূরণ করিবার জন্যই দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিত। যদ্যপি ভারতের ন্যায় ঐ সকল দেশেও প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন প্রসন্নতা ও মুক্তহস্ততা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে, বোধ করি, তাহারা কোন ক্রমেই বিদেশ পর্য্যটন করিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত অবস্থা অত্যাশঙ্কনীয়; সুতরাং প্রাগ্ভারতীয়েরা স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশীয়দিগের দ্বারা অভাবপূরণের প্রার্থী হইতেন না। ফলকথা, ভারতবর্ষের উন্নতির পথ ভারতবর্ষেই ছিল; তাহা না থাকিলে, প্রাচীন ভারতীয় আর্ষাণ অবশ্যই বহির্বর্ণিজ্যে লিপ্ত হইতেন।

কিন্তু ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি লোক বহির্বর্ণিজ্যে সংবদ্ধ হইয়া পোতারোহণে অপরাপর দেশে গমনাগমন করিতেন। সুমাত্রা, জাভা, বালী প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। জাভাদ্বীপে হিন্দুদিগের কতকগুলি দেব মূর্তি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও বালীদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুবংশীয়গণ বাস করিতেছেন। তাহাদিগের আচর ব্যবহার, রীতি নীতি এবং ধর্মাদি ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বাংশে একরূপ না হউক, অনেকাংশে সমীভূত দেখা যায়। * বোধ

* ক্রক এবং টমসনের বিজ্ঞাপনী।

করি, বহুকাল তথায় অবস্থান করিতে এতাদৃশ বিশৃঙ্খলা ও অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। অতএব তত্ত্ব স্থানে বহির্বর্ণিজ্য বশতঃই অবশ্য হিন্দুবসনাস ঘটিয়া থাকিবে। এক্ষণে একরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পূর্ব্বতন হিন্দুগণ ভারতবর্ষ ব্যতীত কোন কোন দেশে গিয়া বহির্বর্ণিজ্যাবাপারে পরিলিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে আবার মনু প্রভৃতি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে আর্ষাঙ্গতির বিদেশ গমন, তথায় বাণিজ্যাদি করিবার বিধান অথবা শাসন দেখা যায় না। যদিও মনুসংহিতার বাণিজ্যাদ্যাঙ্গের মধ্যে একস্থানে লিখিত আছে যে, অত্যন্ত প্রয়োজন হইলে শূদ্র পরদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতে পারে; কিন্তু তাহারা, বোধ হয়, আর্ষাঙ্গের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বকালীয় আদিম জাতি। সুতরাং তাহাদিগের সহিত তাদৃশ আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা না থাকাতাই মহাত্মা মনু একরূপ আদেশ করিয়া থাকিবেন; নতুবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বিহ্ম সেবক শূদ্র বর্ণের প্রতি একরূপ আদেশ করেন নাই কেন? অথবা আমরাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর পারিয়াছি, অনুসন্ধানের ক্রটি করি নাই, কিন্তু শেষোক্ত বর্ণ চতুষ্টয়ের ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে গমন বা তথায় যাইয়া বাণিজ্য করিবার অনি-কার-বিধি কোন শাস্ত্রেই দেখিতে পাই নাই। যে সকল হিন্দু ভারতবর্ষ ব্যতীত দেশে অর্থাৎ অনার্য্য বা ব্রহ্ম দেশে গিয়া

বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তথায় গমন শাস্ত্র সম্মত নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতা বা নির্বাসন নিবন্ধনই তাহা ঘটয়াছিল । ব্রাতা (পতিও অর্থাৎ উপনয়নাদি দণ্ড সংক্রান্ত বর্জিত) প্রাচীন হিন্দুগণই ভারতবর্ষভূত অনার্য্য দেশে যাইয়া বাস করিতেন । কারণ, সমাজচ্যুত হইয়া প্রতিনেশীদিগের নিকট অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর ও অসহ্য ; তদপেক্ষা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে বসতি করা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর । একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বালিয়াছেন যে, রোমনগরে সর্ব্ব নরুপ হওয়া অপেক্ষা কোন সামান্য গ্রামে সর্ব্বপ্রধান হওয়া সুখের বিষয় । ব্রাতা হিন্দুগণও এইরূপ অভিপ্রায়ে স্বীয় ভ্রমভূমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া জালা, বালী প্রভৃতি অনার্য্য দ্বীপে যাইয়া বাস করিতেন । অধুনা বালী দ্বীপে যে সকল হিন্দু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীন ব্রাতা হিন্দুগণের বংশোদ্ভব । অতএব এতদ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, পুরাকালে যে সকল হিন্দু বিদেশে যাইয়া বাস করিতেন, তাঁহারা পণ্ডিত হইয়া লক্ষ্য ও যুগাবশতঃই দেশত্যাগী হইতেন ;—শাস্ত্রানুসারে বা বহির্বাণিজ্য কারবার জন্য নহে । আবার দেখা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ কোন অলঙ্ঘ্যীয় অপরাধ বা নরহত্যাदि করিতেন, মনু সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যাবজ্জীবনের

জনা নির্বাসিত করা হইত । সুতরাং প্রাচীন আৰ্য্যদিগের বিদেশবাসী হইবার ইচ্ছাও একটি বলবৎ কারণ ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রাচীন হিন্দুদিগের কি সমুদ্রগমনোপযোগী অর্ণবপোত ছিল ? তদ্বত্তরে এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহাদিগের সমুদ্রপোত নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না ; কারণ যে অভিপ্রায় উহা নির্মিত হইয়া থাকে সেই বহির্বাণিজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না । কিন্তু অনার্য্যজাতিরা প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোতে বাণিজ্য করিতে আসিত বালিয়া তাত্কালিক হিন্দুগণ উহার কার্য ও আকারাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ছিলেন । পণ্ডিত হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় কিংবা নির্বাসিত হইয়া সেই সকল অনার্য্যজাতিদিগকে পার হওয়ার মূল্য প্রদান'নস্তর তাঁহাদিগের পোতারে হণে জায়া প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিতেন । অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক সময়ে নবাগত আৰ্য্যদিগের মধ্যে সামাজিক পাপ্পের প্রবলতা একপ্রকার ছিল না বালিয়াই বোধ হয় । কারণ, তখন তাঁহারা প্রচুর আদিমনিবাসিপরিপূরিত ভারতে অনধিক সংখ্যায় আগমন করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন এবং কি কোণে তাহাদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিয়া রত্নভূমি ভারতবর্ষে চিরাদিপত্য সংস্থাপন করিবেন, কেবলমাত্র ইহাই চিন্তা করিতেন । এই

জনাই তৎকালে আৰ্যদিগের মধ্যে সামাজিক পাপের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই । অকল প্রভৃতি পশ্চিমদিগের মতে যেখানে লোক সংখ্যা অধিক নহে, সেখানে পাপের পরিমাণও অতি অল্প । সুতরাং ভারতবর্ষে নবগত আৰ্যদিগের মধ্যে তৎকালে কোন গুরুতর পাপ সংঘটিত হইত না, এবং নিৰ্কাসনের বিধি প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল না । মনু বৈদিক সময়ের অনেক পরবর্তী লোক । তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে আৰ্যদিগের করতলগত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল । সুতরাং তখন আৰ্যমণ্ডলীতে বিবিধ প্রকার সামাজিক পাপের সংখ্যাও হ্রাস ছিল না । এই জন্যই মনুসংহিতায় পাপ বিশেষে প্রায়শ্চিত্ত, অর্থদণ্ড, জীবনদণ্ড এবং নিৰ্কাসনাদির বিবিধ প্রকার অনুশাসন লিখিত হইয়াছিল । মনুর সময়ে যাহারা নিৰ্কাসিত হইত, তাহারা মাস্তাজ প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত । কিন্তু মনুর পরসময় হইতেই, বোধ হয়, অতি প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতিয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করে । সেই সময় হইতেই পতিত বা দণ্ডিত হিন্দুগণ জাবা প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ।

যাহা হউক, আমরা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বজ্রেশ্বরের পুত্র বিজয় সিংহ পোতারোহণে সিংহলে গমন করি-

য়াছিলেন, তিনি ত পতিত হইয়া গমন করেন নাই ? উত্তর, তিনি পতিত হইয়া সিংহলে যান নাই বটে, কিন্তু পিতার সহিত বিনাদ করিয়া দেশতাগী হইয়াছিলেন । সুতরাং বিজয় সিংহের সিংহল যাত্রা শাস্ত্র সম্মত নহে । এতদ্ব্যতীত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মতে সিংহল (Ceylon) বালঙ্গা এবং ভারতবর্ষের যদিও মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান আছে, তথাপি উহা ভারতবর্ষের বহিভূত নহে । ইহা স্বীকার করিলে বিজয়ের সিংহল-যাত্রা দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না ।

প্রাচীন হিন্দুগণ জলপথে যেরূপ বহির্বাণিজ্য করিতে অনার্য্য দেশে গমন করিতেন না, সেইরূপ স্থলপথেও তাঁহাদিগের সেই অভিপ্রায়ে কোন স্বেচ্ছদেশে গমন করিবার বিধি ছিল বলিয়া কোন শাস্ত্রাদিতে প্রমাণ নাই ।—তবে মহাভারতাদিতে এইমাত্র দেখা যায় যে, রাজ্য বিস্তারের জন্য অর্জুন প্রভৃতি শূরগণ হিমালয়ের উত্তর দিকস্থ কোন কোন স্বেচ্ছদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য বিস্তৃতির নিমিত্ত কেহই যান নাই । কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ভূপতিগণ এইরূপে অনার্য্যদেশে পদার্পণ করিলে পতিত হইতেন না কেন ? যাহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই মহাভারতাদি গ্রন্থে তাঁহারা একবার অভিনিবেশ পূর্বক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, রাজাদিগের ঈদৃশ কার্য্যে

পাতিত্যা দোষ ঘটে না এরূপ অনুশাসন উল্লিখিত আছে। সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচ্যাত্ম প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গ্রীসাম্প্রতি সেকন্দর সাহ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি শর্মণাচার্য্য নামক জনৈক হিন্দু তপস্বীকে বল পূর্বক গ্রীসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শর্মণাচার্য্য ব্রাহ্মণ, তিনি জানিতেন যে, ভারতবর্ষ বাতীত অন্য দেশে পদার্পণ করিবার মাত্রই পতিত হইতে হয়। সুতরাং এই আশঙ্কায় তিনি গ্রীসের নিকটবর্তী কোন স্থলে চিতানল প্রজ্বলিত করিয়া জীবন বিসর্জন পূর্বক পাতিত্যা পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মের মতে সিন্ধু নদের পূর্ব পারে স্নান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, কিন্তু উহার পশ্চিম পারে অবগাহনে পুণ্যের মেশনাত্রও নাই, বরং পতিত হইয়া পাপ-প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপ প্রথা যে অতি-প্রাচীন কালহইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। আবার কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, রোমীয় প্রাচীন মহাকবি বার্জিলের ‘ইনগুস’ নামক মহাকাব্যে ভারতবর্ষের ট্রয় প্রভৃতি দেশীয় ভূপতিদিগের নিকট সৈন্যসংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, * ইহাতে

* ডাইডেনরুত বার্জিলের অনুবাদ ; ১৪২ পৃষ্ঠা। টি ডাবিনসন হোয়াইট ফ্রায়ার কর্তৃক ১৮২৪ সনে মুদ্রিত।

কি বোধ করা যাইতে পারে? এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে, যে সময়ে শাস্ত্রানুসারে ভারতবর্ষীয়দিগের অনার্য্য দেশে গমন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে যাহারা অনার্য্য দেশে যাইত, তাহারা নিশ্চয়ই পতিত বা ভারতবর্ষের অন্তর্গত পর্বত-নিবাসী পুলিন্দ,কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতি হইবে। তাহারা ভারতবর্ষের লোক বলিয়া বার্জিল তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিতে পারেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহারা অপতিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাকৃত জাতিচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই প্রকার যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, প্রাচীন ভারতবর্ষবাসী আর্য্যগণ শাস্ত্রমত হইয়া কখনই ভারতবর্ষ বাতীত অনার্য্য দেশে গমন করিতেন না; সুতরাং কি স্থলপথে, কি জলপথে তাহাদিগের অনার্য্য দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবার প্রমাণ প্রদর্শন করা এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র।

যাহা হউক, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তদ্বারা ইহাই মীমাংসিত হইতেছে যে, পুরাতন ভারতীয় আর্য্যগণ বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না; অতএব এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে প্রাচীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিষয় কণক্ষিৎ আলোচনা করা কর্তব্য।

প্রাচীন আর্য্যগণ এতাদৃশ স্বদেশপ্রিয় ছিলেন যে, জন্মভূমিকে স্বর্গাপেক্ষাও গরী-রসী জ্ঞান করিতেন। বাস্তবিক, জন্মভূমি

যে কিরূপ আদর ও মায়ার সামগ্রী, তাহা বলিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য। জম্বুভূমির ক্রোড়শূন্য হইয়া জীবন যাপন করা এক প্রকার মৃত্যু বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য প্রবাসীমাত্রই অবগত আছেন। যদিও অবস্থা এবং কার্যোপলক্ষে অনেককে প্রবাসী হইয়া বাঞ্ছিত জীব্যের আহরণ করিতে হয়, তথাপি স্বদেশে থাকিয়া আবশ্যকীয় জীব্যের সম্পূর্ণ লাভাংশে কষ্ট সহ্য করিয়াও মনের যেমন একপ্রকার অতুল ও অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, বিদেশে তাহা কখনই সম্ভবিত্তে পারে না। বিধাতা যে কি এক স্বর্গীয় পদার্থে জম্বুভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই পদার্থ যে কীদৃশ মূল্যবান তাহা তিনিই জানেন। জম্বুভূমির সহিত মানবজন্মের নিরতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহার জন্য প্রাণ দিতেও কিছুমাত্র কষ্টানুভব হয় না। এই নিমিত্তই প্রাচীন আৰ্য্যগণ জম্বুভূমির এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমান সময়েও সেই আৰ্য্যদিগের উত্তর বংশীয়েরা তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতেছেন। ভবিষ্যতেও তাহাই অবিচলিত থাকিবার সম্ভাবনা। পৃথিবীতে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানকার মানবজাতি জম্বুভূমির জন্য কাতর না হইয়া দূরদেশে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারে। সকল ভাষার কাব্যগ্রন্থে খুলিয়া দেখ, কবিগণ জম্বুভূমির এতদূর মহিমা ও স্নেহ কীর্তন করিয়াছেন। হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ উন্মোচন কর,

জম্বুভূমির স্নেহময়ী সৃষ্টি অঙ্কিত দেখিতে পাইবে। প্রাচীন হিন্দুজাতি গর্ভধারিণী মাতাকে সর্সাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহারই সহিত জম্বুভূমিকে সমাবস্থ করিয়া অকপটচিত্তে “জননী জম্বুভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী” বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জননীর তুলনা জম্বুভূমি এবং জম্বুভূমির তুলনা জননী; সুতরাং তদিতর যাহা কিছু সকলই নিম্নগণ্য।

এক্ষণে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি প্রাচীন আৰ্য্যগণ জম্বুভূমির এতদূর পক্ষপাতী ও অনুরাগী ছিলেন, তবে কি জন্য আবার “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী সুদর্শন কৃষিকর্মণি। তদর্শন রাজসেবায়াং ভিক্ষার্যারৈব নৈবচ ॥” এই কথা বলিতেন। অর্থাগমের সকল প্রকার উপায় অপেক্ষা বাণিজ্যেই প্রকৃষ্টরূপে ধনোপার্জন হইয়া থাকে। এদিকে আবার বাণিজ্যাবলম্বন করিতে গেলে দূর দেশে যাইতে হয়; নচেৎ স্বদেশে থাকিয়া এমন কি ব্যবসায় আছে যে, তদ্বারা আশানুরূপ অর্থ লাভ হইতে পারে? যাহারা এবংবিধ আপত্তি তুলিয়া প্রাচীন আৰ্য্যদিগকে জম্বুভূমির প্রতি ভক্তি ও দৃঢ়তাশূন্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহাদের অভ্রান্ত বিচার বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেননা বাণিজ্য দুই প্রকার—বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য। সুতরাং স্বদেশে থাকিয়া অন্তর্বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই “জননী জম্বুভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী” এবং “বা-

গিজো বসতে লক্ষ্মীঃ” এই উভয় মহামূল্য কবিতাংশেরই সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা শেষোক্তটির অনুগামী হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের প্রতি প্রকৃতিদেবী এতদূর সুপ্রসন্না ছিলেন যে, তদানীন্তন হিন্দুদিগকে সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাণিজ্যের জন্য কোন দূর দেশেই যাইতে হইত না।

আমরা কেবল জন্মগ্রহণের স্থানকেই জন্মভূমি বলিব না। ভৌগোলিক মতের অনুসরণ করিয়া সীমান্ত এক একটি দেশকে এক একটি জাতির জন্মভূমি বলিব এবং ইহাই সাধারণ মত। যেমন লণ্ডন নগরে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহার জন্মভূমি শুদ্ধ লণ্ডন নহে, সমুদর ইংলণ্ড। সেইরূপ কলিকাতা, কাশী, বোম্বাই, লাহোর বা মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে বাহারই জন্ম হউক না কেন, ভৌগোলিক নিয়মে সমুদর ভারতভূমি তাহার জন্মভূমি। তবে বিশেষ এই যে, জম্মাইবার স্থান মুখ্য জন্মভূমি ও সমুদর ভারতবর্ষ গৌণ জন্মভূমি। অতএব প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বদেশে থাকিয়া উল্লিখিত কবিতাধর্মের অর্থ পালনে যে সক্ষমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার উদ্ভিদ, ধাতু, প্রাণি ও শিল্প বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন

দেশই নাই, যাহাকে ভারতবর্ষের সহিত এবিষয়ে সমকক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতভূমির যাহা কিছু আবশ্যকীয়, তাহা এই ভারতেই জন্মিত, কিন্তু ভিন্ন দেশীয়েরা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব দূরীকরণার্থে ভারতে আগমন করিত। প্রাচীন ভারতের সহিত তদানীন্তন পরদেশীয়েরা স্বয়ংই বাণিজ্যমূত্রে বন্ধ হইয়াছিল। তাহার। যে সকল দ্রব্য আনয়ন করিত, প্রাচীন ভারতবাসীরা তত্ত্ববতের বিনিময়ে স্বদেশজাত বস্তু প্রদান করিতেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বা-
তীত আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ বাণিজ্যকে পরদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য বলে। এতদ্বার্তীত প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একপ্রকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল, তাহাকে স্বদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। উহা নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হইত; ভারতের এক সীমার দ্রব্য অপর সীমার নীত হইয়া আবার সেই সীমার আবশ্যকীয় দ্রব্য পূর্ব সীমার আনীত হইত। পুনশ্চ কেবল বিনিময়ে আদান প্রদান না হইয়া প্রয়োজনমতে মূল্য দ্বারাও ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা ছিল।

বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষীয়দের সহিত যেরূপ বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যের বিনিময় করিত, সেইরূপ মূল্য দিয়াও ভারতবর্ষজাত বিবিধ বস্তু ক্রয় করিত। পুরাতত্ত্ববিৎ উই-

লিয়ম রবার্টসন সাহেব বলেন যে, বহু প্রাচীন কালাবধি ভিন্ন দেশীয়েরা স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত মুদ্রাদ্বারা ভারতবর্ষজাত বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করিত। ভারতবর্ষ প্রায় পৃথিবীর সকল দেশের নিকট মূল্য লইয়া ভূরি ভূরি দ্রব্য প্রদান করিয়াছে এবং এখনও করিয়া আসিতেছে; ইহার প্রতি প্রকৃতিদেবীর এতদূর দয়া যে, ইহা ভবিষ্যতেও এইরূপ করিতে থাকিবে। * উক্ত সাহেবের সহিত আমাদেরও মতভেদ হয় না। ভারতবর্ষ প্রাচীন কালে স্বর্ণ রৌপ্য যে পরিমাণে ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, বিদেশীয়েরাই উহা মূল্যস্বরূপ প্রদান করিত এবং তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষীয়েরা বিদেশীয়দের নিকট হইতে দ্রব্যের বিনিময়ে অনঙ্কিত (মুদ্রা নহে) স্বর্ণ রৌপ্যাদিও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতেন। যদিও ভারতবর্ষ অন্যান্য ধাতু বহুল পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে, তথাপি স্বর্ণ রজতাদির ভাগ তাদৃশ দেখা যায় না। † কিন্তু এদিকে আবার ভারতবর্ষের আপাদ মস্তক স্বর্ণ রৌপ্যে মণ্ডিত। তবে ইহা কোথা হইতে আসিতে পারে? উত্তর, পরদেশ-সংশ্লিষ্ট অর্থাবাণিজ্য। কতবার কত কত বিদেশীয় রাজারা আসিয়া ভারতবর্ষের বিপুল ঐশ্বর্য

* রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। পরিশিষ্ট ২০৩ পৃষ্ঠা।

† খাজে আবদুল গনিমিঞা নামক কাশ্মীর দেশীয় একজন প্রধান ব্যক্তির জীবনচরিত। ৪২ পৃষ্ঠা।

হরণ করিয়াছে, তথাপি ইহা অসীম রত্নের আকর। গিজনির মামুদ প্রভৃতির অতীত ইতিহাসগ্রন্থের ব্যক্তিমাত্রেরই অবগত আছেন। ঐ সকল গ্রন্থের সাধ্যতীত ভারতবর্ষ গঠন করিয়াছে, তথাপি ভারতভূমি বিশিষ্টরূপে ধনশালিনী। এতদূশ ধনবস্তুর কারণ উল্লিখিত বাণিজ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিখ্যাত পুরাবত্তা প্লিনি তৎকালিক ভারত ভূমিকে যেরূপ অপূর্ণাঙ্গ অর্থশালী বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্তী পুরাবত্তাদেরও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এবং এক্ষণও তাহাই দেখা যাইতেছে। অতএব এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদেশীয়েরা স্ব স্ব দেশের স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যস্বরূপ দিয়াও ভারতবর্ষের স্বভাবজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিত। কিন্তু ভারতীয়েরা স্বদেশে থাকিয়াই উহা গ্রহণ করিতেন, কদাপি বিদেশে যাইতেন না।

প্রাচীন হিন্দুদিগের পোতাভিযানপ্রণালী যে প্রকার ছিল, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাঁহারা সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করিয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন না। সমুদ্রে যাইতে হইলে অবশ্য সুদীর্ঘ ও তরঙ্গাভিঘাতসহনীয় জলযানের প্রয়োজন; কিন্তু তৎকালিক হিন্দুজাতির তাদৃশ তরণী ছিল না। অধুনা ভারতবর্ষে যে সকল নৌকা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালেও সেইরূপ থাকিবার অধিক সম্ভাবনা। তবে গঠনপ্রণালীর কিছু ইতর বিশেষ ছিল। যদি তৎকালে অর্ণব বিচ-

রণোপযোগী রূহৎ রূহৎ জলযান থাকিত, তাহা হইলে তাহার দুশ্ছেদ্য প্রমাণও পাওয়া যাইত । কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সমুদ্রতীরবর্তী উড়িয়া, সরকার প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আশ্বিন ও কার্তিক মাসে কলিকাতায় যে সকল মূল্যপাইসে, তাহা সাধারণ নৌকা অপেক্ষা অনেক বড় এবং সমুদ্রগমনোপযোগী । বাহারা এই আপত্তি তুলিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের সমুদ্রগমনোপযোগী রূহৎ রূহৎ নৌকার স্থায়িত্ব দেখাইতে যত্ববান, আমরা তাহাদিগের বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারি না । কেন না, মূল্যপাইস যদিও নৌকা অপেক্ষা অনেকাংশে রূহৎ বটে, তথাপি তাহাদিগের আকার প্রকার, যিনি একবার নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি কখনই সে সকলকে দূর-সমুদ্রগামী বলিবেন না । ঐ সকল জলযানযোগে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য নীত এবং আনীত হয়, তাহা কেবল ভারতবর্ষেরই উপকূলে ; সুতরাং ভারতবাসীরা ভারতবর্ষেই থাকেন এবং ভারতের বাণিজ্য ভারতেই সংসাধিত হয় । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এবং বিধ বাণিজ্যকে অন্তর্বাণিজ্য কহে । অতএব নৌকার প্রমাণ লইয়া ভারতীয় বহির্বাণিজ্যসম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্ত করিবার আশাস বিড়ম্বনামাত্র ।

প্রস্তাব বাহুল্য ভরে এক্ষণে আর কিছু না বলিয়া নিরস্ত হইতেছি । উপসংহারকালে আমরা দিগের এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রাচীন

কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না, ইহা শাস্ত্র সম্মত । এবং অন্তর্বাণিজ্য বাণিজ্যে যে নিরস্ত ছিলেন, ইহাও শাস্ত্রের প্রমাণ । প্রাচীন পাশ্চাত্য হিরোদটাস, এরিয়ান, প্লিনি, ডিওডোরস, সিকিউলস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও প্রাচীন হিন্দুদিগের অন্তর্বাণিজ্য ব্যতিরেকে বহির্বাণিজ্যের কোন প্রমাণ দেখা যায় না । যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ঘটয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের স্বাধীন ভারতের মেরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না । সুতরাং সেই এক দিন আর এই এক দিন ! এক্ষণে আমাদের জাতাভিমান, পাতিতাদোষ প্রভৃতিকে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন দিয়া, সেই সমুদ্রগর্ভে হিন্দু বাণিজ্য-পোত ভাসমান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । যে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি একমাত্র বহির্বাণিজ্যমূত্রেই সোণার ভারত করতলগত করিয়াছেন, সেই পরম হিতকর বহির্বাণিজ্যের কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করা আধুনিক ভারতবর্ষবাসী প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য । এবং তৎসঙ্গে মন্দিভূত অন্তর্বাণিজ্যের জীৱন্তি সাধন করাও নিতান্ত উচিত । ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তবাসী পার্সিজাতি যে কেবল এই একমাত্র বহির্বাণিজ্যের প্রভাবেই উন্নত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই । তবে অধুনাতন হিন্দুমাত্রেই কি তাহাদিগের ত্রুতে

তৃতী হওয়া উচিত নহে? অধুনা প্রাচীন জাতিদিগের স্বাধীন অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনাই হইতে পারে না। সুতরাং এখন আর বহির্বানিজ্যে লিপ্ত হওয়া শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া অদূরদর্শিতা দেখান আমাদিগের বিবেচনায় নিতান্ত অযৌক্তিক। আমাদিগের অধুনাতন অবস্থারূপ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম এই, যে হিন্দু জাতি হাজ্রে চড়িয়া বিনেশবানিজ্য করিতে গেলে

পতিত হইবার আশঙ্কা করে, সেই পতিত ও ক্ষমভূমির পরম শত্রু। অতএব হে বিপুল ঐশ্বর্যশালী, মধ্যবিত্ত অথবা দরিদ্র হিন্দুসন্তানগণ! আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বর্তমান অবস্থারূপ ধর্ম শাস্ত্রের আদেশে বহির্বানিজ্যে প্ররত হই। তাহা হইলে আমাদিগের দক্ষভাগ্যের কণামাত্রও কি প্রশংসিত হইবে না?

শ্রীরাঙ্গ—

অশিক্ষিত ইন্দিয়ের ভ্রম ও প্রমাদ।

বাহ্য জগতের সমুদয় বিষয়ই ইন্দিয়-জ্ঞেয়। কিন্তু বাহ্যজ্ঞানসার্থক বাহ্য বস্তু এবং ইন্দিয়চয় থাকিলেই যথেষ্ট হয় না, আত্মজ্ঞানেরও আবশ্যক। শকুন্তলা করতলে কপোল বিশ্বাস করিয়া দুষ্কৃতচিন্তায় গাঁড়ি নিমগ্না ছিলেন, কোপন স্বভাব দুর্ক্সমা তাঁহাকে বারংবার ডাকিলেন, তিনি শুনিতে পাইলেন না। এস্থলে দুর্ক্সমার তারস্বর এবং শকুন্তলার অবগেন্দ্রিয় উভয়েই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু শকুন্তলা এক চিন্তায় এত নিমগ্না যে, অন্য সমস্ত বিষয়ে তিনি আত্মজ্ঞানহীন হইয়াছিলেন, এবং এই আত্মজ্ঞানশূন্য হওয়াতেই তিনি শুনিতে পাইলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের জ্ঞান উপলব্ধি জন্ত তিনটি বিষয়ের আবশ্যক; প্রথমতঃ বাহ্যকারণ, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণবিকসিত ইন্দিয় এবং তৃতী-

য়তঃ আত্মজ্ঞান। ইহার একতমের অভাব হইলেই আমরা বাহ্যজ্ঞান লাভে অশক্তি হই। উল্লিখিত উদাহরণে তৃতীয় কারণের অভাব ছিল; তাহা না হইয়া যদি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় কারণের অভাব হইত অর্থাৎ যদি দুর্ক্সমা না ডাকিতেন কিম্বা শকুন্তলা বধির হইতেন তাহা হইলেও শকুন্তলার আত্মজ্ঞান হইত না। কারণভাবে যেরূপ জ্ঞানভাব, কারণভ্রমেও তদ্রূপ জ্ঞানবিভ্রম হইয়া থাকে।

ইন্দিয়ের অগোচর পদার্থের সম্বন্ধে যে সহসা দৃষ্টকার্যের কারণ বলিয়া মানিয়া লয়, সে যেরূপ কুসংস্কারী বলিয়া আখ্যাত হয়, ইন্দিয়গোচর পদার্থে যে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না, সেও তদ্রূপ অবিশ্বাসী অভিধা প্রাপ্ত হয়। অবিশ্বাসী নামে যুগার কটাক্ষ থাকিলেও ইহা

অক্ষুক্ষুদরে বলা যাইতে পারে যে, অ-
শ্বাসীরা জগতের মহোপকারী। তাহা-
দের অনিশ্বাসেই বাহাজগতের অনেকগুলি
সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই
প্রবন্ধে কতকগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহাজ্ঞানের
জ্ঞান দেখাইব এবং তত্ত্ব কারণ নি-
র্দেশ করিতেও সচেষ্ট হইব। পাঠক দে-
খিতে পাইবেন যে, বিনা পরীক্ষায় অ-
নেক সময়ে যাহা তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ নিশ্চিত
জ্ঞান মনে করিতেন তাহা কিরূপ ভ্রম-
সঙ্কুল, এবং অশিক্ষিত ইন্দ্রিয় কত সহজে
ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়।

ইন্দ্রিয়মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই সর্বপ্রধান
এবং চাক্ষুষজ্ঞানের উপর সকলেরই অ-
ত্যন্ত বিশ্বাস। কিন্তু পদার্থের কি
কি গুণ দর্শনেন্দ্রিয়লব্ধ তদ্বিবয়ে পতিত-
দিগের ঘোর মতবৈধ রহিয়াছে। এক
পক্ষ কহেন পদার্থের কেবল বর্ণ এবং
প্রভাই দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অপরেরা
তদতিরিক্ত আকার ও পরিমাণ, এবং আ-
কার ও পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে দূরতাও চ-
ক্ষুর্গোচর বলিয়া নির্দেশ করেন। উভয়
পক্ষই কৃতী এবং বলী, এবং উভয় পক্ষেই
প্রতিপত্তি। বহুসংখ্যক দার্শনিকের নাম
দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের কূটতর্কজ্ঞান বি-
লোড়ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।
সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে
যে, প্রাথমিক * চক্ষুঃ কেবল বর্ণ এবং

প্রভা জানিতে পারিলেও অভিজ্ঞ চক্ষুঃ ত-
দতিরিক্ত পরিমাণ, আকার এবং দূরতাও
বুঝিতে পারে। কিন্তু এই পক্ষগুণ মধ্যে
এমন একটিও নাই যে, তৎসম্বন্ধে অশিক্ষিত
চক্ষুঃ মধ্যে মধ্যে ভ্রমে পতিত না হয়। উ-
দাহরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের উদা-
হরণ। যদি একখানি তাসের এক পৃষ্ঠা
গাঢ় উজ্জ্বল লোহিত এবং অপর পৃষ্ঠা গাঢ়
উজ্জ্বল হরিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া নাসি-
কার উপর একপভাবে ধারণ করা যায় যে,
এক চক্ষুঃ লোহিত পৃষ্ঠা এবং অন্যতর চক্ষুঃ
হরিত পৃষ্ঠা দেখিতে পায় এবং কিয়ৎকাল
এইভাবে রাখিয়া যদি সহসা উক্ত তাসের
পরিবর্তে উভয় পৃষ্ঠাই শ্বেত একরূপ আর
একখানি তাস ধারণ করা যায়, তাহা হ-
ইলে পূর্বে যে দিকে লোহিত ছিল শ্বেত
তাসের সেইদিক হরিত এবং পূর্বে যেদিকে
হরিত ছিল শ্বেত তাসের সেই দিক লো-
হিতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। বজ্রের ঘোরঘর্ষ-
নিবাদ কিয়ৎকাল শ্রবণ করিলে যেরূপ
তৎপর মুহূর্তে ঘটিকাযন্ত্রের টিক্ টিক্ শব্দ
কণে অনুভূত হয় না, গাঢ় লোহিত কির-
্কর চিহ্নডল তাহাকে আরোগ্য করেন।
প্রথমে সে পদার্থের বর্ণ ও প্রভা বাতীত
কিছুই বুঝিতে পারিত না; সমুদয় পদা-
র্থই তাহার চক্ষে আসিয়া লাগিতেছে
এইরূপ মনে করিত এবং স্পর্শ না করিয়া
কোন পদার্থের আকার কিম্বা পরিমাণ
বুঝিতে সক্ষম হইত না।

* এক ব্যক্তি আজ্ঞা নেত্রময় (ছান্দ) রোগগ্রস্ত ছিল। সে বরষ হইলে ডা-

একাল দেখিলে চক্ষুঃ শ্বেত আলোকের লোহিতভাগ * সেইরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শ্বেত আলোকের লোহিত ভাগ অনুভূত না হইলে অবশিষ্ট ষষ্ঠ বর্ণের সমবায় হরিত দৃষ্ট হয়। আবার অপর পৃষ্ঠায় পূর্বে গাঢ় উজ্জ্বল হরিত ছিল, তজ্জন্য শ্বেত আলোকের হরিত ভাগ অন্যতর চক্ষে অনুভূত হয় না, অবশিষ্ট ষষ্ঠ বর্ণের সমবায় লোহিত দৃষ্ট হয়।

রক্তসন্ধাকালে দুইখানি লোহিত মেঘের মধ্যস্থান হরিবর্ণ দেখায়। বাস্তব-

* শ্বেত আলোক সপ্তবর্ণের সমবয়ে উপন্ন ; যথা—লোহিত, নারঙ্গ (পাটল), পীত, হরিত, নীল, বেগুনী এবং বায়লেট। জলকণার স্ফেরের শ্বেত আলোক বিল্লিষ্ট হইয়া রামধনু উপন্ন হয় এবং উহাতে এই সপ্তবর্ণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে লোহিত, হরিত এবং বায়লেটে এই তিনটি মূলবর্ণ। পূর্বে লোহিত, নীল, ও পীত এই তিনটি মূলবর্ণরূপে গৃহীত হইত, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সহকারে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নারঙ্গ, পীত, নীল এবং বেগুনী মূল বর্ণ নহে ; উহারা মিশ্রবর্ণ। নারঙ্গ বর্ণ গাঢ় লোহিত এবং ঈষৎ হরিতযোগে ; পীত-বর্ণ গাঢ় লোহিত এবং গাঢ় হরিত-যোগে ; নীলবর্ণ, গাঢ় হরিত এবং গাঢ় বায়লেটযোগে ; এবং বেগুনীবর্ণ ঈষৎ হরিত এবং গাঢ় বায়লেটযোগে উপন্ন হয়।

বিক উহা নীল আকাশমাত্র। উভয় পার্শ্বে লোহিত মেঘ থাকিতে হরিদাভ অনুভূত হয়। বালমূর্খ্য কিয়ৎকণ স্থিরমননে নিরীক্ষণ করিয়া যদি নরন মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে কএক মুহূর্ত্ত পর্যন্ত একটি নীলমূর্খ্য অনুভূত হইয়া থাকে। নাল কালি দ্বারা কএক পৃষ্ঠা লিখিয়া যদি কাল কালি দ্বারা লিখিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে উহা ঈষৎ নীলবর্ণ দেখায়। লাল যবনিকার ছায়া শ্বেত প্রাচীরে পতিত হইলে উহা রক্তিমাত দৃষ্ট হয়, কারণ যবনিকা সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ নহে, আলোক কিয়ৎ পরিমাণে উহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। যদি যবনিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে তাহা হইলে ছায়ায় ঐ স্থান ঐ নীল ঈষৎ নীল বোধ হইবে। উদাহরণ আরও অনেক সংগৃহীত করা যায়, কিন্তু যে কএকটি উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাতেই পাঠক বর্ণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রম সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। রাত্রিকালে যদি সহসা প্রদীপ নিরূপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় গৃহ ঘোর তমসাস্কর। গবাক্ষ এবং কবাট দ্বারা যে আলোক গৃহে প্রবিষ্ট হয় তাহাতে গৃহস্থিত কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না ; কিন্তু কিয়ৎপরে পাশ্চাত্ত্য পদার্থ সমূহ ক্রমে ক্রমে দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুর এক অবস্থায় যে স্থান ঘোর তমসাস্কর ব-

লিয়া অনুমিত হয় এবং যৎস্থানীয় পদার্থ সমূহ দৃষ্টি গোচর হয় না, চক্ষুর অবস্থান্তরে তৎস্থানীয় পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয় এবং গৃহও তত অন্ধকার বোধ হয় না । ইহা-কেই, আমরা প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রম বলিতেছি । এইক্ষণে ইহার কারণ নির্দেশ করিব । চক্ষুর যে ভাগকে তারা কিম্বা কনীনিকা কহে ; তন্মধ্য দিয়াই আলোক প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টি কার্য সম্পাদন করে । উহা তারকামণ্ডল, কিম্বা কনীনিকা পরিধি দ্বারা পরিবেষ্টিত । এই তারকা মণ্ডল ক-একটি পেশীর সহিত সংলগ্ন এবং তাহা-দিগের সাহায্যে উহা আকৃষ্ট কিম্বা বিক্ষারিত করিয়া আলোক প্রবেশ দ্বার ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ করা যায় । যখন গৃহে প্রদীপ থাকে তখন তারকা মণ্ডল এরূপ কুঞ্চিত হয়, যে দর্শনোপযোগী আলোক মাত্র চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে । প্রদীপ নিৰ্জ্বালিত হইলে কবাট-গবাক্ষাগত ক্ষীণ আলোক মাত্র থাকে ; কুঞ্চিত-দ্বার-প্রবিষ্ট সেই ক্ষীণ আলোক দৃষ্টি কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না । এই-জন্য তারকা মণ্ডল বিক্ষারিত করিয়া আ-লোক প্রবেশ দ্বার বৃহত্তর করিতে হয় । বিক্ষারিত করিতে সেকতিপন্ন মুহূর্ত অতি-বাহিত হয় । সেই অতাপ্পকাল গৃহ ঘোর তমসাপ্পন্ন বোধ হয় এবং বিক্ষারিত হইলে ক্রমে দৃষ্টিজ্ঞান জন্মিতে থাকে । এইক্ষণে পুনরায় যদি গৃহে প্রদীপ আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে বিক্ষারিত-দ্বার-প্রবিষ্ট

আলোক চক্ষুর অসহ্য হয় এবং চক্ষুঃ-স্বতঃই মুদিত হইয়া আলোক-প্রবেশ দ্বার কুঞ্চিত হইলে পুনরায় উন্মীলিত হয় । সূ-র্যের প্রথর আলোক হইতে অম্পা-লোক গৃহে প্রবেশ করিলে কিম্বা অম্পা-লোক-গৃহ হইতে সূর্যের প্রথর আলোকে-বহির্গত হইলেও এইরূপ প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রম জন্মিয়া থাকে ।

তৃতীয়তঃ । পরিমাণ বিষয়ক দৃষ্টিবি-ভ্রমের উদাহরণ * । মধ্যাহ্নের সূর্য্য অপেক্ষা প্রভাতের এবং সায়ং কালের সূর্য্য বৃহত্তর বোধ হয়, এবং পৌর্ণমাসী নিশিতে উদয়শীল এবং অস্তোন্মুখ চন্দ্রও মধ্যগগনের চন্দ্র হইতে বৃহত্তর অনু-ভূত হইয়া থাকে । কিন্তু মানবজ্ঞ দ্বারা মাপিলে সকল সময়েই সূর্য্যের কিম্বা চ-ন্দ্রের একই ব্যাস দৃষ্ট হয় । এখানে চক্ষুঃ-চক্ষুর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । বিনা যন্ত্রে চক্ষুঃ যাহাকে বৃহত্তর বলিতে-ছিল, যন্ত্র সাহায্যে সেই চক্ষুঃই তাহাকে সমান বলিয়া স্বীকার করিল । **শুদ্ধ-চক্ষুঃ** অপেক্ষা মানবজ্ঞ এবং চক্ষুঃ অধিকতর বিশ্বাস্য সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রভাতে এবং সায়ংহে সূর্য্য এরূপ বৃহত্তর দেখায় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকবর্গের ক্ষুদ্র প্রাণী-হইবে কি না বলিতে পারি না । কিন্তু

* এই উদাহরণটি মানসিক বিভ্রম মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণ নাম-করণ অনুসারে আমরা ইহাকে দৃষ্টি-বিভ্রম বলিয়াই উল্লেখ করিলাম ।

এমাবৎ পণ্ডিতেরা ইহার এক মাত্র উত্তরই দিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই প্রকটিত হইতেছে। অন্যান্য পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াই আমরা পদার্থের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া থাকি। যদি দুইটা রূক্ষ সমান উচ্চ বোধ হয় তাহা হইলে যেটা অপেক্ষাকৃত আমাদিগের নিকটস্থ তাহা হইতে যেটা অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত সেইটা যে উচ্চতর ইহা আমরা স্বতই নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমরা মনে মনে যে যুক্তি পরস্পরা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা বুঝিতে পারি না। এক্ষণে সূর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে উদয়শীল কিম্বা অস্তমুখ সূর্য্য অবলোকন করিবার সময়ে সূর্য্য এবং চক্ষুর মধ্যে নানা পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া আমরা সূর্য্যের পরিমাণ অনুভব করি, কিন্তু মধ্যাহ্নে সূর্য্য এবং চক্ষুর মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না। তুলনা করিবার পদার্থের এই অভাবেই মধ্যাহ্নতপন ক্ষুদ্রতর অনুভূত হয়। যাহারা দার্শনিকদিগের সূক্ষ্ম তর্কে অনভ্যস্ত তাহাদিগের এই ব্যাখ্যাটি হৃদয়গ্রাহী হইবে না; কিন্তু তাহারা মনে রাখিবেন যে প্রাতঃ সূর্য্যমধ্যাহ্ন-সূর্য্য অপেক্ষা রূহতর না হইয়াও রূহতর দেখায় এবং পণ্ডিতেরাও তাহার এই একমাত্র ব্যাখ্যাই দিয়া আসিতেছেন।

চক্ষুঃ দ্বারা সংখ্যাজ্ঞানও জন্মে।

সংখ্যাজ্ঞান ও পরিমাণজ্ঞান উভয়ই একবিধ, অতএব পরিমাণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রম শেব করিবার পূর্বে আমরা সংখ্যাসম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের একটি উদাহরণ প্রদান করিব। উদাহরণটি অতিবিশ্ময়কর। নির্মল নৈশ নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিষ্কোপ করিলে বোধ হয় যেন অসংখ্য তারকা উদিত হইয়াছে। বাস্তবিক যে সমস্ত তারকা আমরা দেখিতে পাই তাহা অসংখ্যও নহে, অধিক সংখ্যকও নহে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অনিয়মে ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতোই এরূপ অধিক সংখ্যক বলিয়া বোধ হয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণ করিলে তারকাসমূহ যে যথার্থই অসংখ্য তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শুদ্ধ চক্ষে যে তারাগুলি দৃষ্ট হয় তাহার সংখ্যা অনধিক পঞ্চ সহস্র। আমরা নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাই বলিয়া মার্কি দ্বিসহস্রের অধিক নক্ষত্র কখনও দৃষ্ট হয় না; তথাপি বিশৃঙ্খল ভাবে ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত থাকাতো অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে বিনা যে সমস্ত তারা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়াছেন। আকার এবং উজ্জ্বলতা ভেদে উহা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

১ম শ্রেণীর—২০

২য় শ্রেণীর—৬৫

৩য় শ্রেণীর—২০০

৪র্থ শ্রেণীর—৪০০

৫ ম শ্রেণীর—১১০০

৬ ঠ শ্রেণীর—৩২০০

৪২৮১

এই তালিকাতে দৃষ্ট হইবে যে সমস্ত নভোমণ্ডলে চক্ষুর বিষয়ীভূত পক্ষ সহস্রের অধিক নক্ষত্র নাই; তাহারও অর্ধেক অর্থাৎ সার্কি দ্বিনছত্র মাত্র একবারে দেখা যাইতে পারে।

চতুর্পদঃ, আকার সম্বন্ধে দৃষ্টি বিজ্ঞ-
মের উদাহরণ। চক্ষুঃ $\frac{2}{8}$ অণুপল ($\frac{1}{50}$ সে-
কেণ্ড) পর্যন্ত দৃষ্ট পদার্থের সংস্কার রক্ষা
করে অর্থাৎ পদার্থ অপসারিত হইলেও $\frac{1}{8}$
অণুপল পর্যন্ত উহা অনুভূত হইতে থাকে।
বহুমুখ একটি শলাকা বেগে ঘূর্ণিত ক-
রিলে একটি বহুচক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।
ইহা সকলেই দেখিয়াছেন এবং সকলেই
জানেন যে চক্রের সমুদয় স্থানে বহু নাই,
বেগে ঘূর্ণিত হওয়াতে এরূপ দেখায়; মৃদু
ঘূর্ণনে এরূপ দেখায় না। কত বেগে ঘূ-
র্ণিত হইলে এরূপ দেখা যাইবে তাহা উ-
পরোক্তসূত্রানুসারে সহজেই গণনা করা
যাইতে পারে। অভিন্ন চক্র দৃষ্ট হইবার
জন্য শলাকা প্রতি অণুপলে চারিবার (অ-
র্থাৎ প্রতিসেকেন্ডে দশবার) ঘূর্ণিত হওয়া
আবশ্যক; বেগ অধিক হইলে হানি নাই,
অল্প হইলে চক্র অভিন্ন হইবে না। এই
সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার
খেলনা প্রস্তুত হইয়াছে। উহার একটির

রূপান্তর আমরা প্রকটিত করিতেছি। ইহাকে
নর্তকচিত্র (Waltzing Figure) কহে।
চক্রের প্রশস্ত পরিধিতে একটি মনুষ্য
কিন্তু একটি বানর নানাবিধে চিত্রিত
থাকে। চক্র বেগে ঘুরাইলে বোধ হয় মনুষ্য
কিন্তু বানরটি নাচিতেছে। এক ভাবের
চিত্র নয়ন হইতে অপসারিত হইবার
সেকেন্ডের মধ্যেই যদি তৎপরবর্তী চিত্রটি
নয়ন গোচর হয়, তাহা হইলে সর্বদাই দৃ-
ষ্টিজ্ঞান হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ভিন্ন
ভিন্ন ভাবে চিত্রিত থাকিতে বোধ হয় যেন
একটি চিত্রই আমরা দেখিতেছি এবং উহা
নাচিতেছে।

প্রতিভয় কিরণমালাও আকার স-
ম্বন্ধে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। কিরণমালা
(প্রায়শই) সরল রেখায় গমন করে। ইহা
অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। একখান
তাসে একটি ছিদ্র করিয়া যদি বাহ্য বস্তু
এবং চক্ষুর মধ্যে ধারণ করা যায়, তাহা
হইলে ছিদ্র, চক্ষুঃ এবং বাহ্যবস্তু এক
সরল রেখায় না হইলে বাহ্যবস্তু দৃষ্ট হইবে
না। অর্থাৎ বাহ্যবস্তু হইতে আগত কিরণ-
মালা সরল রেখায় আসিতে থাকে এবং
ছিদ্র যদি ঐ সরলরেখায় স্থাপিত হয় তাহা
হইলেই কিরণমালা ছিদ্র মধ্য দিয়া আ-
সিতে পারে এবং দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে। তা-
সের ছিদ্র অন্য কোন ভাবে স্থাপিত হ-
ইলে কিরণমালার সরলগতি বন্ধ হয় এবং
দৃষ্টি জ্ঞান হয় না। কিন্তু কিরণমালা যে
সরল রেখায় গমন করে উহা কেবল এক-

বিধ পদার্থে। অর্থাৎ শুষ্ক জলে কিম্বা শুষ্ক কাঁচে, কিম্বা সমঘন বায়ুতে কিরণ-মালা সর্বদাই সরল রেখায় গমন করে। পক্ষান্তরে একবিধ পদার্থ হইতে অন্য বিধ পদার্থে, কিম্বা লঘু বায়ু হইতে ঘন বায়ুতে যাইতে কিরণমালা বক্র হইয়া অন্য সরল রেখায় গমন করে। ইহাকেই প্রতিভম্ব কিরণমালা কহে।

জলে প্রবিষ্ট হস্ত কিম্বা বস্তু কিরূপ বিকৃত দৃষ্ট হয়, তাহা সকলেই জানেন। জল হইতে বায়ুতে আসিতে কিরণমালা নিম্ন দিকে প্রতিভম্ব হয়, এই জন্য দৃষ্ট পদার্থের আকার বিকৃত বোধ হয় এবং স্বাভাবিক স্থান হইতে উচ্চতর স্থানে আছে বলিয়া অনুভূত হয়। শেষোক্ত বিষয়ের একটি সুন্দর এবং অতি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একটি পাত্রে একটি মুদ্রা রাখিয়া একপ স্থানে বসিতে হয় যে আর মুদ্রাটি দেখা যায় না, একটু নিকটে আসিলেই দেখা যাইত। একপ স্থানে বসিয়া যদি পাত্রটি জলপূর্ণ করা যায় তাহা হইলে মুদ্রাটি দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ কিরণমালা জল হইতে বায়ুতে আসিতে প্রতিভম্ব হইয়া নয়নে পতিত হয় এবং এই জন্য মুদ্রাটি স্বাভাবিক স্থান হইতে উচ্চতর স্থানে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। অতিপ্রাণে এবং অতি সায়াহে যে আমরা সূর্য দেখিতে পাই এবং তৎপ্রতি অক্ষুব্ধনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে পারি তাহারও কারণ এই। তখন সূর্য্য বস্তুবিক অন্তর্গত থাকে; প্রতিভম্ব কিরণ

মালায় গঠিত সূর্য্যের বিশ্ব মাত্র আমরা দেখিতে পাই। বায়ু স্তরে স্তরে ঘনতর অর্থাৎ উপরিস্থিত বায়ু হইতে নিম্ন স্থানের বায়ু ঘনতর এবং নিম্নতর স্থানের বায়ু তদপেক্ষা ঘনতর। বায়ুর স্তরে স্তরে প্রতিভম্ব হওয়াতে সূর্য্যের কিরণমালায় গতি ক্রমশঃ নিম্নদিকে হইতে থাকে। এইজন্য বোম্বাই সাহায্যে উল্কে না উঠিলে আমরা যে সূর্য্য দেখিতে পাইতাম না, ভূমিতে থাকিয়াই তাহা দেখিতে পাই এবং অস্প-সংখ্যক কিরণমালা প্রতিভম্ব হইয়া নয়নে পতিত হয় বলিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

পঞ্চমতঃ। দূরতা এবং স্থান সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। পরিমাণ সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে, অনেক সময়ে দূরতা তুলনা করিয়া আমরা পরিমাণ জ্ঞান লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের পরিমাণ তুলনা করিয়া অনেক সময়ে দূরতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যদি একখানি চিত্র পটে দুইটি পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে যেটি ক্ষুদ্রতর সেটি আমাদের হইতে দূরতর স্থানে রহিয়াছে, আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করি। মায়া প্রদীপ (magic lantern) অথবা কিম্বা পশ্চাতে সরাইলে পটনিক্ষিপ্ত বিশ্ব ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ হইয়া থাকে এবং পটস্থ পদার্থ কিম্বা প্রাণী সমূহ অগ্রসর হইতেছে কিম্বা পশ্চাৎগমন করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে ভ্রম জন্মে।

প্রতিভা কিরণমালা যেরূপ পদার্থ সমূহকে বিকৃত দেখায় সেইরূপ তাহাদের দূরতা এবং স্থান সম্বন্ধে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে । মরীচিকা বা মৃগতৃক্ষিকা ইহার সুন্দর উদাহরণ । বায়ু উষ্ণ ভূভাগের সহিত সংলগ্ন হইলে তাপ-সাম্য হেতু উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ হইলেই লঘু হয় । মক্কুমি অত্যন্ত উষ্ণ এইজন্য মক্কুমি বায়ু অত্যন্ত লঘু । উপরিস্থিত বায়ু তদপেক্ষা গুরুতর । এই লঘু এবং গুরু বায়ুর স্তরে স্তরে কিরণমালা প্রতিভা হওয়াতেই এক স্থানের পদার্থ অন্য স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অনভিজ্ঞ পথিক নির্দাক্ষণ ভ্রমে পতিত হয় ।

দৃষ্টিবিভ্রমের পঞ্চ প্রকারেরই নানা উদাহরণ দেওয়া হইল । বাহুল্য ভয়ে এবিষয়ের আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াই আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিব । “ কাটামুণ্ড কথা কর ” ইহা অনেকে দেখিয়াছেন । লেখকের একজন বন্ধু একবার কাটামুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলেন । দেখা গেল যে একটি টেবলের মধ্যস্থানে একটা মাথা কথা কহিতেছে । গুলি পর্যন্ত টেবলের উপরে; টেবলের নীচে দৃষ্টি করিলে বোধ হইল যে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু মুণ্ডের শরীর দৃষ্ট হইল না । কিয়ৎকাল সাবধানে দর্শন করিলে বুঝা গেল যে, টেবলের নীচে দুইখানি দর্পণ তির্ধ্যাংভাবে এমন সুন্দররূপে স্থাপিত যে

দর্পণ আছে বলিয়া শীঘ্র বোধ হয় না । তির্ধ্যাংভাবে স্থাপিত হওয়াতে সম্মুখস্থ পদার্থসমূহ প্রতিফলিত না হইয়া, দর্পণ দুইখানিতে পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহ এরূপ প্রতিফলিত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ বোধ হয় টেবলের নীচে দিয়া অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছে ; এই দর্পণদ্বয়ের অন্তরালে কাটামুণ্ডের শরীর লুক্কায়িত । দর্পণ দুইখানি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত স্থাপিত তাহা বলা বাহুল্য । হয় ত অনেক পাঠক, যাহারা “ কাটামুণ্ড ” দেখেন নাই, তাহারা মনে মনে বলিতেছেন “ এত টুকু বুদ্ধিও কি দর্শকদিগের নাই যে এইটা বুঝিতে পারে ” । তাহাদিগকে আমরা দুর্ঘোষনের কথা স্মরণ করিতে বলি । দুর্ঘোষন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দর্পণ বুঝিতে না পারিয়া কিরূপ লজ্জায় পতিত হইয়াছিলেন তাহা একবার মনে করুন । আরও বলি কলম্বাসের সঙ্গীরা কেহ ডিম বসাইতে পারিল না, কিন্তু তিনি বসাইয়া দিলে সকলেই বলিতে লাগিল যে ঐরূপে তাহারাও পারিত । কলিকাতায় যে সকল বিদেশীয় ঐন্দ্রজালিকেরা প্রতি বৎসর আগমন করে, তাহাদের অনেক কোশলই দৃষ্টিবিভ্রমেরই উপর নির্ভর করে ।

পাঠক এযাবৎ দর্শনেন্দ্রিয়ার নানাবিধ ভ্রমপ্রমাদ দেখিলেন । এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ও মধ্য মধ্য ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে । জ্ঞানলাভ সময়ে যদি ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে বাহ্যবিষয়ে ভ্রম হয় । নাসিকা কন্ধ করিয়া যদি দাকচিনি চর্ষণ করা যায় তাহা হইলে সাধারণ দেবদারু কাষ্ঠ চর্ষণ করা যাইতেছে বোধ হইবে । কেবল দাকচিনি সম্বন্ধেই যে এইরূপ তাহা নহে ; নাসিকা কন্ধ করিলে অনেক পদার্থেরই স্বাদ পাওয়া যায় না । এই জন্য শিশুদিগকে অপ্রিয় ঔষধাদি খাওয়াইতে নাসিকা কন্ধ করিয়া লওয়া উচিত । ভিন্ন কিম্বা বিপরীত স্বাদের দুইটি পদার্থ যদি উপযুক্তপরিমাণে আশ্বাদন করা যায়, তাহা হইলে কিয়ৎকালপরেই দুইটিই একরূপ বোধ হইবে, উহাদিগের পার্থক্য অনুভব হইবে না । যদি চক্ষুঃ বন্ধ করিয়া তক্রু এবং ক্রেটেট সুরা উপযুক্তপরিমাণে আশ্বাদন করা যায় তাহা হইলে কএক বারের পরে উভয়ই একবিধ বোধ হইবে, আশ্বাদের কোন পার্থক্য অনুভূত হইবে না ।

ইন্দ্রিয় মধ্যে নাসিকা সর্বাপেক্ষা ~~সর্বাপেক্ষা~~ অস্পর্শ্যমাত্র । অস্পর্শ্যমাত্রই নাসিকা স্ব-কার্য সাধনে অক্ষম হইয়া পড়ে । সর্বদা তীব্রবর্ণের নানাবিধ পদার্থ দর্শন করিয়াও নরন কার্যকুশল থাকিয়া যায়, কিন্তু অতাপ্পসন্ন মাত্র উগ্র গন্ধ অনুভব করিলে নাসিকা আর কোন গন্ধের উপলব্ধি করিতে পারে না । মৃদুমিষ্ট গন্ধও অল্প সময়মাত্র উপভুক্ত হইতে পারে । গোলাপ জল ও আতর প্রস্তুত করিবার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্রসমূহে গোলাপ

রক্ষরাজি রোপিত হয় । যাহারা এই গোলাপক্ষেত্রে বাস করে তাহারা উহার আমোদসহরী উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না । যাহারা সর্বদা স্নানক্রিয়ার ব্যবহার করে, তাহাদের ব্যবহারই সার ; ভোগ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের হয় ।

নয়ন দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিকতম জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু স্পর্শেই উহা অপেক্ষাও বিশ্বাস্য । পাশ্চাত্য ভূতের * আবির্ভাব হইল ; লোকে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিল না । ক্রুক সাহেব মহা বৈজ্ঞানিক । তিনি সংকল্প করিলেন স্পর্শ করিতে না পারিলে বিশ্বাস করিবেন না । ভূতেরা তাহাতেই স্বীকার । ক্রুক সাহেবকে তাহাদের শরীর স্পর্শ করিতে দিল । তদবধি ক্রুক সাহেব ভূতবিশ্বাসী । এইরূপে দেখা যাইবে যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ পাইলেও যে বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, স্পর্শেই উহা প্রমাণ সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় । কিন্তু স্পর্শেই উহা প্রমাণও ভ্রমশূন্য নহে । বিশেষতঃ

* পাশ্চাত্য সকল বিষয়ই যে সমগ্রগৌরব প্রাপ্ত বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইহা একটা আধুনিক স্বতঃসিদ্ধ । অতএব (Spirit) কে ভূত বলাতে অনেক চটিতে পারেন । যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ভূতে বিশ্বাস করা না করা সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছি না । সময়ান্তরে এ বিষয়ে আমাদের মত প্রকটিত কবিবার ইচ্ছা রহিল ।

উহা প্রাশস্তি অবহিত জ্ঞানোৎপাদনে অক্ষম । দুইটি পদার্থ হস্ত দ্বারা পরিমাণ করিলে অনেক সময়ে কোনটি উষ্ণতর তাহা বুঝা যায় বটে কিন্তু একটি অপরিষ্কৃত গুণ ভারী তাহা নির্দেশ করা যায় না, এবং প্রায় সমভারী হইলে কোনটি উষ্ণতর তাহা নির্দেশ করা কঠিন । তাপ বিষয়েও এইরূপ । দুইটি পদার্থের কোনটি উষ্ণতর তাহা কখন কখন নির্দেশ করা যায় বটে কিন্তু একটির তাপ অপরিষ্কৃত তাপের কত গুণ তাহা নির্দেশ করা যায় না এবং প্রায় সমতাপ দুইটি পদার্থের কোনটি উষ্ণতর তাহা নির্দেশ করা কঠিন । এমন কি তাপ বিষয়ে অনেক সময়ে স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণ অতীব ভ্রমজনক । শরীরের তাপ সর্বদেশে এবং সর্বস্থানেই শতকীর বিভাগের ৩৬ ডিগ্রি । যদি বস্ত্র, কাষ্ঠ এবং প্রস্তর এই তিনটি পদার্থ শরীর অপেক্ষা হিমতর হয় এবং যদি তাহাদের তাপ সমান হয়, তাহা হইলে বস্ত্র অপেক্ষা কাষ্ঠ এবং এতদধিক কাষ্ঠ অপেক্ষা প্রস্তর হিমতর বোধ হইবে । এই জন্য শীতকালে কাষ্ঠ এবং প্রস্তর বস্ত্র অপেক্ষা হিমতর বোধ হয় । আবার বিছানার চাদর কিম্বা সাদা পিঙ্গল, লেপ কিম্বা ফ্লানেল অপেক্ষা হিমতর বোধ হয় । ইহার কারণ এই যে, বস্ত্র ফ্লানেল কিম্বা তুল। অপেক্ষা অধিকতর তাপপরিচালক, তদপেক্ষা কাষ্ঠ এবং তদপেক্ষা প্রস্তর । শরীরের তাপ যে পদার্থ যত পরিমাণে চালন করে

তাহা তত শীতল অনুভূত হয় । আবার দ্রৌমস্থিত তপ্ত বস্ত্র, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের মধ্যে প্রস্তর উষ্ণতম বোধ হয় । কারণ উহা শীতল হইলে যত্রপ সর্বাপেক্ষা অধিকতম তাপ শরীর হইতে গ্রহণ করে, উষ্ণ হইলে তত্রপ সর্বাপেক্ষা অধিকতম তাপ শরীরে প্রদান করে ; কাষ্ঠ প্রস্তর অপেক্ষা অল্পতর তাপ প্রদান করে বটে, কিন্তু বস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর তাপ প্রদান করে, এই জন্য বস্ত্র অপেক্ষা উষ্ণতর এবং প্রস্তর অপেক্ষা হিমতর অনুভূত হয় । গ্রীষ্মকালে যদি বায়ু শরীর অপেক্ষা হিমতর থাকে, তাহা হইলে পাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিলে শীতলতা অনুভূত হয় । গাত্রস্পৃষ্ট বায়ু তাপসাম্য হেতু গাত্র হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া গাত্রের সমান উষ্ণ হইতে চায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ নবীকৃত হইলে তত উষ্ণ হইতে পারে না, সুতরাং শীতল বোধ হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে যদি বায়ু শরীর অপেক্ষা উষ্ণতর হয়, তাহা হইলে পাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিলে পুনঃ পুনঃ উষ্ণতর বায়ু গাত্রসংলগ্ন হওয়াতে গ্রীষ্মাধিক্য হইয়া থাকে । স্পর্শেন্দ্রিয় মধ্যে মধ্যে সংখ্যাজ্ঞান সম্বন্ধেও ভ্রম জন্মাইয়া থাকে । তর্জনী অঙ্গুলির উপরে মধ্যমা অঙ্গুলি তুলিয়া, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া যদি ঐ দুই অঙ্গুলি দ্বারা একটী মটর কিংবা তত্রপ কোন একটী ক্ষুদ্র পদার্থ স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে যে দুইটি পদার্থ রহিয়াছে ।

ইন্দ্রিয় স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থার না থাকিলে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । চক্ষুর নীচে বল পূর্বক অঙ্গুলি বসাইলে সকল দৃষ্ট পদার্থই যে দুইটি দুইটি বোধ হয়, তাহাও এইরূপ ইন্দ্রিয়ের স্বস্থানচ্যুততার জন্য ঘটিয়া থাকে ।

আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কএকটি ভ্রম দেখাইয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব । রাজিতে দ্বিতলগৃহবাসী ভয়াতুর ব্যক্তির নিম্নতলের শব্দাদি ছাদে হইতেছে ভাবিয়া ভূতভয়ে কিরূপ আড়ষ্ট হয়, তাহা অনেকই অবগত আছেন । প্রতিশব্দ দ্বারা বহুসংখ্যক ভ্রম উৎপাদিত হয় । দূরে প্রতিঘাতী কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে শব্দতরঙ্গ তাহাতে প্রতিহত হইয়া পুনর্বার কর্ণে প্রবেশ করে । বোধ হয় যেন দূরে আর একটি শব্দ হইল । নদীর একতীরে যদি একটি কুকুর শব্দ করে, অপর তীরে তাহার প্রতিশব্দ হয় এবং বোধ হয় যেন আর একটি কুকুর অপর তীর হইতে ডাকিল । কুকুর জাতি হইয়া অপর তীরস্থ কুকুরের সহিত বিরোধ করিবার আশয়ে বারংবার ডাকিতে থাকে ।

প্রতি শব্দে দুই অক্ষর অর্থাৎ প্রতি

সেকেণ্ডে পাঁচ অক্ষর উচ্চারিত এবং শ্রুত হইতে পারে এবং শব্দ প্রতি শব্দপলে ৩০০ হস্ত অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫০ হস্ত ভ্রমণ করে । অতএব যদি ৭৫ হস্ত দূরে উচ্চ প্রাচীর কিংবা অন্য কোন প্রতিঘাতী পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে শব্দতরঙ্গ গমনাগমনে ১৫০ হস্ত ভ্রমণ করে তাহাতে অর্ধপল সময় লাগে । অতএব কোন কথা কহিলে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হইবার এবং শব্দ প্রতিহত হইয়া প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে অর্ধপল সময় অতিবাহিত হয়, তাহাতে এক অক্ষর শ্রুত হইতে পারে । একপাল্পলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে “ করিবে না ” প্রতিশব্দ উত্তর করিবে “ না ” । প্রাচীর কিংবা তরঙ্গ প্রতিঘাতী পদার্থ যদি ১৫০ হস্ত দূরে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে শেষ দুই অক্ষর পুনরায় স্পষ্ট শ্রুত হইবে । যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে “ এখানে কি কেহ আছে ? ” প্রতিশব্দ উত্তর করিলে “ আছে ” । ২২৫ কিম্বা ৩০০ হস্ত দূরে প্রতিঘাতী পদার্থ থাকিলে শেষ তিন কিংবা চারি অক্ষর পুনরায় স্পষ্ট শ্রুত হইবে । প্রতিশব্দের এই গুণের উপর নির্ভর করিয়া নানা ভাষায় গদ্য পদ্যময় বহুবিধ সাহিত্যরত্ন রচিত হইয়াছে ।

খণ্ড কবিতা । *

সংস্কৃত ভাষাকারিকেরা পরম্পর-নি-
রপেক্ষ কাব্যবিভরণ্যে লক্ষণভেদে মু-
ক্তক, কুলক, কোব, সংঘাত প্রভৃতি বিবিধ
সংজ্ঞা দিয়াছেন, এবং ইতিহাস-কথাস্থিত
অষ্টাধিক সর্গসম্বিত কাব্যগ্রন্থকে মহা
কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । আমরা
এই প্রবন্ধে পরম্পর সম্পর্কশূন্য কবিতা
মাত্রকেই সাধারণতঃ খণ্ড কবিতা বলিয়া
নির্দেশ করিব, এবং কাব্যের সর্গ-সংখ্যা
ঠিক অষ্টাধিক না হইলেও যদি উহার আদি
অন্ত মধ্য সর্বত্র কোন একটি ঐতিহাসিক
কাহিনীর সূত্রবন্ধন থাকে, তাহা হইলেই
উহাকে আমরা মহাকাব্য বলিয়া গণনা
আনিব । পলাসির যুদ্ধ কাব্যে সর্গ-
সংখ্যা আটের অধিক নহে, উহার অধি-
নায়েকও দেবতা কিংবা শাস্ত্রসম্মত ক্ষত্রিয়
নহেন, এবং সর্গে সর্গে ছন্দোবন্ধনেরও
বৈচিত্র্য নাই, তথাপি উহা মহাকাব্য; আর
কবিকাহিনী কি অবসর-সরোজিনী প্রভৃ-
তিতে বহুবিধের বর্ণনা, বহুরসের অবতা-

রণা এবং বহুবিধ ছন্দের রচনা থাকিলেও
এগুলি খণ্ডকাব্য ।

আমাদিগের বিবেচনায় মহাকাব্য র-
চনায় যে শক্তির পরীক্ষা ও পরিচয় হয়,
খণ্ডকাব্যরচনায় তাহা কখনও হইতে পারে
না । খণ্ডকাব্যের কবি আপনার ভাবে
আপনি বিভোর, আত্মকথা লইয়াই ব্যস্ত ।
তাঁহার কবিতা দুঃখের গীত, কি হর্ষের উ-
চ্ছ্বাস । উহাতে শুদ্ধ কবিস্বভাবই প্রতি-
বিম্বিত হয়, কিন্তু মানবস্বভাবরূপ অনন্ত
জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না ।
কবি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া প্রীতির মর্ম্ম-মূলে
আঘাত করেন, প্রণয়ে প্রভারিত হ-
ইয়া মনুষ্য জাতিকেই শঠ, কপট, নি-
র্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া বাঙ্গালাদেশে ক্রুদ্ধকণ্ঠে
তিরস্কার করিতে থাকেন । মহাকাব্যের
কবি আত্মচিন্তারহিত, আত্মবিস্মৃত এবং
আপনা হইতে দূরে অবস্থিত । তাঁহাকে
তাঁহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না ।
তাঁহার সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদ, তাঁহার যুগ

* ১ । মানস বিকাশ । কলিকাতা প্রাচীন ভারতযন্ত্রে মুদ্রিত ।

২ । কবিকাহিনী । শ্রীদীনেশচরণ বসু প্রণীত ।

৩ । পুষ্পমালা । শ্রীযুক্ত শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত ।

৪ । অবসর সরোজিনী । শ্রীরাধাকৃষ্ণ রায় বিরচিত ।

৫ । বনকুমার । কলিকাতা ইন্সটিটিউট প্রেসে মুদ্রিত ।

৬ । অবকাশ গাথা । শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বসু প্রণীত ।

তাহার ঘেঁষ, তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বি-
লুপ্ত হয় এবং তিনি পরের প্রাণে আপ-
নার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, পরের ক্ষয়কে
আপনার করিয়া, একেবারে সর্বসমস্ত
লাভে যত্নপর হন। তাহার ভাষা ভীমের
জিহ্বার করকাভিঘাতেয় ন্যায় গর্জ্জন
করে, * জ্যোপদীর অভিমানপূর্ণ উদ্বেল অ-
স্তরে ক্রোধ-তরঙ্গের ন্যায় উথলিয়া উঠে,
রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে “সহস্রা বিদদীত ন
ক্রিয়াম্,” ইত্যাদি সদর্থযুক্ত-হিতকথা করণ
করিতে থাকে, এবং প্রকৃতির সায়স্থল
শোভামুগ্ধ দিব্যাদ্যনাদিগের ক্ষুরিতাধরে
শৈলপ্রস্থবাহিনী স্রোতস্বিনীর ন্যায়, অথবা
প্রেম কি বিরহের কণ্ঠধ্বনির ন্যায়, আপনার
ভরেই ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।

বাজালি ভাষা এইক্ষণ খণ্ড কবিতার
পরিপ্লাবিত। এদেশে মানুষের সংখ্যা যত,
বোধ হয় এইক্ষণ কবির সংখ্যাও প্রায়
তত হইয়াছে। বালকেরা শ্মশ্রুকাম কিংবা
দন্তোদ্ভেদ না হইতে হইতেই “প্রেয়সি আ-
মার”-রুলিয়া কবিতা লিখেন; যুবজনেরা
পার্থিব ভোগে বীতরাগ হইয়া তপোবন,
উদাসীনতা এবং বৈরাগ্যের গুণ গান ক-
রেন, অর্ক প্রাচীন বিষয়ী ব্যক্তির কবিতা
লিখিয়া রসিকতার পরিচয় দেন; আর
কাহ কেও স্তুতি করিতে হইলে অথবা
নিন্দা করিতে হইলে, ভূগোলের বিজ্ঞাপন
লিখিতে হইলে অথবা ব্যাকরণের উপসং-
হার লিখিতে হইলে, অধিক আর কি,—

* যথা মহাকাব্য কীরাতাজ্জুনীয়।

কিছু না লিখিতে হইলেও আধুনিক, বঙ্গ-
বাসী দেবী বীণাপাণির ত্রিলোকমুগ্ধ
সুস্বাদা পদ্যবিদে আশ্রয় লন।

বর্তমান বাঙ্গালি সাহিত্যের এই অব-
স্থাকে অনেকে দেশের সৌভাগ্য বলিয়া
মনে করেন। তাহার বুলেন যে, যুগান্তের
আরাধনাতেও যে ফল না ফলে, যদি কোন
দেশের সপাত্র, নিষ্পাত্র, মজ্জীব, নিষ্কীব,
সমস্ত পাদপই সেই ফলে পরিশোভিত হয়,
তবে ইহাকে সৌভাগ্য লক্ষণ না বলিয়া
আর কি নামে উল্লেখ করিব? কিন্তু দুঃখ
এই, অশিক্ষিত হৃদয় যে সকল কথার প্রতা-
রিত হয়, শিক্ষিত বুদ্ধি অনেক সময়েই তাহা
প্রলাপ বাক্য বলিয়া অগ্রাহ্য করে, এবং
হৃদয় যে সকল আপাত-মনোরম স্বচাক
দৃশ্যে বিমোহিত হয়, বুদ্ধির কঠোর দৃষ্টি
প্রায়শঃই তাহার মর্মে উদ্ভেদ করিয়া এক-
বারে বস্তুর প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা লইতে
থাকে। চিত্তাক্ষম বুদ্ধিমান ব্যক্তির উদ্ভি-
খিত কাব্যপ্লাবন কিংবা পদ্যপ্লাবনের ক-
একটি কারণ নির্দেশ করেন। এই কারণ
গুলি আমাদের নিকটেও নিত্য কল্পিত
বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা আমরা নিম্নকণ বুঝিতে পারিয়াছি,
এবং পাঠকবর্গও একটু চিন্তা করিলেই
স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গ এই কবিতা বুদ্ধির
এক কারণ বাঙ্গালির ভ্রমর-প্রকৃতিত।
বর্তমান সময়ের বাঙ্গালিকে যদি কিছুই স-
হিত তুলনায় আনা যায়, সেই তুলনামূলক
ভ্রমর। ভ্রমর যেমন বসন্ত-বায়ু-হিলোলে

ফুলে ফুলে বিচরণ করে, ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে, এবং মুখে দুঃখে সকল সময়েই গুণ গুণ ধনি করে, বঙ্গবাসীও ইদানীং সেইরূপ হৃদয়গত ভাবের হিম্নে'লে ফুলে ফুলে বিচরণ করেন, ফুলে ফুলে মধু আহরণ করেন, এবং মুখে দুঃখে সকল সময়েই গুণ গুণ ধনি করিয়া চিত্ত বিনোদনে যত্ন করেন । তাঁহার শৈথিল্য নাই, তাঁহার গাভীর্ষ্য নাই, কিছুতেই মনঃসন্নিবেশে তাঁহার ক্ষমতা নাই, এবং একটুকু উর্দ্ধে যে উড্ডীন হইবেন, তাঁহার দুর্বল পক্ষপুটেও এমন সামর্থ্য নাই । তিনি সর্ব্বাংশেই একটি ভ্রমর । যে দেশের লেখক এইরূপ ভ্রমর, পাঠক এইরূপ ভ্রমর, সে দেশে ভ্রমর-গীতি ভিন্ন আর কোন্ গীত ক্ষতিগোচর হইবে, বল । ভারত-বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন এবং বঙ্গবন্ধেই লালিত, পালিত, শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন । প্রবাদপরম্পরায় এইরূপ কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি সূর্য্যের অভ্যাস হইতে সূর্য্যের অন্তঃগমন পর্য্যন্ত কোন একই বিষয়ের চিন্তায়, পরমার্থ-চিন্তামগ্ন তাপসের ন্যায়, একবারে নিমগ্ন হইয়া থাকিতে পারিতেন । আধুনিক বঙ্গে কাহাকে কি প্রহর কালও কোন একই তত্ত্বের চিন্তায় গাঢ়মগ্ন দেখিয়াছ ? যদি দেখিয়া থাক, তবে তাহা দৃষ্টিবিভ্রম । বাঙ্গালি এইকণ চিন্তা-বিমুগ্ধ, পরিশ্রম-বিমুগ্ধ, ক্লেশ-বিমুগ্ধ । কালের তরঙ্গে ভাসিয়া, আপনা হইতে যাহা গারে আসিয়া

না চেকিল, সে তাহা উপার্জন করিবার জন্য যত্নপর হইবে না ।

বঙ্গীয় সাহিত্য যে সমুচিত বিকাশের পূর্বেই বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার আর এক কারণ বাঙ্গালির অসহিষ্ণুতা । অসহিষ্ণুতাকে অনেকে সামান্য দোষ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় পুরুষের পুরুষার্ঘ্যসাধনে অসহিষ্ণুতার ন্যায় প্রতিবন্ধক আর নাই । যদি অসহিষ্ণুতাদোষে অধঃপাত না ঘটিত, তবে বাঙ্গালি এতদিনে পৃথিবীর জাতীয় সমাজে অতি গৌরবের আসন গ্রহণ করিত, সন্দেহ নাই । কিন্তু এক অসহিষ্ণুতাই তাহার অশেষ আশার মূলোচ্ছেদ করিতেছে । ইয়ুরোপ ও আসিয়ায় কোন্ জাতি বাঙ্গালির ন্যায় যশোলালসার অধীন ? বাঙ্গালির হৃদয়-যন্ত্র নিতান্ত ম্লথ হইয়া পড়িলেও যশোলিপ্সা উহাতে অনির্বচনীয় তাড়িত বেগ প্রদান করিতে পারে ; বাঙ্গালির প্রাণ একবারে যখন দেহ ছাড়িয়া দেয়, যমুনার উজ্জান জলে বংশীধ্বনির ন্যায়, যশের মৃদু-মোহন ধ্বনি, অন্তঃকণকালের জন্য হইলেও, উহাকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয় । যে জাতি এইরূপ যশোলিপ্সু, সেই জাতির অবশ্যই নিতান্ত যশস্বী হওয়া সম্ভব, এবং যশস্কর কার্যসম্পাদনে তাহার অটল উৎসাহ থাকাই উচিত । কিন্তু বাঙ্গালির তাহা হয় না । তাঁহার অসহিষ্ণুতা তাহাকে যশঃসঞ্চয়ের সুপ্রশস্ত পথেও ক্ষণকাল তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না । অন্যান্য দে-

শের গ্রন্থকারেরা বরসের একাকী অধায়েন
যাপন করিয়া এবং বহু দিন চিন্তার ডুবিয়া
রহিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বা-
ঙ্গালির আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা এতকাল অ-
তৃপ্ত রহিতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষিত
হইবার পূর্বেই বাঙ্গালি, গ্রন্থকার ;—
এবং কাব্য কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ঙ্গম
হইবার পূর্বেই বাঙ্গালি, কবি।

ক্রমিক অধোগতির এত কারণ সত্ত্বেও
যে আমরা বঙ্গ মধো মধো প্রকৃত কবিতার
রসাস্বাদে অধিকারী হই, ইহা সামান্য
আত্মাদের বিষয় নহে।—আমরা ইতঃ-
পূর্বে পাঠকবর্গের নিকট কতিপয় উৎকৃষ্ট
কাব্যের পরিচয় দিয়াছি। আমরা আজ
যে এককথানি কবিতা সংগ্রহ উপলব্ধ
করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি,
তাহাও সর্বথা কাব্য নামেরই উপযুক্ত
এবং আর কিছু না হউক, বাঙ্গালার অ-
মৃতকোটি খণ্ড কবিতা হইতে একটুকু দূরে
স্থান পাইবার যোগ্য।

কোন এক ছলগ্রাহী কবি ভগবান
পানিনিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়া-
ছেন যে, যে সকল বস্তু একস্থানে অথিত
হইলে নিতান্ত অরসিকতার পরিচয় দেয়,
তদীর অকাধ্যায়ীর অনেক স্থলেই তাদৃশ
বহুবিধ বস্তু একস্থানে অথিত রহিয়াছে।
মানস বিকাশ, কবিকাহিনী, অবসর সরো-
জিনী, পুষ্পমালা, বনকুমুম এবং অবকাশ
গাথাকে একই প্রবন্ধে নিবন্ধ এবং এ-
কত্র অথিত দেখিয়া আমাদিগকেও অ-

নেকে ঐরূপ অরসিক বলিতে পারেন।
কিন্তু ফলতঃ আমরা তাদৃশ অশ্রবাদের
বিষয় নহি। আমরা এই ছলখানি কা-
ব্যকে গুণ-গরিমার সমান বলিয়া স্বীকার
করি না। পুষ্পমালার রচনার আমরা যে
রূপ পরিপকতা, প্রাচুর্য, যেরূপ সাব-
ধানতা ও সুললিত পদবিন্যাস দেখিতে
পাই, অবসরসরোজিনী কি বনকুমুমে তাহা
দেখিতে পাই না ; এবং আমরা কবিকাহি-
নীতে কাব্যের যেরূপ বৈদ্যুত-স্পর্শ অনুভব
করি, পুষ্পমালা কি মানসবিকাশেও তাহা
অনুভব করিতে পাই না। রূপের সহিত রূপে,
লাবণ্যের সহিত লাবণ্যে কিরূপ বিভিন্নতা
আছে, পাঠকবর্গ তাহা জানেন। রসগত
মাধুর্য্যেও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে। এই
কাব্য সংগ্রহের প্রত্যেক খানিই রসমা-
ধুর্য্য বিশিষ্ট, এই অংশে ইহার পূর্ণতার স-
মান, অথচ স্বাদগত পার্থক্যে ইহার একথা-
নির সহিত আর একখানির তুলনা হয় না।

কাব্যের প্রধান গুণ দুই, সৌন্দর্য্যের
সৃষ্টি আর উদ্দীপনা। ইহা পূর্বেই প্রকা-
রান্তরে বলা হইয়াছে যে, খণ্ড কবিতায়
মানব-প্রকৃতিগত পূর্ণ সৌন্দর্য্যের চিত্র-
দর্শন অসম্ভাবিত; কিন্তু খণ্ড কবিতায় ব-
হিঃপ্রকৃতির সর্ববিধ সৌন্দর্য্যই অনায়াসে
চিত্রিত হইতে পারে; এবং কবির শক্তি
থাকিলে তিনি উহাতে উদ্দীপনার উগ্র ম-
দিরাও অনায়াসে ঢালিয়া দিতে পারেন।
উদ্দীপনা বিষয়ে বঙ্গ দুই তিনটি অভিনব
কবির উপমাশূন্য নাই, আমরা তাহা-

দিগের পরই বাবু দৌনেশ চরণ বসুর নামো-
লেখ করিতে পারি । দৌনেশ বাবুর লেখা
মর্ম-স্পর্শিনী, মৃত-সঞ্জীবনী । তিনি যে প-
রিমাণে মাদকতা জন্মাইতে পারেন, যদি
তদীয় লেখায় সেই পরিমাণে প্রগাঢ়তার
পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে তাঁহার ব-
রসের অম্পতা িস্মৃত হইয়াও আমরা তাঁ-
হাকে প্রবীণ বলিয়া পূজা করিতে সম্মত
হইতাম । তাঁহার “উদাসীনের বিদায়”
এবং “জাগো মা আমার” প্রভৃতি দ্রব-
বন্ধি-সদৃশ কবিতা নিচয় বান্ধবের পা-
ঠকবর্গ ভূয়োভূয়ঃ পড়িয়াছেন । আমরা
নিম্নে তাঁহার “প্রত্যাগত প্রবাসী” হইতে
কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম । ইহা
পাঠ করিবার সময়ে কাহার শরীর না
কটকিত হয়, তাহা বলিতে পারি না ।

* * *

“বাই এবি বাই দেখি হেরি গে নরনে
ধৈর্য ধরিয়া যদি পারিহে হেরিতে,
কি খেলা খেলেছে কাল সে মুখ সদনে
যথায় প্রিয়ারে সদা পেতাম দেখিতে ;
দেখি এবি কোন স্থানে রয়েছে কেমনে
প্রেমসীর প্রিয় দ্রব্য প্রেমসী বিহীনে ।

এই ত আরশি সেই বাহার অন্তরে
(খেলে যথা শশীকলা সলিল ভিতর)
প্রস্ফুটিত, হায়, যেন যৌবনের ভরে,
খেলিয়াছে প্রেমসীর বদন সুন্দর ;
তরল লাবণ্য, মরি, রূপের মাধুরী
ভাসিত আরশি অঙ্গে কনকলহরী ।

হায় ! দেখি ওকি লেখা প্রাচীরের গায়ে ;
‘প্রাণনাথ ! বড় দুঃখ রহিল এ মন .
নাহেরে তোমার মুখ বুঝি ভাগ যায়,
হ’মনা সাক্ষাৎ আর এ ভব জীবনে ;
বিদায়, বিদায়, নাথ বিদায় এখন,
জীবনের যবনিকা হইল পুতন !’

যথা কোন হীনবল অগ্নির কুণ্ডেতে
ঢালিলে আহুতি, করি ভীষণ গর্জন
উঠে জ্বলি বৈশ্বানর, দেখিতে দেখিতে
সধুম-অনল-ধ্বজ পরশে গগন ;
তেমতি শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
প্রেমসীর বাক্যরূপ আহুতি পাইয়া !

ঘুরিল মস্তক, হায়, ঘুরিল নয়নে
সারশি, আরশি, দ্বার, গৃহের প্রাচীর ;
ভাবিলাম মনে আমি, হায়, কি কুক্ষণে
ধরিলাম তবে এই মানব শরীর !
মারিনু ডুবায়ে রাখা বিচ্ছেদ পাথারে
শরদিম্মু-মুখী সেই স্বর্ণলভিকারে !

না জানি বিরলে বসি (জানকী যেমতি
লঙ্কার অশোকবনে করিতা ক্রন্দন)
কত দিন সুকুমারী স্নেহেত্রা যুবতী
অশ্রুজলে আর্জিয়াছে অঙ্গের বসন ;
কত দিন মম এই নিষ্ঠুরতা মরি,
ভাবিয়া বিবর্ণ মরি, হয়েছে সুন্দরী !

না জানি বসিয়া এই গনাক্ষের দ্বারে
চাহিয়াছে কত দিন পশ্চিম-গগনে,

দেখি ক্রমে বনুধারে ডুবিতে আঁধারে
শূন্য নিশ্বাস এক ভাজেছে ললনে ;
ডুবেছে আঁধার-কূপে মানস আবার
বহিরাছে অশ্রু-জল চক্ষু অনিবার !

অস্থির হইল মন ; শিথিল শরীর ;
ধীরে ধীরে বসিলাম পালঙ্ক উপরি,
একি দেখি !! কে রয়েছে নিদ্রিত গভীর,
আপাদ মস্তক জীর্ণ বসনে আবরি !
শব যথা রহে পড়ি স্থির কলেবর,
রহিয়াছে লম্বমান পালঙ্ক উপর।

বিস্মিত অন্তরে ধীরে উঠায়ে বসন
যেমন চাহিব আমি নে যুথের প্রতি,
সহসা অমনি, হায়, ফিরায়ে বদন,
“নাথ” বলি পুনরায় নীরবিলা সতী ;
মুদিল নয়ন হায়, সহজে আবার
রাগিয়া শেষের অশ্রু মুকুতার ধার !

যথা বিদ্যুতের স্রোত প্রবেশিলে গায়
সমস্ত শরীর উঠে সঘনে কাঁপিয়া,
কাঁপিল এ দেহ মম শোকের জ্বালায়,
পড়িছু ভূতলে হায়, আছাড় খাইয়া ;
শোকের সঙ্গিনী মুচ্ছা করিয়া যতন
করিল এ অভাগারে পুনঃ অচেতন !

লভি সংজ্ঞা চাহিলাম চতুর্দিকে মরি,
দেখিলাম প্রেমসীর প্রাণশূন্য কায়া
পড়িয়া রয়েছে, হায়, পালঙ্ক উপরি,
ভাজিয়াছে অভাগিনী সংসারের মায়া !

এ শূন্য ভবনে আর ভ্রমিয়া কি ফল !
আজ হ’তে আশা মোর ফুরাল সকল !”

দীনেশ বাবুর লেখনী প্রকৃতির লীলা-
তরঙ্গবর্ণনেও অনিপুণা নহে। তিনি মানব-
হৃদয়ের ভাবলহরী আঁকিতে গিয়া যেরূপ
বনের উচ্ছ্বাস তুলিতে পারেন, প্রকৃতির
শোভারূপি চিত্র করিবার সময়েও কোন
কোন স্থলে প্রায় সেইরূপ কৃতকার্যতা
লাভ করেন। তাঁহার ধবল শেখরে না-
মক কবিতার আরম্ভেই ইহার সূচাক্ষ নিদ-
র্শন আছে।—

“ভাসিতেছে জ্যোৎস্না নিখর অন্ধরে ;
হিমার্দ্্রির শুভ্র শেখরে শেখরে
খেঁচে তরঙ্গ—রক্তত তরল
নির্ঝরিনী-নীরে পাতার পাতায়,
শতপুষ্প শিরে শত লতিকায়
কৌমুদীর কায়া করে ঝলমল।”

যে সকল খণ্ডকবিতা পুষ্পমালার প্র-
থিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুষ্পমালা
নাম দেওয়া কোন অংশেই অসঙ্গত হয়
নাই। এদেশে বাঁহারা কাব্যশাস্ত্রের অ-
নুশীলন করেন, তাঁহাদিগের নিকট শিব-
নাথ বাবুর কবিত্বশক্তির নূতন পরিচয় দে-
ওয়া বিফল। তাঁহারা জানেন যে শিব-
নাথ বাবুর হস্ত হইতে বাঁহালা সাহিত্যে
প্রকৃতই নিরন্তর পুষ্পরষ্টি হইতেছে। তাঁ-
হার কএকটি গুণ অনন্যসাধারণ। তিনি
যেখানেই যে ভাবে প্রীতির বর্ণনা করিয়া-
ছেন, তাহা হিমার্দ্্রিবক্ষোনিঃসৃত পবিত্র
গজোদকের ন্যায় সুখদ হইয়াছে ; তা-

হাতে তুমার পরিত্যক্ত হয়, অথচ আকর্ষণ-
পানেও হৃদয় আনিব হয় না । ফুল, ফল,
লতা, পাতা, বনের পাখী, স্রোতের জল,
ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু বর্ণনাতেও শিবন'থ
বাবু যার পর নাই প্রশংসনীয় । তিনি
যাহা কিছু দেখেন, তাহাই যেন মধুময়,
অথচ সে মধুতে নিতান্ত বিরক্তচিত্তেরও
চিত্তবিকার জন্মে না । বস্তুতঃ পুষ্পমালার
কবিতাচয়ে, যেরূপ মাধুর্য, যেরূপ রসবত্তা
আছে, যদি সেইরূপ আবেগ, তরঙ্গ ও তর-
তর প্রবাহ থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে
আমরা ঋকবিতার আদর্শ বলিয়াই বাখ্যা
করিতাম । আমরা তাঁহার পরিত্যক্তা র-
মণীর গুটিকত কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ।
তিনি যখন পরদুঃখে কাতর হইয়া কঁাদিতে
চাহেন, পরদুঃখকাতরা কবিতাও তখন কি
রূপ কঁাদিতে পারে, পাঠক তাহা দেখিয়া
বিমোহিত হইবেন ।

“অভাগীর কেউ নাই ! কার কাছে কঁাদিব ?
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে বলিব ?

তাই বলি বিভাবরি !

অভাগীকে রূপা করি
আঁধার অঞ্চলে ঢাকো প্রাণ-ভরে কঁাদিব,
তোমারি নিকটে সখি ! অশ্রুজলে ভাসিব !

কত শত অশ্রু তুমি রেখেছ ত ঢাকিয়া,
নহয় নিশ্বাস যার বায়ু সনে বহিরা ।

মোর অশ্রু সেই সনে,

রাখ সখি ! সংগোপনে ;

জুড়াই তাপিত প্রাণ প্রাণ ভরে কঁাদিয়া,

তোমার অঞ্চল য'কু অশ্রুজলে ভিজিয়া,
অয়ি ! মুখমগ্নি নিশি ! তারা-হার পরিয়া,
বসুধার সিংহাসনে রয়েছ ত বসিয়া ।

চেয়ে দেখ পদতলে

ডে লতা ভাসে জলে,

তুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়া করে ছিঁড়িয়া,
নিরমল ফুল থাক তারাসনে মিশিয়া ।

অথবা পারলো যদি হাহাকার বহিতে,
অভাগীর হাহাকার লও তথা ডরিতে,
যথা সেই নিরদয়,

ঘুমাইছে এ সময় ;

যাও তথা হাহাকারে নিদ্রাভঙ্গ করিতে,
নিদ্রাভঙ্গে অভাগীর দুঃখ-কথা কহিতে ।

অভাগীর হাহাকারে যেই আঁখি মেলিবে
অমনি রজনী ! তুমি ধীর-স্বরে বলিবে,

‘ঘুমাও, এ রবে কেন

নয়ন মেলিলে

অবলার হাহাকার কেন রাখা শুনিবে ?

ঘুমাও কাঁদুক তাঁরা চিরকাল কঁাদিবে ।’

রে দীপ ! তোমার তৈল ফুরাইয়া আসিছে,
তাই মরি শিখা তব নিবুনিবু করিছে ;

আশা তৈল পামরার

বিন্দুমাত্র নাহি আর,

তবু কেন প্রাণশিখা এতক্ষণ জ্বলিছে ?

দুর্বল হৃদয়বর্তি কহ করে পুড়িছে ?

পুড়িতে পুড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে ;
তখন প্রাণ শিখা একেবারে নিবিবে ।

হাহাকার, অশ্রুজল,

যুচে যাবে এ সকল ;

নির্ধর পতির আশা সেই দিন মিটিবে,
সেই দিন কমলের শতদল ফুটিবে ।

বিপন্নের বন্ধু তুমি চির দিন ঘোষণা,
তবে কেন মৃত্যু! আজ অশ্রুগীরে লগ্না ?

নারী প্রাণে কত স্নেহ,

তাই যদি দেখা হয়,

যথেষ্ট হয়েছে ! সত্য আর প্রাণে স্নেহ না,

একা ছিঁচু, ছিঁচু ভাল একাকিনী পড়িয়া
কাদিতাম এ বিজনে অশ্রুজলে ভাসিয়া,

কত কষ্ট আছে ভাল,

কেমন এলি হেন কালে ?

নিজে মরি তোমাকে লোক করিব মইরা ।

যাই যদি কার কাছে যাইব লো রাখিয়া ?”

অবসর সরোজিনীর রচয়িতা জীবন্ত
বাবু রাজকৃষ্ণ রায় খণ্ডকবিতার এক অক্ষয়-
প্রসবন-স্বরূপ হইয়াছেন । কবিতার ভা-
ষাই এইক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক ভাষা হই-
য়াছে, এবং বোধ হয় তিনি সকল বিষয়েই
কবিতা লিখিতে পারেন । এদেশে খণ্ড-
কবিতার দুইটি যুগ গিয়াছে । একযুগের
প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধনামা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ;
আর এক যুগের প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক দুইটি
কবি । ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কবিতার যে-
রূপ শঙ্করদেব খাকিত, সেইরূপ কাব্য

খাকিত না ; এইক্ষণকার কবিতার কা-
ব্যশক্তির জন্য বেক্রপ বড় পরিলক্ষিত হয়,
শঙ্করদেবের গ্রন্থে তাৎক্ষণিক দেখা
যায় না । রাজকৃষ্ণ বাবু এই উভয় যুগের
মধ্যবর্তী । তাঁহার কবিতার শব্দসম্পদ ও
রসবৈভব দুইই প্রশংসনীয় । বোধ হয়
রসবৈভব অপেক্ষা শব্দসম্পদ একটুকু অ-
ধিক । তিনি প্রেমের বিশ্ববাসী বর্ণন
করিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“ ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুঠীতে,

ভূধর-শেখরে, নীরদ্রির নীরে,

বিজয় বিপিনে, মেঘের পবনে,

রবির, বিধুর উজল কিরণে,

মকড় মাঝারে, কুমুম নিকরে

জলের প্রপাতে, ধনির ভিতরে,

অচল গহ্বরে, তটিনীর তটে,

জলধরজালে, নীল নভপটে,

পাদপ, ফুলারে, সাগর-পুলিনে,

সর-স্রোতাভিত্ত কুমুদ, নলিনে,

উজল জ্বলিত বিজলী-কোলে ;

অশনি নিনাদে, যুবল ধারায়,

মেঘ-গরজনে, অনল-শিখায়,

সমীর-দুলিত গাছের পাতায়,

বিকচ-কুমুম-ভূষণা লতায়,

আরো কত আছে,—কবিতা কেমনে ?

যা জানি,—না জানি নিখিল জ্বলে

সমভাবে তুমি সকল স্থলে । ”

যজ্ঞে যাহার নবীন প্রতিভা এইক্ষণ
এত সমৃদ্ধ হইয়াছে, অতি অশ্রদ্ধার
তিনি এই বিষয়টির কিরূপ বর্ণনা ক-

দ্রিষ্টাচ্ছেন, আমরা পাঠককে তাহাও দেখাইব ।

“বুঝি নাই

যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে
হৃদয় শোণিতসহ হৃদয়ে সঞ্চারে,

আদি নাই, অন্ত নাই,

বিরাম বিশ্রাম নাই,

মানব হৃদয় গঙ্গা, সুখা প্রবাহিণী

শান্তভাবে,বিলোড়নে বিশ্ববিপ্লাবিনী ।”

লোকের কচি বহু প্রকারের ;—আমাদিগের এই বোধ হয় যে, কবিতা বহুভাষিণী না হইলেই অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী হয় । রাজকুমার বাবুর স্বরস্বতার বর্ণনা এই জন্যই তাঁহার অন্যান্য কবিতা অপেক্ষা আমাদিগের নিকট অধিকতর মনোরম বোধ হইল ।

বনকুমার কবি-হৃদয়ের প্রথম কুমুম ; অপূর্ণ বিকসিত, অযত্নরক্ষিত, অকৃত্রিম । আমরা ইহার সৌরভে পুলকিত হইয়াছি । গ্রন্থকার আমাদিগের নিতান্ত স্নেহাস্পদ । আমাদিগের বিবেচনার তিনি আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিলেই ভাল হইত । তথাপি, তিনি প্রথম উদ্যমেই যাহা উপহার দিয়াছেন, আমরা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলাম । যাহাকে লোকে মলিত-কবিতা বলে এবং যে সকল খণ্ডকবিতার সহিত মলিতবনিতার উপমা হইয়া থাকে, বনকুমারের রচিত একটি পাখির প্রতি সম্বোধনে ব্যতীত তাদৃশ কবিতার কৃতকার্য

হম নাই । কিন্তু যে সকল কবিতায় হৃদয়ের অন্তর্গত গভীর বেদনা, ঘেব, ক্রোধ, অভিমান এবং কালকূট হলাহল ঢালিয়া দিতে হয়, এই অভিনব কবি এখনই তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন । তাঁহার “বৈকুণ্ঠনিবাসে বহে না রে আজ, আমল হিমোল ” ইত্যাদি পংক্তি পাঠ সময়ে চিত্ত উদ্বেল হয় । আমরা নিম্নে তাঁহার একটি শ্লোকমাত্র তুলিয়া দিলাম । ইহা পাঠ করিয়া সকলেই হয় ত স্বীকার করিবেন যে, রচয়িতার আসন্নাম গোপনে প্রয়োজন নাই ।

“ দুর্বার জলধি মরি ! ভারত বেকিয়া
উচ্ছে করিল রোদন !

হিমাংশু শিশিরচ্ছলে

তাজিলেক অশ্রুজলে

বরষিল অগ্নি রবি আরক্ত বদন
কাঁদিলেক চরাচর ভারত কারণ ! ”

অবকাশ গাথা শব্দের লালিতা ও রচনার মাধুর্য্যে বনকুমার অপেক্ষাও অধিকতর আদরণীয় । কিন্তু বনকুমারের ভাষায় যেরূপ ওজস্বিতা আছে, অবকাশগাথার কোন কবিতায়ই তাহা নাই । আমরা ইহার নিদ্রা, কাননে ধ্রুব ও দময়ন্তী প্রভৃতি কতিপয় কবিতা পাঠে মোহিত হইয়াছি ; আবার শারদীয় মহোৎসবের আরম্ভে কবির রায় গুণাকরের সেই নাচানো ভাষার জঘন্য অনুকরণ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিয়াছি ।

বিনয়ে বাধা।

একগতে বিনীত বলিয়া লোকের নিকট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয়? কত কঠোর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে কীর্তি উপার্জন করা যায় না, যদি দুটি কথা বিক্রয় করিলেই, সেই কীর্তি সংগ্রহ করা যায়, তবে কাহার প্ররতি না তাহাতে উদ্ধত হয়? তবে সকলেই বিনয়ে অবনত হয় না কেন? ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য, এবং ইহা ক্ষুদ্রস্বভাব অথবা প্রকৃত দর্শন শাস্ত্রের কথা।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে এই বোধ জন্মিয়াছে যে, বিনয়ের পক্ষে অনেকেরই কতকগুলি বাস্তব, কি অবাস্তব, কল্পিত কি অকল্পিত বাধা আছে। মনুষ্য সেই বাধাগুলিকে যতক্ষণ না অতিক্রম করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত বিনয়ী হওয়া অসম্ভব।

কাহারও মন স্বভাবতঃ বিনয়ের দিকে, কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জাগ। লোকের নিকট বিনীত হইলে, পাছে লোকে তাঁহাকে ছোট মনে করে, খাট মনে করে, অথবা শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন ও ক্ষমতাহীন কি সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ বিবেচনায় উপেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্বদা সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঔদ্ধত্য কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঔদ্ধত্য দেখাইয়া, যেখানে দুর্ব্বলের কোন প্র-

য়োজন নাই, সেখানেও দুর্ব্বল বলিয়া, যেখানে জুহুজন, বিষদৃষ্টিবর্জন, ও মদপ-পদ-বিক্ষেপে, কোন আবশ্যকতা নাই সেখানেও কুক্ষিতক্র, কঠোর চক্ষু এবং দা-স্তিক ভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া রথা দুর্জিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা প্রকৃত দীনাত্মা, প্রকৃত দরিদ্র। বিধাতা ষাঁহাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারশির ত্রাস রূপ-রাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিম ছটা দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের স্বর্গ থাকে না; এবং বিধাতা ষাঁহাদিগকে শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা ও অন্য প্রকারের বৈভব দিয়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও তাঁহাদিগের মতি উদ্যে না। ষাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদিগের আবার প্রদর্শন কি? প্রদর্শন দরিদ্রের জন্য। ষাঁহাদিগের অন্তরে অভিমানের অমলজ্যোতিঃ, সাগরগর্ভনিহিত অমূল্যরত্নের মায়, লোকচক্ষুর অগোচরে লুক্কায়িত রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা কি? লজ্জা হীনজনের জন্য।

বিনয়ের আর এক বাধা ভয়। অনেকের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাঁহারা জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী প্রতিমায় কান্তি ও দৃঢ়তার ন্যায় অনায়াসে ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে। তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে।

ভয় এটে, পাছে বিনয়ের দিকে মাঝিতে
 নাঝিতে ক্রমে আত্মাবমাননা হয়, এবং অ-
 ভ্যস্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে।
 এই ভয়ের অর্থ, আপনাতে অবিশ্বাস । হা!
 বিড়ম্বনা ! মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতাকে
 পৃথিবী 'শক্তি' বলিয়া পূজা করিয়াছে,
 লোকসম্মিলকর্ষে ও মৌজনা শিক্ষায় তাহার
 ক্ষম হয়, না বৃদ্ধি হয় ? বুদ্ধির স্বাভাবিকী
 প্রতিভা, মনস্তিতার অপরিহার্য্য গৌরব, আ-
 স্রার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা, এ সকল
 যদি বিনয়েরই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর
 ইহাদের দুর্ব্বল ভারবহনের প্রয়োজন কি ?
 তুমি যদি যথার্থ বড় লোক হও, নিশ্চয়
 জানিও যে, লোকের পাদপ্রান্তে পড়িয়া
 থাকিলেও তুমি মুকুটমণির ন্যায় শোভা
 পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতার
 বাধিয়া রাখিবে । আর যদি তুমি যথার্থ
 ক্ষুদ্র লোক হও, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয়
 জানিও যে, তোমার লোকের মস্তকে কি
 স্বর্ণসিংহাসনের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও,
 তোমার স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা সমস্ত আচ্ছাদন
 ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে । অ-
 দীনসহ শ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের পদপ্র-
 ক্ষালন করিয়াছিলেন ; তাঁহারা মন্ত্রমুগ্ধের
 ন্যায় তদীয় আত্মা পালন করিতেন এবং
 তাঁহাদিগের পরবর্তীরা অদ্যাপি তাঁহাকে
 জগতে অতুল, অনন্যসাধারণ দেবত্ব-সম্পন্ন
 বলিয়া আরাধনা করেন । নীচেরো রোম-
 বাসীদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা ক-
 রিতে আত্মা দিয়াছিলেন । লোকে অ-

দ্যাপি তাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উ-
 পরে, অন্ততঃ কম্পনায়ণ পাত্ৰকাঁঘাত করে ।
 বড় আর ছোট, লৌহ আর চৌধক ;
 চৌধককে উর্দ্ধে রাখ, অধোতে রাখ, উ-
 ত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লৌহ অবধারিতই
 উহার আকর্ষণীয় অধীন হইবে । কারণ,
 চৌধকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে । বড়
 আর ছোট, বহ্নি আর তৃণসূপ ;—বহ্নিস্ফু-
 লিককে তৃণসূপের উপরে রাখ আর নীচে
 রাখ, তৃণসংযোগে বহ্নি আপনা হইতেই
 জ্বলিয়া উঠিবে । কারণ, বহ্নিতেও চৌধ-
 কের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে ।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা স্বার্থচিন্তা । মনে
 লজ্জাও নাই, ভয়ও নাই অথচ এই বিশ্বাস
 আছে যে, বিনয়ের অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা
 হইবে না । যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে,
 বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে,
 কার্ঘ্যোদ্ধার হয় না, তখন বিনয়ের মধুধারা
 সিঞ্চে কি পুণ্য আছে, বল ।

বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও
 আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বী-
 কার করি না । লৌকিক কার্য্যক্ষেত্রে
 বজ্রের ন্যায় আঘাত যে সময়ে সময়ে
 অনিবার্য্য, তাহা আমরা মানিয়া লইতে
 প্রস্তুত আছি । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,
 বজ্র কি দুর্জয়ীত ? বজ্রপাতের প্রথমে
 মেঘঘটা,—কি শুল্কর, কি শুল্কদর্শন,
 কি শুল্কীতল ছায়াপ্রদ ! তার পর সৌদা-
 মিনীর বৃহৎ হাস্য । কাহার মন না উহা
 কাড়িয়া লয় ? তার পর জলদমালার মি-

রতি, অবনতি ও অবিরামবারিধারা ; এবং তাঁরপর উক্তমন্তকে মুহমুহঃ অননিপাত। তবে কেন বজ্র রথা আর অবিস্ময়ের অপবাদ দাও ? যদি বাহ্যে বল থাকে, তবে পুরুষের মত দৃঢ়ভাবে কার্য কর, অথচ পুরুষের মত বিনীত হও। ইহাতে স্বার্থরক্ষার কখনও বিঘ্ন ঘটবে না।

বীরসমাজে বোনাপাটি নিতান্ত বিনীত ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি, সম্রাটসমানে বিজয় বৈজয়ন্তী দোলাইয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎই শত্রুপক্ষের নিকট অতি কাতরকণ্ঠে সন্ধিসংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট, পুনঃ পুনঃ জরলাভের পরেও তিনি স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, হীনতর কোন ব্যক্তি তদনুরূপ বিনীত হইতে সাহস পায় না।

পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ডও সামাজিকদিগের সহিত কথোপকথনে ও ব্যবহারে যার পর নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক দুর্ভেদ্য বর্ম বলিয়া জানিতেন, যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত সলাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্বত্র অনুভূত হইত এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার চরণোপান্তে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্জয় অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়ানুত অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এদিগে

তাঁহার কনিষ্ঠ, শৃগাল জুন, মানের কাপ্পমিক অনুরোধে দুর্জিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অপমানিত রহিতেন। অগ্রজের অনবদ্য পৌরুষদেহে যে মাধুরী রূপযুক্তা কামিনীর ন্যায় একবারে মিশিয়া থাকিত, তিনি যণি যুক্তার মামা পরিয়াও তাঁহার ছায়া পাঠিতেন না।

পুরাকালে রোমের এক তেজঃপুঞ্জ সম্রাট একদা পারিষদবর্গ সমভিব্যাহারে রাজপথে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। একটি দীনমুর্তি ভদ্রসন্তান দূর ভইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত্রমে অভিনাদন করিলেন। তিনি তাঁহা হইতেও অধিকতর অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। পারিষদদিগের মধ্যে একজন এই আচরণের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া একটুকু হাঁসিতে ছিলেন। সম্রাট সেই হাঁসির তাৎপর্য বুঝিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“আপনার কি এই অভিলাষ যে সকল বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অবস্থিত রহিয়া এইক্ষণ বিনয়ে আমি ইহার নিকট অধঃকৃত হইব ?”

বিনয়ে বাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় হয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুঝি থাকিলে তাঁহারা এই মহানুভাব-সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, বাঁহাদিগের প্রকৃতিই নিনয়বিরোধিনী,—বিষবর্ষিনী,—ছিন্নতার বীণার মত বিসংবাদিনী, তাঁহারা আশ্চর্যকর্ষচিন্তায় এবং অধ্যাত্মমৌল্যের গৌরবধানে নিমগ্ন হইবেন।

সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১। বঙ্গবধুবিনাপ। শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানি উপহার পাই মাই, কিন্তু সমালোচনার জন্য আদর সহকারে ক্রয় করিয়া আনিরাছি। এই আদরের বিশিষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থকারের সহিত বান্ধবের কোন রূপ সম্পর্ক নাই, তিনি কখনও বান্ধবে কিছু লিখেন নাই। তথাপি তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ভদ্রক্রমে আপনাকে বান্ধবের একজন লেখক, এবং বান্ধবের কতকগুলি কবিতাকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের প্রতি যার পর নাই বন্ধুতা ও আদর দেখাইয়াছেন। বান্ধবের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেমোন্মাদিনী নামে একটি কবিতা আছে, এই কবিতা নবীন বাবুর; এবং বাঙ্গালার বর্ষা নামে আর একটি কবিতা আছে; উহা যমুনালহরী নামক গীতি কবিতার রচয়িতা গোবিন্দ বাবুর। গ্রন্থকার এই কবিতা দুটিকে আপনার বলিয়া তুলিয়া নিরাছেন। আমরা এতদিনে বুঝিলাম যে, বাঙ্গালী সাহিত্য সমাজে সকল লেখকই লম্বুচেতা নহেন। অন্ততঃ বঙ্গবধুবিনাপের রচয়িতার এই অপবাদ দেওয়া অসম্ভব। কারণ শাস্ত্রে আছে।

‘স্বয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লম্বু-
[চেতসাম্ ।]’

অর্থাৎ ইনি আমার নিজ, উনি আমার পর এইরূপ ষাঁহাদিগের গণনা তাঁহারা লম্বুচেতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখায় এইরূপ আত্মপর গণনার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। তিনি বঙ্গদর্শনকেও নিজ বিলাসক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথার সহিত বন্ধিম বাবুর সম্পর্ক, আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, আত্মপর-গণনা-রত অনুদারচেতা নবীনচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র গ্রন্থকারের উদারতার মাহাত্ম্য না বুঝিয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন।

২। কবিতাকুঞ্জ। শ্রীবরদাচরণ ঞ্জ প্রণীত। বরদা বাবুর কবিতাকুঞ্জে কোকিলের কলকণ্ঠ কি ভ্রমর গুঞ্জন ইহার কিছুই আমাদের প্রতিগোচর হইল না। কিন্তু বঙ্গে যে সকল ভেক আজি-কালি নিরস্তর বিকটশব্দ করিয়া লোকের নিদ্রা-স্থখে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তাহাদিগের কণ্ঠধ্বনি অপেক্ষা সুমধুর ধ্বনি শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু এই স্বরমাধুর্য্য, মধো প্রবিষ্ট হইলে। কুঞ্জের দ্বারদেশে হরাণার অতি কঠোর হরফের গীত;—
“যথা ধূর্তা নীচা নারী প্রতারণা-পরী,
সদা ঈর্ষ্যা-হিংসাযুত, কড়ু নহে মনঃপুতা
লোলুপ অনুরা।”

৩। মানসকুসুম। দ্বিতীয়ভাগ।
শ্রীরামদয়াল ঘোষ প্রণীত। নামেই পরি-
চিত হইতেছে যে মানসকুসুম একখানি
পদ্য গ্রন্থ। ইহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ,
এই তিন বিষয়ে তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা এবং
আলেকজান্ডার ও দণ্ড্য নামে আর একটি
সংক্ষিপ্ত কবিতা আছে। এই শেষোক্ত
কবিতাটিই আমাদের নিকট অপেক্ষা-
কৃত ভাল লাগিল।

৪। দুর্দশা-কাব্য। প্রথমভাগ।
শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্র-
ণীত। ইহার লেখা পড়িয়া আশা অথবা
আশঙ্কা হইল, ইনি নানা ফুলের মধু
আহারণে এবং গীতে ভ্রমরাধুকরণে যত্ন-
শীল হইবেন। বোধ হয় কাব্যের প্রকৃতি
বিষয়ে সমুচিত শিক্ষা ও উপদেশ লাভ
করিলে, ইনি খণ্ড কবিতা রচনায় কি-
ঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভও করিতে পারেন। এত
দীর্ঘকালের পরেও কবিতায় জগদানন্দ বা-
বুর কলঙ্ক করা ইহার পক্ষে শিষ্টতা সন্দা-
শয়তা, ও সুকচিশালিতার কার্য্য হয়, নাই।

৫। স্বপ্নদূত। শ্রীকিশোরীলাল রায়
বিরচিত। এখানিতে স্বপ্নদর্শন-বর্ণনাম্বলে
পরমার্থতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে কবিতায়
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের
বিবেচনায় ইহার অর্থ নারিকেলের অভ্য-
স্তরস্থিত সুস্বাদু অম্বুর ন্যায়, নিতান্ত কঠিন
আবরণে সমারস্ত রহিয়াছে। একথা ক-
তদূর সত্য পাঠকবর্গ নিম্নোক্ত চারিটি
পংক্তি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

“হাস্য হয় ক্রন্দনের অরঞ্চ যেমন।
যুক্তবাক্যে প্রলাপের রিপুতে গগন ॥
হুড়রিপু যথা হুড় গ্রাসী পক্ষীবর।
মধুর অরাতি হয় যেমন ভ্রমর ॥”

বোধ করি, সাধারণ পাঠকস্বল্প অরঞ্চ
হুড় হুড়গ্রাসী প্রভৃতি শব্দের অর্থ জা-
নেম না; জানিলেও এই সকল শব্দ চর্চণ
করিয়া ইহাদের অভ্যস্তরস্থিত রস নিষ্ক-
ষণ করা ভাল বুঝেন না।

৬। সুবমালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বি-
রচিত। অবসর-সুরোজিনীর রচয়িতা সু-
বমালার লক্ষ্মী নারায়ণের বন্দনা করিয়া
ছেন। ইহার ভাষা সুবের উপযোগিনী।

৭। কুসুমকাননে কণ্টকতক। ইহাতে
বিরলে শিশিরবিন্দু, নির্ঝাসিতের বিলাপ,
স্বপ্নসুন্দরী, পতিহীনা কামিনী, নিশীথে
কমলিনী, ও প্রিয়তমারে আমার এইরূপ
কএকটি কবিতা আছে। ইহার ভাষা ক-
বিতা ও মানসকুসুমের ভাষা অপেক্ষা সা-
ধারণতঃ উৎকৃষ্ট, ভাবও অপেক্ষাকৃত সরল
ও তরল। কিন্তু তথাপি দুই এক স্থানের
শব্দবিন্যাস দেখিয়া আমরা প্রকৃত সন্তুষ্ট
হইরাছি। একটি কবিতার লেখা আছে,—

“প্রিয়তমারে আমার!—

সংসার সাহার্য্য মাঝে তুমিই ওসিস্,

শোক শিরোকার যবে, দেহ মন দগ্ধ হবে,

তুমিই সান্ত্বনাবারি দাও দিবানিশ্।”

আমরা ভাগ্যবশতঃ কোন দিন এক-
টুকু ইংরেজী পড়িয়াছিলাম, তাই যেন সা-
হার্য্য আর ওসিস শব্দের লালিত্য ও অর্থ-

গত মাধুর্য্য কোন প্রকারে আমাদিগর হৃদয়ঙ্গম হইল ; কিন্তু প্রিয়তমারা ইহার তাৎপর্য্য পরিগ্রহে সমর্থ হইবেন কি না, সে বিষয়ে অতি গভীর সন্দেহ আছে। বলিতে লজ্জা হয়, অথচ না বলিয়া ও পারি না ; শিরোকার শব্দের অর্থ এখনও আমাদিগের বোধগম্য হয় নাই। ইহা কি সংস্কৃত শব্দ না ইংরেজী অভিধানে উল্লিখিত মিরকো নামক বিখ্যাত বায়ু পাঠক তাহার বীমাংসা করিবেন।

৮। ভারতেশ্বরী কাব্য। জীপারীচরণ দাস প্রণীত।—

৯। ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আজ ভারত-ঈশ্বরী। জীরাধাবলভ দে প্রণীত।—

অর্থানুসারে নাম করিতে হইলে, এত্থানের নাম রাজসুন্দরী কাব্য। যুদ্ধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থে রুটেনিসার রাজপ্রতিনিধি এবার যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এত্থানি তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। রাধাবলভ বাবু বয়সে বালক। তাঁহার ক্ষমতার সহিত পার্শ্বীবাবুর ক্ষমতার তুলনা করা অসঙ্গত। কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে যে, তাঁহার প্রথম কবিতাটি বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছে। পার্শ্বীবাবুর লেখা আদ্যোপান্ত শ্লেষপূর্ণ। তাঁহার বন্দনার শ্লেষ, বিলাপে শ্লেষ, আবেদনে শ্লেষ এবং অভিনন্দনেও শ্লেষ। এইরূপ লিখিত কবিতা রচনায় তিনি স্পষ্টতঃ হেমবাবুর অনুকরণে

যত্নপর হইয়াছেন, কিন্তু উপযুক্তরূপে কৃত কার্য্য না হইয়া থাকিলেও নিন্দনীয় হইল নাই। ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পার্শ্বীবাবুর অভিজ্ঞতা আছে।

১০। মিত্রোদয়। মাসিক পত্র ও সমালোচন। জীহিরায় যুথোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে যে সকল বিষয়ের সমীক্ষা দেখিলাম, এবং সেই সকল বিষয় যেভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় ইহার দ্বারা বাঙ্গালী সাহিত্যের উপকার বই অপকার হইবে না। ইহার ষষ্ঠসংখ্যায় চিতোরের যুদ্ধ নামে যে একটি কবিতা আছে, তাহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র, কোন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ইহাতে একবারে পরিসমাপ্ত হইতে পারে না, তথাপি আবার ইহার মধ্যে ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। ইহা কেন? বাঙ্গালির দ্বারা কি ইংরেজী ভাষায়ও উৎকর্ষ সাধন হইবে?

১১। দিবাকর। মাসিক পত্র ও সমালোচন। জীরাজেজ্জলাল সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত। এই পত্রিকাখানি বর্তমান হইতে প্রচারিত হইতেছে। আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ইহার সম্পাদক কাব্যো অনুরাগী; কাব্যরসজ্ঞ এবং কাব্যের দোষ গুণ বিচারে অভিজ্ঞ কি না, তাহা এখন পর্য্যন্তও পরীক্ষিত হয় নাই।

রামায়ণ * ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ।

রামায়ণশীর্ষক প্রথম প্রস্তাবে ইতালীয় পণ্ডিত গোরেসিওর মত যথাযথ বিবৃত হইয়াছে । বর্তমান দ্বিতীয় প্রস্তাবে ইংলণ্ডীয় পণ্ডিত মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মত সমালোচিত হইতেছে ।

ভারতীয় সাহিত্যসংসার স্বভাবতঃ নিতান্ত বিপুল ও আয়ত । গম্ভীরদর্শন হিমগিরির গম্ভীর প্রকৃতির ক্রোড়ে ভারতীয় কবিতা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত । ভারতভূমির নায় ভারতীয় কবিতাও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় লীলাঙ্গন । কম্পনা যত্নপূর্ব্বক এই সৌন্দর্য্যরাশি কবিতার গায় গায় সাজাইয়া দিয়াছে । পবিত্রহৃদয় গঙ্গার সহিত অনায়াসে এই ভারতীয় কবিতার তুলনা হইতে পারে—উভয়ই বহুশাপ্রসারিণী, রসবহুলা ও মার্দ্দব, প্রসন্নতা প্রভৃতিতে আতট পূর্ণা । রামায়ণ ও মহাভারত এই কবিতা-ক্ষেত্রের অনির্বচনীয় শ্রী সম্পাদন করিতেছে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই দুই মহাকাব্যের গুণে এতদূর মোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের অনেকেই ইহার গুণগরিমার বর্ণনায় স্ব স্ব প্রবন্ধ পল্লবিত করিতে ক্রটি করেন

নাই । মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্ এই পণ্ডিতন-প্রদায়ের অন্যতম ব্যক্তি । তিনি রামায়ণ-সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনেক স্থলেই স্বীয় পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন । রামায়ণের গুণে মোহিত হইয়া কোন কোন স্থলে তাঁহার লেখনী অজস্র প্রশংসা-ধারা বর্ষণ করিয়াছে । রামায়ণ যখন বৈদেশীক পণ্ডিতগণের হৃদয় এইরূপ আকর্ষণ করিয়াছে, তখন যে উহা পৃথিবীর মধ্যে একটি উৎকৃষ্টতম রত্ন তদ্বিষয়ে মত-দ্বৈধ নাই ।

আর্য্যগণ বেলুতীগের ভুবানমণ্ডিত প্রদেশে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাদৌ সপ্তমিস্কুর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত পঞ্চনদে অবস্থিতি করেন । কালক্রমে তাঁহাদিগের বংশ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিস্তৃত হয় । এই বিস্তৃত বংশের সন্ততিনর্গ যখন গাঙ্গপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন একদল সাহসিক, যুদ্ধকুশল অসভ্য জাতি বিজয়োন্মত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করে । মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মতে এই গাঙ্গপ্রদেশ-

বাসী আর্ষাসমুত্তিগণের সহিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী অনাৰ্য্যদিগের সামরিক সংঘর্ষেই রামায়ণের উৎপত্তি । রামায়ণে বিক্রা ও তরিকটস্থ শৈলমালার অধিবাসিগণ বানর এবং দাক্ষিণাত্যের আর্ষোত্তর অসভাগণ নরশোণিত-লোলুপ বহুমস্তক বহুহস্ত রাক্ষস শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে । বোধ হয় বাস্তবিক বানরগণের জিগীষারূতি ও শত্রুদমন স্পৃহা দেখিয়াই রামের সৈন্যদিগকে বানরীকৃতিতে পরিণত করিয়াছেন । ঐতিহাসিক বিশেষের লিখিত বিবরণ এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে * ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রামায়ণ যুদ্ধ-কুশল আর্ষ ও অনাৰ্য্য জাতির অবদান পরম্পরার সংগ্রহ । বেদের ন্যায় ইহা আদৌ লিপিবদ্ধ ছিল না । সাধারণ সমাজে ইহা মৌখিক বক্তৃতায় বিদ্যুত হইত । মণিরার উইলিয়েম্‌স্ বলেন, রামায়ণ-প্রতিপাদ্য এই ঘটনা সমূহ সম্ভবতঃ প্রথমে গদ্যে বিদ্যুত

* জীবো এক স্থলে লিখিয়াছেন, একদা বহু সংখ্য বানর বন হইতে বহির্গত হইয়া সদলে মাসিদনীয় সৈন্যের সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হয় । যুদ্ধসজ্জিত শত্রু-সম্মুখীন সৈন্যের অবস্থানের সহিত তাহাদিগের অবস্থানের অনুমাত্র বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় নাই । ইহাতে মাসিদনীয় সৈন্যের একপা মতিভ্রম হয় যে, তাহারা প্রকৃত শত্রুসেনা ভাবিয়া এই দলবদ্ধ বানরদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করে ।

হইয়া পরে সময় অনুসারে সহজবোধ্য অনুষ্ঠানভ্রমে নিবদ্ধ হইয়াছে ।

রামায়ণের পরিবর্তন সময় দুটি । এক সময়ে উহা পদ্যে প্রণীত হয়, অন্য সময়ে বহুপরিবর্তিত ও বর্তমান অবস্থায় স্থাপিত হইয়া উঠে । মণিরার উইলিয়েম্‌সের মতে রামায়ণের প্রথম অবস্থা ব্রাহ্মণ্যকালের পূর্ববর্তী । এই সময় খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্তী নয় । তিনি স্বগতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কএকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন :—

১ । রামায়ণে সতীদাহের কোনও বিবরণ লক্ষিত হয় না । মহাভারতে দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুপত্নী মাত্রী এবং বশুদেব ও কৃষ্ণের সহধর্মিণীগণ স্বামীর সহগমন করিয়াছিলেন কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা গতানু হয়, তাহাদিগের পত্নীগণ এই রীতির অনুসরণ করে নাই । ইহাতে প্রতীত হইতেছে সতীদাহ অথবা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তরবর্তী পঞ্জাবের নিকটস্থ প্রদেশে প্রথমে প্রবর্তিত হয় । রামায়ণের প্রথম প্রচার সময়ে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচ্য প্রদেশে প্রসৃত হয় নাই । পঞ্জাবে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে । মেগাস্থিনিম্‌ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত সময়ে ঐ প্রথা মগধ পর্য্যন্তও বিদ্যুত হইয়াছিল । সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রণীত হইয়াছে (*) ।

* মণিরার উইলিয়েম্‌স্ রামায়ণ ও

২। রামায়ণের প্রথম প্রণয়ন সমগ্র ব্রাহ্মণ্যকালের আর বৌদ্ধকালেরও পূর্ববর্তী। রামায়ণের স্থলবিশেষে বুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু উহা মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়। সমগ্রান্তরে উক্ত বিষয় রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। সুতরাং রামায়ণ এই সময়ের অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩। মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি পাঠে স্পষ্ট অনগত হওয়া গিয়াছে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের ভাষা অমিশ্র সংস্কৃত ছিল না; তখনকার ভাষা বিমিশ্র সংস্কৃতের প্রকার ভেদমাত্র। সচরাচর এই ভাষা “প্রাকৃত” সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। রামায়ণে এই প্রাকৃতের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। যদি রামায়ণ তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই উহাতে সংস্কৃত নাটকাদির ন্যায় কোন প্রকার প্রাকৃতের সংগ্রহ থাকিত। কিন্তু রামায়ণ সরল, সহজবোধ্য ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। ইহাতে কোন প্রকার কটকপ্পনা অথবা কাঠিন্যের চিহ্ন নাই। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, সাধারণের ভাষা মহাভারত উভয়ই এক প্রস্তানে নিবদ্ধ করিয়া ইনিয়াদ ও ওদিসির সহিত তাহার তুলনা ও সমালোচন করিয়াছেন। আমরা বর্ণনীয় গ্রন্থের অনুরোধে রামায়ণ হইতে মহাভারত বিযুক্ত করিয়া লইলাম।

প্রাকৃতে পরিণত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই সরল সংস্কৃত বুদ্ধিতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাধারণের এইরূপ সংস্কৃত ভাষার অধিকার ছিল।

৪। রামায়ণের বিবরণ পাঠে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়, দাক্ষিণাত্য ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিমবর্তী প্রদেশে আর্যগণের আধিপত্য ছিল না। সুতরাং রামায়ণ যখন প্রণীত হয়, তখন উক্ত প্রদেশে আর্যসম্ভূতির উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু অশোকের অনুশাসন লিপি অনুসারে বোধ হয়, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মগদের আধিপত্য ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব, দিল্লী, কটক এবং গুজরাটে মগধসাম্রাজ্যের খোদিত লিপি নমুনা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর বহুপূর্বে রামায়ণ প্রণীত হইয়াছে।

৫। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ডিওনক্রিস্টোমস্ নামক জর্নৈক গ্রীক লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে হিন্দুদিগের বিস্তৃত মহাকাব্যের বিবরণ বর্তমান ছিল। এই বিবরণ হোমারের ইনিয়াদ হইতে লিখিত অথবা অনুবাদিত হইয়াছিল। অধ্যাপক লামেস্স প্রমাণ করিয়াছেন যে, ডিওনক্রিস্টোমস্ মেগাস্থিনিমের লিখিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। মেগাস্থিনিম্ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের

সভায় অনেক কাল ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে ইনিমাদের সদৃশ কাব্য বর্তমান ছিল । কিন্তু হিন্দুগণ যে এবিষয়ে হোমার হইতে কোন ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের এই বিবরণে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না ।

মণিরার উইলিয়েম্‌স্ এই পাঁচটি যুক্তি দেখাইয়া স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্মণা ও বৌদ্ধ সময়ের পূর্বে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ প্রথম প্রণীত হয় । প্রথম অবস্থায় রামায়ণের যে সমস্ত প্রণেতা ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে । এটি না হইলে বাল্মীকিকেই প্রণেতা বলা উচিত । কিন্তু মণিরার মতে বাল্মীকি কখনই সমস্ত গ্রন্থের প্রণেতা নহেন ।

ভারতবর্ষের যে অংশ কোশল নামে অভিহিত হইত, মণিরার উইলিয়েম্‌সের অনুমান অনুসারে বাল্মীকি সেই অংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন । কোশলরাজ্যের প্রধান নগর অযোধ্যা । সূর্য্যবংশপ্রভব মহারাজ দশরথ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন । এই কোশল রাজ্যের নিকটেই রাজর্ষি জনকাস্থিত বিদেহ রাজ্য অবস্থিত । বাল্মীকি কৃষ্ণবজ্রর্ষেদের মতানুবর্তী ছিলেন । রামায়ণঘটিত গল্পও তৈত্তিরীয়ক সমূহের মধ্যে বহুপূর্ব্বক সংরক্ষিত ছিল । কলিকাতা রিভিউতে (১) কফ্ট্ সাহেব লিখিয়াছেন বাল্মীকি গঙ্গা ও যমুনার মঙ্গমস্থল এ-

লাহাবাদের নিকটে যমুনাতে অবস্থিত করিতেন । কিম্বদন্তী অনুসারে বুন্দেলখণ্ড বান্দা বিভাগের একটি পাহাড়ও তাঁহার আবাসস্থান বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে । অনেকে স্থির করিয়াছেন, বাল্মীকি জীবনের প্রথমাবস্থায় কুরুরক্ষা দিয়া ছিলেন, পরিশেষে আপনার পাপকার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া এই বান্দা বিভাগের পাহাড়ে মুনিরূপে অবলম্বন করেন । এই স্থানেই রাম-পরিত্যক্ত সীতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । সীতা বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থিত করিয়া কুমারযুগল প্রসব করেন । বাল্মীকি এই কুমারদ্বয়কে স্বপ্রণীত রামচরিত শিক্ষা দেন । কফ্ট্ সাহেবের মতে বাল্মীকি রামের সমকালবর্তী নহেন ।

রামায়ণের গল্প নিতান্ত হৃদয়াকর্ষক এবং লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত । ইহা অতি বিস্তৃত, দোষরহিত ও বক্তব্য বিষয়ে সংযত । ইহার গল্পাংশ পরম্পরের সহিত সমঞ্জসীভূত । ইহার ভাষা সরল সুখবোধ্য ও সর্ব্বপ্রকার কাঠিন্য বিবর্জিত । এই সমস্ত গুণ থাকাতে রামায়ণ সহজেই মনে রাখিতে পারা যায় । স্মৃতির এইরূপ অনুকূলতার জন্য রামায়ণ যখন শেষাবস্থায় স্থাপিত হয়, তখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে মুখে মুখে কীর্তিত হইত । রামায়ণ প্রায় অনুষ্ঠম্ চন্দ্রে বিরচিত । এইক্ষণে যে রামায়ণ লোকসমাজে প্রচলিত আছে তাহাতে প্রায় ২৪ সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয় ।

মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মতে রামায়ণের দ্বিতীয় অবস্থার সময় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে রামায়ণ প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সংগৃহীত ও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ্যসাময়িক রামায়ণই এক্ষণে সর্বত্র প্রচলিত।

রামায়ণের সহিত ইনিয়াদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাল্মীকি ও হোমার উভয়েই সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ঘটনা-পট চিত্র করিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু রামায়ণের সহিত ইনিয়াদের সাদৃশ্য থাকিলেও বিষয় বিশেষে পরম্পরের সহিত পরম্পরের বহু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও উভয়ে আৰ্য্যজাতীয়, তথাপি দেশ কালাদির দূরত্ব অনুসারে আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের কাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা ইউক, মানবজীবনের প্রকৃত চিত্র অক্ষণে ও প্রাচীন সময়ের ব্যবহার বর্ণনার রামায়ণ হোমারের কাব্য অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। রামায়ণ প্রাচ্যদেশ-পরিদৃষ্ট অমানুষী কল্পনায় পরিপূর্ণ, ইনিয়াদ সরল মানবী ঘটনায় সংযত। সুতরাং যেখানে ইউরোপীয় প্রকৃতি অল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিত, সেস্থলে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কঠোর অভ্যুজ্জ্বলতার পরিচয় দিয়া কল্পনাসামর্থ্য প্রকাশ করিত।

এই কারণে সময়, স্থান ও কার্য্য অংশে ইনিয়াদ অতি অপ্রশস্ত সীমায় সঙ্কুচিত;

কিন্তু রামায়ণে ইহাদিগের ক্ষেত্র অসীম। এক একটি চরিত্রের অঙ্গণ বিষয়ে রামায়ণ ওদিসির সহিত তুলনীয় হইতে পারে, কিন্তু গম্পসংযোজন ও রচনাসারল্য প্রভৃতিতে রামায়ণ ইনিয়াদের তুল্য লক্ষণাক্রান্ত। রামায়ণে যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহনী বর্ণনা আছে, হোমারের কাব্য কোন অংশেই তাহার গুণাতিক্রম হইতে পারে না। ভাবের সরলতা ও সুপরিচ্ছন্নতা এবং রচনার গাভীর্য্য ও পরিপূর্ণতা বিষয়ে রামায়ণ ইনিয়াদ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রামায়ণ প্রাচ্যদেশপ্রসিদ্ধ রূপক, উপমা প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত। এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তা অনেক সময়ে উদ্দীপনার বাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

হিন্দু মহাকাব্যের প্রায় সমস্ত উপমাই আসিয়াজাত জন্তু অথবা বৃক্ষ লতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ বিশেষ হইতে আহৃত। পরন্তু স্বাভাবিক দৃশ্যের বর্ণনাস্থলে হিন্দুকবিগণ স্বীয় রচনা যেরূপ আলেখ্যবৎ রমণীয়তা ও স্বভাবোক্তিতে পরিশোভিত করিয়াছেন, গ্রীক অথবা লাতিন কবিগণ সেরূপ করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যদেশের বহিঃ প্রকৃতি নিতান্ত রমণীয়; ফল-পুষ্প সুশোভিত-বৃক্ষাবলী, উজ্জ্বল আকাশ, নবীকৃত বর্ষাকাল, প্রচণ্ড ঝটিকা, সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণ প্রভৃতিতে প্রাচ্যভূমির যে অপূর্ণ শোভা হয়, তাহা ইউরোপীয় দিগের দৃষ্টিপথবর্তী হয় না। এই কারণে তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বভাব

বর্ণনে হিন্দুদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন । আচার ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিলেও রামায়ণ অপেক্ষা হোমারের কাব্য উচ্চসভ্যতার পরিচয়স্থল নহে । যদিও রামায়ণের যুদ্ধক্ষেত্র ও অস্ত্রাদি প্রয়োগ নিতান্ত অত্যাধিক এবং অমানুষীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ, তথাপি তৎসমুদয়ে অসভ্যতা বা নির্দয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না । হেক্তরের প্রতি একিলিসের ব্যবহারের সহিত রাবণের প্রতি রামের ব্যবহারের তুলনা করিলেই এবিষয়টি পরিষ্কৃত হইবে । একিলিস পতিতশত্রুর প্রতি নির্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন ; রাম পতিত শত্রুর প্রতি সৌজ্ঞেয় একশেষ দেখাইয়াছেন । এইরূপ উদারতা-গুণে রামায়ণ, ইনিয়াদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সুখ সমৃদ্ধির বর্ণনাতে রামায়ণ ইনিয়াদের নিক্ত গণ্য নহে । বাল্মীকির অযোধ্যা ও লঙ্কা হোমারের স্পার্টা ও ট্রয় অপেক্ষা অনেক অংশে ভোগবিন্যাস এবং সৌভাগ্যসম্পদের বিন্যাস ক্ষেত্র ।

অনেক অবান্তর গল্প বর্তমান থাকাতে রামায়ণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ে ধারাবাহিকত্বের অভাব দৃষ্ট হয় । এটি হিন্দু মহাকাব্যের একটি প্রধান বিঘ্ন এবং ইহাই কাব্যান্তরের সহিত তারতম্য করিবার একটি বিশেষ লক্ষণ । এঅংশে ইনিয়াদ যদিও সমালোচকগণকৃত দোষারোপ হইতে বিমুক্ত নহে তথাপি উহা রামায়ণ অপেক্ষা অনেকাংশে মার্জিত ।

অনেকে বিশ্বাস করেন, ইনিয়াদ বিভিন্ন-স্থান-প্রচলিত একবিষয়ক গীতি-কবিতার সংগ্রহ মাত্র । এই সংগ্রহে পরিশেষে মহাভারতের ন্যায় অন্যান্য কবিতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । গ্রীক সংযোজনী শক্তি এইরূপ বিভিন্ন অংশ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্ষেপ সমূহকে এক সূত্রে গ্রহণ করিয়া একাবয়বী করিয়া তুলিয়াছে । ইনিয়াদের স্থলবিশেষে গম্পান্তর দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা ভারতীয় কাব্যগত অবান্তর গম্পের ন্যায় অতি বিস্তৃত ও বর্ণনীয় বিষয়ের বাধাজনক নহে । যদিও এ গুলি মহাকাব্যের সমাপ্তি পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজ্য নহে, তথাপি একবার দেখিলেই বোধ হয় যেন উহা প্রধান গম্পগত বিষয়ের সহিত আপনা হইতেই উল্লিখিত হইয়াছে । এতদ্বিবন্ধন হোমারের অবান্তর গম্পের সহিত প্রধান গম্পের বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয় না । পক্ষান্তরে প্রাচ্য লেখক ও কথকগণোক্ত গম্পের ধারাবাহিকত্ব অনেক স্থলেই ব্যাহত হইয়া থাকে । এই সম্প্রদায় পরম্পর সংস্রবশূন্য ভিন্ন ভিন্ন গম্প সমূহ এক সূত্রে গাঁথিতে সুখ বোধ করেন, এবং ইচ্ছামুসারে প্রত্যেকটিরই সমাপ্তি ভঙ্গ করিয়া থাকেন । এইরূপে একটি গম্প শেষ না হইতেই অন্য একটি গম্পের আরম্ভ হয়, এবং এই আরম্ভটি সমাপ্ত না হইতেই আর একটি তাহার সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে । এইরূপে গম্প রাশির শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া বর্ণনীয়

বিষয়টিকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বলে হিতোপদেশ ও আরবোপ-
ন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে
অবান্তর গল্পপ্রিয়তা হিতোপদেশ ও আ-
রবোপন্যাসের গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে,

তাহাই রামায়ণের রচনার পরিষ্কৃট হয়।
এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, রামায়ণ অ-
পেক্ষা মহাভারতেই এই অবান্তর গল্পের
আধিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমণঃ।

দেবোপাখ্যান ।

(গ্রীষ্ম ও ভারতবর্ষ)

অষ্টম প্রস্তাব ।

কিয়ুপিড্, এফ্রোডাইট্, চেরিটেস্ ।

কাম, রতি, যষ্টি ।



পূর্ববর্তী প্রস্তাব সকলে যে সমস্ত
দেব দেবীর তুলনা করা গিয়াছে, উভয়
দেশীয় দেবোপাখ্যানেই তাঁহাদের রূপব-
র্ণনা আছে। কিন্তু কাম ও রতির আ-
কৃতি ও স্বরূপ যথাযথ বর্ণন করিতে
কেহই প্রয়াস পান নাই—যাঁহারা পা-
ইয়াছেন তাঁহারাও অকৃতকার্য হইয়া-
ছেন। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হস্তে প-
ড়িয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধা-
রণ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ
কএকটি মাত্র পেনসিলের চিহ্ন স্থাপন
করিয়া দিয়া, সেই চিহ্ন অবলম্বনে রং
ফলাইয়া সমগ্র দেহকে সূচ্যম এবং সুস-
জ্জিত করিবার ভার পশ্চাদ্বর্তী কবি এবং
ভাবুকদিগের স্ব স্ব কৃতি এবং অভি-

প্রায়ের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। যে
বিষয়ে ব্যাস, বাল্মীকি, মাঘ, ভারবি, কা-
লিদাস, ভবভূতি, সেক্সপিরার, লিটন
হস্তার্পণ করিতে অসম্মত অথবা অকৃত-
কার্য হইয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উল-
টিয়া গেলেও কি তাহা অন্যের সাধ্যাত্ত
হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? হোমার
বর্জিউন, ডাণ্টে যাহাতে অকৃতকার্য তা-
হাতেই বা কে হস্তার্পণ করিবে? এজন্যই
তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা সাধ্যাত্ত।

সংস্কৃত কবি কারণ বুঝিয়াই, মদনকে
অনঙ্গ, অতমু, অশরীর, মনসিজ প্রভৃতি
নিরাকারমূঢ়ক নাম প্রদান করিয়াছেন।
তিনি বিবেচনা করিয়াই মহাদেবের কো-
পানলে কামকে দগ্ধ করিয়া নাম তুলির

সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন । নিরাকার মনে ধারণা করা যায় না, সুতরাং কামনা বা বাসনা সমষ্টি জগতের সকল সৌন্দর্য, সকল কোমলতা সহ মিলিত করিয়া শিব-পার্বতীর বিবাহ সময় কামকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন । যে সকলকে অহোরাত্র দগ্ধ করে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ঈশ্বরের শক্তিমত্তাও প্রমাণ করিয়াছেন ।

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন এবং হস্তন এই পাঁচটি কামের পঞ্চশর । আবার তাঁহার ধনু পুষ্পময়, তিনি পুষ্প-ধনু, নবচূড়ামুর সেই ধনুর নায়ক । বসন্ত তাহার চিরসহচর এবং হৃদয়সখা । তিনি ‘ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে, মধুকর নিকর করস্থিত কোকিল কুজিত কুণ্ড কুটীরে’ বাস করেন । তরুরাজি যখন নবপল্লবে সুরশোভিত হয় ; প্রকৃতি নাতিশীতোষ্ণ ভাব ধারণ করেন ; বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সকল নবোপ্ত সবুজশস্যে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ণ শোভা ধারণ করে ; যখন কুজঝটিকা বিনির্মূল নীল নভো-মণ্ডল শশীনক্ষত্রের বিমল কোণুদীতে পরম-দমনীয় হইয়া উঠে ; পরম প্রীতিপ্রদ নিকুঞ্জবনে বিবিধ পাদপ সমূহ পুষ্পিত ও সু-ফুলিত হইয়া সুসমা বিস্তার করে, অশোক কিংশুক কেশরাদি কুমুম সকল মলয় সমীরণে ঈষদান্দোলিত হইয়া সুবাস বিস্তার করে ; ত্রতী সকল উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কাস্তকঠবিন্ধ্যস্ত ললনার ক্ষীণা বাহুবলীর ন্যায় আশ্রয়রক্ষ অবলম্বন করে ;

যখন কোকিলকুঞ্জে সমস্ত স্থলে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে এবং ‘নন্দা ও হর্ষ’ ‘শম ও প্রাপ্তি’ সহ নিরাজ করিতে আরম্ভ করে তখন জগতে মদনের আবির্ভাব । যেমন কোন দেশের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা বুঝিয়া মাত্রই সতর্ক নিদেশীয় ভূপতি আপন অধিকার বিস্তার করিতে লোলুপ হইয়া অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করেন, সেই রূপ জীবগণের হৃদয়-রাজা বিলাস বাসনার দুর্বল হইয়াছে দেখিয়া মাত্রই বিশ্ব-বিজয়ী অনঙ্গদেব আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসেন । অপধুষা শুক্রশি-বাও তাঁহার অধিকার বহির্ভূত হইতে পারেন না । মনুষ্যের ত কথাই নাই দেব-গণও তাঁহার অধীন ।—

‘কামপরমবশং নবিপ্রকুর্ষু।

ক্ষিভুমপিযদমীপ্পশতিভাবাঃ ।

কাম মনসিদ্ধ, কারণ বাসনা মনেই উপর । বাসনার প্রাবল্যে চিত্তের বিবেক শক্তি থাকে না, ভ্রান্তি আসিয়া সকল আলোড়িত করিয়া ফেলে, সুতরাং মদনের শর সম্মোহন, উন্মাদ । লোহাদি উপাদানে নির্মিত শায়কে শরীর বিদৌর্গ করিতে পারে, কিন্তু মনের কিছুই করিতে পারে না । মদনশর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃঢ় বিদ্ধ করে । তাঁহার সন্ধান অব্যর্থ ।

প্রকৃতিতে যেখানে যাহা সুন্দর আছে একত্র কর, যেখানে কোমলতা পাও তাহাতে আনিয়া সংযুক্ত কর, কল্পনাতে মনে উপযুক্ত রূপ অবয়ব গঠিত এবং যথা

পরিষ্কৃত কর মনসিদ্ধের মনোমোহিনী
মুষ্টি দেখিতে পাওনে। সে এত সু-
ন্দর, তাহাতে মর্দ্য এত অধিক যে কু-
সুমসুখাসবাহী মনঃসাক্ষতের সুমন্দহি-
মোলও তাহাতে মহা হয় না। আবার
আক্রমণ এত ভরানক যে দেবমানব কা-
হারও নিকৃতি নাই।

পৃথিবীতে চিরনসন্ত থাকে না, সখা বা-
তীতও কামদেন একাকী থাকিতে ভাল
বাসেন না। সুতরাং চিরনসন্তবিরাজিত
বাসনপ্রভুনিকেতন অমরানতীতে, পা-
রিকাতমুখাসিত, অঙ্গুরা ও বিদ্যাদ্রী প-
রিত্ত নন্দন কাননে সখাসহ মনের আ-
হ্লাদে অনঙ্গদেব নাম করেন। আবার
নিমেষ মাত্র সমস্ত জগৎ পরিভ্রমণ ক-
রিয়া একবার সকলের হৃদয় পর্যাবেক্ষণ
করিয়া আইসেন।

শ্রীসের কিয়ুপিড্ অনায়া দেবগণের
আগ্নি আকৃতিতে মনুবা। তিনি অন্ধ, অঙ্গ-
বরদ্ধ বালক। আবার কেহ কেহ একপ ন-
লেন তাঁহার একটি মাত্র চক্ষু। তাঁহার পৃষ্ঠে
তুণ, হস্তে ধনু। তিনি এবিধের কামের
অরূপ। তিনি অত্যন্ত দুর্জয় ও নিষ্ঠুরবৎ।
হাসিতে হাসিতে একবার এদিক, এ-
কবার ওদিক ঘাইতেছেন আর স্রোণ
বুঝিয়া অতর্কিতভাবে, স্বয়ং অলক্ষ্য
থাকিয়া, অসতর্ক দেবদেবী মানবমা-
নবী-হৃদয়ে দৃঢ়তর শর সন্ধান করিতে-
ছেন। প্রণয় ভাল মন্দ বুঝে না, সুন্দর
কুৎসিত বিবেচনা করে না। সুতরাং ভিনস-

হৃদয়বিহারী প্রণয়রূপী কিয়ুপিড্ অন্ধ।
আবার প্রণয় অকারণে নান্দিনিশেবের
পক্ষপাতী, সুতরাং কিয়ুপিড্ এক চক্ষু-
হীন।

আর্য্যকবি বলেন অন্য কোন চক্ষু দ্বারা
যাহা দেখা যায় না, অথবা দেখা গেলে ভ্রম-
কৃত্য প্রযুক্ত যাহা বুঝিতে পারা যায় না, প্র-
ণয়চক্ষে তাহা দেখা যায় এবং বুঝা যায়।
প্রণয়নেত্রে অলৌকিক জ্যোতি, অলৌকিক
ক্ষমতা। প্রণয়চক্ষু দিব্যচক্ষু। সুতরাং
মদনের নগ্ন সর্বাপেক্ষা ভেদস্বী।

এই দুইটি মতের কোনটি উত্তম তাহা
সম্বিবচকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।
এবিধের কবির কল্পনা দুইদেশে দুইরূপ
সৌন্দর্য বিকাশ করিতেছে। বাস্তব, সা-
ধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সৌন্দর্য ও
বাসনা প্রায় একত্র চলে। সুন্দরতাকে অন্ধ
করিয়া সৌন্দর্যের অবমাননা এই জন্তই
আর্য্যকবি উপযুক্ত বোধ করেন নাই।

রতি ও ভিনসের স্বরূপ বর্ণন করা আরও
কঠিন। উভয়েই রূপ এবং প্রণয়ের অধি-
ষ্ঠাত্রী দেবী। বাহার ইচ্ছারূপ উৎস হইতে
সৌন্দর্য উচ্ছসিত হইয়া সমস্ত জগৎ
উদ্ভাসিত করে; যিনি তরু, লতা, ফুল, ফল,
পত্র, পল্লব, এবং শাখাশল দুর্বাদল প্র-
ভৃতিকে স্তরে স্তরে মনোহর বেশে সা-
জাইয়া রাখেন; যিনি বালকের প্রাতঃ-
সূর্যাসদৃশ প্রফুল্ল বদন, এবং যুবক যুবতীর
বিলাসপরিপূর্ণ রূপরাশি বিকশিত করেন;
যিনি চন্দ্রের কৌমুদী, সূর্যের রশ্মি এবং

নক্ষত্রের শোভাকে প্রাণারাম এবং মনোমদ করেন তাঁহার সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া কল্পনার বিষয়ীভূত হইবে ! এখানে কবি হার মানেন, বিজ্ঞান বিবশ হন, গণিতশাস্ত্র বসিতেও আসন পান না । আকাশের কূট প্রশ্ন যাহার মর্খোদ্ধারে অসমর্থ, যাহার প্রকৃতিনির্ণয়ে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন পরমপুরুষ দেবগণও অসমর্থ, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপে নির্ণিত হইবে ? তিনি সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যসমষ্টি । ঝটিকান্দোলিত, উত্তালতরঙ্গসকুল মহাসাগরের অনন্তজলরাশিতে অথবা ললিত-নবজলতা-পরিবৃত নিকুঞ্জবন-বিহারিণী ক্ষুদ্র কল্লোলিনীর মন্দ প্রবাহে ; হিমাচলের তুষারমণ্ডিত গম্ভীরাকৃতি শীর্ষদেশে অথবা হরিৎ-শমশোভিত শমতল ক্ষেত্রে ; পূর্ণারত রামধনুতে কিংবা কদলী, কেতকী, গুবাক-গর্ভপত্রে, অর্দ্ধপক পনস বা কুকবক পত্রে ; যোগীর যোগাবাস গিরিগহ্বর-মধ্যবর্তী শূন্য প্রদেশের আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণোৎপন্ন গম্ভীর অগচ্চ রমণীয় দৃশ্য ; কোমুদীশ্রী নবদুর্বাদলে, প্রথররবিকীর-গোদীপু মকভূমি মধ্যস্থিত ওয়েসিনে এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন বিদ্যামালায় যে সৌন্দর্য্য, রতি ও ভিনসে তাহার সকলই আছে । তাঁহাদের রূপে মানিনীর মনিন অথচ প্রণয়পূর্ণ মুখস্খবি এবং বর্ষাকালের পূর্ণারত নদীর অথবা পুন্ড্রকোড়ে পুন্ড্রবতীর শোভা বিরাজ করে । সেতার ও এসাজের সুরমধুর

বাদ্য, কোকিলের কলকণ্ঠ, ললনার মধুর প্রণয়ভিবাদন, শিশুর আধ আধ মধুর কণা সকল, এবং যোগা পুন্ড্রের রুদ্ধ-জনকের প্রতি আশ্রাস বাক্যে যে মধুরতা উপাদান করে তাঁহাদের মধ্য সে সমস্তই আছে । গ্রীষ্মের মৃদুমন্দ মাকতহিল্লোল, বর্ষার দূরবর্তী মেঘরব ও বারিসিক্ত পাখীর ধ্বনি, শরতের ফলপূর্ণ রক্ষ, হেমন্তের শন্যশোভা, শীতের সুখশয়া ও বসন্তের পুষ্পরুম্মা অন্তঃকরণে যে সুখ উপাদান করিতে পারে, ভিনস্ ও রতির অনবদ্য সৌন্দর্য্যে সেই সুখ উপাদান করে । কি ভয়ঙ্করে, কি মনোহরে, কি মধ্যবর্তী মিশ্রণোৎপন্ন অবস্থায়, যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখে তাহার সকল গুলিই এফোডাইটে এবং রতিতে পাইবে । সোভিসিদের গ্রহনক্ষত্রবিন্যস্ত চক্ষু যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পার অথবা বিলাসীর রসালস চক্ষে যে কোমলতা আবিষ্কার করে তাহার সকলই একাধারে বিরাজ করে । সেইরূপ-সমুদ্রের এক বিন্দু একবার পতিবিরহবিধুরা ললনার নিদ্রিত নয়ন-সমক্ষে প্রাণকান্তের সহাস্য প্রেমপূর্ণ মুখস্খবি আনয়ন করিতেছে, আবার বৈজ্ঞানিক সমক্ষে সমস্ত জগতের উপপত্তি, স্থিতি, প্রলয়রূপে উপস্থিত হইয়া অন্য একপ্রকারের শোভা ধারণ করিতেছে ।

ভিনস্ ও রতি উভয়েই একরূপ সুন্দরী যে, তাঁহারা সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যের উপমাঙ্গুল। যে অত্যন্ত সুন্দরী সে রতি বা এফোডাইট,

তাহাদিগকে কাহার সহিত তুলনা করিব ? তাহার “অনির্বাচ্য নিকপমা, আপনি আপনা সমা” । এতদ্ব্যতীত আর কি বলিব ?

এক রূপ বলিতেই অস্থির,—চতুর্দিকে যাহা কিছু সুন্দর দেখিয়াছি একত্র করিতে ক্রটি করি নাই—ভালবাসা কেমনে প্রকাশ হইবে ? হৃদয়ের যে নিগূঢ় ভাব কিছুতেই প্রকাশ হইবার নয়, যাহার প্রকৃত অবস্থান মাত্র কবির কল্পনায়, তাহা কিরূপে প্রকাশ হইবে । যিনি এক দিনের জন্যও নিঃস্বার্থ ভাল বাসিয়াছেন, যিনি মুহূর্ত্ত-জনাও আত্মসুখ, আত্মজীবন অন্যের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই প্রণয়ের সত্ত্বা ও স্বরূপ বুঝিবেন না । যিনি প্রকৃত প্রণয়াদার, তিনি আপন হৃদয় পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবেন, রতি ও ভিনস্ যে প্রণয়-উপাদানে নির্মিত তাহার এক কণামাত্র, এক পরমাণু প্রমাণ পদার্থ তাঁহাতে আছে বলিয়াই তিনি অন্যগত-প্রাণ । যে হৃদয় সম্পূর্ণ সেই উপাদানে নির্মিত তাহাতে কত সুখ ও কত দুঃখ । অনলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রের সমস্ত দগ্ধ করে, কিন্তু অনল স্বয়ং জ্বলে না । কারণ অনল অচেতন পদার্থ । কিন্তু যে অনলে অমৃতভিষেক এবং দাহ্য গুণ একত্র অবস্থান করে সঙ্গীত হৃদয়ে সেই অনল জ্বলিয়া উঠিলে কত সুখ ও কত দুঃখ ।

ভিনস্ ও রতি একই প্রকার, রূপে ও গুণে উভয়েই অভূম্য । তবে কি তাহা-

দের কোন প্রভেদ নাই ? অবশ্যই আছে । দুই কখনও এক হইতে পারে না । যাহা অনেকাংশে একরূপ তাহারও কিছু না কিছু প্রভেদ থাকে । যদি প্রভেদ থাকিলে তুলনায় কে শ্রেষ্ঠ দেখা যাউক ।

ভিনস্ বসন্তের কুমুমরেণু,—কুমুমসমষ্টির সৌন্দর্য্য,—সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুন্দর বস্তু, অতি সুগন্ধ, এবং দেখিতে যার পর নাই মনোহর, কিন্তু প্রত্যেক বায়ুতে কলঙ্কিত ও বিঘটিত এবং প্রতি প্রদোবে পর্য্যাসিত । রতি নক্ষত্রের নিমল জ্যোতি, শরৎ শশীর কৌমুদী ছটা,—উচ্চতমা, পরম পবিত্রা এবং নরন ও মনের ভূপ্তি সাধিনী । ভিনস্ও রতি, রতিও রতি ; কিন্তু রতির সতে আশক্তি, ভিনসের সদসৎ সকলেই আশক্তি । রতি পতিব্রতা সতী, ভিনস্ পরম্পূহা বতী । রতি গৌরবিনী, ভিনস্ কলঙ্কিনী ।

হরকোপানলে মদন ভস্মাবশেষ হইলেন । রতি দেখিলেন তাহার জীবনে প্রয়োজন কি ? বিনম্বে পাপ হইতেছে । অতএব সমস্ত জগৎকে বুঝাইলেন, অগ্নি প্রবেশ করিয়া শীঘ্র স্বামী সন্নিধানে গমন করা কর্তব্য, ত্রীর স্বতন্ত্র জীবন ও অবস্থান সম্ভবে না ।

“শশিনাগহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়েতে ।

প্রমদাঃ পতিবত্সর্গা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ।”

তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে

স্বামী বিনা জীবন দীপশূন্য দশার
ন্যায় নিতান্ত অকর্ণণ্য ও অকিঞ্চিৎকর ।
আশ্রয় রক্ষের পতনে আশ্রিতা মতীর অন্য
গতি নাই । অতএব স্বামীসখা বসন্তের
নিকট বলিলেন ।

“ গতএব নতে নিবর্ততে
সমখ্যাদীপইবানিলাহতঃ ।
অহমস্যা দশেব পশ্যাম্য
মবিসহ্য বাসনেন ধূমিতাম্ ॥
বিধিনা কৃতমর্কটৈশাসম্
ননুনাং কামবধে বিমুক্ততা
অনপারিনি সংশয় ক্রমে
গজভগ্নে পতনায় বলয়ী । ”

ভিনসের কুকর্মা কলুষিত আত্মার এ-
রূপ ভাব কখনও উদয় হয় নাই । তিনি
স্বকীর স্বামী বর্তমানে, সেই নিরীহ প্রকৃতি
ভ্রলোক ভলকানকে অবজ্ঞা ও অনাদর
করিয়া দেব মানব মধ্যে যাহাকে যখন
মনে হইত তাকেই পতিত্বে বরণ করি-
তেন । দেবসেনাপতি মার্চ এবং অজ্ঞাত
শত্রু অনাগতযৌবন এডনিসের সহিত
তাহার গুপ্ত প্রণয়ের বর্ণনার ইয়োরাপীয়
সকল দেশের কাব্যে কলঙ্কিত । ভলকান
যখন টের পাইতেন তখন ক্রোধে অধীর
হইয়া ভিনসকে প্রহার করিতেন । ভিনস
অনেক সময় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা
করিতেন । এত তাহার নিজের চরিত্র ।
জগতে যত দুর্কর্ম যত অত্যাচার সকলই
ভিনস কর্তৃক সংসাধিত । মেনিলসের
হেলেন পারিসকে দিয়া যে বিষম অনর্থ

সংঘটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ট্রয় না-
গর ধ্বংস হইল, এগামেম্ননের পরিবারের
শোচনীয় দুর্গতি হইল, এবং গ্রীস ও ট্রয়ের
বীরকুল নিশূল হইল ।

কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়
যে গ্রীক কবি প্রণয়কে স্বাধীন করিতে
গিয়া, স্বাধীন মকরকেতুকে বিনাহ বন্ধনে
বদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এরূপ করিয়া-
ছেন । যাহাকে ইংরেজীতে ‘ ফিলভ ’
অর্থাৎ স্বাধীন প্রণয় বলে তাহা গ্রীক ক-
বির অনুমোদিত । কিন্তু আর্য্য কবির মত
মেরূপ নহে । যেমন এক উৎসের জল
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইলে তাহার বেগ, গভী-
রতা, তরঙ্গ, তর্জন কিছুই থাকে না, সেই-
রূপ হৃদয়ের তরলতা, প্রণয়ের উৎসের
পবিত্রতার এক স্রোতে প্রধাবিত না হইলে
কখনই নিত্য, গম্ভীর, অবিরামবাহী এবং
‘ তটাবিস্তীর্ণ ’ হইতে পারে না । এমতটি
যে কেবল যুক্তিধারা সাধা এমন নয় ;
এটি নীতি শাস্ত্রের ভিত্তিভূমি । প্রণয় বি-
কৃত হইয়া উদ্ভ্রান্ত ও উন্মত্ত হইলেও আদার
পরিবর্তন করিতে পারে না, তাহা করিলে
আর তখন ঐ নাম থাকে না । সে প্রণয়ের
বিড়ম্বনা মাত্র । যদি ভাসবাসা কবির কল্পনা
মাত্র না হইয়া প্রকৃত কিছু থাকে তবে সে
একের জন্য । প্রণয় ‘ একমেবাদ্বিতীয়ম্ । ’
ভিনস ও রতিতে যে প্রভেদ তাহা প্রদর্শিত
হইল । এক্ষণে বলা বাহুল্যে রতির শ্রেষ্ঠত্ব
বিষয়ে দ্বিধা করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক
হইবে ।

। চেরিটেস্ (এস্) সহ ষষ্ঠীদেবীর তুলনাবলে উভয়েই মাতৃস্বরূপা, হৃদয়ানন্দ বিধায়িনী। গ্রীক কবি যতটি দেবমূর্তি ও প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছেন চেরিটেস্ সর্বো-
পেক্ষা মনোহারিনী হইয়াছে। কবির ম-
নের গতি আর চিত্রকরের তুলি সকল স-
ময়ে একরূপ থাকে না। মনের সুখের
অনুভাব যাহা কল্পনা করা যায় তাহা অ-
পেক্ষাকৃত সুন্দর হয়। চেরিটেস্ সেই সুখের
সময় কল্পিত হইয়াছিলেন সংশয় নাই।

ঐ দেখ পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা
রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছিল,
মূর্তিমতী ককণা, স্নেহময়ী জননী তাহাদের
দুঃখে দুঃখিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে অভয় ও
আহার দান করিতেছেন এবং বামহস্তে
পরামর্শনে সকলের দুঃখ দূর ও শরীরশীতল
করিতেছেন। কি মনোহারিনী মূর্তি! যেন
হিন্দুদিগের পাষানময়ী অগচ হৃদয়শীলা
ককণাময়ী। তাঁহাকে মিস্ট্রও বলে। নি-
রাশ্রয়ের আশ্রয়দান, নিরন্নকে অন্ন বিতরণ
এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করণ তাঁহার
নিত্য কার্য।

আমাদের ষষ্ঠী দেবীও এই প্রকার হৃ-
দয়ানন্দদায়িনী। শিশু মাতৃ অঙ্ক আঁধার
করিয়া পরলোক গমন করিতেছে, মাতা
ষষ্ঠী তাহাকে সাদরে ধূলাসহ অঙ্কে লইতে-
ছেন—হুণা নাই, অনাদর নাই; আর মিস্ট্র
বাক্যে বালককে বুঝাইয়া ও নানাপ্রকার
আশ্বাস দিয়া পুত্রপ্রার্থিনী সমক্ষে পা-
ঠাইতেছেন। নিঃসন্তান মলিনবদন ল-

লনা মনের বেদনার ক্রন্দনে চক্ষু কুলাই-
তেছে, তাহার হৃদয়ে তনয়াভাবে গুরুতর
আঘাত লাগিতেছে; যখন তাহার সমক্ষে
অন্যের বালক তাহার আপন জননীকে
মা মা বলিয়া আশ্রয় আশ্রয় সন্মো-
দন করিয়া তাঁহার শ্রবণ যুগলে অমৃত
বর্ষন করিতেছে, প্রবালবৎ অপর অর্ক বি-
স্তার করিয়া যুক্তাশুভ দশনজ্যোতি বি-
কাশ করিতেছে, এবং কচি কচি মুখ খা-
নিতে মধুর হাসি হাসিতেছে তখন তাহার
মনে সম্মানভাবে কত কি লইতেছে, তা-
হার ইচ্ছা করা দুঃসাধ্য। এক একটি
উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত হইয়া নাসরিক্স পু-
ড়িয়া যাইতেছে, কোনটি বা অন্তর্গম্য
হইয়া হৃদয় স্তরে স্তরে দ্রব করিতেছে, এবং
তাহার পূর্ণেন্দু সদৃশ বদন স্নান করিতেছে।
তখন ষষ্ঠীদেবী তাহার প্রার্থনার সন্তুষ্ট
হইয়া তাহার উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ প্রশ-
মিত করণার্থ তাহার অঙ্ক নবকুমারে শ্রো-
ভিত করিতেছেন।

চেরিটেস্ তিনজন। পার্সীতে সহচরী
জয়া বিজয়া নাম তাঁহার। ভিনস্‌সহ-
চরী। সুতরাং জয়া বিজয়া যেমন পার্সী-
তীর অনুকরণ করেন, তাঁহারাও ভিনসের
অনুকরণ করেন। গ্রীক কবি গোলাপে ক-
টেক, পুষ্পমধুতে বিষ দেখিয়া চেরিটিগ-
ণকে ভিনস্‌সজিনী করিয়াছেন। তাঁহাদের
আচরণ সম্বন্ধে কদম্ব গাণ ও গল্‌পে দুই
গোমুত্র প্রক্ষেপ করিয়াছে।

ভারতের তৃতীয় শ্রেণীর অনেক দেব-

দেবীর কার্যের সহিত, চেষ্টাটেন্দিগের
কার্য্য একা হয় কিন্তু এসকল বিরত
করিলে পাঠকদিগের বিরক্তি জনক
হইবে ভয়ে বিরত রহিলাম । অতঃপর

আর তুলনা করা নিম্নগোজন । যাহা
হইয়াছে তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য
সফল হইবে এমত ভরসা করা যাইতে
পারে ।

কি করি ?

১

কি করি ? জিজ্ঞাসি কারে, কে দিনে উত্তর ?
জ্ঞাতেনি নিশ্বাস সহ, বহে প্রশ্ন অহরহ,
অজ্ঞাতে, নিদ্রায় উঠি,—স্বপনে সিহরি,
শুনি সনিশ্বাস প্রশ্ন—“কি করি কি করি”?

২

কি করি ? ইহার হার ! নাহি কি উত্তর ?
স্বর্গ, মর্ত্য, ধরাতলে, পাতালে, জলপিঞ্জে,
জিজ্ঞাসিনু একে একে, কেহ দয়া করি
দিগ না উত্তর, তবে বল না কি করি ?

৩

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র আলোকে
সাজাইয়া নীলস্বর, চন্দ্রযুগ মনোহর
বিকালি নীরবে আহা ! রহিল চাহিয়া ;
কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া ।

৪

ওই চন্দ্রযুগ আর সেই চন্দ্রযুগ !
ওই চন্দ্র শিলাময়, ওই চন্দ্রে বহিচর
অলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,
দূর হতে সেও যদি এত মনোহর ।

৫

আমার সে পূর্ণচন্দ্র, অমৃত আধার,
অমৃত অধরে ভাসে, অমৃত নরনে হাসে,
আমার সে পূর্ণচন্দ্র স্বধার আকর,
আজি দূর হতে হার ! কতই সুন্দর !

৬

কি করি ? নিষ্ঠুর স্বর্গ,—দিলনা উত্তর,
শুশামাজ ধরাতল, খুলি নিজ বক্ষস্থল,
দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রান্তর,
শ্বাসিল সমীরে দীর্ঘ—দিল না উত্তর ।

৭

বসুন্ধরে ! যাহা ছিল রয়েছে, তোমার,
তথাপি এতঃখ তব, হয় যদি অনুভব,
আমার কুসুমবন, কটেক কানন,
হইয়াছে, মকমর মূর্খের জীবন !

৮

কি করি, কেমনে সহি ? তুমি পারাবার
হার ! তুমি মহাবাতে, ভীষণ তরঙ্গাঘাতে
গর্জিতেছ মহামল্লৈ বিনারি গগন,
ক্ষুদ্র মানবের দুঃখ শুনিবে কখন ?

৯

হার রে সমীম তুমি, তুমি পায়াবার !
অসীম মানব মন, করে যদি বিলোড়ন,
মানসিক ঝটিকায় নাহি তব জ্ঞান
কি ভীষণ দৃশ্য ! সেই নির্মীত তুফান !

১০

কাঁদি ভীষকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার
নিবারহে অমূল্য নিধি : দাক্ষণ সংসারবিধি,
নাহি দিবে সেই শান্তি আমারে কখন,
একই ভরসা মনে নীরব রোদন ।

১১

বাসুকি পাতালে তুমি, সহস্র ফণায়,
ধরিয়াছ এক ধরা ;—তুচ্ছভার বসুকরা,
নিরাশ জীবন সঙ্গে তুলনা তাহার ?
এক ক্ষুদ্র ধূলীসহ তুলনা ধরার ।

১২

কাতর এ তুচ্ছভারে, দিলে না উত্তর ?
শতদন্তে চিরি বুক, একাধারে কত দুখ—
চন্ডের আগ্নেয় গিরি, ধরার কানন,
সমুদ্র তরঙ্গ ভঙ্গ কর দরশন ।

১৩

কিন্তু নাহি সংহে আর, কি করি এখন,
কত কাল সয় বল, হায় এই তীব্রানল,
স্মৃতির সহস্র শিখা—সংসার নির্দয়,
কটকিত, রক্তাক্ত করিবে হৃদয় ?

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই ঝটিকা সংগ্রাম
কতকাল সব আর, হায় এই গুরুভার—
নিরাশ জীবন ভার, কতকাল আর ?
বহিতে হইবে দুঃখ অনন্ত, অপার !

১৫

বহি কারতরে বল ? সে কি ! কার তরে ?
ওই আশা মৃদুস্বরে উত্তরিছে—“তার তরে,
যারে তুমি প্রেম, প্রাণ করেছ অর্পণ,
প্রতিদানে প্রেম, প্রাণ দিগেছে যে জন ।”

১৬

কিবা দান, প্রতিদান ! কিবা বিনিময়,
হায় এই ধরাতলে ; এই এক সুর ফলে
যে দিগেছে, যে পোরেছে দুই পুণাবান,
কোথা স্বর্গ ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম !

১৭

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদূরে আমার,
যা দিয়াছি অতি ক্ষুদ্র, যা পোরেছি সে সমুদ্র,
দিগে এই তুচ্ছ প্রাণ প্রেরণী আমার !
পোরেছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার !

১৮

তুমি যারে প্রিয়তমে বলেছ তোমার
তোমাতে যে এসংসারে, আমার বলিতে পারে
ধরাতলে সেই সুরখী, সেই ভাগাবান,
মানব জীবন তার নন্দন উদ্যান ।

১৯

তবে কেন কি করিব ? আমি দীন হীনে,
হায়রে অমূল্য নিধি, দিয়াও দিলনা বিধি,
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাই হবে দরশন ।
“কি করি কি করি” তাই ভাবি অনুক্ষণ ।

২০

হায় ! হেন রত্নহার পড়িয়া গলায়,
না পারি নু সগরবে, ধামিতে বিম্বিত ভবে,
জগত করিতে আলো রূপের প্রভাষ,
কি করি কি করি—তাই ভাবি কি সদায় ?

২১

শোভিবে না সেই বড় গলায় আমার,
নাহি চাহি দরশন, নাহি চাহি পরশন,
একবার বল প্রিয়ে তুমি কি আমার,
পরাতলে আমি কিছু নাহি চাহি আর ।

২২

কি করিব ? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়
জলপি ফনয়ে হার, স্থাপির হে পুর্নিমায়,
নবোদিত পূর্ণশনি চাক্র কোৎসার
বিভাসি অনন্তব্যাপি, সিকুনীলিমায় ।

২৩

আশার স্বদূর প্রান্তে তেমতি তোমায়
স্থাপিয়া ভীষন মম, এই নীল সিন্ধুসম,
ঝলসিব, মুখ দুঃখ তরঙ্গ নিচয়
সচঞ্চল হবেন তব প্রতিবিসময় ।

২৪

জ্বলিবে, নিবিবে, উর্মি হাসিবে নাচিবে
সেই প্রতিবিসময়ে ; অনন্ত আশার জলে,
সেই হৃতা, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া
আশা জলে দেহ তরি দিব ভাসাইয়া ।

প্রমোদিনী ।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

লুতাত্ত্ব ।

দিস্তীর্ণ জলরাশি । পূর্বদিকে দৃষ্টি-
পাত করিলে বোধ হয় কুজ্জ্বলিকা যেন
এই রৌদ্রের সমরও জল এবং আকাশ
সংযুক্ত করিয়া রহিয়াছে । শূন্যে, বায়ু-
সমুদ্রে কি যেন জ্বলন্ত কল্পিত হইতেছে,
বুঝি এ নিদারুণ গ্রীষ্ম অসহ্য হওয়ার জল-
নিধি ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে-
ছেন, তাই বায়ু এত কাঁপিতেছে । বেলা
এক প্রহরের অধিক নাই । একজন পথ-
শান্ত অশ্বারোহী উপকূলবর্তী একটি বৃক্ষ-
শাখায় অশ্ববন্ধন করিয়া তরুণে বসিয়া

আছেন, বিশ্রাম করিতেছেন । দেখিতে-
ছেন, একটি নবপল্লবও সঞ্চালিত হইতেছে
না, অথচ বীচিমাল্য-সমাকীর্ণ সাগরান্থ
অনবরত সমীপবর্তী বেলাভূমি ধৌত ক-
রিতেছে । দক্ষিণানিল সাগর সমিলে অ-
বগাহন করিয়া মধ্যো মধ্যো শীতল হস্তে
পথিকের ললাটে স্পর্শ করিতেছে । সহসা
একখণ্ড মেঘ আসিয়া স্বর্ধাকে ঢাকিয়া
ফেলিল, অপ্রকৃত জলধির নীল শরীর গাঢ়
নীলবর্ণ হইল । বাতাস বহিতে লাগিল ;
অশান্ত উর্মিরাজি আরও অশান্ত হইয়া
উঠিল ; এক একটি তরঙ্গ পর্বতশীর্ষ হইতেও
উচ্চ হইয়া শতধা বিভক্ত হইতে লাগিল ।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেত্রাঘাত তরুণী সকল কো-

প্রায় ছুটিয়া গেল তাহার চিহ্ন মাত্রও
 রহিল না। পথিক তখন দুর্ঘ্যোগের লক্ষণ
 দেখিয়া আশ্রয়স্থান লাভে ব্যগ্র হইলেন,
 এবং সত্বর অশ্বারোহণ করিয়া প্রাণপণে
 ঘোটক চালাইতে লাগিলেন। তিনি এ-
 প্রদেশে ইতঃপূর্বে আর আইসেন নাই,
 সুতরাং এত অল্প সময়ে যে আকাশের এত-
 পরিবর্তন ঘটিবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই,
 এবং এই জন্যই এত আশ্বস্তিতে বসিয়া-
 ছিলেন। কিয়দূর গমনের পরই ঝটিকা
 সহ স্রষ্টি ও করকাপাত হইতে লাগিল।
 মেঘের ঘন ঘন গর্জনে তাঁহার অন্তঃ-
 করণ নিতান্ত ভীত হইল এবং তিনি অশ্ব
 তীব্রতর কশাঘাত করিতে লাগিলেন।
 সহসা একটি অটালিকা তাঁহার নিকটবর্তী
 হইল। তারাতারি অশ্বটিকে নিকটস্থ
 রক্ষশাখায় বন্ধন করিয়া যেমন কিষ্কিৎ
 অগ্নিসর হইয়াছেন অমনি সেই তুরঙ্গের
 উপর বজ্রপাত হইল। অশ্বের প্রাণ বহি-
 র্গত হইল, তথাপি দাঁড়াইয়াই রহিল।
 সেই ভীষণ শব্দে এবং নরনাক্কক বি-
 ছাতালোকে পথিকও অচেতন হইয়া
 প্রাচীরপার্শ্বে পতিত রহিলেন।

পরক্ষণেই অটালিকার গবাক্ষ এবং
 কবাট সমূহ উন্মুক্ত হইল, কএকটি লোক
 আসিয়া মৃতকম্প পথিককে সমস্তে উঠা-
 ইয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁ-
 হার চৈতন্য সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিতে
 লাগিল। অল্পকাল পরেই তিনি সংজ্ঞা
 লাভ করিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার

মনে হইল যে দীর্ঘপথের একমাত্র সহচর
 প্রিয় অশ্বটি জীবিত নাই, তাহার উপরই
 বজ্রপাত হইয়াছে। পথিক অত্যন্ত দুঃখিত
 হইলেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া
 শয়ন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত
 হইলে পর নরন উন্মোলন করিলেন। দে-
 খিলেন, দুইটি পরম সুন্দরী ললন। এক-
 পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে তাঁহাকে
 নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে যেন
 আবার বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল, কিন্তু এবার
 জ্যোতি স্থির,—সুখদ। একটির বয়স আ-
 ন্দাজ অষ্টাদশ বৎসর—মোহন যৌবনপূর্ণ।
 তিনি অপূর্ব অঙ্গজ্যোতিবিশিষ্টা; গৌর-
 বর্ণা, এবং শুভবসনপরিহিতা; দেখিতে
 যেন ঈশা দেবীর ললাটদেশস্থ সমুজ্জ্বল ন-
 ক্ষত্র, সুন্দর অথচ ঈষৎস্নান। অপরা পঞ্চ-
 দশবর্ষীয়া, যৌবন সোপানে দণ্ডায়মানা;
 অতুলা মুখকমলে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের
 অনবদ্য লাবণ্যযুক্ত গঠনে, মনোহর কেশ-
 গুচ্ছে রূপমাধুরী যেন উছলিয়া পড়ি-
 তেছে। কি সুন্দর সুদীর্ঘ নয়ন, কি মনো-
 হারিনী ঐক্যভঙ্গী, কি অনির্বচনীয় অধর
 শোভা! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুস্বিক্ষ মুখশ্রীতে
 এবং লাবণ্যযুক্ত কলেবরে পরম রমণীয়।
 পথিক বুঝিতে পারিলেন প্রথমা বিধবা,
 দ্বিতীয়া কুমারী।

‘প্রথমা বিধবা’? শোচনীয় চিন্তা!
 বিধাতার কি বিবেচনা মাত্রও নাই?
 তিনি গোলাপে কণ্টক দিয়াছেন, ক্ষতি-
 নাই; পুষ্প একদিনেই পর্য্যুষিত হইবে;

চন্দ্র রাহুগ্রস্ত করেন, তাহাতেও বড় আসে যায় না, চন্দ্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের অঙ্গ সম্পর্ক ; চন্দ্র অচেতন পদার্থ, পৃথিবীবহির্ভূত এবং পূর্ণ অবস্থায়ও কলঙ্ক পরিভাগ করে না । কিন্তু যে নয়ন ও মনের তৃপ্তিসাধনের প্রধান সাধন, এমন সুদৃশ্য কমনীয় পদার্থ বালিকার বৈধব্য অসহ্য ! পথিক ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষে জল আসিল ! তিনি মন্তক উন্নত করিয়া কামিনীধরকে দেখিলেন । কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্রই বিধবা কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইলেন । গমন কালে তাঁহার অঙ্গজ্যোতি আবার পথিকের নয়ন স্পর্শ করিল । অপরা দাঁড়াইয়াই রহিলেন ।

আমাদের পথিক যুবক । তাঁহার বয়স ত্রয়োবিংশ অতিক্রম করে নাই । বীরোচিত পূর্ণায়ত শরীর চিন্তার আশ্রয়স্থান হইয়া এপর্যন্ত শরীর শীর্ণ অথবা প্রফুল্ল মুখী মান করে নাই । তিনি যেন নিদাঘের নির্মল আকাশ দেখিতে দেখিতে কালক্রান্তে সুসজ্জিতা সুখের জীবন-তরনী ভাসাইয়াছেন, একটি নিঃশ্বাসেও সেই জলরাশি আন্দোলিত করে নাই । তাঁহার মানস-সরোবরে যেন স্বর্ণ কমল ফুটিয়া রহিয়াছে, মরালবৎ মৃদু মন্দ গমনে স্বর্ণচকু বিস্তার করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন । বীরত্ব এবং দৃঢ়তা সৌন্দর্য্য ও কোমলতার মিশ্রিত হইলে যে একটি গাভীরামিশ্র মনোহর লাবণ্য

উৎপাদন করে যুবকশরীরে তাহাই নিরাক্ষর করিতেছে ।

অপরা দাঁড়াইয়াই রহিয়াছেন । দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন ? পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা যুবকের দিকে একমনে চাহিয়া আছেন, কেবল যুবক যখন সেই প্রফুল্ল মুখ-কমল সন্দর্শন জন্য বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন উত্তোলন করিতেছেন, তিনি তখন আপন নয়ন ভূপৃষ্ঠে রাখিতেছেন । যে বংশে চন্দ্র সূর্য্যের অতিরিক্ত প্রপিতামহ অবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, সেই নির্মল ক্ষত্রিয়কুলেও এমন রত্ন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না । তাই বুঝি প্রমোদিনী সতৃষ্ণ-নয়নে সেই রূপ সুধা পান করিতেছিলেন; তাই বুঝি মনোনিবেশ করিয়া সৌম্যমুষ্টিতে হৃদয়ের অবস্থা পাঠ করিতেছিলেন । অন্যটির এ সংসারের অভিনয় সাজ হইয়াছে—তাঁহার আর আশা কি, দেখাই বা কি, এবং দেখিয়া প্রয়োজনই বা কি ?

যুবকের পাদপ্রান্তে শাস্ত্রপ্রকৃতি একটি পুরুষ এবং শয্যাসমীপে একটি রূদ্ধা স্ত্রী-লোক উপবিষ্ট ছিল । তিনি ইহাদের দুই জনকে পরিচারক এবং পরিচারিকা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন । বর্ষীয়সী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল “আপনার ত কোন শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই ?”

যুবক । “না । কণেক মাত্র কষ্ট ছিল, এখনও কণের নিকট যেন শব্দ হইতেছে । কিন্তু কোন অনিষ্ট ঘটে নাই ।”

রূদ্ধা । “আমরা আত্মাদিত হইলাম ।”

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন “এ স্থানটির নাম কি?” রুদ্রা কহিল “কাল্পীপুর ইহার অতি সন্নিকট। ছাত্তের উপর দাঁড়াইলে রত্নেশ্বরের মন্দির দেখা যায়।” যুবক যেন বিস্ময়াবিত অথচ হর্ষিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রকৃতই কি মন্দিরটি ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত?”

রুদ্রা। “হাঁ, একবার গেলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।”

তখন রুদ্রা আলাপ পরিচয় করিয়া ক্ষণপ্রভাকে আসিতে বলিল। বিধবার নাম ক্ষণপ্রভা। তিনি নিকটে আসিলে ‘এখন যাওয়া উচিত, আর বেলা নাই’ এই কথা বলিয়া প্রমোদিনীকেও সঙ্গে হইতে বলিল। তাঁহারা দুই জনেই দাঁড়াইলেন। কিন্তু প্রমোদ যে অমৃতইন্দ্রে মক্ষিকার ন্যায় মাতার দিতে ইচ্ছা করিতে ছিলেন, তাহার একবিন্দু স্রব পান না করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। স্তব্ধ অমৃতকণাবর্ষী আর দুই একটি কথার শুনিলার জন্য এবং হৃদয়কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া কর্তব্যের অনুরোধে বলিলেন, “কি! ইনি আজ যার পর নাই কষ্ট পাইয়াছেন, অতএব এরা ত্রি এখানে বিশ্রাম করিতে বল।”

যুবকের কর্ণে মধুবর্ষণ হইল! নিদাঘ-শুষ্ক মরুভূমিতে এই প্রথম বৃষ্টি হইল, বারি বিন্দু পতন মাত্রেই শুষ্কিয়া গেল, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। তখন ধন্যবাদ দেওয়া উপলক্ষে দুই একটি কথা বলা স্থির করি-

লেন। বলিলেন, “সুচরিত্রে! আপনার শ্রকোমল হৃদয় যে দরিদ্র পথিকের দুঃখে ব্যথিত হইল এ তাহার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আপনাকে মানসিক কষ্ট দেওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কর্ম। অদ্য জীবন রক্ষা করিয়া আপনারা তাহার যে উপকার করিলেন তাহার প্রতিদান এ পৃথিবীতে সম্ভবে না। জীবনের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক। যে জীবন রক্ষা করিলেন তাহা দান করিলেও যখন উপযুক্ত প্রতিদান হয় না, তখন আর তাহা চিন্তা করা রুখা। আপনার কথার অবশ্য হইতে পারি না, অদ্য রাত্রিতে এই গৃহে অবস্থান করিতে নশ্বত হইলাম। জগদীশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন, আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।”

ক্ষণপ্রভা আবার কক্ষান্তরে লুকাইত হইলেন। প্রমোদিনী সুধাবিশুদ্ধমনে পথিকের কথা গুলি শুনিলেন,—ভাবিলেন “জীবন অপেক্ষা মূল্যবান কোন বস্তু কি এত বড় পৃথিবীর কোন অংশেই নাই? এ সংসারে অপার্থিব, নিত্য সুখদ এমন বস্তু আছে যাহা জীবন হইতেও মূল্যবান। আচ্ছা, যুবকের কথা সফল হউক, আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। উপযুক্ত প্রতিদান যদি না থাকে চাই না, অথবা প্রতিদান আবার কিসের?” প্রকাশে বলিলেন— “আপনার জীবন রক্ষা হইয়াছে এই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।

প্রমোদিনী এতগুলি কথা কহিলেন।

কেন কহিলেন ? অপরিচিত বান্ধবের সহিত
আলাপ করিতে এত সাহসই বা কোথা
হইতে আসিল ? অন্যদিন, যাহাদের সহিত
একত্র অবস্থান তাহাদিগের নিকটেও
কিছু বলিতে সতর্ক, আজ সে ভাব কেনই
বা অস্বস্তিত হইল ? সকল প্রশ্ন নিমেষ
মধ্যে মনে মনে আন্দোলন করিলেন, ল-
জ্জিত হইলেন, মস্তক অবনত করিলেন ।
মনুষ্যের মনোরত্তিগুলি নিতান্ত ভীক, তা-
হার। যে কণ্ঠ আপাততঃ মন্দ বলিয়া মনে
করে অথচ যাহার প্রতিরোধ করিতে পারে
না, তাহা সম্পন্ন হইয়া গেলে পর অধিকক্ষণ
মনকে ভর্তসনাও করিতে পারে না । সেই
সময় কৃতকর্মের অনুকূল শতশত যুক্তি আ-
সিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং মনোরত্তিগুলি
পরাজিত হইয়া নিস্তব্ধ হয় । প্রমোদের
মনে হইল ‘ যুবকের নিকট কিসের লজ্জা ? ’
‘ ইনি আমার ! ’

প্রমোদিনীর এত আশ্লাদ, এত উৎ-
সাহ ! অবোধিনী ! সংসারে সম্পূর্ণ অ-
নভিজ্ঞা, তাই এত আশা, এত চাক্ষু্য ।
ক্ষণপ্রভার মুখে হাসি নাই, স্বভাবজাত
প্রফুল্লতা নাই, কারণ তাহার রঞ্জিত দর্পণ
ভাঙ্গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার । প্রমো-
দের ত তাহা নয় ! তাঁহার দর্পণ প্রতি-
পলে নূতন নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া ভবি-
ষ্যৎ পরম সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে ।
মনে করিতেছেন ‘ অন্য কি শুভদিন ! দি-
বসের চিত্র !, রজনীর স্বপ্ন, কল্পনার ম-
নোহর চিত্র সকলই আজ সকল হইল ।

মনুষ্যে মনুষ্যে কেমন প্রভেদ ! এই বি-
স্তীর্ণ পৃথিবীতে দুই জনও সর্বোৎকৃষ্ট হয়
না, একই অভূত । তিনি কল্পনাবলে ভ-
বিসাং জীবনবস্তুর এক প্রান্ত হইতে অ-
পর প্রান্ত পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন । কিন্তু
মধ্যে যে কত বিজ্ঞান অরণ্য, দুরাবোধ প-
র্ষত, অনন্ত সমুদ্র, প্রাণনাশক কটক থা-
কিতে পারে তাহা একবার মনেও হইল না !

পথিক প্রথম ভাবিয়াছিলেন এই ই-
হাদের বাড়ী । সুতরাং যাওয়ার কথা শু-
নিয়া নিরাশ ও চমৎকৃত হইলেন, তথাপি
প্রমোদিনীর কথা অতিক্রম করিতে না পা-
রিয়া সে রাত্রি সেই গৃহেই অবস্থান ক-
রিতে স্বীকৃত হইলেন । প্রমোদ অতি য-
ত্নের সহিত তাঁহার আহার ও শয্যার যথা-
সম্ভব সুবিধা করিয়া দিয়া ক্ষণপ্রভা এবং
দাস দাসী সহ বহির্গত হইলেন । যতক্ষণ
যুবকের মস্তক নত ছিল ততক্ষণ তাঁহাকে
দেখিতে দেখিতে গেলেন, কিন্তু যখন বু-
ঝিলেন, যুবকচক্ষু তাঁহার অনুসরণ করি-
তেছে তখন আর ফিরিয়া চাহিলেন না ।
শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন ।

পথিক আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ
শয়ন করিলেন । নিয়োজিত দানগণ তাঁ-
হার বাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি
বিশেষ মনোযোগী ছিল, তথাপি তাঁহার
সুখবোধ হইল না । তাঁহার নিকট সে গৃহ
দশমীর পর চণ্ডীমণ্ডপ, অথবা অভিনয়
সমাপনান্তে নাট্যশালার ন্যায় বোধ
হইতে, লাগিল । তিনি মনঃচক্ষুতে

সেই পূর্ণেশ্বরদন, সেই গৌরব ও গান্ধীর্ষ্য-
মিশ্রিত হাসি হাসি মুখকান্তি, এবং
প্রকৃত চক্ষু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।
যখন নিজাবেশ হইল, দেখিলেন বজ্রপাত
হইল, সৌদামিনী বহির্গত হইয়া দুইভাগে
বিভক্ত হইল, এবং দুইটি অপূর্ণ বামামূর্তি
ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।—একটি স্থির
শুভ্র, কিন্তু জ্যোতি ক্ষণস্থায়ী; অপরটি কিঞ্চিৎ
রক্তিমাত, কিঞ্চিৎ তরল ও চপল অথচ-
স্থায়ী, এবং বাহ্যিক দাহিকাশক্তি বিহীন
হইয়াও অন্তর্দাহী। আবার সহসাই যেন
পরিবর্তন। পণিকের বোধ হইতেছে কা-
হার যেন অনুসরণ করিতেছেন, কিন্তু
ধরিতে পারিতেছেন না। তিনি যেন রা-
শীকৃত বালুকাস্তপে দণ্ডায়মান হইতে প্র-
য়াস পাঠিতেছেন, কিন্তু পদতল হইতে
বালুকা সকল সরিয়া যাইতেছে! কিছুই
স্থির থাকিতেছে না। মনে আশা ও নি-
রাশায় ভরানক বিবাদ আরম্ভ, কে জয়ী
হইবে নিশ্চয় নাই।

যুবক ভাবিতে লাগিলেন “আমি কি ক্ষ-
ণেই উর্গনভের তন্তুনির্মিত জালের এক
প্রান্ত স্পর্শ করিলাম, উর্গনভ সুদূরবর্তী প্রান্তে
পলায়ন করিল! যদি হাত না দিতাম, হৃ-
দয়-স্রোতের গাঁথনি দেখিয়া লইতে পারিতাম।
প্রণয়-তন্তু স্পর্শ করিয়া নিজের শান্তি মুখ
সকলই বিসর্জন দিলাম! না, লুতা স্বজা-
লেই বদ্ধ, যে জাল বিস্তার করিয়াছে সে
সুদূরবর্তী পাশ্বে পলাইলেও জাল পরিত্যাগ
করিবে না। তবে আমার অমুখ কি?”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মক্কাভূমে প্রবাহিনী।

“আপনি আমাদের দক্ষিণ বাহু। বাহ-
মনি রাজা আপন। হইতে কত উপকার লাভ
করিয়াছে ইয়ত্তা করা যায় না। এরাজ্য
কতটুকু ছিল? আপনার বুদ্ধি বলে ক-
ক্ষণ প্রদেশ অতি সহজে আমাদের হস্তগত
হইল, পূর্ববর্তী দুইজন নবাব যাহাতে অ-
কৃতকার্য হইয়াছেন আপনি তাহা নিমেষ
মধ্যে সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। পরাক্রান্ত
বিজয় নগরের রাজাকে পরাভূত করিয়া
গোরা প্রদেশ অধিকার করিলেন, উড়িষ্যা-
ধিপতিকে আশ্রয় দান করিয়া সিংহাসনে
পুনঃস্থাপন এবং তৎসঙ্গে আমাদের গো-
রব বুদ্ধি করিয়া তুলিলেন। কন্সাপিলি ও
রাজমহেন্দ্রী আমাদের রাজ্যভুক্ত হইল।
অল্প দিন মধ্যেই এই বহুনিষ্ঠীর্ণ ভূভাগে
মুনিয়ম ব্যবস্থাপিত এবং মুশাসন প্রতি-
ষ্ঠিত হইল, প্রজাদের অনবরত সমরজ-
নিত অমুখ আর রহিল না। পরাক্রান্ত
হিন্দুরাজগণ দূর হইতে এদেশ প্রতি দৃষ্টি-
পাত করিতেও আর সাহসী হরেন না।
যত্ন আমার জননী বুদ্ধিকোশল ও বিচার-
ক্ষমতা। শুভক্ষণে আপনার উন্নতিপথের
কণ্টক অপসারিত করিয়াছিলেন। আমরা
যেমন আপনার নিকট, আমাদের রাজ্যও
সেইরূপ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বর্তমান
দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং উড়িষ্যা-বিজ্রোহ
দমন করার যে প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন ক-

রিলেন, এসকল বিষয়ে আমি যেন এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক আছি এইরূপ ভাবিয়া কার্য করিবেন ।” শাহ এই বলিয়া নীরব হইলেন মন্ত্রীশ্রেষ্ঠ মহম্মদ গাওয়ান তখন কহিতে লাগিলেন ।

“ মহাশয় ! আমি আপনার আজ্ঞাধীন ভূতা, নিজ ক্ষমতার কিছুই করিবার সাধ্য নাই । আপনি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলােন আমি তখনও আপনার জননীৰ অনুমতি না লইয়া কোন কার্য করি নাই । তবে যখন সচিবস্থলে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তখন আমার বুদ্ধিতে যাহা উত্তম বোধ হয় তাহা পরামর্শ দিয়া থাকি মাত্র । আমি ক্ষমতার জ্ঞাত লোক নই । যখন যে কার্য করি যদি তাহাতে আপনার মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে পারি তবেই আমার পরিশ্রম সফল । যখন কার্যভার গ্রহণ করিয়াছি এজীবনের শেষ যুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এ শরীর এবং মন আপনার শরীরে শোণিতের শেষ বিন্দু থাকি পর্য্যন্ত আপনার হিত সাধনে অবহিত থাকিব । আমি উড়িষ্যার বিদ্রোহে ভীত নহি, ঈশ্বর প্রসাদে অতি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব এবং ভরসা করি এই সুযোগে আমাদের রাজ্যের আরতন আরও বৃদ্ধি হইবে । কিন্তু নিরন্তরদিগের অল্প কষ্ট নিবারণ চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত আছি ।”

যামুদের আশ্বাস বাক্যে মহম্মদ শাহের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল । অল্পকাল মধ্যেই স্থির হইল, অনতিবিলম্বে উড়িষ্যার

বিকল্পে ধাবমান হইতে হইবে । বৃদ্ধ মন্ত্রী সাহস দৃষ্টে শাহও সাহসী হইয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং এই যুদ্ধে যাইবেন স্থির হইয়া গেল । নির্দ্ধারিত দিবস তিনি সকলের নিকট বিদায় লইতে অঙ্গরে প্রবেশ করিলেন । মন্ত্রী একটি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম এসফ আদেল । তিনি বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীর অনুকৃতি হইয়া উঠিতে লাগিলেন । তাঁহার সমবয়স্ক আর একটি যুবক যামুদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন ; তিনি ক্ষত্রীয়, নাম ধরনী নাথ । অতি কিশোর বয়সেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন । বিশেষতঃ পারস্য ভাষায় এবং রাজনীতিতে বিলক্ষণ আনুরক্তি থাকা এবং গৃহপালিত সিংহের আর নজ্ঞ অথচ গৌরবপূর্ণ স্বভাব গুণে তিনি আদেল অপেক্ষাও মন্ত্রীর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন । গাওয়ান এই দুই তরুণ বয়স্ক প্রশস্ত চিত্ত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং বিদ্রোহ দমনে প্ররত্ত হইলেন ।

প্রথমতঃ, বিবেচনা করিলেন, যুদ্ধ উপস্থিত, এসময় রাজকোষ হইতে অধিক অর্থব্যয় করা যুক্তি যুক্ত নয় । অতএব দুর্ভিক্ষ নিবারণে নিজের ধনাগার উন্মুক্ত করিলেন । তাঁহার প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, নিজের দৈনিক ব্যয়ের জন্য বেতন হইতে দুই টাকা নির্দ্ধারণ করিলেন, তদ্বারা পত্রিকারের ভরণ পোষণ নিৰ্ব্বাহ হইত ।

দুর্ভিক্ষ প্রণীড়িত প্রদেশ সমূহে প্রথমতঃ পুষ্কাশ লক্ষ, পরে আর পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। ইহার পর সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এবং গৃহ শয্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া আরক্ত কার্য সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। এত অর্থ থাকিতেও তিনি নিতান্ত দরিদ্রবৎ কাল যাপন করিতেন। কারণ, তাঁহার মনে এই ধারণা ছিল পূর্ব পুরুষেরা কোন মহাদ্রোশ্য সাধনের জন্য এত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ তাহার প্রশস্ত সন্ধ্যাবহারের পথ দেখিলেন, তাই সর্ব্বশ্রম বিতরণ করিয়া বসিলেন। তাহার পর রাষ্ট্রসরকারে তাঁহার যে নির্দ্ধারিত জায়-গীর ও রুতি প্রভৃতি ছিল অল্প বেতন ভোগী-কর্মচারীগণের মধ্যে সে সমস্ত বিতরণ করিয়া দিলেন। এই সমুদায় দান রাজার নামে করা হইল। এইরূপে অপরিমিত বদান্যতার সহিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া উঠিলেন। তাহার নোংরার গৃহও একটি অল্প ছত্র হইয়াছিল, প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকে আহ্বার পাইত। দেশ বিদেশে সকলেই একবাক্যে বলিত এমন উদার প্রকৃতি প্রশস্তমনা ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই।

মহম্মদশাহ যুদ্ধগমন জন্য মাতার অনুমতি চাহিলেন। রক্তা বেগমের একমাত্র প্রশ্ন মন্ত্রী যাইবেন কিনা? গাওরান স্বয়ং সেনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আর আপত্তি করিলেন না, আশীর্ব্বাদ ক-

রিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন তিনি প্রণয়িনী নুরনেহারের নিকট গমন করিলেন।

নুরনেহার একাকিনী বসিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রটি এক পাশে বসিয়া, মধুর হাসিতে, আধ আধ ভাষে কমনীর অঙ্গন-ফালনে মাতৃহৃদয়ে সুধাবর্ষণ করিতেছিল; মাতা তাই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শাহকে আগত দেখিয়া গাঁত্রোস্থান করিলেন, এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া জঙ্ঘু চুষন করিলেন। শাহ তাঁহার হস্তধরিয়া মাদরে উঠাইলেন। নুরনেহার তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, এবং রণবেশ দেখিয়া ভীতা হইলেন। যুবতী প্রণয়িনীর নিকট হইতে যুদ্ধে যাইবার জন্য বিদায় লওয়া বড় সহজ নয়। মহম্মদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটি কথাও বলিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার কম্পনা যেন ক্ষণেকের তরে বালকটিকে পিছুহীন এবং প্রণয় পুত্রলি নুরনেহারকে এই বিস্তীর্ণা পৃথিবীতে একাকিনী দেখিল। অঙ্গক্ষণ পরেই হৃদয় যেন চমকিয়া সচেতন হইল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস তাগ করিয়া প্রিয়তমার হস্তধারণ করিলেন, এবং সেই প্রণয়পূর্ণ বিশ্ববিমোহন মুখের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ‘এখন যাই?’ তিনি যে যুদ্ধে যাইবেন একথা অপৰ্য্যন্ত বলেন নাই, অথচ তাঁহার মনে হইতেছিল বলিয়াছেন; সুতরাং বলিয়া উঠিলেন ‘তবে এখন যাই?’

নূরুন্নেহারের শরীর শীহরিয়া উঠিল, শাহের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনার অজ্ঞাতসারে শযাপাশে বসিয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল কমনে ঈষৎ কালিয়া আশ্রয় করিল, স্বামীর প্রতি কিরংকাল স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন, শরীরে ঘর্ষ ছুটিল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, অস্পৃষ্টমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কোথায় ? কি জন্য ?’ শাহ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সবিস্তার সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নূরুন্নেহারের পাশ্বেদেশে উপবেশন করিলেন, সুন্দরীর মুকোমল শ্রীবা ঈষৎ হেলিয়া স্বামীর বক্ষঃসংলগ্ন হইল। উভয়েই নীরব রহিলেন। উভয়েই যেন নিদ্রিত। সম্রাট যখন আবার বলিলেন ‘এখন বিদায়, বাঁচিয়া থাকিলে সাফাৎ হইবেন’ রাজ্ঞী দুশ্শব্দ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সচেতন হইয়াই যেন বলিলেন ‘যখন যাওয়া স্থির হইয়াছে তখন আর কি আমার কথায় থাকিবেন ? যাইবেন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই বালক—’ আর বাক্য ক্ষুদ্র হইল না। বক্ষঃস্থলের গুরু আঘাত যেন শাহের কণ্ঠগোচর হইতে লাগিল। যখন তাঁহার কণ্ঠ মুকোমল বাহুবলী অর্পিত হইল তখন যেন সকল সঙ্কল্প অন্তর্হিত হইল। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর শাহের যুবরুদয়ে বশোলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিল। আশ্রু আশ্রু কণ্ঠ হইতে কোমল হাত দুই খানি খুলিয়া রাখিলেন, আর অপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না।

‘তবে এখন ?’ এই বলিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার কণ্ঠ শুনি ‘হৃদয়’।

শাহ জ্ঞতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধরনীনাথ এবং এসফ আদেল অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রী মহাশয়ের এত বিলম্ব কেন তাহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহম্মদ যখন আন্দরে প্রবেশ করেন তখন মন্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ‘পথে যদি গোলাপ পুষ্প কাহারও কার্ষাক্ষম হস্ত আকর্ষণ করে তাহার কটক বাতীত আর কিছুই লাভ হয় না।’ এই কথাটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। একবার স্থিরভাবে ঈষৎ হাসির সহিত কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এসফ হাসিলেন, কিন্তু কথা যেন ধরনীর হৃদয় স্পর্শ করিল, স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ‘কটক বাতীত আর কিছুই লাভ হয় না।’

অদ্য গাওয়ানের আসিতে এত বিলম্ব কেন ? অন্য দিন যিনি সকলের অগ্রগামী অদ্য কেন তিনি আসিতেছেন না ? কাহার জন্য গৃহে বসিয়া আছেন। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই কাহার সহিত আলাপে এত ব্যাপৃত। ঐ যে স্বর্ণলতার ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী একটি অন্টম বর্ষীয়া বালিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ওটি কে ? গুলনেয়ার—মন্ত্রী মহাশয়ের বার্কিকোর সম্বল, একমাত্র অপত্য স্নেহের পুতুল। গুলনেয়ারকে এক বৎসর রাখিয়া তাহার মাতার লোকান্তর

হয়। বালিকা তদবধি পিতৃবাৎসল্যে প্রতি
পালিত হওয়ার তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে
পারে না। তাহার জনাই মায়ুনের
এত বিলম্ব।

মহম্মদশাহ সহজে মাতার নিকট বি-
দায় হইতে পারিলেন,—মাতা বুদ্ধিমতী,
রাজ্যশাসন করিয়াছেন, প্রয়োজন বুঝেন।
প্রমোদিনীর নিকটে বিদায় লইতে কষ্ট হইল
বটে কিন্তু বরষেহারও যুবতী, বুদ্ধিশীল।—
তিনি হৃদয়ের অগ্নি গুপ্ত রাখিতে জানেন।
কিন্তু মন্ত্রী বিদায় তেমন সহজ নয়। অ-
ষ্টমবর্ষীয়া বালিকা মুখ চায়, দুঃখ বুঝে
কিন্তু প্রয়োজন বুঝে না; হৃদয়ের অনলও
গোপন করিতে শিখে নাই। সে মাতৃহীনা
জন্মদুঃখিনী। সে কাহার নিকটে থাকি-
বে? পৃথিবী, রাজা, রাজ্য, মুক্ত বিব্রাহ
এসমস্ত তাহার মনে স্থান পায় না, সে
এইমাত্র জানে তাহার পিতাই সকল।
লোকে যখন তাঁহাকে প্রশংসা করে
সরসী বাল্য সতৃষ্ণমনে সেই প্রশংসা-সুধা
পান করিয়া মুখী হয়।

মন্ত্রী বলিলেন “মা! এখন আসি
গিয়ে”। সর্বনাশ উপস্থিত! গুলনের
কক্ষিৎ দূরে ছিল, বাস্ততার সহিত দৌ-
ড়িয়া যাইয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধ-
রিল; মন্ত্রীর সাধা কি এক পা অগ্রসর
হন! হতবুদ্ধি হইলেন। যখন গুলনের
কাঁদিয়া তাহার মা নাই ভাই নাই
এই সকল কথা বলিতে লাগিল তখন
সচিবশ্রেষ্ঠ গাওয়ান আর অশ্রু সংধরণ

করিতে পারিলেন না, নিম্নারিনী পর্কত
হইতে বাহির হইল। কোথায় তাঁহার প-
রাক্রম, কোথায় বা বুদ্ধি! তিনি একগে
অবলার অশ্রু অপেক্ষাও দুর্বল, নিম্না
হইতেও বশীভূত, নিরাশ্রয়া নিদ্রিতা যুবতী
অপেক্ষাও আশ্রয়বিহীন এবং অজ্ঞানতা-
পেক্ষাও নির্দোষ। অষ্টমবর্ষীয়া বালি-
কার অশ্রুর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত
হইলেন! ধন্য পিতৃশ্রদ্ধা, ধন্য মাতৃনেত্র
প্রতি ভালবাসা। যে ব্যক্তির হিমার্জি-
বৎ অবিচলিত হৃদয় বৃদ্ধবয়সে পড়িবিবাহে,
উপযুক্ত পুত্রশোকে, পরাজিতের আর্তি-
নাদে কখনও প্রকাশ হয় নাই, যাহার
আবেগ, তরঙ্গ, গভীরতা কেহই পরিমাণ
করিতে পারে নাই, অষ্টমবর্ষীয়া বা-
লিকা সেই হৃদয় প্রবীভূত করিল; এতকাল
যে স্রোত অন্তরে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহাকে
দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়াছে, আজি তাহা নরন
পথে বাহির হইল। বৃদ্ধ কথাকে অনেক
বুঝাইলেন, বালিকা তাহা বুঝিল না, শু-
নিল না, কোন প্রলোভনেই তাহাকে
পিতার সঙ্গে যাওয়ার সঙ্কল্প হইতে বিরত
করিতে পারিল না। গাওয়ান বাহ্যিক
আকারে এবং পারিবারিক বিপদ সমু-
হের আক্রমণে মকড়মির আগ্নেয় পর্কত।
জল যে কত বালুকার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত
কেহই বুঝিতে পারে না। উপরে সহস্র
রশ্মি অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন, অভ্যন্তরে
অগ্নিরাশি অনবরতঃ জ্বলিতেছে। অদ্য
কোথা হইতে যেন এক বিন্দু জল সেই

অগ্নিতে পতিত হইল, মস্তুর হৃদয়ানল বর্জিতশিখায় জ্বলিয়া উঠিল। নির্যাসিনী বালুকারাশি প্রাবিত করিল, সকলে দে-
খিল, পাদদেশে শায়ন শস্যক্ষেত্র ! ম-
নের এই সুকোমল অবস্থায় বালিকার সু-
কোমল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারি-
লেন না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাঁতে
স্বীকার করিলেন।

মহম্মদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া
সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,
সকলের হৃদয় আত্ম হইল। সকলে গুল-
নেয়ারকে পূর্বপেক্ষাও অধিক স্নেহ
করিতে লাগিল। ভক্তগণ যেমন উপাস্য
দেবতাকে মধ্যাহ্নে রাখিয়া সমারোহ-
পূর্বক লইয়া যায়, সেনাগণও সেইরূপ
আলোকলতাসদৃশ, কীর্ণাদী, মাতৃহীনা,
বৃষ্টিমতী সরলতা গুলনেয়ারকে সঙ্গে ল-
ইয়া চলিল। কিন্তু অবোধিনী কোথায়
চলিল?—সেখানে যুদ্ধের ভীষণ শব্দ, অ-
শ্রের হেবারন, গজের রংহণ ধনি, অস্ত্রের
ঝন্ঝনি ভয়ঙ্কর কোলাহল উৎপাদন ক-
রিয়া মাতৃগর্ভস্থ শিশুকেও কম্পিত
করিয়া তুলিবে; যে স্থানের মৃত্তিকা রক্ত-
স্রোতে প্রাবিত হইবে, সহস্র শৃগাল গৃ-
ধিনী প্রভৃতি মৃতশরীর বিদারণ করিয়া
ভক্ষণ করিবে এবং তদর্শনে তাহাদের
পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়বর্গ হাহা-
কার করিবে। সেখানে কি দেখিবে? কোন
মুখ লাভ করিবে? আর তাহার পিতা
সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, দেখেন না

কখন যদি তাহার যুদ্ধক্ষেত্রে পতন ক-
থবা পথেই আকস্মিক পূর্ণ হয় তবেই বা
তাহার কি দশা হইবে? এ সকল নিতান্ত
প্রয়োজনীয় কথাও তাহার মনে আসিল
না। অবোধিনী যুদ্ধে চলিল। তাহার
মনে আছে পিতার সহিত যাঁতেছে আর
কিসের ভয়? কেবল বর্তমানই তাহার
দিব্যচনা ও আলোচনার বিষয়। রাত্রি
প্রভাত হইলে যে কি হইবে অনাগতবুদ্ধি
বালিকা কি তাহা চিন্তা করিতে পারে?
সে কিছুই ভাবিল না, আত্মাদে মস্তুর
সহিত যুদ্ধে চলিল।

এক দিবস পথে নিশীথ সময়ে মস্তুর
আপন শিবির মধ্যে পটমণ্ডপে শয়ান
আছেন, কতটিও নিকটে শুইয়া আছে।
মামুদ স্বপ্নে দেখিলেন কতটি নিকটে নাই,
চমকিয়া উঠিলেন। জাগরিত হইয়া শয্যা
অনুসন্ধান করিলেন, তনয়া নাই; প্রদীপের
আলোকে দেখিলেন সকলই শূন্য, নিস্তব্ধ;
তাঁহার প্রাণের গুলনেয়ার বস্ত্রগৃহেও
নাই; কি আশ্চর্য! চতুর্দিক সৈন্যগণ
প্রহরী নিযুক্ত আছে, শিবির রক্ষা করি-
তেছে, পাখীটি উড়িয়া যাঁতে পারে
না, ইহার মধ্যে সেনাপতির হুঁতাই
নাই! অন্ধকার রাত্রি, আলোক লইয়া
সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান
করা হইল, চতুর্দিকে অসংখ্য লোক
প্রেরিত হইল সকলেই দেখিল গুলনেয়ার
নাই!!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনঃ প্রাপ্তে।

মাহারা রাজনীতি-সমুদ্র সমুদ্রণ করিয়া রত্নসংগ্রাহে যত্নশীল তাঁহাদের মন কোন্ সময় কোন্ বিষয়ে নিমগ্ন থাকে বুঝিয়া উঠা যায় না। মামুদগাওয়ান একমাত্র অপত্যরত্ন হারা হইলেন, পৃথিবীর মধ্যে আপন বলিবার একমাত্র পাত্রী, সরলতার প্রতিকৃতি তনয়া হারাইয়া বসিলেন, অনেকই ভাবিল তাঁহার মন নিতান্ত বিকল হইয়া যাইবে, যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কর্মেই মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। মাহারা এরূপ ভাবিয়াছিল, তাহার রাজনীতি কি পদার্থ এ কথা বুঝিত না, অথবা গাওয়ানকে চিনিত না। তিনি সমস্ত ক্রোশ হৃদয়ে গোপন রাখিয়া অমসহিষ্ণু অধাবসারসম্পন্ন যুবাণুস্বরের ন্যায় অবিচলিত-চিত্তে সময়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অসাধারণ ক্ষমতাবলে অত্যঙ্গ সময়ে মধ্যে উদ্ভিষাধিপকে পরাজিত করিলেন, মছলিপতন তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে হস্তগত হইল। অনন্তর মহম্মদশাহের কোতুহল নিরুত্তি করণার্থ আপনার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাত্র ছয় সহস্র সৈন্যসহ ধাবমান হইয়া বহুদূরবর্তী কাফিপুরস্থ রত্নেশ্বরের সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির লুণ্ঠন করিলেন। এই কুর্খ্য এত অল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে রাজা রক্ষার্থ আসিবার পূর্বেই তিনি

সৈন্যসহ পাঁচ কোশ দূরবর্তী একটি স্থানে প্রত্যাগত হইয়া শিবির সম্মিলন করিলেন।

কতিপয় দিবসের কঠিন পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় সে রাত্রিতে তাঁহার শীত্বেই নিদ্রাকর্ষণ হইল। অঙ্গাঙ্গণ পরেই একটি স্বপ্ন দেখিয়া ব্যস্ত হইলেন। তখনই ধরনীনাথ এবং এসফ আদেলকে ডাকাইয়া বলিলেন “আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। আমার বোধ হইল যেন কাফিপুরের দেব রত্নেশ্বর আমার মস্তকের নিকটে দাঁড়াইয়া বজ্রগম্বীর স্বরে বলিলেন, ‘রে পাপাত্মা যদন! এতকাল তোমার সম্পণ্ণ মতি ছিল এজন্য তোমার উন্নতি হইয়াছে, এখন কুর্কর্মে প্রবৃত্ত হইলি, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমার মন্দির অপবিত্র করিলি! তোমার কন্যাকে আসন্ন বিপদ হইতে আমিই আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছি, তৎপরিবর্তে তুমি আমার সম্পত্তি হরণ করিলি! আর তোমার উন্নতি হইবে না। এতকাল কেহ তোমার শত্রু ছিল না, এখন আর শোচনীয় পরিণাম সময়েও কেহই মিত্রভাবে নিকটে দাঁড়াইবে না। আজ যে প্রভুর মনস্তৃষ্টি সাধনে এই বিগহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলি অন্য হইতে দুই বৎসর মধ্যে সেই প্রভুই তোমার শিরশ্ছেদ করিবে। যে কন্যাকে রক্ষা করিয়াছি, তোমার সেই প্রিয় তনয়া গুলনেয়ার তোমার সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিবে। আর তোমার প্রভুও তোমার মৃত্যুর পীর বৎসরমধ্যে মৃত্যু-যুখে পতিত হইবে।’ এমন আর কখনও

হয় নাই । যদি ইহার কোন অংশ সত্য হয় তবে সে ঘটনা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইবে । যাহাকে পাওয়া যাইবে না বলিয়া পাষণে হৃদয় দৃঢ় বন্ধ করিয়াছি তাহাকে যদি আবার প্রাপ্ত হই আর তখন যদি এই প্রকার ঘটনা হয় তাহা কি সহ্য হইবে ? স্বপ্ন সত্য হউক মিথ্যা হউক আমার নিতান্তই বিশ্বাস হইতেছে গুল-নের কাঞ্চিপুরেই আছে, অতএব তোমরা তাহার অনুসন্ধান করিতে থাক । ”

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দুঃখের ভাবনা ভাবিয়া ধরনীনাথ কাঞ্চিপুরে যাইতে স্বীকার করিলেন । মন্ত্রীরা আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই দোরাঙ্ককারময়ী রাত্রিতে একাকীই নিদ্রান্ত হইলেন । প্রভুর নিয়োগ তাহাতে আবার একটি সৎকার্য্য সম্পাদন, সুতরাং ভয় তাহার মনে স্থান পাইল না ।

তাহার এই প্রসঙ্গে আরও একটি কারণ ছিল, কিন্তু তাহা বলিলে পাছে কেহ মনে করেন যে ‘ ধরনীনাথ স্বকার্য্য সাধনে বাধা ছিলেন, মন্ত্রীরা আদেশ না থাকিলে নিজেই অনুমতি লইয়া কার্য্য সাধন জন্য অপেক্ষা করিতেন ’ এই ভয়ে কারণটি প্রকাশ করিলাম না । ধরনী সুদীর্ঘ পুরুষ, নিঃস্বার্থ পরোপকার তাহার শরীরের এক প্রধান ধর্ম্ম । এতাদৃশ মহাপুরুষের সদভিপ্রায়ে যদি কেহ সন্দেহান করেন এই ভয়ে প্রকাশ করিতে এত সতর্ক ।

‘ ঘোর অন্ধকার । বনাকীর্ণ পথ । এই বিস্তর প্রদেশের মধ্যদিয়া কে সুবককে পথ

দেখাইয়া গুলনেরারের স্থানে লইয়া সুবিধা করিয়া দিবে ? তিনি এই কথা মনে আন্দোলন করিতে করিতে সমুজ্জাতিমুখে চলিলেন, পথিমধ্যে দেখিলেন স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে । ধরনীনাথ বুঝিলেন মুসলমানেরা হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে এই ভয়ে কাঞ্চীরাজ রাত্রিতে সতর্ক হইয়া আছেন । এমত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থান দিয়া গমন করিলে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া আঁধারে গা ঢাকিয়া পূর্বাভিমুখে চলিয়া গেলেন, কেহ দেখিল না ।

ধরনীনাথ মনে করিতেছিলেন, এদিকে কেবল একটি নক্ষত্র আছে, তাহার শুভ পবিত্র আলোকে গুলনেরার কোথায় আছে দেখাইয়া দিবে । সুতরাং একটি অটালিকা সমীপস্থ হইয়া তাহার উচ্চ গবাক্ষ প্রতি চাহিয়া রহিলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য ! জনৈক ঘোর অন্ধকারে আবৃত, সে গৃহে যে কেহ আছে এমন বোধ হইল না । তথাপি আশা এমনই বস্তু ; বস্তু বিশেষের এমনই আকর্ষণ শক্তি যে, পদে পদে তাহার ভ্রম হইতে লাগিল । তাহার বোধ হইল মৌলমিনী নিবিড় কুম্ববর্ণ মেঘ ভেদ করিয়া বাহির হইল, এবং অপূর্ব রমণীয়ুষ্টি পরিগ্রহ করিয়া গুলনেরারের হস্তধারণ পূর্বক পরপ্রান্তে দাঁড়াইল ! পরে বুঝিলেন, ভ্রাস্তি ! ভ্রম বুঝিলেন অথচ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন । ইতিমধ্যে তাহার পশ্চাদিক হইতে টপ্ টপাটপ্ টপ্ টপ শব্দ হইতে লাগিল । প্রণয়প্রতিমা প্রেমসীর মুখ-

কমলসম্পর্শনস্থাপান সময়ে হঠাৎ ঐকক্ষন উপস্থিত হইলে যেমন সেই পূর্ণেন্দু হইতে অতৃপ্ত নয়ন অতি কক্ষে অপসারিত হয়, এবং তাহাতে ক্ষময় যেমন ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, সেই শব্দ শুনিয়া যুবকেরও তাহাই হইল, অতি কক্ষে নয়ন অপসারিত করিলেন । শূন্যগর্ভাক্ষ পানে চাহিয়াছিলেন তাহাতে বাঘাত হইল, এক্ষণে তাঁহার সহ্য হইল না, ক্ষময় যেন বিদীর্ণ হইল । কিন্তু ঐ গৃহে যাহা দেখিতে আশা করিতেছেন তাহা যদি অন্যের প্রাপ্য হয় তাহা কি সহ্য হইবে ?

প্রশ্ন হইল ‘কে’ ? উত্তর নাই । পুনরপি জিজ্ঞাসা হইল “শত্রু, না মিত্র ?” উত্তর হইল “যাহা মনে করিতে ইচ্ছা হয় ।” ধরনী এই কথা বলিবামাত্র প্রশ্নকারী বলিয়া উঠিলেন “এত আশ্পর্কী ক্ষত্রিয় সহ্য করিতে পারে না । প্রস্তুত হও ।” সূতরাং তৎক্ষণাৎ উভয়ে ভয়ঙ্কর ঘৃণা যুদ্ধ আরম্ভ হইল । উভয়ের আশ্চর্য্য রংকোশল, অভূতপূর্ব্ব শিক্ষা এবং আত্মরক্ষা-প্রণালী যদি কেহ তখন দেখিতে পাইত সে অবশ্যই এতদ্বত্বের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়া পরস্পর প্রণয় সংঘটন করিয়া দিত ; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না । পরিশেষে ধরনীনাথের কোশলের নিকট আগন্তুক পরাভূত হইলেন, তাঁহার দৃঢ় আঘাতে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন । ধরনীও তখন আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । এবার অপরিচিত

ব্যক্তি ধরাশায়ী হইলেন, ধরনী তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া পরে যেমন তাঁহার কণ্ঠদেশে নিষ্কোষিত অশ্বি ধারণ করিয়া বলিতেছিলেন “এখনই সংহার করিতে পারি, কিন্তু বীরত্ব দেখিয়া ভক্তি উপস্থিত হওয়ার, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয় বিবেচনায় ক্ষমা করিলাম” অশ্বনি পশ্চাদ্ধিক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ধরনীর মস্তকোপরি বিশাল খজাঘাত করিল । সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তি উন্নত তরবারিতে আঘাত করিয়া অশ্বি উৎপাদন করিলেও কাহারও শরীরে লাগিল না । অপরিচিত ব্যক্তি উঠিয়া সেই কাপুরুষকে যার পর নাই তিরস্কার করিলেন । এই ঘটনার বিবাদকারী ক্ষত্রিয়-দ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্য হইয়া উঠিল ।

অপরিচিত বলিলেন আপনি বীরের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন । আমার পক্ষীয় একজন লোক আসিয়া আপনার উপর আঘাত করিল, আমরা দুইজনে বুদ্ধ করিতেছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া সহায় হইল ইহা বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়াছে । আমি পরাজিত হইয়া অন্য একজনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কোন প্রকার সহ্য করিয়া আপনাকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়াছি অথবা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে পরামর্শ করিয়া আসিয়াছি যদি এই সকল ভাব আপনার মনে উদয় হয় তবে আমাকে ক্ষত্রিয়ের

অনুপযুক্ত জ্ঞানে অবজ্ঞা করিবেন সংশয় নাই ।’ তিনি আরও বলিতেছিলেন কিন্তু ধরনীনাথ বলিলেন ‘ ক্ষত্রিয়ের মনে কখনও একরূপ ভাব হইতে পারে না । যদি আপনি কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলেও আমি ভয় করিতাম না, শত শত বীরপুরুষপরিহৃত হইলেও আমি আশ্রয়কর করিতে জানি ।’ উভয়েই আগন্তকের ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, যুবক তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে ক্ষণেক পূর্বেই সম্মত হইয়াছিলেন । এক্ষণে এই সাহসকার বাক্য শুনিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন ‘ তবে কি আপনার ইচ্ছা আছে ?’ আর উত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই একটি শব্দ করিলেন, অমনি সহস্র সহস্র সৈন্য নিমিষমধ্যে আসিয়া সে স্থান বেতন করিয়া লইল । যুবক মশালের আলোকে দেখিতে পাইলেন সকলেই সশস্ত্র, আজ্ঞা পাইলেই হর । মনে বিস্ময় এবং বীরত্ব যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । তখন সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া লক্ষ প্রদান পূর্বক অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং একটি রক্ষক পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া পদাতিকগণকে বলিতে লাগিলেন ‘ এক এক জন করিয়া ইচ্ছা হয় অথবা সকলে একত্র ইচ্ছা হয় আক্রমণ কর, ঘাটগিরিকেও যদি স্থানচ্যুত করিতে পারি আমার একটি চরণও টলাইতে পারিবে না ।’ অপরিচিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন । ধরনীনাথের এতাদৃশ সাহস

সম্পর্শনে প্রীত হইলেন । আর একটি শব্দ করিয়া মাত্র সৈন্যগণ অবসৃত হইল । যেন পৃথিবী বিধা বিভক্ত হইল এবং সকলে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, কে কোথায় গেল তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না । আগন্তক ধরনীনাথকে বলিলেন আমার ইচ্ছা নাই যে আপনাকে আর আক্রমণ করি । যখন উভয়ের মধ্যে প্রণয়ভাব সংঘটিত হইয়াছে প্রতিজ্ঞা করিলাম আপনার শরীরে আর কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না । যুবক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি আর কখনও শত্রুতা প্রদর্শন করিবেন না একরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । একটি আলোকসমীপে উপস্থিত হইয়া আগন্তক বলিলেন ‘ সেনাপতি ! বিপক্ষেরা কতদূর ?’ সেনাপতি কহিলেন ‘ মহারাজ ! তাহারা প্রায় পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে, আর ফিরিয়া আসিবে বোধ হয় না । আপনি এখন রাজধানীতে যাইয়া বিশ্রাম করুন ।’ ধরনীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । বলিলেন ‘ মহারাজ ! না জানিয়া যে অনায়াস কার্য্য করিয়াছি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ।’ রাজা যশোধন বলিলেন ‘ আপনার কোন অপরাধ হয় নাই সমস্ত অপরাধই আমার, আমার জ্ঞাতি মার্জনা করিবেন ।’ কাঞ্চী-রাজ এই কথা বলিবার পর উভয়ে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন; তিনি বুঝিতে পা-

ইলেন, ধরনীনাথ শত্রুপক্ষীয়, সুতরাং বিরুদ্ধ হইলেন। তিনি গুপ্তভাবে আসিয়া সমস্ত পথ প্রভৃতি জ্ঞাত হইলেন দেখিয়া নিতান্ত চিন্তিতও হইলেন। ধরনীনাথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন “আমাকে শত্রুমনে করিবেন না। মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণও আমার কার্য নয়। মন্ত্রীবর মামুদ গাওয়ান আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিশাস্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অত্যন্ত রক্ত, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে যদি তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় তবে তাঁহার প্রতিকার করিতে পারিব এই আশয়ে যুদ্ধের সময় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি। আপনার শত্রুগণ আর ফিরিবেন না, তাহারা গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছে। মন্ত্রীজীবিত থাকিতে বাহমনিরাজকে আর হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতেও দিব না।”

যশোধনের বৈরক্তি অপনীত হইল। তিনি তখন যুবকের সহিত বহুবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। যশোধনও যুবক। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশ অতিক্রম করে নাই সুতরাং তাঁহার উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক, বন্ধুতাও তজ্জন্যই দৃঢ় হইতে চলিল। পথিমধ্যে ধরনীনাথ মন্ত্রীর গুনকর্তন করিতে লাগিলেন। কঠোরতাবলম্বী মুসলমান মধ্যে এমন লোক আছে কাঞ্চীপুর্বে জানিতেন না। কথায় কথায় মন্ত্রীর অপেক্ষার বিষয় জ্ঞাত হইলেন। রাজা বলিলেন “রত্নেশ্বর যে স্বপ্ন প্রদর্শন করেন তাহার সকল গুলিই

সত্য হয়, এটি মিথ্যা হইবে সম্ভব নয়। ইহার প্রথমংশ সত্য হইয়াছে। মন্ত্রীদুহিতা গুলনের আর আমার আশ্রয়েই আছে। যদি তাহাকে আপনার নিকট প্রতারণা করি আপনি বোধ হয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। ধরনীনাথ তাহাকে ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু মন্ত্রীর শোচনীয় পরিণাম স্মরণ হওয়ার নিতান্ত বিবাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া রাজাও স্নান হইলেন, তখন উভয়ে রাজবাটিতে প্রবেশ করিলেন। রাজার অমায়িক বন্ধুত্বাবহারে ধরনী প্রীত হইলেন। চতুর্দিকে গ্রহরী, অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কেমন করিয়া পিতার নিকট হইতে উঠিয়াছিল, এবং কোথায় গিয়াছিল, কিরূপেই বা কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইল তিনি আগ্রহাতিশয় সহকারে রাজার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যত আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তত প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন “একুপ সম্ভবপর!”

সবিশেষ যত্নে তাহারাদি সম্পন্ন হইল। যুবক শয়ন করিলেন, রাজাও বিশ্রামার্থ আপন কক্ষে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে এরাতি ধরনীর নিদ্রা হইল না, তাঁহার মনে হইতে লাগিল ‘বজ্রপাত, অট্টালিকা, গবাক্ষ, ধ্রুব নক্ষত্র, স্থির সৌদামিনী, মন্ত্রীর স্বপ্ন, গুলনের আর আশ্চর্য্য অস্ত্রধান, আর? আর কি?—তাঁহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য!’

রাত্রি যেক্রমেই হউক প্রভাত হইল।

পরদিবস নগরবাসীগণ দলে দলে দেবমন্দিরের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিতে আসিল। দেবমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুসলমানের প্রতি অভিসম্পাত, ভকের ক্রন্দন প্রভৃতিতে অনেক সময় গেল। ধরনীনাথ সকল দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু উৎসুকোর সহিত কাহাকে যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। একবার ছায়ার আঁচ দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। মনের আবেগ নিবারণ করিতে একবার সমুদ্র-তীরবর্তী প্রাসাদটি দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহার দ্বার সকল বাহিরের দিক হইতে বন্ধ! তাঁহার সকল পরিশ্রম ব্যথা হইল।

বেলা এক ঘটিকার সময় রাজা যশোধন যবনদুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। গুলুনেয়ার ধরনীনাথকে দেখিয়া আহলাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। সে হস্ত এমন কোমল, তাহার মৃদু গৌরবর্ণ লতাকান্তিতে এমন অপূর্ব স্নেহরস যে, ধরনীনাথ অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন এমনই চঞ্চল যে, সেই অকৃত্রিম ভ্রাতৃস্নেহের রসাম্বাদন অনেকক্ষণ ঘটিল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল নগরে অবশ্যই এমন কেহ আছে যে এই ক্ষীণাক্ষী অর্ধমবসীরা বালিকাকেও তাঁহার কণ্ঠে

সংলগ্ন দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিতা হইবে। গুলুনেয়ারের অপরাধ কি? গুলুনেয়ার সুন্দরী, কালে আরও সুন্দরী হইবে। এই তাহার অপরাধ! 'কাহারও' হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া অনুচিত বিবেচনায় ধরনীনাথ ধীরে ধীরে হস্ত দুইখানি কণ্ঠ হইতে মুক্ত করিলেন এবং বালিকাকে শিদিয়ার স্থাপন করিলেন। রাজার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া স্বয়ং অশ্রারোহণে নগরের প্রশস্ত বয়ে বাহির হইলেন। রাজা প্রাসাদের বহির্দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, পরে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু যুবককে মধ্য মধ্য আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করার ভুল হইল না। তাঁহার পরিচয় না পাওয়ার কিঞ্চিৎ দুঃখিত রহিলেন।

কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছেন পরেই একটি গৃহের ছাদের উপর ধরনীনাথের চক্ষু ধাবিত হইল, আর ফিরিল না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ হইতে গুলুনেয়ার সহাস্য বদনে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ধরনীনাথকে কি দেখাইতে লাগিল। পাঠক বোধকরি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যিনি ধরনীনাথের দৃষ্টিকে এত শীঘ্র, তাড়িত বেগে দিগ্‌দর্শনের কাটার ন্যায় স্থির রাখিয়াছেন তিনি একটি যুবতি রমণী এবং হয়ত তিনি তাঁহার পূর্বপরিচিতা। বাস্তবিক যাহার অনুসন্ধানে সর্বদা তাঁহার চক্ষু চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছিল, যাহার অনুসন্ধান

তিনি রত্নেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছিলেন ও ছাগার নায় দেখিয়া তৎপ্রতি ধ্যানমান হইয়াছিলেন এবং বাহার অনুসন্ধান তাঁহার কাঞ্চীপুর আসাওই অন্যতর কারণ, ছাদের উপরে তাহারই মনোহারিণী মূর্তি বিরাজিত । পাঠকও তাহাকে অবশ্যই চিনেন, কারণ রত্নেশ্বরের মন্দিরে প্রথমেই তাহাকে দেখিয়াছেন ।

প্রমোদিনীও ধরনীনাথের প্রতি প্রশস্ত-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছিল । আজ তাহার কেমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য । বালার্কের কিরণ পরিহিত রক্তবস্ত্রে এবং স্বর্ণচম্পক শরীরে পতিত হইয়া কেমন অপূর্ণ দেখাইতেছিল । অপ্রকাশিত হাস্যপূর্ণ আসো কি প্রফুল্ল-তাই বিরাজ করিতেছিল । আমাদের যুবক স্থিরদৃষ্টিতে সেই রূপরাশি দেখিতে-ছিলেন এবং একমনে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলির আলোচনা করিতেছিলেন ।

প্রথম সাক্ষাতের স্তম্ভিত এবং বিস্ময়-পূর্ণ ভাব অপসারিত হইলে পর ধরনীনাথ একটু হাসিলেন, প্রমোদ হাসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল । কিন্তু সেই সুন্দর বদনের সেই মধুর হাসি লুপ্ত হইতে না হইতেই আবার অঞ্চল নাড়িয়া মাথা নোয়াইয়া, “অভি-বাদন করিয়া ক্রতবেগে কোথায় চলিয়া গেল । ধরনী অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট এবং অত্যন্ত মর্মান্বিত হইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ যেন ছিড়িয়া যাইতেছে এমন বোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরক্ষণেই প্রমোদের চলিয়া যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান

ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে পাঠিলেন যে, অদূরে রাজা যশোধন আসিতেছেন । মনে মনে ভাবিলেন ‘তবে ইনি কি আমার সুপের পথের কটেক ? ’ আবার ছাদের উপরে চাহিলেন, কিন্তু এবার আর কিছুই নাই ; শূন্য, শূন্য, শূন্য ; সমস্ত শূন্য, জগত আধার । আর ক্ষণমুহূর্ত্তমাত্র বিনয় না করিয়া গুলনেরারের শিবিকা বাহকদিগকে শিবিকা চালাইতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও অশ্ব চালাইয়া দিলেন । অশ্ব চালাইতে চালাইতে আর একবার ছাদের দিকে চাহিলেন কিন্তু এবারও আর কাহাকে দেখিলেন না ।

পাঠক এতদুভয়কে কিরূপ মনে করিতে-ছেন । যুবককে যেরূপই ককণ, প্রমোদিনী-কেত অত্যন্ত চণলা প্রগল্ভা জ্ঞান করিতে-ছেন । আমরাও তাহাকে তাহাই জ্ঞান করি, তবে করা যায় কি ; মতোর অনু-রোধে যেরূপ সেইরূপই রাখা হইল ।

অনেক দূর চলিয়া গেলে পর বাহকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ একস্থানে পা-লকি রাখিল । গুলনেরার বাহিরে আসিল এবং ধরনীনাথ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । দুই জনে একত্র হইয়া মনের সুখে আলাপ করিতে লাগিলেন । গুলনেরার বলিল ‘দাদা ! আজ কি আশ্চর্য্য সুখ বোধ হইতেছে ! তোমায় দেখিলাম, বা-বাকে দেখিব । আবার যিনি আমার এতদিন ভাল বাসিলেন যাওয়ার সময় তাঁহাকেও দেখিলাম । তুমি তাঁহাকে দে-

থিয়াছ, তিনিও তোমার দেখিয়াছেন। যদি তোমাদের দুইজনের বিবাহ হয় আমি বড় মুখ বোধ করিব। বোকে দেখিতে পাইব। তিনি বুঝি তোমার বড় ভাল বাসেন ?’

যুবকের হৃদয় তরঙ্গান্বিত হইয়া উঠিল ; বালিকা সমস্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছে বলিয়া আশ্চর্যান্বিতও হইলেন। ভাবিলেন ‘যাড়া’ বিশ্বাস করিতে আমার হৃদয় কদাপিও সাহস করে না, বালিকা তাহাই প্রকাশ করিতেছে ?’ সম্মিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বাঃ তুমি কি বলিতেছ ; প্রমোদিনী যে আমাকে ভালবাসেন তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?’

“তিনি সর্বদাই তোমার কথা আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। যখন দুই জনে একত্র বসিতাম, কি সমুদ্র তীরে বেড়াইতে বাইতাম, কি নিদাঘগ্রহে উপবিষ্ট থাকিতাম সর্বদা কেবল তোমার কথাই জিজ্ঞাসা ও আলাপ করিতেন। তোমার কে আছে, একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম কেহ নাই। তুমি বিবাহ করিগাছ কি না একদিন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, না, বিবাহ করিলেও বো দেখিতাম। তোমার অনেক টাকা আছে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি তাহাও নাই বলিগাছি, কারণ থাকিলেও আমি সকলই জানিতাম।’

যুবক হাসিতে লাগিলেন ; হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হইল। গুলুনেরার ব-

লিল ‘দাদা ! আর তুমি এখানে আসিও না। প্রমোদিনী পুনঃ পুনঃ আমায় তোমাকে নিষেধ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তুমি যাহাকে অত্যন্ত ভালবাস ও বিশ্বাস কর সে তোমার শত্রু, মিত্র নয়। হৃদয় সুযোগ পাইলে তোমার প্রাণনাশ করিবে ; প্রয়োজন হইলে তোমাকে হত্যা করা তাহার পক্ষে সহজ !’ যুবক চমৎকৃত হইলেন, কিছুই বুঝিলেন না। মনে লেশমাত্রও শঙ্কা জন্মিল না, কিন্তু হৃদয় গভীর সন্দেহে আলোড়িত হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সংসারে কৃতজ্ঞতা ।

কি ঘোর অন্ধকার ! প্রকৃতি কেমন নিশ্চল ! কোন স্থানে একটি পত্র শাখাচূত হইলে যে পরিমাণে শব্দ হওয়া সম্ভব তাহাও প্রতিগোচর হইতেছে না। প্রকৃতি শয়ান নব ভয়ঙ্করী। সকলই নীরব। কেবল অদূরে একটি বালিকার অনতিপরিষ্কৃত বিলাপপূর্ণ কণকণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে,—কি কহিতেছে, কাহার নিকট কহিতেছে, কিছুই বুঝা যায় না। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতল—মনুষ্যালোকের নন্দনকানন—মানবজীবনের নাট্যশালা—হৃদয় গীত বাদ্য প্রভৃতি আশ্রয়জনক ঘটনাপুঞ্জের প্রিয় নিকেতন—পৃথিবী—একগে শয়ান !

যদি স্থানান্তর একাংশ অন্য অংশ
অপেক্ষা ভয়ানক হয় তবে সে স্থান
আজ, এই অমাবসার তামসী নিশীতে,
দেবগিরির কারাগৃহ । বহির্দার রুদ্ধ ক-
রিয়া সশস্ত্র প্রহরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান
আছে । তাহার অভ্যন্তরে, এই যমচক্রের
মধ্যস্থলে একজন রুদ্ধ আবদ্ধ রহিয়াছেন ।
জীবনে সকল প্রকার অভূত অভিনয় প্রদ-
র্শন করিয়া এক্ষণে চরম অভিনয়ে প্ররুত
হইয়াছেন । আর একটি কুসুমকলিকা স-
দৃশী বালিকা, গবাক্ষ সমীপে দণ্ডায়মান
হইয়া রোদন করিতেছে । প্রহরীগণ তাহার
রোদনে দাঁড়াইয়া হইয়া নিয়ম এবং আদে-
শের বিরুদ্ধেও তাহাকে রাত্রিতে প্রাচীর-
ভ্যন্তরে থাকিতে দিয়াছে । নিষেধ করিতে
পারে নাই । নিজ নিজ সম্মান স্বরণ ক-
রিয়া পুরুষ হস্তে তাড়াইয়া দেয় নাই ।

“ বাবা ! বাবা ! বাবা !—তুমি স্মরণ
দিচ্ছ না যে । ও কি, তুমি কান্দিতেছ যে
বাবা ! তোমাকে এখানে এমন করে আ-
নিয়া বদ্ধ করেছে কেন ? আমাকেই বা
আসিতে দিতেছে না কেন ? আমি ত কি-
ছুই বুঝিতে পারিতেছি না বাবা ! তুমি
ওদিগকে বল আমাকে তোমার নিকট
আসিতে দিউক, আমি আসিয়া তোমার
কোলে বসি । আমার মন যে কেমন
করিতেছে, আমার কাণা আসিতেছে ।
বাবা ! তোমার এরূপ অবস্থা আমার সহ্য
হয় না, আমাকে তোমার নিকটে নেও ।
আমি আর কতক্ষণ বাহিরে অঙ্গকারে

দাড়াইয়া থাকিব ! হীমে আমার শরীর শী-
তল হইতেছে । আমি আসিয়া তোমার চক্ষু
মুছাইয়া দি । ” এই বলিয়া লৌহশিক
দুইটির মধ্যদিয়া গবাক্ষপথে বালিকা আপ-
নার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি গৃহ মধ্যে প্রবেশ ক-
রাইল । প্রাচীরের বেধ অধিক, হস্ত ক্ষুদ্র ।
অভাগিনী চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার পি-
তার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, চক্ষু মুছাইয়া দিয়া
সুখী হইতে বা সুখী করিতে পারিল না ।

রুদ্ধ কান্দিতেছিলেন । ক্রন্দন সংবরণ
করিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র
হস্ত দুখানি আপন হস্তে লইলেন । তাহার
মনে এক্ষণে কি ভাব, কে বলিবে ? নি-
রাশ্রম বালিকা কারাগৃহের প্রাচীর-
ভ্যন্তরে অথবা গৃহে প্রবেশ করিতে পারি-
তেছে না । তিনি তাহার পিতা অথচ
সাহায্য করিতে পারিতেছেন না । দুঃখ
তাঁহার হৃদয় মুখবন্ধ পাত্রে উত্তপ্ত আ-
ধেয়বৎ দগ্ধ করিতে লাগিল । আর সংব-
রণ করিতে পারিলেন না । আবার কা-
ন্দিয়া ফেলিলেন :—তাঁহার ক্রন্দনে বা-
লিকাও উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিল ।

অভাগিনী আজ রাত্রিতে হতাশ হৃ-
দয়ে ব্যাকুল হইয়াছে, রাত্রি শীঘ্র প্রভাত
হউক প্রার্থনা করিতেছে । কিন্তু প্রভাতে
তাহার যে কি দশা ঘটিবে তাহা কি সে
বুঝিতেছে ? ভাবিতেছিল শাহের পার
ধরিবে, বেগমদের পায়ে পড়িবে তাহা
হইলে মন্ত্রী অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবেন ।
তাঁহার পিতা আবার তাহাকে কোঁড়ে

লইবেন । কিন্তু প্রাতঃকালে শাহের মুখ
হইতে যে কি অস্বার্থ নিদাংকণ বাক্য বাহির
হইবে তাহা সে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে ।

সহসা কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল ।
একজন লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার
রোধ করিল । বালিকা দৌড়িয়া যাওয়াও
প্রবেশ করিতে পারিল না । তাহার আর
সহ্য হইল না, উঠেঃস্বরে কাদিতে কা-
দিতে স্বল্পের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লা-
গিল ।

পাঠক এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন
বাহমনি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মানুদ গা-
ওরান কারাকদ্ধ । তাহার অপরাধ কি জা-
নেন না, অথচ তিনি কারাকদ্ধ ! তিনি এই
সুবিষ্ঠীর্ণ রাজ্যের সর্ব্ব সর্ব্বা হইয়াও দ-
রিদ্র, অপ্রমের ক্ষমতা সত্ত্বেও দুর্ব্বল, এ-
কান্ত প্রভুপারায়ণ হইয়াও প্রভুর নিগ্রহভা-
জন । ধনা সংসারের কৃতজ্ঞতা ! যিনি আ-
পনার ভুজবলে ও বুদ্ধিকৌশলে, একটি
কুদ্র প্রদেশকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া
সুশাসন জনা প্রাচীন রাজ্যের অপেক্ষা
স্বহৃৎ আটটি প্রদেশে বিভক্ত করিলেন,
নর্ম্মদা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত এবং সাগর
হইতে সাগর পর্য্যন্ত, পশ্চিম উপকূল হ-
ইতে পূর্ব্বোপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অ-
ধিকার ও সুশাসিত করিলেন ; শাসনকর্ত্তা-
গণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহের
ভয় দূরীকৃত করিলেন এবং আপন জার-
গীর, আপন সম্পত্তি অসমুদ্রে ওমরাবর্গ-
হারা বটন করিয়া নিজেদের মহানুভব উদার

প্রকৃতির পরিচর্য্য নিলেন অদ্য তাহার এই
শোচনীয় দশা !

বালিকা গণাক্ষপথে দৃষ্টি সঞ্চালন
করিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ ক্ষীণ লোক ভয়-
চকিতচক্ষে প্রবেশকারীকে দেখিতে লা-
গিল । সে ব্যক্তি পরিচিত, এতকাল তা-
হার পিতার অন্ন প্রতিপালিত । নাম
হুসেন বেহারী । হুসেনকে দেখিয়া বা-
লিকা ভীতা হইল । এক একবার আ-
কাশ পানে চাহিতে লাগিল । কিন্তু
শ্রাবণের আকাশ মেঘহীন, তাহাকে আ-
শ্বস্ত করিতে যদি একটি নক্ষত্র কোথাও
বাহির হইতে চেষ্টা করিত অমনি নির্দয়
মেঘ আসিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিত ।
তাই বুঝি ভীতা হইতে ছিল !

হুসেন বলিল ‘মহাশয় ! যখন একটি
স্ত্রীলোকের প্রেমে যুক্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্ম প-
রিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করি-
রাছিলাম, তখন প্রবল পরাক্রান্ত চিত্তের
মহারোগীর হস্ত হইতে আপনিই আমার
রক্ষা করেন । দুঃখ করিয়াছিলাম ব-
লিয়া মিন্ট ভৎসনা করিয়াছিলেন বটে,
কিন্তু আশ্রয় দিয়াছিলেন । দীর্ঘকাল প্র-
তিপালন করিয়া আপনিই আমার উন্নতির
পথ করিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনার
বিপদে আমারও বিপদ । রাজার বিপক্ষ
হওয়াও মহাপাপ, আমি আপনাকে যে
পরামর্শ দিতেছি তাহাতে সম্মত হউন ।
এই দরখােষ্টে নাম সাক্ষর করুন ।’ এই
বলিয়া দরখােষ্ট পড়িতে আরম্ভ করিল ।

এতকাল সাধানুসারে আপনার কার্য করিয়াছি। এখন রুদ্ধ বয়সে যদি কোন অন্যায় করিয়া থাকি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি ভ্রান্ত হইয়া একপ কাঙ্গ করিয়াছি, এক্ষণে অনুতাপ হইতেছে। আমি মন্ত্রীত্ব পরিত্যাগ করিলাম, অবশিষ্ট জীবন কারাগৃহে যাপনেও সম্মত আছি, তথাপি যেন আমার শোণিতপাত না হয়।”

স্থিরপ্রকৃতি গাওরান আজ ক্রুদ্ধ হইলেন। দরখাস্তখানা ছিড়িয়া ফেলিলেন এবং হুসেনের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন। হুসেন ছিন্ন দরখাস্ত তুলিয়া লইল এবং ভীত হইয়া ক্রতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বালিকা আবার এই সুযোগে যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, দুরাচার দয়ার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই সরল বালিকার গ্রীবা ধরিয়া শূন্যে উঠাইল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে প্রবেশ করিতে দিয়াছে বলিয়া প্রহরীগণকে ভয় প্রদর্শন ও গালি প্রদান করিতে লাগিল। গুলনেয়ারকে আরও শূন্যে উঠাইয়া সজোরে প্রাচীরের বহিঃস্থিত বস্ত্রে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিল। পাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল “যাহারা অন্যের উপার্জনের ব্যাঘাত জন্মায় তাহাদের এই দশাই ঘটে! হাঃ! আমি যে কাসসাপ জান না? দশচক্রে ভগবান ভূত!” মন্ত্রী শুনিলেন, বুঝিলেন, বালিকার যে বিপদ ঘটিল তাহাও জানিতে পাইলেন। একজম

প্রহরী কাঁদিয়া গিয়া সকল কথা কহিল, কিন্তু তিনি আর যে মন্ত্রী নহেন, বিবশ্বনা বিমধর মাত্র!

কালরাত্রি প্রভাত হইল। মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আসীন হইয়া কঠোরস্বরে বলিলেন “পাণী! রুদ্ধ মন্ত্রীকে আমার সমক্ষে আনয়ন কর।”

আজ্ঞা! প্রাপ্তিমান্ত মসারুদ প্রভৃতি আনিসিনীর দাসগণ রক্তবস্ত্রে রুদ্ধকায় সজ্জিত করিয়া মশস্ত্র ধারণমান হইল। ওয়রাগণ সকলেই প্রকৃত অগচ চিহ্নিত এবং বাহ্যিক আকারে কিঞ্চিৎ বিবশ। তাহারা ‘কি হয়’ কেবল এই ভাবনার অস্থির হইল।

দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মাসুদ গাওরান দ্রুতকপরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচীরের বাহিরে আনিলেন। কি শোচনীয় দৃশ্য! ইহা যদি গুলনেয়ারের নয়নগোচর হইত? গুলনেয়ার এখন কোথায়?

মন্ত্রী বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন বহির্দ্বারের অনতিদূরে একটি বালিকা শয়ান রহিয়াছে। তাহার বাম হস্ত মস্তকের নীচে, দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ চক্ষু আবরিত, যেন সূর্য্যকিরণ চক্ষু বিদ্ধ হইয়া নিজের ব্যাঘাত জন্মাইবে বলিয়া একপাভাবে চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রুদ্ধবর্ণ কেশজাল অর্দ্ধারত শরীরে, অনারত মুখকমলে, এবং হস্তে, অর্দ্ধারত করিয়া অপূর্ব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। ক্ষৌণ শরীরে অপূর্ব জ্যোতিঃ! অর্দ্ধারত মুখকমলে সৌ-

রক্ষা পতিত হওয়ার বোধ হইতেছে যেন
রক্তনীতে সুন্দরী প্রদীপহস্তে গৃহান্তরে যা-
ইতেছে ! শরীরে অলঙ্কার নাই, কে যেন
বলপূর্বক সে সকল অপহরণ করিয়াছে ।
প্রমোদিনী যে সকল বস্ত্রমুলা রত্নে এই
সোনার প্রতিমাখানি সাজাইয়াছিলেন
তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই । মাথার কতকাংশ
শোণিতসিক্ত । গাওরান সিহরিয়া উঠি-
লেন । তিনি বুঝিলেন স্বপ্ন সফল হইল,
হতভাগিনী জীবিতা নাই ! ককণস্বরে ব-
লিলেন “ দেখ ভাই ! এতকাল তোমরা
অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা শুনিয়াছ আত্ম
সেই পূর্বের কথা মনে করিয়া আমাকে
একবার জন্মের মত ভাল করিয়া দেখিতে
দেও ! ” কেহ কেহ সম্মত হইল । মস-
মুদ বিকট হাস্য করিয়া বলিল “ রাজবি-
জ্রোহীর প্রতি আবার অনুগ্রহ ? ” অমনি
শোণিত তরবারি হস্তে লইয়া তাঁহার চক্ষুর
নিকট ধরিল । তখন সেই হৃদয়বিদারক
দৃশ্য হইতে বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে চক্ষু ফি-
রাইয়া গেলেন । একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস নি-
গত হইল !

মহম্মদশাহ এখন পর্যাস্ত সুরায় উন্মত্ত ।
পূর্বদিন প্রাতঃকাল হইতে পান আরম্ভ
করিয়াছেন, এপর্যাস্ত প্রায় বিরতি নাই ।
পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার পারিষদবর্গ
মস্ত্রীর অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহার হস্তে এক
খানা লিপি প্রদান করিয়াছিল । তাহাতে
লিখিত ছিল যে, যদি উড়িয়া রাজ্য বি-
জ্রোহী হইয়া দেবগিরি আক্রমণ করিতে

পারেন, মস্ত্রী তাঁহার সহায়তা করিবেন ।
যুদ্ধে যে রাজ্যলাভ হইবে উভয়ে বিভাগ
করিয়া লইবেন । পত্রখানি যেন দৈবাৎ
হৃত হইয়াছে এইভাবে সেই পত্রবাহকসহ
শাহের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল ।
লোকটিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল
“ কিসের পত্র জানি না । মস্ত্রী মহাশয়
মধ্যে মধ্যে অতি গোপনে এই মত আরও
লিখিয়া আমার দ্বারা পাঠাইয়া থাকেন,
আমিও উড়িয়া রাজকে দিয়া উত্তর আ-
নিয়া থাকি, আর কিছুই জানি না । ”
শাহ সাক্ষর দেখিলেন । মোহর গাও-
রানের তাহাতে সংশয় নাই । পারিষদ-
বর্গকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া মস্ত্রীকে কারা-
কদ্ধ করিয়া রাখেন, অদ্য তাঁহার বিচার ।
মস্ত্রী গৃহে গমন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার
সময় তাঁহাকে কারাগারে আনয়ন করিয়া
রাখা হইয়াছিল ।

শাহ নিতান্ত কদর্য ভাষায় গালিবর্ষণ
করিয়া গাওরানকে জিজ্ঞাসা করিলেন
“ এ সাক্ষর কার ? ” মস্ত্রী লিপিখানি
হস্তে লইয়া পাঠ করিলেন, কিছুকাল বি-
স্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিলেন । পরে
বলিলেন “ হাঁ ! এ মোহর আমারই বটে,
কিন্তু এই লিপির বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অ-
নভিজ্ঞ । ”

শাহ ক্রোধকল্লিত কলেবরে তাঁহার
প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।
হুসেন বলিল “ বৃদ্ধ মৃত্যু নিকট বলিয়া ভয়
পাইয়াছে, কিন্তু বুঝিতেছে না যে অপরাধ

স্বীকার করিলে দোষের অনেক মার্জনা হইতে পারে !” মহম্মদ তাঁহার প্রাণ-মাণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, অথ কোন রূপ শাস্তি দিবেন ভাবিতেছিলেন । তখন মন্ত্রী হুসেনের ভৎসনা অসহ্য হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন “ভীকরা মৃত্যুর পূর্বে সহস্রবার যমগন্ধনা ভোগ করে । কিন্তু সাহসীগণ একবার বই মরে না ।” শাহ ভাবিলেন মন্ত্রী প্রকৃত অপরাধী না হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন । এক্ষণে সে সাহস নাই বলিয়া মৃত্যুই নিশ্চয় জানিয়াছেন । এমন সময় হুসেন পূর্বরাত্রির ছিন্ন দরখাস্ত খানি তাঁহার হাতে দিয়া কহিল “এই দেখুন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ক্ষমা করিবেন না ভয়ে নিজেই ছিড়িয়া ফেলিয়াছে ।”

শাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এদরখাস্ত ছিড়িয়াছ ?” মন্ত্রী বলিলেন “হাঁ ! কিন্তু আমি লিখি নাই ।”

মাত্র ‘হাঁ’ শাহের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষাতকদিগকে আদেশ করিলেন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রীর শিরচ্ছেদ কর । রক্ত গন্তীর ভাবে বলিলেন, “আমার মৃত্যু সামান্য কথা, আমি এজন্য অনুমাত্রও ক্ষুব্ধ নহি ।

কিন্তু যে রাজ্য গঠন করিতে আমার যত্ন অহোরাত্র ঘূর্ণিত হইয়াছে আমার মস্তকের সহিত সে রাজ্যও মস্তকহীন হইবে ।” শাহ অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । ষাতকগণ গাওসানকে প্রস্তুত হ-

ইতে বসিল । হুসেন অনুচরবর্গের সহিত আহ্লাদে মগ্ন, উপকারীর প্রাণ দণ্ড দর্শন করিতে দাঁড়াইল । একবার মসামুদের কাণে কাণে বলিল “শুভ কর্ণে বিলম্ব ভাল নয় । ধরনী নাগ এবং এসফ আদেশ উপস্থিত হইলে বিঘ্ন ঘটতে পারে ।” ক্রতঃ পামর তখন বুঝে নাই যে, যে হস্তে উপকারীর শিরচ্ছেদ হইল একদিন পরে সেই হস্তই তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিবে । ষাতকও বুঝিল না যে তাহারও সেই দশা ঘটবে ।

ধর্মপ্রচারক মহম্মদের সদৃশগনসমূহের অনুকৃতি, ভারতীর মুসলমান ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট শিরোরত্ন, দেবগিরির উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মামুদ গাওসান রাজাজ্ঞার মস্তকদানে প্রস্তুত । তিনি এক একটি কথা বলিয়া গন্তীর ভাবে সকলের নিকট বিদায় লইলেন, যদি কখনও কোন অপ্রিয় কার্য করিয়া থাকেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । এসফ এবং ধরনীনাগের নিকট যাহাতে এই ঘটনা প্রচারিত হইয়া প্রতিহিংসা লওয়া স্থলে দেশীয় লোকের রক্তপাত না হয় তজ্জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করিলেন । জানুর উপর বসিয়া পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন । শ্বেতকেশ শ্বেতশ্রাব প্রশান্ত মুখমণ্ডল অনির্বচনীয় সৌম্যভাব ধারণ করিল । মসামুদ এই অবস্থায় তাঁহার মস্তকে সূতীক্ষ্ম খড়গাঘাত করিল । মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে

পতিত হইল !! সকলে স্তম্ভিত হইল !
ছিন্নমুণ্ডেও কোন প্রকার ক্রেশের চিহ্ন
প্রকাশ পাইল না ! তৈলশূন্য দশা-
মাত্রাবশিষ্ট প্রদীপ হঠাৎ বাতাস আ-
সিয়া নির্বাণ করিল, কিন্তু তাঁহাতে ধূঁয়াও
নির্গত হইল না !!!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

হরিবে বিষাদ ।

একদিন দুইদিন তিনদিন করিয়া স-
চিবরত্ন মামুদের শোচনীয় হত্যা কাণ্ডের
পর সপ্তাহ গত হইল । এই সময় এসফ
দক্ষিণে এবং ধরনীনাথ বিজাপুরে ছিলেন ।
সপ্তাহ পর তাঁহারা উভয়েই আগিয়া উপ-
স্থিত হইলেন । দেখিলেন, রাজসভার
কার্যাবস্থা হইয়া আছে, নগরবাসী এবং
প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে ; বিদেশীয়
শাসনকর্তারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠি-
য়াছেন, হিন্দু রাজগণ স্ব স্ব অধিকার
বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছেন । মহম্মদ শাহ
অনুপুর্বেই অহোরাত্র অবস্থান করেন, এ-
কেবার সর্বনাশ উপস্থিত । বাহমণি রাজ্য
ছার খার হয় ।

কি জন্য এরূপ হইল তাহা আর অনু-
সন্ধান করিয়া জানিতে হইল না । শত
শত লোক হাহাকার করিয়া মন্ত্রীর শোচ-
নীয় পরিণামের বিষয় জ্ঞাপন করিল ।
ধরনী ও এসফ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ।
তাঁহারা জানিতে পাইলেন, মোহররক্ষক-

কে সুরাপান করিয়া তাহা দ্বারা কাগজে
সাক্ষর করিয়া লইয়াছিল, এবং পামর
হুসেন সেই কাগজে জাল চিঠি প্রস্তুত
করিয়া তদ্বারা মামুদের সর্বনাশ সাধন ক-
রিয়াছে । তাঁহারা আরও অবগত হইলেন
যে মন্ত্রীদ্বিহিতাও সেই নির্দয় ত্রাচারের হ-
স্তেই নিহত হইয়াছেন । আর কে হুসেনকে
রক্ষা করে ? আর কে আগিয়া ষড়যন্ত্র-
কারী ওয়রাগণের সহায় হয় । কে ই-
বা মমাসুদ প্রভৃতি আভিসিনীর দস্যুবর্গের
দেহ ও মস্তক একত্র রাখে ? ফণি মণ্ডলা-
কারে বেষ্টিত করিয়া নিদাঘস্বর্ষোর প্রচণ্ড
তাপে নিশ্চল হইয়া আছে, নিদ্রা যাই-
তেছে । তাহাকে একবার জাগরিত কর
ভরস্কর গর্জন করিয়া উঠিবে, তৎক্ষণাৎ
দংশন করিবে । তাঁর বিষ শীঘ্রই আত-
তায়ীর জীবন হনন করিবে । আততায়ী ষড়-
যন্ত্রকারীগণ কাল সর্প জাগরিত করিল,
কে আর তাহাদিগকে রক্ষা করে ?

রক্ষা বেগম মন্ত্রীকে পুত্র অপেক্ষাও
অধিক স্নেহ করিত, তাঁহার শোচনীয়
মৃত্যু সংবাদে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন,
এবং ইহা যে শুদ্ধ কুলোকে কুচক্র তাহা
বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন । সুতরাং পু-
ত্রকে প্রতিহিংসা লইতে আদেশ দিয়া ম-
ন্ত্রীর মৃত্যুর তিন দিবস পরেই পৃথিবী পরি-
ত্যাগ করিলেন । প্রতি দিন যে ভাবে স-
হস্র সহস্র লোক জলে জল, মৃতিকায় মৃ-
তিকা বায়ুতে বায়ু মিশাইতেছে তিনিও
সেইরূপ মিশাইলেন ! শাহ প্রকৃতিস্থ হই-

সাই গত বিস্ময় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, মাতৃদত্ত উপদেশে আপনার অপ-
রিষ্কুট সন্দেহ আরও বন্ধমূল হইল, আ-
বার ধরনীনাথ এতৎ এসফ আনিয়া তন্ন
তন্ন করিয়া যখন সকল বিবরণ জ্ঞাত হইয়া
তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন তখন তিনি উ-
ন্মত্তবৎ হইলেন। তৎক্ষণাৎ বড়মন্ত্রসং-
লিপ্ত সকলকে হত্যা করিতে আদেশ দি-
লেন। অনতিবিলম্বে আদেশ কার্যো পরি-
ণত হইল। তখন ধরনীনাথ এ পাণ পুরী
পরিভ্রাণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন।
এসফও বিজাপুরে গমন পূর্বক স্বাধীন
রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। দেখিতে
দেখিতে বাহ্মণি রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশ
হিন্দুরাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

মহম্মদ শাহ দিন দিন অনুতাপানলে
দগ্ধ হইতে লাগিলেন। একদিন প্রিয়তমা
নুরজেহারের সহিত একগৃহে শয়ন করিয়া
আছেন, গৃহে প্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলি-
তেছে। এমন সময়ে মহম্মদ দেখিলেন,
ছায়ারূপী মন্ত্রী আসিয়া প্রদীপের পশ্চাতে
দাঁড়াইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন “প্রতি-
হিংসা লওয়া হইয়াছে, আর চিন্তা কেন?
রাজ্য শাসন কর। দুই দিন পরে সকলেই
একত্র হইব।” মহম্মদ চমকিয়া উঠিয়া ব-
সিলেন। নুরজেহার নিজা হইতেই সেই
বক্তৃনির্বোধবৎ গম্ভীর স্বর শ্রবণ করিয়া
জাগরিত হইলেন। উভয়েরই বিশ্বাস হইল
মন্ত্রীর আত্মা শরীর ধারণ করিয়া আসিয়া-
ছিল। এই অবধি প্রতিদিন স্বপ্নে ভ্রম্মনক

হতাকাণ্ড দেখিতেন, দিবসেও “মামুদ
গাওয়ান আমাকে খণ্ড খণ্ড করিল, হৃদয়
বিদীর্ণ করিল” এই বলিয়া চীৎকার ক-
রিয়া উঠিতেন। ইহার পর তিনি এক বৎ-
সরখাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ের
মধ্যে তাঁহার আহা, নিদ্রা, বিশ্বাস কোন
বিষয়েই প্রণিধান ছিল না। পরিশেষে
তাঁহার অস্পব্যাপী অগচ্ গোবদপূর্ণ জী-
বনের অবসান হইল; জলবুদ্বুদের স্রাব,
আতোষ বাজীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্রাব, নৈশ্বর
জীবনের ক্ষণস্থায়ী ঘটনাবলীতে দর্শক-
হৃদয়ের নরন ও মন তৃপ্ত করিয়া অনন্তসা-
গরে মিশিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে
রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছিল, ইতিহাস-
বেত্তা পাঠকগণ সবিস্তার জ্ঞাত আছেন।

গুলনেরার ক্রুরপে তাঁহার পিতার
নিদ্রিতাবস্থায় শিবিরমধ্য হইতে বাহিরে
আসিল এবং ক্রুরপেই বা সে কাঞ্চিপুরে
নীত হইল, সময় অভাবে আমরা এপর্যন্ত
তাঁহা বিবৃত করি নাই। এখন এস্থলে
তাঁহা গ্রহণ করিলাম।

গুলনেরার মন্ত্রীর পটমণ্ডপে শয়ান
ছিলেন। সহসা স্বপ্নে দেখিল যেন তা-
হার পিতা শয্যায় নাই, কোথায় যাইতে-
ছেন। বালিকা উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ প-
শ্চাৎ চলিল। তিনি ক্ষত যাইতে লাগিলেন
সেও দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অনশেষে
তাঁহাকে পশ্চাত্তাগে রাখিতে কোতুইলা-
ক্রান্ত হইয়া দৌড়িয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া

অনেক দূরে গেল । কিন্তু পশ্চাদিকে চাহিয়া দেখিল তাহার পিতা নাই । চমকে নিদ্রাভঙ্গ হইল । দেখে যে কোথায় শিবির, কোথায় তাহার পিতা, আর কোথায় বা তাঁর । মাঠের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে ! তাহার ক্ষুদ্র শরীর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত ছিল, অন্ধকারে কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইয়াছে কেহই দেখে নাই । পূর্বেও এরূপ স্বপ্ন দেখিত কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয় নাই ।

অদূরে একটি আলোক দেখিয়া ভাবিল সেই খানে তাহার পিতা থাকিতে পারেন । অগ্রসর হইয়া দেখিল একজন সন্ন্যাসী । সে যোগবলেই হউক, অপবা তাহার অবস্থা দেখিয়াই হউক, সমস্ত বুঝিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কাঞ্চীপুরে আনিয়া এবং প্রভাত সময়ে তাহাকে রাজার নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইল । গুলুনের আর এত ভীতা হইয়াছিল যে, কএক দিন একটি কথাও বলিল না । পরিশেষে প্রমোদিনী ও ক্ষণপ্রভার সহিত একত্র অবস্থান করিয়া মনের অনেক কষ্ট ডুবিয়া গেল ।

কোমলহৃদয়া ললনাঙ্গর যবনভূষিতাকে সহোদরার মত স্নেহ করিতেন । তাহাকে তাহার পিতৃ পরিবারস্থ সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন । বালিকা অন্যায়ের সহিত ধরনীনাথের নাম লইত, এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত । প্রমো-

দও শুনিতেন বাণী হইয়া প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করিত এবং সেই কোমলকণ্ঠে প্রিয়তম নামের মধুরতার তাঁহার শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিত । সর্বদাই শুনিত ধরনীনাথ, ধরনীনাথ । একদিন গুলুনের জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি ? প্রমোদ বলিল ‘ধরনী’ । বালিকা বুঝিল না, চাহিয়া রহিল । প্রমোদিনী তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, আবার অস্পষ্টকণ পরেই একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অন্যদিকে তাকাইল ।

কুমারী ক্ষণপ্রভা এবং প্রমোদিনী, ধরনীনাথ নাম কল্পে জানিল তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক । প্রথমেই সমুদ্র-তীরে যাহার সঙ্গে পাঠকের দেখা হইয়াছে, যিনি বস্ত্রের শব্দে অচেতন হইয়া একটি অটালিকার সোপানোপরি পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং যিনি অটালিকামধ্যস্থিতা-রমণীস্বরের সেবার পুনরায় সংজ্ঞা, বলিতে গেলে এক রকম জীবন, লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই ধরনীনাথ । তিনি অনুকল্প হইয়া সে রাত্রি সেখানে যাপন করিলেন, কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষে আসিয়াও ক্ষণপ্রভা আর তাঁহাকে দেখিতে পারিল না । দেখিল তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, একখণ্ড বহুমূল্য হীরক, এবং একছড়া উৎকৃষ্ট গজমুক্তাহার একখানি কমালে বাঁধা আছে, একখণ্ড কাগজে “প্রমোদিনী” নামটিও তাহার মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে । কাককর্ষাখচিত স্বর্ণ-

মণ্ডিত একটি শিরজ্ঞান নিকটে পড়িয়া আছে, তাহার একপাশে লেখা আছে ধরনীনাথ।” সকল অ’ছে কিন্তু তিনি কোথায় ? উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, দেখিল, মৃত জাশটিকে কাক-কুকুরে ভক্ষণ করিতেছে । তাহার মন নিতান্ত বিকল হইল । কিন্তু কিছু প্রকাশ করিল না । প্রমোদিনীর নাম লিখিত দেখিয়া তাহার স্মৃতি বোধ হইল না, নামটি ছিড়িয়া ফেলিল । এমন সময় প্রমোদিনীও সেই স্থানে আসিল । ঐ সমস্ত বস্তু দেখিয়া তাহার মনে নানাপ্রকার ভয়ের উদ্বেগ হইল, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল; ক্ষণপ্রভার মুখের দিকে তাকাইল কিছু কহিতে পারিল না ; -কিন্তু ক্ষণপ্রভা যখন জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি মনে হয় ? এসকলের অর্থ কি ?” তখন তাহার মাথা ঘুরিতে, নাসিকারক্ষু ক্ষীত ও বক্ষস্থল একবার উন্নত একবার অবনত হইতে লাগিল, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল । প্রমোদকে বুঝাইতে ক্ষণপ্রভা কত বলিতে লাগিল, কিন্তু সে হৃদয় ক্ষণমাত্র সময়েতে একবারে আত্মদান করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাকে বুঝান সানান্য কথা নহে । প্রমোদ মাথা ধরিয়া প্রাচীরাবলম্বনে বসিয়া পড়িলেন । এক ঘণ্টা এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর আশা আগিয়া তাহার কাণে কাণে মৃদুমধুর স্বরে কি যেন বলিয়া গেল, অমনি উঠিয়া যত পূর্বক পথিকের সকল সংগ্রহ করিয়া লইল । আপনার হৃদয়ের, সতর্ক মনের অ-

জ্ঞাতসারে যুক্তাকণ্ঠী কণ্ঠধারণ করিল, সমস্ত শরীর সিহরিয়া উঠিল । শিরজ্ঞানে নামটি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিল । পাঁচ সাতবার মনে মনে পড়িয়া একবার প্রকাশ্যে পড়িল “ধরনীনাথ ।” ক্ষণপ্রভা যে নিকট ছিল তাহা তাহার মনেও ছিল না, স্মরণে ক্ষণপ্রভা হাসিয়া উঠিলে প্রমোদ লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল । ক্ষণপ্রভা বলিল “আমাকে দেখিয়া ভয় কি ? এজন্মে ভয় করিও না ।” প্রমোদিনী মনে মনে বলিল “তবে কি জন্মান্তরে আমাকে বঞ্চিত করিবে ?”

কুমারীদ্বয় গৃহগমন করিবীর সময় নিদাঘগৃহের রক্ষককে ডাকাইয়া পথিকের বস্ত্রাদি রাখিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; সে বলিল, “তাঁহার উদ্দেশ্য কি জানি না । কিন্তু আমাকে দুইটি স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া এবং আমার একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে চলিয়া গিয়াছেন । যাওয়ার সময় এসকল বস্তু কুমারী প্রমোদিনীকে রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন ।” প্রমোদের মনে কত স্মৃতি, কত আশ্লাদ ! ক্ষণপ্রভা যেন কিঞ্চিৎ বিষন্ন হইল । তাহার উভয়েই বুঝিয়াছিল বোধ হয় ছদ্মবেশে যাওয়া কর্তব্য বোধ করিয়াছেন । কাঞ্চীপুরস্থ রত্নেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দেখিবেন, রাজার ন্যায় পরিচ্ছদ দৃষ্টে যদি কেহ সন্দেহ করে এই ভয়ে ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াছেন ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

আশা-মরীচিকা ।

কাঞ্চীপুরের দেবমন্দির লুণ্ঠন হওয়ার পর যখন ধরনীনাথ গুল্মেন্নারকে আনিতে গিয়াছিলেন তখন প্রমোদিনীকে একটি অটালিকার ছাতের উপর দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জ্ঞাত প্রমোদ যে মস্তক নত করিয়াছিল সেই কমনীর চিত্র সর্বদা যুবকহৃদয়ে জাগরুক ছিল, এবং তাহাতেই তাঁহার মনও আশ্রিত ছিল। প্রথমদর্শনে তাঁহার মনে হইয়াছিল জড়োপাসকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়াকাশের নক্ষত্রটিকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে এবং মনে মনে অনন্তজীবন পূজা করিতে হইবে, স্পর্শ অথবা অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখিতে পাইয়া নিরাশাবস্থা দূর হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইয়াছিল তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট জ্যোতির্বিদ এবং তাঁহার চক্ষুর ন্যায় দর্শনযন্ত্র পৃথিবীতে আর নাই। দূরবীক্ষণ কখনও আকাশের নক্ষত্র গৃহের ছাতের উপর আনিতে পারে না, জ্যোতির্বিদও গ্রহনক্ষত্রের হৃদয় পাঠ করিতে পারে না, তিনি দুই কার্যই করিলেন।

কিছু দিন পরে আবার কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ করতে বাসনা হইল। গুল্মেন্নারের

মুখে আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন সুতরাং আবার তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু এবার ছদ্মবেশে, একজন সন্ন্যাসী। বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস পরিচিত প্রাসাদ সমীপবর্তী সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী যুবক তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। কুমারীগণ ‘আত্মানমাত্মানাবলোকয়ন্তুম্’ সন্ন্যাসীকে গৃহপ্রবেশ সময়ে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর চক্ষুও সেই কণু যুগ্ম শব্দ শ্রবণে তৎপ্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া যেন পরমাত্মায় লীন হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিবেন। অনেক ভাবনার পর মন উপদেশ দিল ‘কাকচরিত্র হইলে কুমারীগণের অদৃষ্ট গণনা করিতে যাইতে পারিবেন। সুতরাং সন্ন্যাসী কাকচরিত্র হইলেন। সংকল্প স্থির হওয়া মাত্রই গণনা করিবার ইচ্ছা হইল। আপনার অদৃষ্ট প্রথমতঃ আপনিই গণনা করিতে বসিলেন। হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। দক্ষিণ নয়ন অনবরতঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল। সকলই অমঙ্গল। গৃহপ্রবেশের দিনই ঝড় বৃষ্টি। সুতরাং গণনার স্থির হইল ‘যুবক! বিরত হও। তোমার অভিলষিত বস্তু সিংহের নখরাভ্যন্তরে!’

যুবক ভীত হইলেন, কিন্তু বিরত হইলেন না। দ্বার সমীপে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিলেন, একটি রক্তা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘কে?’ তিনি বলিলেন

একজন কাকচরিত্র । 'ক্ষণপ্রভা কাকচ-
রিত্রের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে
গৃহে লইয়া যাঠিতে আদেশ করিল এবং
রক্ষাকে প্রমোদিনীর বিনাহ এবং আপ-
নার মৃত্যু গণনা করাষ্টতে শিখাইয়া
দিল । প্রমোদিনী হাসিল, কিন্তু মনে
ভাবিল ক্ষণপ্রভা মরিতে চান কেন ?

কাকচরিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন ।
তাড়িৎ যেমন মেঘারুত আকাশ ভেদ ক-
রিয়া বাহির হয়, ক্ষণপ্রভার প্রভাবিশিষ্ট
চক্ষুও সেইরূপ যুবকের ছদ্মবেশ ভেদ ক-
রিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল এবং
তৎক্ষণাৎ হাসি অথবা লজ্জামিশ্র বা-
ওতার সহিত একটি শব্দ করিয়া কক্ষা-
স্তরে প্রবেশ করিল । প্রমোদিনী কি
চিনিল না ? হাঁ সেও চিনিল, প্রণ-
য়ের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, স্মরণে সে সহজেই
যুবকের হৃদয় পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল ।
কিন্তু যুগ্মার্থীর আশা যেমন যুগের দর্শন
লাভেই চরিতার্থ হয় না অনুসরণ করিয়া
যুগটিকে করায়ত্ত করে, সেও তাহাই ক-
রিতে যত্নবতী হইল । স্মরণে কাকচ-
রিত্রের নিকটেই বসিল ।

আমাদের কাকচরিত্র পণ্ডিত । তিনি
কেবল নভোমণ্ডল দেখিয়াই বিদ্যালাত
করিয়াছেন এমন নয়, তাহার সামুদ্রিকেও
ব্যুৎপত্তি আছে । স্মরণে প্রমোদের হস্ত
দেখিতে চাহিলেন । প্রমোদ আস্তে আস্তে
কোমল হস্তখানি যুবকের হস্তে স্থাপন ক-
রিল, সন্ন্যাসীর গণনা আর মনে রহিল না,

হস্ত ধরিয়া বিনশশরীরে ভাস্ত্র মনে ব-
সিয়া রহিলেন । অনেকক্ষণ পর প্রমোদ
চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বলত
আমার অভিলাব পূর্ণ হইবে কি না ?'

এবার কাকচরিত্রের আকাশ প্র-
মোদিনীর গম্ভীরভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল । তিনি
অনিমেঘনয়নে সেই আকাশ দর্শন ক-
রিলেন, চমকিত হইলেন । শূন্যমনে ব-
লিলেন, 'যাহা অভিপ্রেত তাহা আপনার
হস্তগত । কিন্তু তাহা ধারণ করিবার পূর্বে
সিংহের কবল হইতে সেই হস্ত মুক্ত ক-
রিতে হইবে ।' প্রমোদিনীর শরীর কম্পিত
হইল । মনে করিল যথার্থ কথা ।

দ্বিতীয় প্রশ্ন । মুক্ত হইবার সম্ভাবনা
আছে কিনা ?

উত্তর । আমি আশা করি হইবেন ।
ঈশ্বর এবিষয়ে আপনার সহায় হউন ।

তৃতীয় প্রশ্ন । তাহাকে একদিন শয্যা
পার্শ্বে অচেতন অবস্থায় শরান দেখিয়াছি-
লাম, এবং আর একদিন ছাত্তের উপর ।

উত্তর । আপনার নয়নে সে মূর্তি
অঙ্কিত ।

প্রমোদিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ল-
জ্জিতা হইলেন, একটুকু হাসিলেন । ভা-
বিলেন উঠিয়া যাইবেন । কিন্তু আর যদি
দেখা না পান ? এই ভাবনা ।

যুবক তখন বলিতে লাগিলেন "যে
চিনিয়া অপরিচিতের ন্যায় কাহারও প্রতি
ব্যবহার করে, তাহার গণনার যেটির
ভাল ফল সেটিও মন্দ হইয়া যায় "

প্রমোদিনী এবার আর থাকিতে পারিল না, আশ্রয় আশ্রয় উঠিয়া ছাত্তের উপর গেল। একবার মস্তক ঈষৎ বক্র করিয়া সন্ধ্যাসীকে দেখিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষে চক্ষু মিলিত হইল দেখিয়া মুখমিশ্র লজ্জানিমীলিতনয়নে ক্রতপদে প্রস্থান করিল। মরণীনাথ তাঁহার অনুগমন করিলেন। উভয়ে ছাত্তের প্রান্তভাগে দাঁড়াইলেন। প্রমোদ বলিল “এখন পড়িয়া মরিলে কেমন হয় ?

যুবক আর আশ্রয়দমন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, ‘সুন্দরি ! তোমার নাসি দুর্লভ ললনারত্নের যে কত দূর ক্ষমতা তাহা যদি বুঝিতে চাও একবার মুকুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইও। আমি প্রথম দিন হইতেই তোমার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা যে না বুঝিতেছ এমনও নয়। আমার দিন নাই, রাত্রি নাই, অরণ্য নাই, যখন যে অবস্থায় তোমাকে মনে হয় সকল অতিক্রম করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই আমার এত পরিশ্রম। তোমারই জন্য আমি ছদ্মবেশী। এতদিনের ভালবাসার যদি এই প্রতিদান হয়, যদি তুমি আমার পরি-
ত্যাগ কর, একরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কর, আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব না। এই তুমি, এই সমুদ্র, অটালিকা এই সকল দেখিতে দেখিতে পাখির জীবন এই স্থানেই বিসর্জন দিব। পরকালে কখনই আমার এমন ভাবে পরিত্যাগ করিতে পারিবেনা।

মরণীনাথ চক্ষে জল আসিল। উভয়েই বসিলেন। কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইয়া বসিলেন। কিন্তু উভয়ের আত্মবিস্মৃতি আরম্ভ হওয়ার প্রথমতঃ প্রমোদের হস্ত যুবকের হস্তে, পরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে নাস্ত হইল। যুবকের চক্ষের জলে হস্তখানি মিলিত হইতে লাগিল।

প্রমোদিনী কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া বসিল, আমি কিরূপ বিপরী যদি তাহা একবার জানিতেন তবে আর আমার আশ্রয় হইতে বলিতে সাহসী হইতেন না। অমৃত কে অনাদর করে ? প্রথম দর্শনের দিন হইতে অদ্যপর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কষ্টময় সময়ের মধ্যে তিলেকের জন্যও যদি আপনার দেবোপায় মুখমুখী বিস্মৃত হইয়া থাকি তবে যেন আমার পরকালেও মুখ হয় না ! আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি ! হয়ত আপনি আমাকে চঞ্চলা মনে করিবেন, না হয়ত নির্লজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিবেন। কিন্তু সে সকলের কারণ আপনিই, দোষ আপনার। পূর্বে আমি একরূপ ছিলাম না। আপনার ক্ষান্ত হউন, বাস্তবিকই আমি সিংহের কবলগত। এই জন্যই আপনাকে সতর্ক করিতে গুলনেরারকে শিখাইয়া দিয়াছিলাম আপনি যেন এ প্রদেশে আর আইসেন না।’

যুবক বলিলেন, ‘সুচরিত্রে আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, তোমার জন্য যদি মরিতেও হয় তাহাতেও আমার মুখ তথাপি বা দেখিয়া থাকিতে পারিব না।

তুমি রাজকন্যা আমি ভিখারী। এত উচ্চ
ভাষা আমার পক্ষে দুর্ভাষা মাত্র একথা
আমি বিলক্ষণ জানি। তথাপি মন মানেন
না, তথাপি হৃদয়কে প্রবেশ দিয়া রাখিতে
পারি না, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।
যদি সহ্য করিতে পারিতাম তবে অনলে
শরীরসহ মনের অনল ভস্ম হওয়া পর্যন্ত
অপেক্ষা করিতাম, আর পারি না।
তুমিই আমার স্বয়ং, তুমিই সর্বস্ব। তুমি
যদি আমার পরিভাগ কর তবে—আর
বলিতে পারিলেন না।

প্রমোদ কাদিয়া বলিল ‘আপনি
কেন আত্মনিন্দা করিতেছেন? ইহাতে যে
আমি মনে বেদনা পাইয়া থাকি বুঝেন
না? আপনি যে উচ্চবংশজাত একথা
যদি শপথ করিয়াও অস্বীকার করেন ত-
থাপি এবিষয় আমার হৃদয়ে থাকিবেই
থাকিবে। আমার নিকটে আপনার যাহা
আছে অনেক রাজার ঘরে তাহা নাই।
যদি আপনি পথের ভিখারী হইতেন,
তাহা হইলেও কি ভুলিতে পারিতাম? এ-
মন ভিখারী লাভ করিতে কত রাজকন্যা
ভিখারী হইবে। আপনি যদি মুসলমান
হইতেন তবে ভাল হইত।’

যুবক এই শেবাংশের অর্থ বুঝিতে
পারিলেন না জিজ্ঞাসা করায় প্রমোদ ব-
লিল ‘মুন্সরী গুল্মেন্নারের উপযুক্ত স্বামী
আপনা ব্যতীত আর নাই।’

ধরনী বুঝিলেন, এবং সেই জন্মদুঃ-
খিনীর শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিয়া

প্রমোদিনীর হৃদয় ব্যথিত করিলেন। প্র-
মোদ ভাবিল যে, আপন রূপের আকর্ষণী
শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়াই যেন মনে ক-
রিল ‘এখন আর পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী
নাই।’ অনন্তর বলিতে আরম্ভ করিল।

‘আমাকে রাজকন্যা বলিয়া কেন
রখা কর্তৃ দিতেছেন? একদিন রাজার
কন্যা ছিলাম, এক্ষণে ভিখারিণী। পিতা
কঙ্কণ রাজা হারাষ্ট্রের কাঞ্চীরাজের আ-
শ্রয়ে আসিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন,
ছোষ্ঠভ্রাতা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে না
পারিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন,
আমরা মাত্রে ঝিয়ে বন্দিবীর’ নায় এই
রাজার গৃহে আছি। মাত্রে ইচ্ছা আমরা
চিরদিনই এই গৃহে থাকি, তদনুসারে বি-
বাহের আয়োজন হইয়াছে।’

আর বলিতে পারিলেন না! দুই বৎ-
সর পূর্বে যে ভয়ঙ্কর অশনিনির্ভাদ ধরনী-
নাথকে অচেতন করিয়াছিল, আজ যদি
সেই বজ্র তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত তাহা
হইলেও এত বেদনা পাইতেন না। যখন
বুঝিলেন রাজ্য যশোধন প্রমোদকে বি-
বাহ করিবেন তখন আর স্থির থাকিতে
পারিলেন না, ভয়ানক অগ্নি হৃদয়ে জ্ব-
লিয়া উঠিল, পড়িয়া গেলেন।

প্রমোদিনী কাদিয়া উঠিল। ক্ষণ-
প্রভা দৌড়িয়া গেল, রক্তা জল আনিল।
প্রমোদ যুবকের মস্তক বক্ষঃস্থলে রাখিয়া
অঞ্চল দ্বারা বাজন করিতে লাগিল,
ক্ষণপ্রভা মস্তকে, চক্ষু, কণ্ঠে জল সিক্ত

করিতে অরম্ভ করিল । অনেকক্ষণ পর তাঁহার চৈতন্য হইল, কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্তন । উন্মত্তবৎ মূর্তি, তাঁহার পৃথিবী শূন্যময় ! কণপ্রভা বলিল ‘অভাগিনি ! আমিও পূর্বেই বলিয়াছি দুঃশায় প্রবৃত্ত হইও না । নিজেও মরিবে অন্য একজনকেও সজ্জী করিবে । দাদা জানিতে পারিলে আমাদেরই বা কি উপায় হইবে ? ’

প্রমোদিনী উত্তর দিল না । যুবক উঠিয়া বসিলেন । তখন প্রমোদ গৃহ গমনের জন্য প্রস্তুত হইল । ধরনীনাথ তাঁহার মুখের দিকে এক্রপ মর্ম্মপীড়িত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাঁহার সমুদয় আশা ভরসা জন্মের মত বিসর্জিত হইল । তাহা দেখিয়া কুমারী যারপর নাই ব্যথিত হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিলেন ‘যখন জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক তোমার কণ্ঠের মুক্তাহার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি তখন যদি এজীবন যায় তথাপি এহৃদয় অন্যের হইবে না । জীবন গেলেও তোমারই থাকিব, পরকালেও তোমারই থাকিব । তুমি আমাকে এত ভালবাস আমি কেবল তোমাকে কষ্টই দিলাম । ’

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া সেই মহিমাপূর্ণ ভাববিকাশক মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন । প্রমোদিনী আর একবার তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে ভবনে প্রস্থান করিল । যুবকও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

সন্ধ্যা ।

সংকল উপস্থিত । পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া সাগরের জল রক্তময় করিলেন, জলরাশি অহ্লাদে নাচিতে লাগিল । একজন গম্ভীর প্রকৃতি চিন্তাশীল ভাবুক একটি প্রক্ষুটিত গোলাপ হস্তে লইয়া উপবিষ্ট আছেন ; সমুদ্রের লহরীলীলা অবলোকনেই যেন নিবিষ্টমনে বসিয়া আছেন । কিন্তু মুখশ্রী গম্ভীর হইলেও বিষম, হস্তস্থিত গোলাপটি একবার নাসিকার নিকট, একবার মস্তকে, একবার অধরে, একবার চক্ষে একবার কণমূলে, একবার গণ্ডস্থলে, এবং অনবরতঃই হৃদয়ে স্থাপন করিতেছেন । সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এত প্রিয়, এত আদরের গোলাপটি সমুদ্রোর্ধ্বে মধ্যো নিক্ষেপ করিলেন । যতক্ষণ, যতটুকু দেখা গেল, দেখিলেন, যখন ডুবিয়া গেল বলিলেন, ‘আর না, আজ হইতে আমার আশাও বিসর্জন দিলাম । ’ তখন সে স্থান হইতে উঠিলেন এবং অনিশ্চিতমনে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন ।

পাশি মধ্যো একটি যুবককে তাঁহার ন্যায় বিষমমনে যাইতে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভাই অদ্য তোমার এবেশ কেন ? রাত্রিকালে, একাকী কোথায় যাইতেছ ? ’

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি আমা-
দের পরিচিত যশোধন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন তিনি তাঁহার সখা ধরনীনাথ !

ধরনীনাথ বলিলেন ‘ ভাই ক্ষমা করুন ।
বিশেষ প্রয়োজন আছে, অপেক্ষা করিতে
পারি না । আপনি আমার এতপ্রকার হিত
সাধন করিলেন, আমি অনিচ্ছাভিন্ন আর কিছুই
করিতে পারিলাম না । আপনি আমাকে
মিত্র বলেন, কিন্তু ভাই ! আমি চিরকালই
আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া আসি-
তেছি । ভাই ! এ পাপিষ্ঠের শরীর স্পর্শ
করিবেন না, এ আপনার অনুগ্রহের অ-
যোগ্য । যদি এ পাপ জীবন পরিত্যাগ
করিলে আপনার মুখ হইত, করিতাম—কিন্তু
তাঁহাও হইবে না । ক্ষমা করুন, আমার
ক্ষমা করুন ! ’ এই বলিয়া ধরনী এত দ্রুত
চলিয়া গেল যে যশোধন আর অনুগমন
করিতে সাহসী হইলেন না, তাঁহার মনের
এতাদৃশ চাঞ্চল্য কাঙ্ক্ষীরাজ আর কখনও
দেখেন নাই, স্মরণে বিস্মিত হইলেন,
এবং আশ্বে আশ্বে গৃহে গমন করিলেন ।
ক একজন লোককে যুবকের অনুসন্ধান
যাইতে বলিলেন ।

প্রমোদিনী অপরাহ্ন বেলা দুই ঘটিকা
থাকিতে গৃহে গমন করিয়াছিল । অন্তঃক-
রণ নিতান্ত বিমর্ষ । একাকিনী একটি গো-
লাপ হস্তে লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া-
ছিল । রাজাও সেই সময় সেই দিকেই গ-
মন করিয়াছিলেন । তিনি মোনার প্রমো-
দকে তদবস্থ দেখিয়া ভীত হইলেন । কিছু

জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইলেন না ।
প্রমোদও তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত চকিত
ও ভীত হইল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শ-
রীরের কম্পনে গোলাপটি হস্তচ্যুত হইল ।
যশোধন অতি যত্নের সহিত তাহা তুলিয়া
লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ প্রমোদ !
একি ? প্রমোদ কাদিয়া তাঁহার পায় প-
ড়িল, বলিল ‘ মহারাজ ! আমার ক্ষমা
করুন, আপনি আমার অনেক উপ-
কার করিলেন, হতভাগিনী তাঁহার কিছুই
প্রতিদান করিতে পারিলাম না । আমি
অবলা, আমার কোন শক্তি নাই । আমি
কেবল ঈশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল
প্রার্থনা করিতে পারি । অধিক কি ব-
লিব, এতকাল আপনাকে ভাল বাসিতাম
না, আজ হইতে জ্যেষ্ঠ মহোদয়ের ন্যায়
ভালবাসিব, অন্য হইতে আমাকে ক্ষণ-
প্রভার কনিষ্ঠা জ্ঞান করিবেন । আমার
নির্বুদ্ধিতা যদি কখনও আপনার কোন
অনিষ্ট করিয়া থাকে আমাকে ক্ষমা
করিবেন । দাদা ! বলুন আমাকে ক্ষমা
করিবেন । ”

যশোধন অবাক হইলেন । তাঁহার
এতদিনের অভিলাষ ছিন্নমূল হইল । তাঁ-
হার সকল আশা, সকল ভরসা গভীর
জলধিতলে নিক্ষিপ্ত হইল । একটি নিঃ-
শ্বাস নির্গত হইল । অতি কষ্টে, আপ-
নার সহিত আপনাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া
বলিলেন “ ক্ষমা করিলাম, তুমি আজ
হইতে আমার মহোদর কনিষ্ঠা ভগ্নী ! ”

অনন্তর বাণী হইতে বহির্গত হইয়া সেযুজ্জীৱে গমন করিলেন এবং এতদিনের আদরের হৃদয়কুসুম হস্তস্থিত গোলাপসহ সমুদ্রে বিসর্জন দিলেন ।

প্রমোদের নিকটে প্রকৃত বলিয়া আসিলেন সত্য কিন্তু পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব শুনিতে তাঁহার হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলিল এবং উপস্থিত রহস্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহে তাঁহার মন দ্বিধা বিভক্ত হইতে লাগিল । এক একবার ক্রোধে এবং প্রতিহিংসার শরীর জর্জরিত হইতে লাগিল আবার উৎকণ্ঠে প্রতীক্ষাগুলি প্রবল হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষমা করিতে বাধ্য করাইল । তিনি প্রমোদকে সর্বাস্বঃ-করণে ক্ষমা করিলেন । গৃহে গমন করিয়া ক্ষণপ্রভার নিকটে প্রমোদিনীর মনের ভাব সন্নিহার জিজ্ঞাসা করিলেন । সে অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্যোষ্ঠ মহোদরকে বিরত করিতে না পারিয়া শঙ্কা ও সঙ্কোচের সহিত সকল ঘটনা সংক্ষেপে বলিল ; গোপন করা অথবা মিথ্যা বলা তাঁহার স্বভাববিপরীত, সুতরাং সকলই যথার্থ রূপে বলিল । যশোধন শুভ্রিত হইলেন । ক্ষণপ্রভা মনে করিয়াছিল আজ যেন কি দুর্ঘটনাই ঘটে । কিন্তু একটি নিঃশ্বাসও শুনিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য হইল । মনে মনে বলিল “বাল-বিধবাগণ যেন দাদার নিকটে চিত্তসংযম অভ্যাস করে ।”

যশোধন বহির্ভাগে গমন করিয়া স-

প্রাহমধ্যে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন । আদেশ সম্পাদিত হইল । সকলেই বলিতে, লাগিল প্রমোদিনীর সহিত যশোধনের বিবাহ । যশোধন বলিতেই প্রমোদের বিবাহ, সকলে বুঝিত তিনি বিবাহ করিবেন । দশের মুখে শুনিয়া প্রমোদিনী ভীত হইল । মনে ভাবিল এমন ব্যক্তি কি এমন পাপ কার্য্য করিবে ?

দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ অতীত হই গেল । বিবাহের দিন, পঞ্চাৎ বিবাহের সময় উপস্থিত হইল । সভায় সকলে উপবেশন করিল, কন্যা আনীত হইল । প্রমোদিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, নিদােষের কেতকীগর্ভপত্রের ন্যায় তাঁহার রসনা শুষ্ক ও উষ্ণ হইল, নিঃশ্বাস অগ্নিময় হইল । তখনও ভাবিল “সময়ও আছে, উপায়ও আছে ।”

পুরোহিত রাজাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা বসিলেন না । নির্দ্ধারিত সময়ে একখান বস্ত্রান্বিত পাল্কির মধ্য হইতে বহুমূল্যপরিচ্ছদপরিহিত এক পরমসুন্দর যুবা পুরুষকে বাহির করিলেন । এমন সুশ্রী পুরুষ কেহ কখনও দেখিয়াছে এমন বোধ হইল না । প্রমোদ দেখিল, চিনি, আহ্লাদে অবশ হইল । ক্ষণপ্রভা দেখিল, দৌড়িয়া আসিল । ক্ষণপ্রভা প্রবেশ পূর্বক দ্বার রোধ করিল । এমন সময় প্রমোদিনীর নিকটে একটি কোলাহল উঠিল । সকলে গিয়া

দেখিল একখান শানিত ছুরিকা তাহার বস্ত্র হইতে সভামধ্যে পতিত হইয়াছে । যশোধন দেখিলেন, বুঝিলেন । কোন বিপদ ঘটে নাই দেখিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন “অবোধিনি ! তুমি কি কক্ষীপুরাধিপতিকে এমন পাষণ্ড অপদার্থই মনে করিয়াছিলে যে, প্রতিজ্ঞা করিয়া সে তাহা ভঙ্গ করিবে ? আশ্চর্য্যতার তুলা মহাপাপ জগতে আর নাই ।”

পরে গম্ভীরস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “আপনারা হয় ত বিস্মিত হইতেছেন, এ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি কোথা হইতে আসিলেন ?” কিন্তু আমি নিলক্ষণ জ্ঞাত আছি ইনি একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ । আমি একবার ইহার বীরত্ব পরীক্ষিত ও সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি । আমি ইহাও জানি প্রমোদিনী এই যুবকের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত এবং ধরনীনাথও প্রমোদকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন ; এমন কি যদি এই দুই জনের মিলন না হইত, পৃথিবী তিনরাত্রিও এ দুই জনকে চক্ষু দেখিত কি না সন্দেহ । প্রমোদ আমার আশ্রিতা, যদি আমার ভয়ে ভীত হইয়া বিবাহে সম্মতি দিত, তবে পরে উভয়েরই যার পর নাই অশুখ হইত, প্রমোদ আত্মঘাতিনী হইত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই দেখিলেন । আজ আমি যে কার্য্য করিলাম তাহাতে প্রতিপালিতা ও বন্ধু উভয়ের প্রতি কর্তব্য ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম, এজন্য আমার মন সর্বদা

আনন্দিত থাকিবে । ইহার আকার প্রকার হইতেই বংশমর্যাদা একরূপ বুঝিয়া লওয়া যায় । আমার বিশ্বাস হয় ইনি কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হইবেন । ইনি যে ক্ষত্রিয় তাহা আমি নিলক্ষণ জ্ঞাত আছি । প্রমোদিনীর মাতা ও ভ্রাতা এখানে আছেন, তাঁহারা সম্মত হইলেই বিবাহ নিষীদ্ধ হইতে পারে ।”

সকলেই সম্মত হইলেন, বিবাহ সম্পন্ন হইল । তখন রাজা যশোধন তাঁহাদের ভরণপোষণার্থ বিশেষ কোন উপায় বিধানের প্রস্তাব করিলেন । এতক্ষণ পর্য্যন্তও ধরনীনাথ নিস্তব্ধভাবে বসিয়াছিলেন আর থাকিতে পারিলেন না । রাজার এতাদৃশ মহত্ব দেখিয়া আত্মলাভে অশ্রুবিমর্জিত করিতে লাগিলেন, কৃতজ্ঞতায় সমস্ত শরীর পুলকিত হইল । গদ্যাদবচনে কহিলেন “মহারাজ ! প্রচুর হইয়াছে । যে পর্য্যন্ত উপকার করিলেন এই ঋণ পরিশোধ করিতেই আমার কয় জন্ম অতিবাহিত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই, আর আমার ঋণী করিবেন না । আমার প্রতিপালনের জন্য আপনার অর্থব্যয় করিয়া আবশ্যক নাই ।”

“আমি কে ?” এই প্রশ্ন অনেকদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু বলি নাই । যে অবধি প্রমোদিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই অবধিই আত্মগোপন আবশ্যক হইয়াছিল । তাহার দুইটি কারণ ছিল । প্রথমতঃ, আমার মনে হইয়াছিল আপনার সহিত প্রমোদিনীর বিবাহ হইতে

পারে, আমি যদি আপনার সুখের পথের কণ্টক হই, তবে নিতান্ত কৃত্যের কার্য করা হয় । আপনি রাজা আমি পথের ভিখারী এইরূপ সংস্কার হইলে হয়ত প্রমোদের মন আপনার প্রতিধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল । দ্বিতীয়তঃ, যদি তাহা না হয়, তবে প্রমোদ আমাকে ভিখারী জানে পতিভে বরণ করিয়া পরে সজ্জতিপর জানিলে আরও অধিক সমুদ্র হইবেন ; এই দুইটি কারণ মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে এত দিন প্রকাশ করি নাই । প্রমোদের দূত প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আপনার বিষয়ে নিরাশ হইলাম, তাই সে দিন সাক্ষাৎ হওয়াতে অনুতপ্ত হৃদয়বেগ গোপন করিতে পারিলাম না বলিয়া আপনার সহিত আলাপও করিলাম না । পরিশেষে অনার হইল বুঝিতে পারিয়া আপনার প্রেরিত পালকিতে আসিলাম ।

“শুনিয়া থাকিবেন বুন্দেলখণ্ড বলিয়া একটি প্রদেশ আছে । আমার পিতা সেই প্রদেশের শাসনকর্তা ও রাজা ছিলেন । আমরা দুই ভাতা মেদিনীনাথ রায় ও ধরনীনাথ রায় তাঁহারই সম্মান । পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে মেদিনী রায় চান্দ্রীতে রাজত্ব করিতেছেন, আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া নির্মুক্তভাবে

সুখান্বেষণে এবং জ্ঞানালোচনার সময় যাপন করিতেছি । অন্য প্রমোদিনী চান্দ্রীর সিংহাসনের পাটরাণী হইলেন, আমি গৃহে গমন করামাত্রই ভাতা কোন বিশেষ কারণে সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন । তিনি মহারাণী সজ্জের সহকারী হইয়া যবন দমনে বাহির হইবেন ।

সকলে আশ্বাসে মগ্ন হইল । যশোধন বলিলেন অগ্নি কেহই বস্ত্রের আবরণে গোপন রাখিতে পারে না । আপনি যত কেন ছদ্মবেশ অবলম্বন করুন না, রাজার ন্যায় রূপ কোন ক্রমেই লুকাইতে পারিবেন না । যাহা হউক অন্য আমি বড় সুখী হইলাম । এমন গৃহে ভগ্নী বিনাহ দিতে আমি স্নান জ্ঞান করিতাম । প্রমোদ আমার ভগ্নী হইল ।

কএক দিন আমোদ আশ্বাস করিয়া রাজা ধরনীনাথ প্রমোদিনীকে লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন । রাজা যশোধন অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন । প্রমোদিনীর মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভাতা তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন । ধরনীর জীবনের স্রোত ভিন্ন দিকে ভিন্ন কার্যে প্রধাবিত হইল । নবদম্পতি সুখের সম্মারে সুখের মিলনে পরম্পর পরম্পরের সুখ সম্পাদন করিতে লাগিলেন ।

রণরঘুর প্রলাপ।

৪। মনোহর হইতে ভয়ঙ্কর ; এই কি সেই ?

নীল আকাশে কলধৌত কলানিধি ;
অপূর্ণ, তথাপি শোভায় অতুল। নিকটে
নক্ষত্র নাই, থাকিলেও সুধাংশুর ভুবনমো-
হন রূপরাশির সম্মুখে সংকুচিত, সুতরাং
অদূরবীক্ষণ মানবনয়নের অদৃশ্য ; শ্রাবণের
আতটপূর্ণ তরঙ্গিণীবক্ষে দূরস্থিত তরণীর
ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষীণালোক সদৃশ, সেই
নভস্তলে, চন্দ্র হইতে দূরে—বহু দূরে—
দুই একটি তারকা মিটি মিটি করিতেছে।
চন্দ্র থাকিলে তারার জ্যোতির্বিকাশ অ-
সম্ভব,—সতীর অঙ্গে হীরক মলিনপ্রভ
হইয়া থাকে।

প্রকৃতিকে সুধামারে ভাসাইয়া চন্দ্র
আপনি আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে।
আকাশে মেঘ, কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড,
এই আছে এই নাই ; এক খণ্ড মেঘ এক
পার্শ্বে অবরুদ্ধতের ভাবে আরদ্ধ হইয়া
ক্রমে স্বক্ষান্তরগত হইয়াছে, তাহার প-
রেই আবার নীল আকাশ ; আবার সেই
মেঘ, আবার সেই আকাশ। ইহাদের
উপর দিয়া, ইহাদের মধ্য দিয়া চন্দ্র ভা-
সিয়া যাইতেছে ; যে মেঘখণ্ডে চন্দ্র-সং-
স্পর্শ হইতেছে, সে ই হাসিতেছে ; তাহার
পর স্নান, স্নানতর, পাংশুবর্ণ, ক্রমে কা-

শিলাকলুষিত। একটা প্রকাণ্ড অশ্বখ
রন্ধের শ্যামল পত্রপুঞ্জ পবনের মৃদু হি-
ম্নোলে তর তর নাচিতেছে আর মহো-
ল্লাসে রাশি রাশি জ্যোৎস্না ধরিয়া মা-
খিতেছে ; ক্ষণে ক্ষণে, মাখিতে মাখিতে
তরতলে সেই জ্যোৎস্না ছড়াইয়া নি-
তেছে। অদূরে শস্যক্ষেত্র, কৌমুদীর বি-
লাস জন্য কোমল শয্যা ; তথায় কৌমুদী
যেন আবেশে বিলুপ্ত।

ঐ অশ্বখমূল হইতে কিছু অন্তরে,
তৃণ ওল্লবজ্জিত একটা উচ্চ স্থানে বসিয়া
আমি নিম্পন্দপ্রায় এই স্নিগ্ধ মধুরিমা নি-
রীক্ষণ করিতেছি। আকাশে চন্দ্র ভাসিয়া
যাইতেছে ; ধরাতলে আমি বসিয়া আছি,
তথাপি আমিও ভাসিয়া যাইতেছি ; কেবল
সেই মেঘজাল যেমন তেমনি, যেখানকার
সেইখানেই রহিয়াছে। চন্দ্র একক, চন্দ্র
নিকুদেশ্য, চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে ; এমন
চন্দ্রকে ভাসাইয়া দিয়া প্রকৃতির সুখ হই-
তেছে। আমিও একক, আমিও নিকুদেশ্য,
তাই বুঝি আমিও ভাসিয়া যাইতেছি।
আমাকে ভাসাইয়া কি কাহারও সুখ
হইয়াছে ? দূর হউক, এ প্রশ্ন তুলিব না,
একথা ভাবিব না ; ভাবিলে অনেক কথা

মনে পড়িবে, অনেক ব্যক্তি মনে আসিবে।
তারা ইহলে হৃদয় আলোড়িত হইবে, সু-
ধাকরকে ভুলিয়া যাইব ; সুধাকর ভানিয়া
যাইবে আমি একা রহিয়া যাইব। অতএব
সে কথা ভাবিব না ; সেই পত্রখানি প-
ড়িতে পড়িতে, চন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে ভা-
সিয়া যাই।

কৈ ! আমার সে পত্র কৈ ! বিধাতা !
আমার কি কিছুই থাকিবে না ? তবে আ-
মায় রাখিয়াছ কেন ?

* * * * *

আমি কে ?—কোথায় আমি ? কি
জনা এখানে আসিয়াছি ? কেমন করিয়া
আসিলাম ?—এখানে বসিয়া কেন ?

ইহার প্রত্যেক প্রশ্নই এক একটি বি-
ষয় সমস্যা।

আমি কে ?—জানি না, জানিবার
উপায়ও নাই ; কারণ কেহই জানে না।
'আমি,—এই পদার্থের একটি পৃথক্
সত্তা আছে, ইহা বুঝিতে পারি ; পরি-
চিত অপরিচিত, সুন্দর কুৎসিত, নবীন
প্রবীণ এইরূপ অগণিত 'আমি' পদা-
র্থের সম্বারে 'মানুষ' নামে একটা স-
ম্প্রদায়, সমাজ বা জাতি আছে তাহাও
শুনিতে পাই। কিন্তু ইহার অধিক কিছুই
জানি না ; আমার এতদূরও যে জানি
বলিতেছি, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে পারি
না। কেমন করিয়া বুঝিব ?—এই তুমি
যাহাকে 'ঘোর অমানুষ'—নিতান্ত অ-
পদার্থ—বলিয়া নাসিকাগ্র জম্বাদ্বিত ক-

রিবার জন্ত প্রয়াস পাঠিতেছে,—সেও
"মানুষ"। অতএব আমি কে. না জা-
নিয়াও, না বুঝিয়াও আমাকে বলিতে হ-
ইতেছে—আমিও "মানুষ"। শুনিলে
পরিহাস করিতে দুর্দম লোভ হয় বটে,
কিন্তু কপাটা তথাপি পরিহাসের নয়।
তুমি পরিহাস কর, তুমিই পরিহাসের
পাত্র হইবে। তথাপি, পুনরায় সেই কথা,
তুমি "মানুষ", আমি "মানুষ"। চ-
মৎকার সমস্যা, ইহার পূরণ নাই !

আমি মানুষ, আমার পৃথক্ সত্তা আছে,
কিন্তু আমার পার্থক্যের শেষ এই অবধি।
স্বাভাব্য বল, স্বাধীনতা বল, আমার কি-
ছুই নাই ; আমি কোটি কোটি জনের
একজন মাত্র। রূপ দর্শনের বিষয়, কিন্তু
আমি দেখিতে পাইব না ; রস আশ্বাদ-
নের বস্তু, কিন্তু তাহাতে আমার অধিকার
নাই। আমার শত্রু আছে, কিন্তু শত্রুতা
সাধিতে পাই না ; আমার প্রণয়ী আছে,
কিন্তু ভালবাসিতে পাই না। যাহাতে
আমার একান্ত প্ররুতি, তাহা দোষ ; যা-
হার নাম স্বরণ করিলে আমার অন্তর সি-
হরিয়া উঠে, তাহা গুণ। যখন দেবম-
ন্দিরে থাকিতে আমার সাধ হয়, তখন
আমার বাসস্থান কারাগৃহে ; যে মুহূর্তে
প্রাণের প্রতি আমার বড়ই মমত্ব, তৎক্ষণাৎ
আমাকে ফাঁসীর কাছে খুলিতে হয়। ইহা
তোমার আমার বিধান নয়, তোমার আ-
মার নিষেধ নয় ; অথচ,—মানুষের ! যখন
আমি জনতামধ্যে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা ;

যখন আমি নির্জনে, তখন আমার সঙ্গে
সঙ্গে, আমার দেহ মন ব্যাপিয়া, জা-
এতে স্বপ্নে, ভয়ঙ্করী বিভীষিকা!—আত্মা,
পরকাল, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর! বাহিরের
কোলাহল যখন মন্দীভূত হয়, তখন অ-
ন্তরে ইহার। তুমুল সংগ্রাম করিতে থাকে।
তখনও আবার সেই প্রকৃতি স্থলে নিরুত্তি,
বিরাগের স্থলে অনুরাগ!—সেই অর্গপ্রা-
সিনী বশ্যতা, সেই মর্য়পেষণী অধীনতা।
কিন্তু ইহাতেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, ম-
নুষ্যবংশ উৎসন্ন হয় না, এক জন্ম মরিতে
চাহিলেও তাহাকে মরিতে দেয় না; আ-
বার, যদি কেহ একজনের প্রাণহানি করে,
সে বাঁচিতে চাহিলেও তাহাকে বাঁচিতে।
এ বিষয় রহস্য, ইহার মর্যোদ্ভেদ কে ক-
রিবে?

প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে
বুঝি, মনুষ্যের ন্যায় অসহায়, নিকৃপায়,
সধিসামর্থ্যহীন জীব আর নাই;—প্রকৃ-
তির ক্রীড়া জন্য মনুষ্য যেন কাচনির্মিত
পুতুল। প্রকৃতির কোটি কোটি বিশ্বসৃষ্টি
আছে, আর সর্বপ্রকার জীবেরই স্বাতন্ত্র্য
আছে; তাহাদের প্রত্যেকেই বাঁচিতে
মরিতে একা, স্বখে দুঃখে একা, স্বপ্নে জা-
এতে একা, কার্ষো আলস্যে একা। আ-
বার, এই একের প্রতাপ আছে, বিক্রম
আছে, অনন্যাপেক্ষ হইয়া চলিবার অধি-
কার এবং সাধা আছে। কেবল মনুষ্যের
ইহা নাই,—সিংহ হস্তী হইতে মশক পি-
পালিকা পর্যন্ত সকলকেই ভয় করিয়া ম-

নুষ্যের চলিতে হয়। মনুষ্যের এ সকল
নাই, স্মৃতরাং মনুষ্যের সুখ নাই, শাস্তি
নাই। কিন্তু মনুষ্যের কম্পনা আছে
অভিমান আছে, রাগ আছে। যে প্র-
কৃতি তাহার এত প্রতিকূল, তাহাকে ক-
রায়ত্ত, তাহাকে দাসীত্বে নিযুক্ত, তাহার
অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া তৎপ্রতি শাস্তি
বিধান করিতে, মনুষ্যের স্মৃতরাং বাসনা
আছে। সেই জন্য মনুষ্য আপন আপন
ভুলিয়া, জাতীয় দুঃখে মনস্তত্ত্ব হইয়া, সকলে
মিলিয়া এক হইয়াছে; তাই জনে জনে
এক নাই, এক এক করিয়া সকল একে ম-
হৈকত্ব লাভ হইয়াছে। এখন, তাহার
ফলে মনুষ্য ঘোর অস্বাভাবিক জীব! ম-
নুষ্য আর প্রকৃতির কথা শুনিতে চাহে না,
প্রকৃতিই মানুষের কথা শুনে।

অতএব “আমি” একা স্বাতন্ত্র্যহীন,
সাধ্যহীন হইলেও ক্রিয়াক্রপী; জাতীয়
মন্ত্রে যুক্ত হইয়া, আমার অহং ভাব নিসর্জন
দিয়া সেই প্রকৃতিশাসন উদ্দেশে “আমি”
কর্মণীল।

যতগুলি প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছি,
তাহার এইমাত্র উত্তর সম্ভবপর; এতদ্বিহীন
স্পষ্টতর, স্থিরতর, অধিকতর সম্ভবত কো-
নও উত্তর আছে কি না, জানি না;
আর ভাবিবও না, কারণ ভাবনার পার
নাই।

কিন্তু,—হায়! তথাপি ভাবনা?—
কিন্তু, আমি রংরঘু, আমিও কি এই নির-
মের বশে অন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি?

আমি জানি, আমার ত নিয়ম নাই, সূত্র নাই, তবে আমি এখানে কেন ?

আমি এখানে কেন ? আকাশের নক্ষত্রমালা নিয়মের অধীন, যথানিয়মে শূন্যে বিদ্রাজ করিতেছে । আর, সেই নক্ষত্র যুষ্টিতে নক্ষত্রের রূপকে তিরস্কার করিয়া দর্শকের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়-ভয়ের সঞ্চার করিয়া উল্কা শূন্যপথে ছুটিয়া শূন্যে মিশিয়া যায় ।—আমিও মানব জগতের উল্কা, আমার কেহই নাই, কিছুই নাই ; আমার স্বাধীনতা নাই, শাস্তা নাই ; আমার ইহকাল নাই, পরকাল নাই । আমি কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হাসিতে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছি ; যতদিন না শূন্যে মিশি, তত দিন এইভাবে ভাসিব । আমি ত মনুষ্য নহি !

সত্য সত্যই কি আমার কেহই নাই ? কিছুই নাই ? প্রণয়ী নাই ? সহোদর নাই ? আমার জন্ত এক বিন্দু অশ্রুপাত করে, এমন কেহই নাই ? নাই থাকুক, যাহার স্মৃতির দিনে আমি একবার হাসিতে পাই, এমন ও কি কেহ নাই ?

—আর,—

আমার স্মৃতিাকর ?—হায় ! তুমিও পশ্চিম গগনে চলিয়া গেলে ? আমার জন্য অপেক্ষা করিলে না ? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিতেছিলাম, সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেও দিলে না ? সংসার তোমারি অভাবে মলিন হইবে, আমি যে সকল হারা হইব ?—আর আমার সে

পত্র খানি, তাহাও নাই ! সত্য সত্যই আমার কেহ নাই ! কিছুই নাই ?

* * * * *

আমি কি ভাবিতেছি ? কতক্ষণ এভাবে বসিয়া এই সকল অলৌকিক ভাবনা করিতেছি ? আমি কি অজ্ঞান হইলাম ?

এখনও চন্দ্র আছে ; পত্র খানি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, একবার খুজিয়া দেখি ।—কিন্তু, কোথায় খুজিব । আমি কোন্ পথে আসিয়াছি ?—তথাপি অন্বেষণ করি, ইত্যন্তঃ ভ্রমণ করিয়া দেখি । কেন বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমার মন যেন বলিতেছে যে এই পত্রের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের বিশেষ সম্পর্ক । তবে ত দেখিতেই হইল ।

আমি গৃহভাগ করিয়া আসিয়াছি, স্মৃতরাং মনের বড়ই ব্যাকুলতা হইয়াছে । যে কখনও বিদেশে গিয়াছে, “ যাই ” বলিয়া একদিনের তরেও গ্রামান্তরে গিয়াছে, সেই জানে যাইতে হইলে চিত্ত কেমন বিকল হয় । বাল্যে যখন বিদ্যালিক্ষার নিমিত্ত প্রবাসে যাইতাম, মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং বয়সাবর্গের সঙ্গসুখে যখন নিয়মিত কালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হইত, তখনও এই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি । কিন্তু তখন মনে হইত যে কষ্ট কেবল মাতা ও পিতা, মোদর ও বন্ধুবর্গকে দেখিতে পাইব না বলিয়া ; তখন প্রতি পাদক্ষেপে যখন এক একবার ফিরিয়া টল টল লোচনে চাহিতাম, আজিকার জন্ত কেহ আ-

মাকে ফিরাইয়া আরও এক দিন বাড়ীতে থাকিতে দিউক, এই কথা যখন গুলুগুঃ ভারিতাম, তখন মনে মনে করিতাম যে তাহাদের সকলকে পাউলেই বুঝি যাইতে বাখা পাইব না। আমার যাত্রা কালে মাতার নয়নে ভয় ও ভালবাসা যখন উছলিয়া উছলিয়া পড়িত, তখন নিশ্চয় করিতাম যে এদৃশ্য দেখিতে না হইলেই বুঝি আর কষ্ট নাই। কিন্তু তাহা ত নয় ;— মাতা পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, আমি ত এই মান্নার সংসার ছাড়িতে চাহি না। যখন একে একে একাদিক বাল্য সখা আমার হৃদয়ে তাহাদের জীবিতের রেখা রাখিয়া অকালশুষ্ক, অপরিষ্কৃত প্রহ্নন তুল্য খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, তখন ত আমি তাহাদের সঙ্গে যাইতে চাহি নাই। তবে আর কোন মুখে বলিব যে ইহার জ্ঞা কি তাহার জ্ঞা গৃহত্যাগে কট ? যখন এতজ্ঞে আমার ভালবাসিত, তখনও যে দুঃখ, আজি যে দাদা পর, বধূ পরাং পর, আজিও আমার চিত্ত বৈকল্য হইরাছিল। বস্তুতঃ আমাকে তুমি ভালবাস বলিয়া যে আমি তোমায় ভালবাসি, তাহা নয় ; ভালবাসা কিছু নীরস, সঙ্কচিত হৃদয়, নীচাস্তঃকরণ পণ্যজীবের আদান প্রদানের সামগ্রী নয়। গৃহ বল, জন্মভূমি বল, স্বদেশ বল, ইহারা ভালবাসিতে জানে না, অথচ আমরা ইহাদিগকে ভালবাসি। তাই বলিতেছি, গৃহের জন্যই গৃহত্যাগের কষ্ট।

আমার সেই কষ্ট হইরাছে ; আবার, এমন গৃহে আমাকে ভালবাসিতে কেহ নাই মনে করিয়া আমার দ্বিগুণ যন্ত্রণা হইরাছে। সেই জন্য কোন পথে বাজি হইতে আসিয়াছি, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই ; কতদূর আসিয়াছি তাহা পথশ্রমেও বুঝিতে পারি নাই ; কোথায় আসিয়াছি, তাহা ত জানিই না। তাহার উপর ক্লান্ত হইয়া চন্দ্ররশ্মিতে শরীর শ্লিষ্ট করিতে বসিয়া, পথের একমাত্র সশল, সন্তানার একমাত্র উপায় সেই অপরিচিত হস্তের পত্র খানি হারাইয়াছি যখন জানিলাম, তখন কি বলিয়া না অভিভূত হইব ? কেমন করিয়া হৃদয়বেগে অবিচলিত থাকি ?

সংজ্ঞা হারাইরাছিলাম, এখন সংজ্ঞা পাইলাম ; অচেতন ছিলাম, এখন চেতনা হইল, সেই জন্য সেই পত্রের উদ্দেশে, অনিশ্চিত, পূর্বমুখে চলিলাম।

সেই পত্রের জন্য অনন্যমনে পাদমূলে, সম্মুখে, পাশ্বে দেখিতে দেখিতে পূর্বমুখ চলিলাম ! স্থানে স্থানে গুলোর ঝোপ; কাহাকেও অর্কবেষ্টন করিয়া, কাহাকেও বা পদ দলিত করিয়া, কাহারও একটা পল্লব ভাঙ্গিয়া দিয়া, কোথায়ও একটি পাতা ছিড়িয়া লইয়া, সেই পাতা খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে তাহাকে অঙ্গুলী ঘর্ষণে পেষণ করিতে করিতে, সেই পূর্বমুখ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কিন্তু মনুষ্য গতায়তের পথ দেখিতে পাইলাম না। যে দিক্ হইতেই আসিয়া থাকি, আমি পথ ধরিয়াই আসিয়াছিলাম,

তবে আর এদিকে গিয়া কেন রথা কাল-
হরণ করি ? ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিতের ন্যায়
দাঁড়াইলাম, এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করি-
লাম, আবার চলিলাম । কিন্তু আর বড়
অধিক দূর যাইতেও হইল না । পত্রের
চিত্তায় পত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে,
সেই দিকে যাইতে যাইতে, সহসা দেখি-
লাম আমার সম্মুখে দূরবাণী, ক্রমনিম্ন
বালুকাময় প্রান্তর ;—দক্ষিণে, বামে, স-
ম্মুখে নিরবচ্ছিন্ন বালুকার স্তূপ । আমার
কৌতূহল জ্বলিল, সেই সিকতারাশি অতিক্রম
করিলাম, তখন দেখিলাম ভাগীরথী সা-
গরসঙ্গমে যাইতেছেন । তিনি যে ভাগীরথী,
তাহা কাহারও চিনাইয়া দিতে হইল না ;—
মহাজনের মহত্ব, মহাজনের গৌরব স-
র্বদা প্রতিভাত হইতে থাকে ।

ভাগীরথীদর্শনে আবার ক্ষণকালের
জন্য সকল ভুলিয়া গেলাম । অনন্তকাল
ধরিয়া গঙ্গা অবিলম্বে সাগরসঙ্গমের সু-
খলাভ করিতেছেন, তথাপি অনন্তপ্রবা-
হিনী সেই সাগরাভিমুখেই প্রধাবিতা ।
প্রণয়ের চরমোৎকর্ষের সেই সজীব মূর্তি,
সেই পবিত্র জাহ্নবীতীরে দাঁড়াইয়া, কল্প-
নায় আলোচনা করিতে লাগিলাম । তখন
দাদাকে, বউকে আপন বলিয়া মনে প-
ড়িল ; আমি কোথায়, তাহা মনে হইল ;
তাহার পর চক্ষে জল আসিল, আর গঙ্গা
দেখিতে পাইলাম না । অমনি মুখ ফি-
রাইলাম, আবার সেই পত্রের কথা স্মৃতি-
পথে উদ্ভূত হইল, পুনরপি সেই বালুকা-

রাশির উপর দিয়া চলিলাম । কিন্তু তখন
আমার দিগ্‌নির্ণয় ছিল না ।

কতকদূর গিয়া দেখিলাম বালুকা-যেন
মনুষ্যের পদক্ষেপে ভাজিয়া ভাঙ্গিয়া র-
হিয়াছে ; নিকটে পথ আছে ভাবিয়া এ-
কবার চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখি-
লাম——ভয়ঙ্কর দৃশ্য !—অনতি-
দূরে মনুষ্যের মৃতদেহ ! তাহার পরিধানে
বস্ত্র ছিল, তেমনি রহিয়াছে ; কণ্ঠের স্ব-
র্ণাভরণ অম্পৃষ্ট রহিয়াছে । আমি যে
স্থানে দাঁড়াইয়া, সেখান হইতে দৃশ্যমান
কোনও ক্ষত চিহ্নও সে দেহে দেখা গেল
না । নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিতে
সাহস হইল না, কিন্তু বিশ্বাস হইল যে সে
ব্যক্তি সদ্যমৃত । ভ্রমিতগতিতে সে স্থান
ভ্রাগের মানসে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু
দুই পা না যাইতেই——একখানি পত্র !

এই কি সেই পত্র ? আমি ত এ পথে
গিয়াছিলাম বলিয়া আমার বোধ হয় না ।
হউক বা না হউক, কৌতূহলের বশে পত্র
খানি কুড়াইয়া লইলাম ; ভয় হইয়াছিল,
কৌতূহলে তাহার কণকিঃ উপশম হইল ।
তথাপি সেই পত্রহস্তে দৌড়িতে লাগি-
লাম । তীর অতিক্রম করিয়া যখন বুঝি-
লাম যে গঙ্গা বহুদূরে পড়িয়াছে, তখন
চন্দ্রালোকে পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম ।
অতি কষ্টে অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়ি-
লাম——

“ প্রত্যন্তরনিবেদনক বিশেষঃ—
আদৌ বসন্ত সে ধাতুর লোক নহে ।

ফলতঃ যাহার জন্য আমি এই ভয়ানক
কর্মে প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম,
সেই অন্য নিষ্পেষণ হইয়াছে, তাহাতে আ-
মার মনে বড়ই উৎকণ্ঠা হইয়াছে । বৃত্তরাং
আর আমার দ্বারা কোনও প্রত্যাশা করি-
বেন না । যাহা হউক, প্রকাশেরও কোনও
আশঙ্কা নাই । আপনার পত্র পোড়াইয়া
ফেলিয়াছি, এপত্রও ছিঁড়িয়া ফেলিবেন ।
ইতি ২৯ এ কার্তিক । ”

পত্রের শিরোনামা নাই, কাহারও
স্বাক্ষর নাই । বোধ হইল হস্তাক্ষর অপ-
রিচিত নহে !

পাঠকালে, পাঠান্তে বারংবার লো-
মাঞ্চ হইতে লাগিল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল,
বার বার চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম ।
তখন চন্দ্র অন্তর্গত হইল । ক্ষণকাল পরে
দেখিলাম কতকগুলি স্বক্ষের অন্তরালে এ-
কটা আলোক ; একবার চন্দ্র বলিয়া স-
ন্দেহ হইল, কিন্তু তাহার বর্তমান আয়তন,
উদ্যমশীল ধূমপুঞ্জ এবং চটপট শব্দে সে
সন্দেহ শীঘ্রই দূরীভূত হইল ।

লোকালয়ে অগ্নি লাগিয়াছে মনে করিয়া
পত্রখানি বস্ত্রাঞ্চলে দৃঢ়বন্ধনপূর্বক সেই-
দিকে দৌড়িলাম । শ্রীরণরঘু গোস্বামী ।

কার্য ও কারণ ।

এ জগতে কারণ বিনা কার্যের উৎ-
পত্তি সম্ভবে না ! আকাশের নক্ষত্র অ-
বধি পৃথিবীর নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যেখানে
যে কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহারই কারণ আছে । ঐ যে নদীর
জল জোয়ারে ফাঁপিতেছে, ভাঁটার কমি-
তেছে তাহারও কারণ আছে । ঐ যে মেঘ
উঠিল, শূন্যমার্গ অন্ধকার হইয়া গেল, রুটি
মুসলধারে পড়িল, প্রবল ঝটিকা বহিল,
তাহারও কারণ আছে । বায়ুহীন প্রদেশে
শব্দ নাই, গন্ধ নাই ; তথায় জল বত্রিশ
পাদ উর্দ্ধে উঠে ইহারও কারণ আছে ।
এই পরিবর্তনশীল জগতে যে কিছু পরি-
বর্তন দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই

কারণ আছে । কারণ ব্যতীত কার্যের
আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না ।

পণ্ডিতেরা কারণের এইরূপ লক্ষণ নি-
র্দেশ করিয়া থাকেন;—যাহা ব্যতীত কা-
র্য্যসিদ্ধি হয় না, তাহার নিয়ত পূর্ববর্তিতাই
কারণত্ব* । কারণের অভাব হইলেই
কার্যের অভাব হইবে† । কোন কা-

* অন্যথাসিদ্ধিশূন্যম্য নিয়তপূর্ববর্তিতা
কারণত্ব । ভাষা পরিচ্ছেদ ।

† কারণাভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ।

আত্মিকঃ ।

নৈয়ামিক ফাউলার সাহেবও কারণের
এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন ।*

See Fowler's Inductive Logic Ch I

যে কারণ নিরূপণের জন্য এইরূপ বিধি আছে,—ইতর কারণ থাকিলেও যাহার অভাবে কার্যের অভাব, তাহাই ঐ কার্যের কারণ বলিয়া জানিবে * । কার্য ও কারণ মধ্যে এরূপ গাঢ় সম্বন্ধ যে, দ্বিতীয়ের অভাবে প্রথমটির অস্তিত্ব সম্ভবে না ; প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টির ঘটন কে'নরূপে স্বীকার করা যায় না । অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা থাকে যে, কারণ বর্তমান থাকিলেও কোন প্রতিরোধী ঘটনা ঘটনা সেই কারণের কার্যোৎপাদক শক্তি নষ্ট করিয়া দেয় । সুতরাং যখনই আমরা বলিব যে, কারণ সত্ত্বে কার্যের সত্ত্বা অবশ্য স্বীকার্য, পাঠকগণকে বুঝিতে হইবে যে, কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রতিরোধী ঘটনা উপস্থিত নাই † ।

কারণ তিন প্রকার,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত । যাহা সমবেত হইলে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তাহার

* ‘যদ্যতিরেকেণ ইতরকারণসমুদয়-সত্ত্বে যস্য অভাবঃ পশ্যতি তৎ কার্যং প্রতি তস্য কারণত্বং নিশ্চিনোতি ।’

পণ্ডিতবর জনশ্রুতি মিল তাঁহার রূত ন্যায়শাস্ত্রে কারণ নিরূপণের অবিকল এইরূপ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন ।

Compare Mill's Inductive Logic, 2nd & 3rd Canons.

† See Fowler's Inductive Logic Chap I. ইহাকে ইংরেজীতে Negative conditions বলে ।

সমবায়ী কারণ কহে ; যাহা তাহাতে আসন্ন, তাহাই অসমবায়ী কারণ ; এবং এই উভয় হইতে ভিন্ন যে কারণ, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায় । ষট প্রস্তুত সম্বন্ধে কপাল সমবায়ী, কপালসংযোগ অসমবায়ী এবং দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত কারণ * । আমরা কোন বিশেষ কারণের উল্লেখ করিব না, কিন্তু যখনই ‘কারণ’ শব্দের প্রয়োগ করিব, তখনই পাঠকগণকে সকল কারণ একত্র করিয়া যাহা হয় (অর্থাৎ যাহার একটি অভাবে কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে) তাহাই বুঝিতে হইবে † ।

* নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন ;—

ভবেত্তস্য (কারণস্য) ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্তিতং । সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথা-
প্যাসমবায়িহেতুত্বং । এবং ন্যায়নরৈজস্বতী-
রমুক্তং নিমিত্তহেতুত্বং । যৎসমবেতং কার্যং
ভবতি জ্ঞেয়ম্ সমবায়ি জনকং তৎ । তত্রা-
সন্নং জনকং দ্বিতীয়মাত্মাং পরং তৃতীয়-
মাং । পুনশ্চ—তৎপ্রতি । অর্থাৎ কার্যের
প্রতি) কারণং ত্রিবিধ্যং । সমবায়িকারণং
১ যথা ঘটকার্যং প্রতি কপালং । অসমবায়ী
কারণং ২ যথা ঘটকার্যং প্রতি কপাল-
সংযোগাদি । নিমিত্ত কারণং ৩ যথা
ঘটং প্রতি দণ্ডচক্রাদি ।

ইতি তর্কশাস্ত্রং ।

† ইহার জন্য কখন কখন ইংরেজীতে Cause এই শব্দের পরিবর্তে Co-cause শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ।

আমরা যাহাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহা পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটি ঘটনা ঘটিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিবর্তন দেখা গেল—একটি দৃঢ় যুক্তাঘাত করিলাম, তোমার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কার্যকারণ সম্বন্ধ। কারণের ফলটি যত ভয়ানক বা গুরুতর হয়, সেই পরিমাণে সম্বন্ধটি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। একবার দেখিলে আর জন্মে ভুলি না। যে একবার কামানের শব্দ শুনিয়াছে, সে তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। যে শিশু একবার প্রদীপের নিকট খেলা করিতে গিয়া দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছে, সে প্রাণ থাকিতে আর প্রদীপের নিকট যাইবে না।

সর উইলিয়ম হ্যামিল্টন কার্যকারণের এই রূপ সম্বন্ধ নির্দেশ করেন, যথা; এ জগতে আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহারই যে কারণ আছে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কার্যের কারণ আছে বলিলে আমরা কি বুঝিব? যাহা আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, তাহাই যে ঈশ্বরকর্তৃক প্রথম সৃষ্টি, অর্থাৎ ঈশ্বর শূন্য হইতে (Out of nothing) যে ইহাদিগকে সৃজন করিলেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি না! সুতরাং যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহা পূর্বে ছিল,—অন্য আকারে থাকুক, অন্য অবস্থায় থাকুক—তাহারা ছিল, এই ইহাদিগের আরম্ভ নহে; ইহা আমাদের

স্বীকার করা কর্তব্য। এ জগতের পরমাণু ক্রমিবার নহে, বা ডিবার নহে, তাহার সমভাবেই আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং যাহা কেন চক্ষু দেখি না, তাহার পরমাণুগুলি অন্য কোন দ্রব্য হইতে আসিয়াছে; না আদিলে কোথা হইতে পরমাণুর সম্ভব হইতে পারে? সৎ হইতে অসৎ হইতে পারে না, অসৎ হইতেও সৎ হইতে পারে না*। ঈশ্বর শূন্য হইতে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন শুনিলে আমরা কি বুঝিব? তিনি আপন হইতেই এই জগতের সত্তা আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার অধিক আমাদের বুद्धির অগম্য; চিন্তার অতীত ও স্বপ্নের অগোচর।

সুতরাং কারণের পরমাণু হইতেই কার্যের পরমাণুর সম্ভব হইয়া থাকে। কারণে যাহা থাকে কার্যেও তাহা থাকিতে দেখা যায়; যাহা কার্যে দেখিতে পাই না তাহা কারণেও ছিল না ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা। সম্পূর্ণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস† আমাদের বুद्धির অগম্য। সুতরাং কার্যকারণ ভাব আর কিছুই নহে, কেবল এই যে, যাহা এখন দেখিতেছি তাহা পূর্বে

* “নামতো বিদ্যাতে ভাবো না-
ভাবো বিদ্যাতে সতঃ।”

† Absolute commencement and absolute annihilation.

অনা আকারে ও অনা অবস্থায় বর্তমান ছিল * ।

আমরা এরূপ তর্কের অনুমোদন করি না। সম্পূর্ণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস আশাদিগের বুদ্ধির অগম্য, একথা আমরা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। প্রতি দিনই আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি। যখন পাত্রের জলটি শুকাইয়া যায়, তখন কি আমরা ভাবি না যে, জলটি ধ্বংস হইয়া গেল; তখন কে ভাবে যে, বাষ্প আসিয়া কণায় কণায় জলকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই জলে মেঘ হইয়াছে; সেই মেঘে বৃষ্টি পড়ে। এরূপ তর্ক যে সত্য, তাহা আশাদিগের বিশ্বাস আছে, কিন্তু এসত্য কয়জন জানে? যখন গ্রীষ্মকালে জলাশয় সকল শুকাইয়া যায়, তখন কৃষক কি একবারও ভাবে, এই জল বাষ্পে পরিণত হইয়া মেঘ হইতে আবার বৃষ্টি হইবে? সেই জল যে অল্প আকারে এ জগতে বর্তমান আছে, তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য। জল যে মেঘকণায় পরিণত হয়, এবং এজগতের কোন পরমাণুই ধ্বংস হইবার নহে, ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু হ্যামিলটন সাহেব যে বলিয়াছেন যে, এতদ্বিপন্ন চিন্তার অগম্য, তাহা আমরা আপনাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম। জগতে সকলেই বিজ্ঞানবিৎ বা দার্শনিক হইলে, যে পরমাণু এক্ষণে আছে,

তাহার প্রকৃত আরম্ভ ও প্রকৃত ধ্বংস হইতে পারে না একথা একদিন বলিলে খাটিতে পারিত। প্রকৃত আরম্ভ ও প্রকৃত ধ্বংস হইতে পারে না একথার চিন্তা করিলে কি ফল ফলে, আমরা তাহাই দেখাইব।

ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে (হ্যামিলটন সাহেবের কথানুসারে) যে, যে জগৎ এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি, তাহা পূর্বেও ছিল, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই, এবং কিছুতেই ইহা ধ্বংস হইবে না।

হ্যামিলটন সাহেব তদুত্তরে এই বলেন যে, পূর্বে ‘জগৎ-সৃষ্টির’ ক্ষমতা ঈশ্বরে ছিল; সেই ক্ষমতা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সৎ হইতে অসৎ হয় নাই, ক্ষমতা হইতে জগৎ হইয়াছে। সে হিসাবে সে ক্ষমতা এক্ষণে আর ঈশ্বরে নাই। সে ক্ষমতা জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। অতএব ঈশ্বর যদি এইরূপ আর একটা জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি পারিবেন না, কেন না, সে ক্ষমতা আর নাই! এই জগৎ যখন ধ্বংস হইয়া আবার তাঁহার ক্ষমতায় পরিণত হইবে, তখন তিনি আবার জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এক্ষণে নহে। সুতরাং হ্যামিলটনের কার্য কারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে গেলে মহা গোলোযোগ আসিয়া পড়ে।

* Sir William Hamilton's Lectures on Metaphysics.

অনেকে বলেন যে, কার্য হইলেই

কারণ থাকিলে, এইটী আশাদিগের স্বতঃ-
সিদ্ধ বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন যে, প্র-
ত্যেক কারণেরই কার্য থাকিতে হইবে ;
ইহা প্রমাণের অতীত, প্রমাণ করা যাইতে
পারে না। যাহা আপনি আপনাকে প্র-
মাণিত করিতেছে, তাহার আবার অন্য
প্রমাণের প্রয়োজন কি ? পঞ্চমবর্ষীয় বা-
লকও যাহা দেখে তাহারই কারণ অনুস-
ন্ধান করিতে যত্নশীল হয়। পশ্চাদ্ধিক
হইতে তাহার গাত্রে লোষ্ট্রক্ষেপ কর, অ-
মনি সে সেই দিকে চাহিয়া দেখিবে ; না
দেখিতে পাইলে কে, কেন, প্রশ্ন করিতে
নিকটবর্তী মাতা বা পিতাকে জিজ্ঞাসা
করিবে। যদি কার্যকারণ সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ
না হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র দুধের বালক
কেমন করিয়া প্রত্যেক কার্যেরই কারণ
আছে, এসত্য জানিবে ?

কিন্তু আমরা এমতের পোষকতা ক-
রিতে পারি না ! আজি পর্য্যন্ত কিছুই যে
জগতে স্বতঃসিদ্ধ আছে ইহা আমরা স্বী-
কার করি না। এক একরূপ স্বতঃসিদ্ধতা
সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়
নাই। আজি দেখিলাম, অগ্নিতে বস্ত্র
দিলেই পুড়িয়া যায়, কালিও দেখিলাম,
পরম্ব দিবসও ঐ ঘটনা ঘটিল ; এই-
রূপ যখনই পরীক্ষা করিয়া দেখি, তখ-
নই অগ্নিতে বস্ত্র দিলেই পুড়িয়া যায়। এই-
রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, অগ্নিতে বস্ত্র
দিলেই পুড়িয়া যাইবে। তখনও আমার
একরূপ জ্ঞান জন্মায় নাই যে, অগ্নিতে যাহা

দিব, তাহাই পুড়িয়া যাইবে। তখনও আ-
মার বিশ্বাস হয় নাই যে, প্রত্যেক ঘটনা-
রই কারণ আছে, কারণ বাতীত কার্যের
উৎপত্তি হয় না। যে শিশু একবার প্রদী-
পের নিকটে গিয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে,
সে আর প্রদীপের নিকটে যাইতে চায় না।
কেন ? তাহার কি জ্ঞান জন্মিয়াছে যে
প্রত্যেক কারণেরই কার্য আছে, বা প্র-
ত্যেক কার্যেরই কারণ আছে ? কখনই
নহে, সে এই পর্য্যন্ত জানে যে, প্রদীপের
নিকটে গেলে পূর্কের মত তাহার কষ্ট হ-
ইবে, এই জন্য সে যাইতে চায় না ; নতুবা
যে কারণ বাতীত কার্য হয় না, এজ্ঞান
তখন তাহার হইয়াছে, ইহা আমরা বলি
না। এইরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে,
নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে, কার্য বাত্রে-
রই যে কারণ আছে, এই জ্ঞান আমরা
লাভ করিয়া থাকি। যখন একরূপ ঘটনা
আমরা স্বচক্ষে দেখি, তখন কার্যকারণ
সম্বন্ধ আমরা কোন্ সাহসে স্বতঃসিদ্ধ
বলি ? *

* মার উইলিয়ম হ্যামিল্টন সাহেব তাঁহার
প্রণীত Discussion on Philosophy &c.
নামক পুস্তকে কারণত্বের স্বতঃসিদ্ধতা প্র-
মাণ করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।
তৎপ্রণীত "Lectures on Metaphysics"
তেও ইহার উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে
পাওয়া যায়। রিড এবং হিউয়েল
(Reid and Whewell) ও এই মতের পো-
ষকতা করেন। হারবার্ট স্পেন্সর (Har-

এতৎ সম্বন্ধে কোন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকঃ বলিয়াছেন, ‘ প্রত্যেক কার্যের কারণকে থাকিতেই হইবে, অনেকে এই কথা বলিয়া আমাদিগের কার্যকারণ ভাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে চাহেন । থাকিতেই হইবে, এই কথা বলিবার পূর্বে আমাদিগের দেখা উচিত, প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে কি না ? ইহা আমরা কোন রূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারি না, এবং কখনও পারিব না । সুতরাং কার্য হইলেই কারণ থাকিতে হইবে এই কথা বলিয়া এই ভাবকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করিতে যাওয়া ধর্ম্মতার কার্য ব্যতীত আর কিছুই নহে ।

বিপক্ষীরেরা বলেন, যদি ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ না বল, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত কোন কার্যকে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি । ভাব দেখি, কার্য আছে, তাহার (but Spenser) বলেন-যে, বাস্তবিক বাহ্য-জগতের পর্যালোচনা দ্বারা আমরা ইহার জ্ঞান লাভ করি । কিন্তু বহু পূর্বপুরুষাবধি এইরূপ বলিয়া আসিতেছে বলিয়া, কারণই এক প্রকার মনের স্বতঃজাত বিশ্বাস ইয়া দাঁড়াইয়াছে । মালব্রান্স (Malbranche) ঈশ্বরকেই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমরা জগতে কারণের যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার মতে তাহাতে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ আছে । See also Mill's Logic book chap 3.

কারণ নাই । আমরা এতদ্বত্তরে এই বলি যে, কারণ ব্যতীত কার্যের সম্ভব আমরা ভাবিতে পারি । আমরা কারণকে মনে স্থান না দিয়া কেবল কার্যটি ভাবিতে পারি । তবে কার্যের সহিত যে কারণকে ভাবিয়া থাকি তাহা কেবল এই সংসারের গতিতে । আমরা কারণ ব্যতীত কার্য কখন দেখি নাই, এই জন্যই একটীর সহায় অপারটীর সহায় আমাদিগের মনোমধ্যে উদয় হয় । যতই আমরা বয়োবৃদ্ধ হইতে থাকি, ততই প্রত্যেক জ্বরের নানা রূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই ; এই দেখিয়া দেখিয়া আমাদিগের মনে কার্যকারণের ভাব দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায় ।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, কারণ যদি কার্যকে উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে কার্যোৎপত্তির ক্ষমতা কারণে আছে । অগ্নিতে যদি কিছু পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বলিতে হইবে ; সূর্য উত্তাপ দেয়, সুতরাং উত্তাপ দিবার শক্তি সূর্যের আছে ।

এইরূপে তাহার কারণে একটি শক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন । হ্যামিলটন সাহেবই এই মতের একজন প্রধান প্রবর্তনিতা ।

কিন্তু আমরা কারণে কোন রূপ ক্ষমতা বা শক্তি দেখিতে পাই না । অগ্নিতে কোন গুণ আছে (সে গুণ শক্তি নহে) এবং বস্ত্রেও কোন গুণ আছে, এই দুইটি গুণের

সান্নিধ্য হইলেই বস্তু আর একরূপ কোন জ্বালা পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে একরূপ বলিতে পারি না যে, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, কেন না তাহা হইলে অগ্নি সকল জ্বালাকেই ভস্মসাৎ করিতে পারিত; এ জগতে অনেক সামগ্রী আছে যে, অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, যে গুণের অস্তিত্ব থাকিতে বস্তু দগ্ধ হইয়া গেল, সেই গুণের অস্তিত্ব সেই সকল সামগ্রীতে নাই; এই জন্যই উহারা অগ্নি সংস্পর্শেও পুড়িল না। *

এতদ্ব্যতীত আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে অগ্নিতে বস্তু দিলেই বস্তু আর এক প্রকার আকৃতি ধারণ করে। বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ, এবং বস্ত্রের অকার-পরিবর্তন এই দুইটা ভাব আমাদের মনে শৈশবাবস্থা হইতে একরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে যে, যখনই বস্ত্রে অগ্নিসংযোগ দেখিব, তখনই সেই পরিবর্তনের কথা মনে পড়িবে। কিন্তু বস্তু পুড়িতেছে দেখিতে পাইলে আমরা একরূপ মনে করিতে পারি না যে, অগ্নিতেই বস্তু পুড়িয়াছে। কারণ হইতে কার্যের অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য হইতে কোন বিশেষ কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

* ম্যান্‌সেল, কোম্‌ট্‌, জেমস্‌ মিল এবং জনস্টুয়ার্টমিল মহোদয়েরা কারণে যে কোনরূপ ক্ষমতা আছে তাহা স্বীকার করেন না।

কোন দার্শনিক বলেন, পূর্বাপর ভাবই কারণত্ব। 'ক' এর পূর্বে যদি 'খ' ও 'গ' ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে 'খ' ও 'গ' কারণ, 'ক' কার্য। কিন্তু এটি ঘোর ভ্রমাত্মক। একথা সত্য হইলে, দিনকে রাত্রির কারণ বলিতে হইবে, এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলিতে হইবে। এ তর্কটি অস্বাভাবিক দোষযুক্ত। বিশেষতঃ দিবা এবং রাত্রির মধ্যে যে কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রায় কোন নৈরায়িকই স্বীকার করেন না। *

কারণ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার স্মূল মর্ম্ম এই;—

১। কারণত্ব অপ্রমাণিত; ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। ইহার স্বতঃসিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩। অনেক কারণে কার্যাদেশক শক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন; একরূপ শক্তি কারণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এক কারণ হইতে এক কার্যই হইয়া থাকে, সুতরাং কারণ হইতে আমরা কার্যের অনুমান করিতে পারি। কিন্তু এক কার্যের বহু কারণ থাকিতে পারে,

* দিন রাত্রির কারণ নহে এবং রাত্রিও দিনের কারণ নহে পরন্তু উভয়ই একটি কারণের কার্য। সফটব্য জন্স্টুয়ার্টমিলের ন্যায় শাস্ত্র। (Mill's Logic—chapter on causation)

এইজন্য আমরা কার্য দেখিয়া কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ করিতে পারি না ।

৫ । যে কারণ হইতে যে কার্যের উৎপত্তি হইতেছে, যত দিন এই জগৎ থাকিবে

কিবে সেই কারণ হইতে সেই কার্যেরই উদ্ভব হইতে থাকিবে ইহার কোনরূপ অন্যথা ঘটবে না ।

শ্রী—

সমালোচনের সমালোচনা ।

গত কএক বৎসর যাবৎ আদিশূর-কর্তৃক কানাকুল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন ও সেই ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । তন্মধ্যে ইউরোপীয় লেখক দ্বারা ইংরেজি ভাষাতে যে দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার একখানি হটের সাহেবের । তিনি বাদ্যলার সংক্ষিপ্ত রূপান্তর লিখিতে লিখিতে প্রসঙ্গক্রমে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগের বিবরণ লিখিয়াছেন । দ্বিতীয় গ্রন্থ সেরিং সাহেব কৃত । উহা ব্রাহ্মণগণের গোত্রনির্ণয় এবং ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি বিষয়ক । তিনিও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন । এতৎ সম্বন্ধে তৃতীয় গ্রন্থ গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিরচিত লঘুভারত ; তিনিও আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগের বিবরণ লিখিয়াছেন । শেৰোক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং উপরোক্ত তিন খানি গ্রন্থের

মুদ্রণ বিবরণ সাধারণের জ্ঞানগোচর হয় নাই । বহুদিন হইল কোলকাতা সাহেব আনিস্টাটিক রিসার্চ নামক সাময়িক প্রচারিত গ্রন্থে, এবং ডাক্তার কে, এম্, বন্দোপাধ্যায় কলিকাতারিভিউতে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও অনেকেই দেখিতে পান নাই । সম্প্রতি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি কর্তৃক বাদ্যলা ভাষাতে সম্বন্ধনির্ণয় নামে একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে । বোধ হয় সাধারণে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকিবেন, এবং গত ১২৮৩ সনের পৌষ মাসের আখ্যাদর্শনে উক্ত পুস্তকের সমালোচন উপলক্ষে রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিভাগ সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় সাধারণের গোচর হইয়াছে । কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থকর্তা কি কোন প্রস্তাব লেখক কি কোন সমালোচকই এবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, সকলেই কেবল আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী মত প্রচার করিয়াছেন ।

লালমোহন বাবু, গোবিন্দকান্ত বি-
দ্যাভূষণ এবং সেরিং সাহেবের মতে
রাঢ়ী বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণই কান্য-
কূজাগত ব্রাহ্মণের সম্ভান; যে দেশে তাঁ-
হারা বাস করিয়াছিলেন সেই দেশের
নামানুসারে তাঁহাদের শ্রেণীর নাম চই-
য়াছে। হট্টের সাহেবের মতে রাঢ়ীরাগণ
কান্যকূজীয় ব্রাহ্মণগণের স্বদেশে বিবাহিত
বৈধ পত্নীর সম্ভান। বারেন্দ্রগণ—এদেশের
ব্রাহ্মণকন্যাতে উক্ত কান্যকূজাগত ব্রাহ্ম-
ণের ঔরসজাত সম্ভান। লালমোহন বাবু
কহেন “ইহারাও অর্থাৎ বারেন্দ্ররাও
আদি পঞ্চগোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের স-
ম্ভান”। আর্ষ্যদর্শনের সমালোচক ড-
ঃ পলকে লিখিয়াছেন “ইহা লালমোহন
বাবুর অনুমান মাত্র, কারণ তিনি ইহার
সপক্ষে কোন প্রমাণ প্রদান করিতে পা-
রেন না এবং তাঁহার এই অনুমান অপ্রতি-
দ্বন্দ্বীও নহে; কারণ কেহ কেহ এবিষ-
য়ের অন্য প্রকার মীমাংসাও করিয়া থা-
কেন। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চগোত্রীয়
ব্রাহ্মণেরা সত্বীক বঙ্গে আইসেন নাই,
তাঁহারা যত্‌কালীন বঙ্গে আগমন করেন,
তখন তাঁহাদের পূর্বোক্তা ভাষ্যারা বাঢ়ী-
তেই ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গে আসিয়া এখা-
লকার ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কন্যাকে বিবাহ
করেন ইত্যাদি।” সমালোচক প্রকারান্তরে
হট্টের সাহেবের উক্তির পোষকতা করি-
তেছেন।

• সম্বন্ধনির্গরকর্তা এবং তৎসমালোচক

উভয়েই কহেন ৯৯৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ
ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ক্ষিতীশবংশাঙ্কী
চরিতে ৯৯৯ শকে ব্রাহ্মণ আইসার বিবরণ
লিপিত আছে। এই গ্রন্থখানি আধুনিক
নবদ্বিপাধিপতি রাজা রুঞ্চচন্দ্রের সময়ে
প্রস্তুত হয়, সুতরাং ইহার লেখার প্রতি
তত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সম্বন্ধ-
নির্গরকর্তা ঐ ৯৯৯ অব্দের সম্বৎ ব্যাখ্যা
করিয়া ৮৬৩ কি ৮৬৪ শকাব্দে আদিশূর
কর্তৃক গোড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন সিদ্ধান্ত করি-
য়াছেন*। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-
সাগরও স্বকৃত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ৯৯৯ শকাব্দে
আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন বলিয়া
লিখিয়াছেন। ঘটকদিগের কারিকা দৃষ্টে
জানা যায় ৯৯৪ শকের কাঠিক মাসে
ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন। (১) কিন্তু
কুলাচার্য্য গ্রন্থের লিখা ইহার বিপ-
রীত। তাহাতে লিখিত আছে ৯৫৪
শকে ব্রাহ্মণেরা গোড়ে আসিয়াছিলেন।
(২)। এখন কুলাচার্য্য গ্রন্থের লেখা সত্য
কি না তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে;
এবং তাহাতে বৌদ্ধ রাজাদের অধিকার
সময় এবং আদিশূরের রাজত্ব কাল বি-
বেচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কনিঙহাম সাহেবের কৃত আর্কি-
ওলজিকেল সার্ভে নামা গ্রন্থে পাল-

* সম্বন্ধনির্গর ১৬১ পৃঃ এবং গ্র-
ন্থের প্রথমে স্থিত ক্রোড় পত্র।

বংশীয় রাজাগণের যে তালিকা প্রকাশ
হইয়াছে তাহা এই ।

গোপাল	৭৬৫	খৃঃ অব্দ
ধর্মপাল	৭৯০	ঐ
দেবপাল	৮১৫	“
জয়পাল	৮৪০	“
দেবপাল	৮৬৫	“
শূরপাল	৮৯০	“
নারায়ণপাল	৯১৫	“
রাজপাল	৯৪০	“
* * পালদেব	৯৬৫	“
বিগ্রহপাল	৯৯০	“
মহীপাল	১০১৫	“
নরপাল	১০৪০	“
বিগ্রহপাল	১০৬৫	“

কাশীর নিকটবর্তী শরনাথে একটি নি-
দর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা প্রাচীন পালি
অক্ষরে ও পালি ভাষাতে লিখিত । তদ্রূপে
জানা যায় ১০৮০ সম্বতে মহীপাল কাশী
অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে
মহীপাল গোড়রাজা বলিয়া লিখিত হ-
ইয়াছে ঐ ১০৮০ সম্বত ১০১৫ খৃঃ অব্দ
হইতেছে । কলিঙহাম সাহেব ১০১৫ হইতে
১০৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহীপালের রাজত্ব-
কাল কহিতেছেন । মহীপালের কীর্তি
অদ্যাপি দিনাজপুরে বর্তমান আছে । ম-
হীপালের পর নরপাল রাজা হন । ১০৪০
হইতে ১০৬৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত তাহার
রাজত্ব কাল । ডাক্তর বকানন কহেন
পালবংশের শেষ রাজার পরেই আদিশূর

বাজালাতে রাজা হন । অধ্যাপক ল্যাশন
সাহেবের বিবেচনা এই : ০৪০ খৃঃ অব্দে
বৈদ্যবংশীয় রাজা কর্তৃক পালবংশের
রাজত্ব লোপ হয় । সাহেবদিগের মতে
আদিশূর বৈদ্যবংশীয় এবং সেনবংশের
আদি ব্যক্তি । বাস্তবিক আদিশূর যে
বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়া বাজালা
অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে আর কোন
সন্দেহই নাই । কুলপ্রদীপ নামা প্রাচীন
গ্রন্থেও লিখিত আছে, আদিশূর বৌদ্ধ রাজা-
দিগকে পরাজয় করিয়া গোড় অধিকার
ও তথ্যতে বৈদিকধর্ম প্রচার করেন ।

লঘুভারত নামা গ্রন্থে লিখিত হই-
য়াছে আদিশূর তাহার স্বশুরের সহায়-
তায় বীরসিংহকে পরাস্ত করিয়া, পাল-
বংশীয় নৃপতিগণের বংশোচ্ছেদ করিয়া,
পালবংশাসনে গোড়ে স্বাধীন রাজা হন,
এবং কলির ৪১৩০ বত্সর গতে (স্মৃতরাং
তাহার পুস্তক রচনার সময়ের সহিত ঐক্য
করিলে ৯৫১ শক পাওয়া যায়) আদিশূরের
রাজ্যারম্ভ হয় । অতএব আদিশূরের রা-
জ্যারম্ভকাল সম্বন্ধে ডাক্তর বকানন এবং
অধ্যাপক ল্যাশনের সহিত লঘুভারতকর্তা
প্রায় একমত হইতেছেন । অধ্যাপক ল্যাশ-
নের মতে ৯৬২ শকে এবং বিদ্যাভূষণের
লিখামতে ৯৫১ শকে আদিশূর রাজা হন ।

বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে লিখা আছে আ-
দিশূর কান্যকূজাধিপতি চন্দ্রকেতুর কন্যা
বিবাহ করেন । কিন্তু কান্যকূজ নৃপতিগ-
ণের মধ্যে চন্দ্রদেব নাম পাওয়া যায় । সু-

ভরাৎ চন্দ্রকেতু এবং চন্দ্রদেবকে একব্যক্তি স্থির করিলাম। কাশীর ইতিহাসে লিখিত আছে ১০৭৪ সম্বতে কাশীতে বুনার নামা রাজা ছিলেন। তাহার দশ বৎসর পর কাশী মহীপাল রাজার অধীন হয় এবং তাহার হস্ত হইতে কণোজের রাজা চন্দ্রদেব কাশী অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ১০৯০ সম্বত অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে চন্দ্রদেব কাশী অধিকার করেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণে আদিশূর যে কিঞ্চিৎ হ্রাদিক ৯৫০ শকাব্দের সমকালে গৌড়ে রাজা হন ইহা প্রতীয়মান হয়, এবং সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধ বংশীয় নরপালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। সত্য বটে নরপালের পরেও আরও কতকটি বৌদ্ধ রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের গৌড়ে রাজত্ব করার কোন প্রমাণ নাই। নরপাল আদিশূর কর্তৃক ত্যাগিত হইয়া মগধ দেশে রাজধানী করেন। তদবধি যে পর্যন্ত না মুসলমানগণ কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন সে পর্যন্ত পালবংশীয় গণ মগধে রাজত্ব করেন।

যদি উপরের লেখা মতে ৯৫০ শকের সমকালে আদিশূর গৌড়ে রাজা হইয়া থাকেন তাহা হইলে তৎসমকালেই ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকিবেন। তিনি যৎকালে গৌড়ে রাজা হন তখন এদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচার ছিল না। কেন যে ছিল না তাহার সন্তুস্তর পাওয়া কঠিন। অনেকে অনুমান করেন বৌদ্ধ রাজাগণের দৌ-

দ্রাত্যো বৈদিক ধর্ম গৌড় দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। ইহা তাদৃশ সম্ভব বোধ হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল, অথচ সে দেশে বৈদিক ধর্মেরও প্রচার ছিল। বাদ্জালার জল বায়ুর এমনই গুণ যে আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ সম্ভানেরাও বৈদিক ধর্মানভিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক এখন আদিশূর বাদ্জালাতে বৈদিক ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যেই উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে বেদপারগ সান্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন তাহার রাজ্যারম্ভের অবাবহিত পরেই ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব এবং তাহা হইলে “বেদব্রাহ্মণা কেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” এই প্রমাণ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই প্রমাণ কোন গ্রন্থের তাহা আমি অবগত নই, জনৈক প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ আমাকে এই প্রমাণ দিয়াছেন এবং নির্দোষ কুলপঞ্জিধৃত বচন বলিয়া লিখিয়াছেন।

এই বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আরও পৌষক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কুলপঞ্জিধৃত স্পষ্ট বচনের আর অধিক পৌষক প্রমাণ প্রদর্শন করা নিপ্পয়োজন বোধে বিরত হইলাম। সম্প্রতি সম্বন্ধনির্ণয় কর্তা আপন গ্রন্থে ৯৯৯ অব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন লিখিয়া সেই অব্দ শকের যে সম্বত বাখ্যা করিয়াছেন এখন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিবেচনা কর, ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত বাদ্জালা দেশে লিখিত, তাহাতে যে অব্দ

লেখা আছে তাহা শকাব্দই হইবেক ; বা-
জাল দেশে সম্ভূত প্রচলিত নহে । বিশে-
ষতঃ ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে শকাস
শব্দ স্পষ্টই লেখা আছে । আদিশূর হইতে
বল্লাল সেন অন্তিম অথবা নবম পুরুষীয়
অধস্তন রাজা । লালমোহন বাবু আ-
ইন আকবরির প্রমানানুসারে ১০৬৬
খৃঃ অঙ্গে বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল স্থির
করেন । যদি ১০৬৬ খৃঃ অঙ্গে বল্লাল সে-
নের রাজ্য আরম্ভ কাল হয় তাহা হইলে
তাহার অন্তিম অথবা নবম পুরুষের পূর্বের
আদিশূর ৯৯৯ শকাব্দে (১০৭৭ খৃঃ
অঙ্গে) কি প্রকারে রাজত্ব করিবেন ইহাই
লাল মোহন বাবুর আশঙ্কার কারণ হই-
রাছে এবং তদনুসারে তিনি ৯৯৯ শকাব্দে
সম্ভূত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ৯৯৯ সম্ভতে
৮৬৩ কি ৮৬৪ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৪২ খৃঃ
অব্দ হয় ঐ সময়ে বাজলাতে পাল বংশীয়
রাজাগণের অধিকার ছিল । বাস্তবিক ব-
ল্লাল সেন যে ১০৬৬ খৃঃ অঙ্গে রাজ্য প্রাপ্ত
হন এবিষয়ে সন্দেহ হয় । বল্লাল সেন
কৃত দানসাগর নামে এক খানি গ্রন্থ
আছে । এই প্রস্তাবলেখক বহু যত্ন করিয়া
ঐ গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ
খানি কে ন শকে প্রস্তুত হইয়াছে তা-
হাতে তাহার কোন নিদর্শন নাই । কিন্তু
সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে
“ নিখিলনৃপচক্রতিলক শ্রীমত্তল্লাল সেন
দেবেন । পূর্ণে শশি নবদশমিতে শকাব্দে
দান সাগরো রচিতঃ । ” এই বচনের প্র-

কৃতার্থে ১০৯১ শকে বল্লাল সেন কর্তৃক
দান সাগর রচিত হওয়া প্রমাণ হই-
তেছে । তাহা হইলে ১১৬৯ খৃঃ অঙ্গে
দান সাগর রচনা হওয়া প্রমাণ হয় । সু-
তরাং ১০৬৬ খৃঃ অঙ্গে বল্লাল সেনের
রাজ্য আরম্ভ হইতে পারে না । লাল
মোহন বাবুও আপন গ্রন্থে সময় প্রকা-
শের বচনটি উঠাইয়াছেন কিন্তু তিনি উহার
১০৯৯ শক অর্থ করেন । “ পূর্ণে শশি-
নবদশমিতে ” এইরূপ পাঠ থাকাতে বিধেয়
অঙ্কের বামগতি হেতু প্রথমে ১০ তত্পর
৯ এইরূপে অঙ্ক স্থাপন করিয়া ১০৯১ শক
অর্থ পাওয়া যায় ।

মহারাজা আদিশূর কান্যকূজাধিপতির
নিকট পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাচনা
করেন । তদনুসারে কান্যকূজাধিপতি গোড়
দেশে আদিশূরের সভাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ
পাঠাইয়া দেন । রাঢ়ীয়গণ কহেন ভট্ট-
নারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, এবং ছান্দড়
এই ৫ জন গোড় দেশে আসিয়াছিলেন ।
তাহাদের আধুনিক গ্রন্থে ঐ পাঁচ নামই
পাওয়া যায় । বারেন্দ্রগণ কহেন নারায়ণ
ভট্ট, সুষেণ, কাশাপ, ধরাধর এবং পরাশর
এই পাঁচজন আসিয়াছিলেন । ইহাতেই সমস্ত
বিরোধের উৎপত্তি হইতেছে, কারণ রাঢ়ী-
য়গণের আধুনিক গ্রন্থোন্মেষিত ভট্টনারা-
য়ণাদি পাঁচজন হইতে যে বংশ গণনা করা
যায় তাহার মধ্যে বারেন্দ্র শ্রেণীর কোন
উল্লেখ নাই । কিন্তু বারেন্দ্র গ্রন্থে বল্লাল
সেন কর্তৃক শ্রেণী ভাগ কালে পঞ্চ গো-

ত্রীণ পঁচজন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হওয়ার রহস্য পাওয়া যায়। বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিত আছে কিন্তু রাঢ়ীর কুলজ ঘটকগণ তৎপ্রতি আপত্তি করিতে পারেন, একজন রাঢ়ীর নির্দোষ কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাঢ়ী বারেন্দ্র রক্তান্ত লিখিত হইতেছে। যথা—

একদিন মহারাজা আদিশূর সভাতে উপবেশন করিয়া পুরোহিত গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন “অহং ক্ষত্র কুলে জাতঃ নকুর্যামু তযজ্ঞকং। অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিবামি দ্বিজোত্তম। কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগ সমুবাঃ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি রূপয়া কথয় প্রভো ॥ বিপ্র উবাচ। কান্যকুজস্থিতা বিপ্রাঃ সাম্বিক বেদ পারগাঃ। তস্মাৎ পঞ্চ দ্বিজাতিয় যজ্ঞ নিষ্পন্নতাং কুরু ॥” অর্থাৎ, আমি ক্ষত্রিয় কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু কোন রূপে যাগ যজ্ঞ করিলাম না। অতএব অগ্নি হোত্রীয় যজ্ঞ করিব। বেদ পারগ ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন তাহা অবগত করিতে ইচ্ছা করি; আপনি রূপা করিয়া তাহা বলুন। তদ্ব্তরে পুরোহিত কহিলেন কান্যকুজ দেশে সাম্বিক এবং বেদ পারগ ব্রাহ্মণ আছেন তথা হইতে পঁচজন ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।

তদনুসারে আদিশূর ২৫৪ শকাব্দে কান্যকুজ হইতে পঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন সেই সকল ব্রাহ্মণের নাম কিতীশ, তিথি মেধা, বীতরাগ, সুধানিধি এবং সৌ-

বরি। ইহারাষ্ট্র গোড় দেশে আসিয়াছিলেন। যথা।

বেদ বাণাক্ষ শাক্যেতু গোড়ে বিপ্রা

সমাগতাঃ।

কিতীশতিথি মেধাচ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্মাত্মা আগতা গোড়

মণ্ডনঃ ॥

অনেকের সংস্কার আছে ব্রাহ্মণের প্রথমে ত্রীমহিত আইসেন নাই এবং এদেশীয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়া ছিলেন; পশ্চাত্ কান্যকুজ হইতে তাহাদের পূর্ব-নিবাহিতা পত্নীরা আইসেন। বোধ হয় সম্বন্ধ নির্ণয়ের সমালোচকও এই মতের পক্ষপাতী, অতএব তাহাদের ভ্রম নিবারণ নিমিত্ত কুলগ্রন্থের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইল।

আরাতাঃ পঞ্চবিপ্রাঃ সূচতুর হৃদয়াঃ প-
ঞ্চকোনাচ্চ দেশাত্
সত্বীকা পুত্রযুগ্মাঃ পরিজনসহিতাঃ সা-
যঃ কাস্তিমন্তঃ ॥

বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরমা।

হয়যানঃ সমাক্ষয় সোপানত্বাঃ দ্বি-
জোত্তমাঃ।

সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ ভূতোরপি সমন্বিতাঃ ॥

বারেন্দ্র কুলপঞ্জি।

মহারাজ রাজাদিশূরোমহাত্মা। জরা
বীরসিংহস্য মেহন্তাদিসখ্যং। তবাজানু-
সারাক্ষি প্রস্থাপয়ামি বিজ্ঞান্ পঞ্চ গোত্রান্
সদারাদিভূত্যান্—

শঙ্করপঞ্চমধ্বত কুলার্চ্যাকাংক্ষিকা।

ব্রাহ্মণগণ যে স্ত্রীপুত্রাদি সহিত আসিয়াছিলেন, ইহার আদৃত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বালুনা ভরে তৎসমুদয় উল্লেখ করা গেল না।

ব্রাহ্মণেরা গোড়ে আগত হইয়া আদিশূরের অভিলষিত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গোড়ে বাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে আদিশূরের মৃত্যু হইল, তাহার পুত্র ভূশূর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কান্যকুব্জানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের ৫টি সম্মানকে বাস নিষিদ্ধ রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রকঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণো-
কনিঃ ।

দক্ষোপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রে-
ষ্ঠোপি ছান্দগঃ ॥

ভরদ্বাজক গোত্রক জীহবোহর্ষনর্দনঃ ।
বেদগর্ভোপি, সাবর্ণে রাঢ়দেশ গতা অমী ॥
দানোদরঃ সদাচার্যঃ শাণ্ডিল্যঃ গো-
ত্রকঃ শ্রুতিঃ ।

গোতমোপি ভরদ্বাজ কাশ্যপেচ রূপা-
নিধিঃ ॥

বাৎস্য গোত্র সমুৎপন্নো দ্রবুকোদধরা-
ধরঃ ॥

পরাক্ষরোপি সাবর্ণে বারেন্দ্র ভূমী
ভূশূরঃ ॥

রাঢ়ীর কুলার্চা গ্রন্থে এই প্রমাণের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আদিশূরের রাজধানী গোড়ে ছিল ; সকলেই কহেন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে গোড়ে আসিয়াছিলেন। বারেন্দ্র দেশ

গোড়ের একাংশ। মহানন্দার পূর্ব কব-
তোয়ার পশ্চিম পদ্মার দক্ষিণ এই সীমাব-
দ্ধি দেশ বারেন্দ্র ; অতএব দেখা যাই-
তেছে যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বারেন্দ্রদেশে
বসতি করেন, তাহাদেরই পরিভ্রম রাঢ়ে
গমন করেন।

কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্তৃক
আনীত ব্রাহ্মণ সম্মানেরাই যে রাঢ়ী বা-
রেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বল্লল সেন কর্তৃক
বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শঙ্করপাণ্ডুর-
দ্ব্যত কুলার্চা কারিকাতে লিখিত আছে
যথা ;—

অথ বল্লল ভূপাশ্রয়ঃ কুলনন্দনঃ ।
কুব্জতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিপক্লবঃ ॥
আদিশূরানীতাবিপ্রাঃ শুদ্রাশ্চৈব তথা-
পর্যঃ ।

এতেষাং সমুত্তীঃ সর্বা আনয়ন্ত নিজা-
লয়ে ॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্ত্রদেশে নিরু-
পিতা : ।

শ্রেণীভুক্ত নির্ণীতং রাঢ়ী বারেন্দ্র সং-
জ্ঞকং ॥

তথৈব দ্বিবিধ প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজো-
ত্তমং ॥

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলার্চা গ্রন্থে
লিখিত আছে, বল্লল সেন আদিশূরানীত
বিপ্র সম্মানগণকে রাঢ়ী বারেন্দ্র এই দুই
শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন, যাহারা
রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদি-
গকে রাঢ়ী, যাহারা বারেন্দ্র দেশে বাস

করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র, এই
সংজ্ঞা-প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

প্রতাপেন শূরো মহানাশিশূরো

নৃপঃ পঞ্চগোত্রান্ দ্বিজান্ কান্যকুজাং ।

সমানীতবান্ পঞ্চ পঞ্চনলাভান্

সত্যং সৎক্রিয়া দিক্ষয়ে গোড়দেশে ॥

ততোবহুতিথে কালে গোড়ে বৈদ্যকু-

লোদ্রহঃ ।

বল্লালসেন নৃপতি রজ্যগত গুণোত্তমঃ ।

রাঢ়ায়াং গোড়-বারেন্দ্র-পৌণ্ড্র-বজ্রোপ-

বজ্রকে ।

অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীৰ্য্য-প্রভাবতঃ ॥

কান্যকুজায়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বাচাতি

গুণোত্তরান্ ।

আদিশূরসা নৃপতেৰ্ঘণো মূর্তিরিব স্থি তান্ ।

দ্বিধা বিভক্তান্ বিদুষো রাঢ়া বারেন্দ্র

বাসিনঃ ।

আদিশূরসা যশসঃ পশ্চাদ্বর্তী যশোগম ।

যথা ভ্রম্যাং সত্যং গেহে তথৈব বিদধা-

ম, ইং ।

ইতি সন্ধিস্তা মর্যাদাং স্থাপন মকরো-

ত্তরোঃ ।

কৃতবান্ গুণতঃ ধীমান্ কোলীনাং শো-

ত্রিচেচ সঃ ।

অর্থাৎ আদিশূর কান্যকুজ হইতে অ-

মল সদৃশ ৫ পঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন ক-

রিয়াছিলেন । তাহার বহুকাল পরে

বৈদ্যকুলোদ্ভব গুণশ্রেষ্ঠ বল্লাল সেন গৌর

দেশে রাজা হন । বলবীৰ্য্য প্রভাবে রাঢ়

বারেন্দ্র, পৌণ্ড্র, বজ্র এবং উপবজ্র দেশে

তাঁহার অধিকার বিস্তার হইয়াছিল । তিনি

আদিশূরের যশোমূর্তি স্বরূপ রাঢ় এবং

বারেন্দ্রবাসী এই উভয় শ্রেণীভুক্ত কান্য-

কুজাগত বিপ্রগণকে অতিশয় গুণশালী

দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যাহাতে আ-

মার যশ আদিশূরের যশের পশ্চাদ্বর্তী

হইয়া সজ্জনের মধ্যে প্রচলিত থাকে, ত-

ক্রপ কার্য্য করা আমার কর্তব্য । ইহা বি-

বেচনা করিয়া উভয় শ্রেণীর বিপ্রগণের মধ্যে

কৌলীনা মর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন ।

আরও

দ্বিজাভীষ্টতুর্বর্ণানাং স্মৃতিকর্তা । পৃথক্

কার্য্যাসিদ্ধৈযথা সমজ্ঞা ।

তথাসোহত্র বল্লালসেনো বিভক্ত চকা-

রাত্র বারেন্দ্র রাঢ়ী সংজ্ঞকান্ ॥

স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজা যে সমেতঃ কু-

তান্তেন রাঢ়ীসংজ্ঞাতরেন ।

তথা বজ্রনেশাগতা ভূমীদেবাঃ কুতান্তেন

বারেন্দ্র-সংজ্ঞা-প্রসিদ্ধাঃ ॥

অসার্থঃ—

যক্রপ স্মৃতিকর্তা চারিবর্ণের স্মৃতি ক-

রিয়াছিলেন, তক্রপ বল্লাল সেন দ্বিজগ-

ণকে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র এই দুই ভাগে

বিভক্ত করিয়াছিলেন ; যাহারা রাঢ়দেশে

বসতি করেন তাঁহারা রাঢ়ী, এবং যাহারা

বারেন্দ্র দেশে বসতি করেন তাঁহারা বা-

রেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ।

উপরি উক্ত প্রমাণ সকলে দৃষ্ট হই-

তেছে, আদিশূর কান্যকুজ হইতে ক্ষিতীশ,

তিগিমেধা, বীতরাণ, সুধানিধি এবং

সৌবরি এই ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। আদিশূরের পুত্র ভূশূর ঐ বিপ্র পঞ্চকের ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও ছান্ড এই ৫ জনকে রাঢ়দেশে পাঠান, অবশিষ্টেরা বারেন্দ্র দেশে থাকেন এবং বল্লাল সেন তাহাদের মধ্যে শ্রেণীভাগ করেন। ইহা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলার্চাৰ্য্য গ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। বারেন্দ্র দেশেই প্রথমে ব্রাহ্মণেরা আইসেন এবং তথা হইতে ৫ জনমাত্র রাঢ় দেশে গিয়াছিলেন, এমত স্থলেও রাঢ়ীয় কুলার্চাৰ্য্য ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইতে আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ কহেন তাহা বুঝিতে পারি না।

এই প্রস্তাব লেখক জর্নৈক রাঢ়ীয় কুলার্চাৰ্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইরাছেন যে তাহাদের মতে আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন যথা;—“স-ত্ৰীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্” ইত্যাদি। অতএব যখন বারেন্দ্র শ্রেণীতে যখন ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদী ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা আদিশূরানীত কানাকূজীর বি-প্রের সম্মান নহেন ইহাই তাহাদের সি-দ্ধান্ত। ঘটকগণের এই অনুমান হইতেই রাঢ়ীয়দলে সংস্কার জন্মিয়াছে; বারেন্দ্র-গণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। রাঢ়ীয়দলে ৫৬ টি গাঞি আছে, তাহা লক্ষ করিয়া তাঁহারা আরও কহেন, “পঞ্চগোত্র ছা-প্পায় গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই।”

এই আপত্তিষয়ের উত্তর সহজেই দে-ওয়া যাইতে পারে। রাঢ়ীয় কুলেও অনেক যজুর্বেদী একগণে আছেন এবং যদি ৫৬ গাঞির অতিরিক্ত গ্রামীকেরা ব্রাহ্মণ না-হন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় কুলের আর তি-নটি গাঞির দশা কি হইবে? কুলরম্য গ্রন্থের মতে রাঢ়ীয় কুলে ৫৯ গাঞি।

আদিশূর কেবল সামবেদী ব্রাহ্মণ কি তিনবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।—পূর্বে কথিত হইয়াছে যজ্ঞকরণ নিমিত্ত তিনি সাম্বিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বা-ঙ্গলা দেশে বৈদিক ধর্ম প্রচার করা তা-হার উদ্দেশ্য ছিল, ইহাতে কেবল একবেদী ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করা সম্ভব বোধ হয় না; বিশেষতঃ প্রত্যেক যজ্ঞেই তিন-বেদী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যথা;—

যজ্ঞামননাং ছন্দাংসি চ্ছাদনাং স্তোমঃ
সুবনাং যজুর্ষজ্জনাংসি এবং সতি অধ্ব্য
সম্বন্ধি যজুর্বেদ নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীর যুপ-
জীবা তদপেক্ষিতৌ স্তোত্র শাস্ত্ররূপাবয়বৌ
ইতরেন বেদদ্বয়েন পূর্য্যত। মাধবাচার্য্যকৃত
ঋগ্বেদ ভাষ্য উপক্রমণিকা ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ মনন হেতু যজ্ঞ, চ্ছাদন হেতু ছন্দ
সুবন হেতু স্তোম, যজ্ঞন হেতু যজুঃ। অত-
এব যজ্ঞের অধ্ব্য সম্বন্ধীয় কার্য যজুর্বেদ
দ্বারা নিষ্পন্ন। এবং যজ্ঞ শরীর সম্বন্ধীয় কার্য
অপর দুই বেদ (ঋক্। সাম) দ্বারা পূরণ হয়।

অধ্ব্যবৎ যজুভিঃ স্যাদৃগ্ভির্হোত্রং দ্বি-
জোতমাঃ।

উদ্যোগে সামতিশ্চক্রে ॥

কুর্য়পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

অর্থীঃ প্রত্যেক যজ্ঞের অধর্যু হোত্র এবং গান এই তিন প্রকার অঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে যজুর্বেদ দ্বারা অধর্যুর কার্য, ঋগ্বেদ দ্বারা হোম এবং সামবেদ দ্বারা উদ্যান কার্য সম্পন্ন হয়।

আদিশূর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি যজ্ঞ করণের নিমিত্ত একবেদী ব্রাহ্মণ আনায়েয়া অমুকল্প ব্যবস্থা করিবেন এমত বোধ হয় না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ প্রায়শঃই দেখা যায় না এবং সামবেদীয় সংখ্যা এত অধিক কেন হইল এই প্রশ্ন হইলে, এতাবশ্যাত্ত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কালে রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্যা চর্চার অভাব এবং ঋগ্বেদিগণের গৃহ কৰ্ম সকল কঠিন হওয়াতে সামবেদী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া বেদভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়দেশবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং নৈষধ কর্তা শ্রীহর্ষকে একব্যক্তি বলিয়াছেন। এইমত তাহার উদ্ভাবিত নহে। তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই এই কল্পনা বাহির হইয়াছে। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে। নৈষধ কর্তা শ্রীহর্ষ আপনাকে শ্রীহীরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অথচ রাঢ়ী শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের আদি ব্যক্তি শ্রীহর্ষ কিতীশাদি বিপ্র পঞ্চকের অন্তর তিথিমেশ্বর পুত্র। নৈষধ কর্তা শ্রীহর্ষ আপন গ্রন্থে আত্ম পরিচয়ে

লিখিয়াছেন, তিনি কান্ধকুজেশ্বর হইতে তাম্বুল, হয় এবং আমন প্রাপ্ত হইরাছি-লেন। জৈন লেখক রাজ শেখর কৃত প্রবন্ধ কোষে লিখা আছে শ্রীহীরের পুত্র শ্রীহর্ষ বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তত্রতা নৃপতি জয়ন্ত চন্দ্রের আজ্ঞার নৈষধ কাব্য প্রস্তুত করেন। ডাক্তার বুলার কহেন এই জয়ন্তচন্দ্রই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত। জয়চন্দ্র ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে কান্ধকুজ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন। বাবু রামদাস সেনও প্রবন্ধ-চিত্রামণি ও প্রবন্ধ কোষের লেখা ও ডাক্তার বুলারের মতানুসরণ করিয়া নৈষধ কর্তা শ্রীহর্ষকে ১১৬৩ অব্দে জয়ন্তচন্দ্রের সভাসৎ থাকা স্থির করিয়াছেন। বিদ্যানিধি ৯৯৯ সম্বতে শ্রীহর্ষের এদেশে আইসা কহেন। ৯৯৯ সম্বতে ৮৬৩ শকাব্দ এবং নৈষধ কর্তা শ্রীহর্ষের বর্তমান ১১৬৩ খৃঃ অব্দে ১০৮৫ শকাব্দ। অতএব ১০৮৫ শকাব্দ হইতে ৮৬৩ শকাব্দ বাদ দিলে ২২২ দুইশত বাইশ বৎসর পাওয়া যায়। অতএব যে শ্রীহর্ষ তাহার মতে ৮৬৩ শকে আদিশূরের সভাতে গৌড়ে। তিনি ১০৮৫ শকে কি প্রকারে বারানসীতে থাকিয়া নৈষধ কাব্য প্রস্তুত করিবেন। বিদ্যানিধি অনুমান করেন যখন শ্রীহর্ষ গৌড়ে আইসেন তখন তাঁহার ৯০ বৎসর বয়স ছিল। এমত হইলে নৈষধ প্রস্তুত করার সময়ে তাহার ৩১২ বৎসর বয়স পাওয়া যায়।

বিদ্যানিধি আদিশূর ও বল্লাল সেন উভয়কেই বৈদ্যাজ্ঞাতীয় কহিয়াছেন । তিনি যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন । দেবীর ঘটক উভয়কেই অমুষ্ঠ কহিয়াছেন । বারেন্দ্র কুল গ্রন্থে উভয়কেই বৈদ্য বলিয়া লিখিত । রাঢ়ীয় কোন কুল গ্রন্থে আদিশূরকে ক্ষত্রিয় কোন গ্রন্থে চন্দ্র বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে । বিজয় সেন লক্ষ্মণ সেন এবং মাধব সেনের নামের যে সকল সমসাময়িক প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেন বংশীয় রাজাদিগকে চন্দ্র বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে । অতএব আদিশূর ও বল্লাল সেন যে বৈদ্যজ্ঞাতি তৎ প্রতি সন্দেহ হয় । এই প্রস্তাব লেখক কর্তৃক যে পুস্তক লিখিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে এবিষয় বাতলা রূপ লিখা হইবে এবং তাম্রশাসনাদির সংশ্লিষ্ট ভাগ অবিকল প্রকাশিত হইবে ।

বিদ্যানিধি কাশ্যপগোত্রীয় হলায়ুধ, যিনি উনিশ জনের মধ্যে একজন কুলীন, সেই হলায়ুধ চট্টকে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী বলিয়াছেন । বাস্তবিক নাম সাদৃশ্যে তাহার ভ্রম হইয়াছে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসকল গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ঐ গ্রন্থে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় তাহার পিতার নাম ধনঞ্জয় এবং তিনি বাৎস্ত গোত্রোদ্ভূত । গ্রন্থ কর্তা লঘুভারতের লিখন মতে নরসিংহ লাড়ুনিকে অষ্টৈতের পিতা কহিয়াছেন । বাস্ত-

বিক তাহা নহে অষ্টৈতের পিতার নাম কুবেরাচার্য্য । গৌর গণোদ্দেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ ও জাড়িয়ান গ্রামী ব্রাহ্মণ গণের বংশাবলী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে । অষ্টৈতাচার্য্য ভরদ্বাজ গোত্রীয় মাড়িয়ান অথবা লাড়ুনি গ্রামীণ ছিলেন, অদ্যাপি তাহার বংশধরেরা অষ্টৈত বংশীয় গোম্বামী বলিয়া খ্যাত আছেন ।

লাল মোহন বাবু লঘুভারতের অনুসরণ করিয়া উত্তর বারেন্দ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাও ভ্রম । আমি উত্তর বারেন্দ্র এবং বারেন্দ্র গণের কুল গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহাতে জানাগিয়াছে উত্তর বারেন্দ্রগণ, বারেন্দ্রের এক শাখা মাত্র । উত্তর বারেন্দ্র কুলে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাস্য, ভরদ্বাজ ও দাবর্নি এই পাঁচ গোত্র ও ষোলটি গাত্রিত আছে । জেলা দিনাজপুর ও মালদহের অধীন গ্রাম সকলে ইহাদের বাস । পূর্বকালে উত্তর বারেন্দ্র এবং দক্ষিণ বারেন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হইত, বর্তমান কালে দক্ষিণ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তর বারেন্দ্র নাম চলন হইয়াছে ।

গ্রন্থ কর্তা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ গণের বিবরণ যে লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ, তাহার প্রত্যেক বিষয় আলোচনা করিলে একখানি গ্রন্থ হয় এবং সম্বৎসরেই তদ্রূপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনাও আছে । অতএব সংক্ষেপে ২।৩ টি মাত্র ভ্রমের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । লাল মোহন বাবু আপন গ্রন্থের

২৩৪। ২৩৫। ২৩৬ পৃষ্ঠাতে যেসকল কথা লিখিয়াছেন তাহার স্মরণ মর্ম এই, “রাজা কংসনারায়ণ উদয়নাচার্য্য ভা-
 হুড়ির সন্তিত একত্র হইয়া মধুর কুল রক্ষা
 করেন। এবং তিনি মধুমৈত্রে কন্যা সম্প্র-
 দান করিয়া নিজে কুলীন হইতে শোভিত
 হন। উদয়নাচার্য্য তাহার লীলাবতী নামী
 কন্যাকে মণ্ডল মিশ্র সমর্পণ করেন, মণ্ডল
 মিশ্র জলবিন্দু স্পর্শে ছিটা কাপ হন।
 লীলাবতীর গর্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানী-
 পতি, রুদ্রপতি, পশুপতি ইহাদের জন্ম হয়”
 কিন্তু এই লেখা সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক। প্রথম
 রাজা কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য এক
 সময়ে বর্তমান ছিলেন না। উদয়নাচার্য্য
 ১২৫০ শকের সমকালে বর্তমান থাকিয়া
 বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্যাদা স্থাপন ক-
 রেন। সেই উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম পু-
 কষে শ্রীকৃষ্ণ ভাহুড়ির জন্ম হয়। এই শ্রীকৃষ্ণ
 ভাহুড়ি কংসনারায়ণের ভগ্নী বিবাহ ক-
 রেন। পক্ষান্তরে দেখ মধুমৈত্রেয় অধ-
 স্তন ৭ম পুত্র জাত দুর্ভাগ্য মৈত্র কং-
 সনারায়ণের সম সাময়িক ছিলেন। রাজা
 কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য কত পুত্র
 ব্যবধান তাহা অন্য প্রকারেও দেখা যায়;
 উদয়নাচার্য্য এবং কুলক ভট্ট উভয়ে সম
 সাময়িক এই কুলক এবং ময়ূরভট্ট ও মঙ্গল
 ওঝাকে সহায় করিয়া উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত
 মর্যাদা স্থাপন করেন। কুলকভট্ট এবং পু-

কমোত্তম বৈদ্যাস্তিক এই দুই জাত। এই পু-
 কমোত্তম বৈদ্যাস্তিকের বংশে অধস্তন ১৪ কি
 ১১ পুত্র কংসনারায়ণের জন্ম হইয়াছিল।

রাজা কংসনারায়ণ কখনই কুলীন
 ছিলেন না, তিনি মধুমৈত্রেয় সম সাময়িক
 ব্যক্তি নহেন, তিনি কখনও মধুমৈত্রে কন্যা
 সমর্পণ করেন নাই। তিনি তাহের পুরের
 রাজগোষ্ঠীয় ব্যক্তি। এবং নন্দনামাসী
 গ্রামের পূর্ব হইতেই শোভিত।

উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নামী ক-
 ন্যাকে মণ্ডল মিশ্র বিবাহ করেন নাই।
 বাস্তবিক লাহিড়ি কুলোদ্ভব ব্রহ্মভাচার্য্য
 লীলাবতী যে বিবাহ করেন এবং ভূপতি
 ভবানীপতি, রুদ্রানীপতি, গৌরীপতি, উ-
 মাপতি এই ছয়জন উদয়নাচার্য্যের পুত্র
 কিন্তু দৌহিত্র নহেন।

বিদ্যানিধি যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রচার করেন
 তাহা অতি মহৎ, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়
 এই প্রকৃত ইতিহাসের অনুসন্ধান না করিয়া
 লোক মুখে শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়া ব-
 সিয়াছেন এবং তদ্বারা বহু লোকের ভ্রম
 জন্মাইয়াছেন।

উপরে যে একটি ভ্রম প্রদর্শন করা
 গেল, তাহা ভিন্ন আরও ভূরি ভূরি ভ্রম
 আছে, অবকাশ মতে তাহার সমালোচনা
 করা যাইবে অথবা ইতিমধ্যে সংক্ষিপ্ত
 গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা হইলে তাহাতেই
 লিখা যাইবে।

সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস । জী-রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত প্রথম খণ্ড । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহি-বিপ্লব ভারতীয় ইতিহাসের এক প্রধানতম ঘটনা । ব্রিটিশ-বিক্রিত ভারত সাম্রাজ্যে পূর্বে যে নীতি প্রদর্শিত ছিল, ১৮৫৭ হইতেই তাহা পরিবর্তিত হয়, এবং এদেশের অন্তর্ভুক্তি এখনও যে অতি ভয়াবহ আঘের পর্বত সকল প্রচ্ছন্ন নিহিত রহিয়াছে—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের চিরস্মরণীয় ইতিহাসই রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে প্রথম তাহা বুঝিতে দেয় । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই ঘটনাবলী অদ্যাপি বাঙ্গালী ভাষায় বিস্তৃত হয় নাই । বাঙ্গালার গজরাজগতিগঞ্জিনী কবিরূপদয়রঞ্জিনী জীমতী কমল কামিনীর পদ নখ ও অমূল্যায়িত কুমুদ রাশির শোভা বর্ণনায় তিনশত মূললিত কাব্য লিখিত হইয়াছে । বাঙ্গালি লিখুদিগের বিরহ বিধুর দক্ষহৃদয়ের দুঃখ দুরাশা বর্ণনারও অক্লান্ত নূতন গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে । কিন্তু যে ঘটনা ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্যতের গ্রন্থি স্বরূপ, যে ঘটনাতে এক যুগের লয়, আর এক যুগের অভ্যুদয়, পুরুষকার ও স্বজাতি বাৎসল্যের পরীক্ষা, সাহস ও কৌশল এই দুইয়ের ভারতম্য নির্ণয়, এবং জাতীয় সংঘর্ষের ফলাফল বিচার দুর্ভাগ্য

ভারতে, দুর্ভাগ্য বক্ষে কাহারও লেখনী সেই ঘটনার আমূল বিবরণ সংকলনে এবং আমূল তত্ত্বনিরূপণে ব্যাপৃত হয় নাই । রজনী বাবু উল্লিখিত কলঙ্কপ্রক্ষালনে যত্নপর হইয়াছেন । তিনি যেরূপ কৃতী, পণ্ডিত, অনুসন্ধানপটু এবং অধাবসারনৌল তাহাতে আমাদের আশা হইতেছে, তিনি কৃতকার্ষ্য হইবেন । কিন্তু তথাপি বলি, কার্যের শেফদর্শন না হইলে আমাদের শঙ্কা দূর হইবে না আর, বাঙ্গালার বর্তমান পাঠকসমাজ যে, গুপ্তকথা ও রসের কথা, প্রেমের কথা ও শাস্ত্রের কথা পরিভাগ করিয়া নানা ধূন্দপন্থের অন্তর্গত-গভীর বেদনার কথায় কণপাত করিবে ফলে পরিচয় না পাইলে আমাদের এমনও ভরসা জন্মিবে না ।

রজনী বাবুর ভাষা, মত ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের অনেক বক্তব্য আছে । কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড মাত্র অবলম্বন করিয়াই তাদৃশ সমালোচন সম্ভব নহে । তিনি এখন পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সিপাহি যুদ্ধের উপক্রমণিকা ; সিপাহিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এখনও বহুদূরে । তবে ইহা অক্ষুণ্ণচিত্তে বলিতে পারি যে যদি রজনী বাবু অগ্রতঃ রত্নান্ত সংকলন না করিয়া সং-

কলিত রক্তাশ্রু উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ অভিনব একখানি ইতি-হাস-বলিয়া গৃহীত না হইয়া কে সাহেব প্রভৃতির রচিত পুরাতন গ্রন্থসমূহের স্বাধীন সমালোচনা বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে। সাহারা সিপাহি যুদ্ধের আতঙ্কজনক অভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাই এক, এবং গ্রন্থপত্রে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই এক। তাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সেই সংগৃহীত বিবরণের সহিত গ্রন্থোক্ত বিবরণের তুলনা করা, রজ্জনী বাবুর একান্ত কর্তব্য হইতেছে।

২। কবিতা কলাপ। দ্বিতীয় ভাগ। শান্তিপুর পুরাতন ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র জীরামলাল চক্রবর্তী বিরচিত। গ্রন্থকার যুগ্মধুর পদ বিন্যাসে পটু। আমরা নিম্নে তাঁহার কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এইরূপ লেখার বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন। আমাদিগের এইরূপ বোধ হয় যে, জয়দেবের অতি রূক্ষ প্রপোজেরা কিছুদিনের জন্য অধ্যয়ন কি বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলেই ভাল হয়। সেই যে কোন দিন ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলন-কোমল পদাবলী এবং প্রিয়াগুণবর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও এদেশে তাহারই তরঙ্গ চলিতেছে। হতভাগ্য বঙ্গবাসী বিশ্বাস করিবারও অব-

সর পাইল না। একে বাঙ্গালি গ্রন্থ-গুণ্য বশতঃ ইদানীং অন্ধ অবলা, তাহাতে আবার গ্রন্থকারবর্গ গুরুতর গৌরবান্বিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া, নিরন্তর শিক্ষা দিতেছেন,—

প্রিয়া নিনে এবে সব হাস অন্ধকার

জীবন দুখের রাতি,

তাঁহাতে প্রেমের বাতি

নিবাল রে ! নিরদর কাল ডরাচার।

আর না হেরিখ তার সে চন্দ্রবদন,

আর না শুনিব সেই পৌষ বচন,

কুরায়েছে সুখের স্বপন ॥

হেরিলে আশায় যার যে চাক অধরে

মেঘযুক্ত শশি সম,

হাসোর বিকাশে ভ্রম—

জলদে খেলায় কিবা দামিনী অশ্বরে,

চকিতে ছেদিল কেরে মৃণাল সহিত

ফুলকমলিনী নীরে করিয়ে পাতিত ?

দক্ষ করি প্রণয়ীর চিত ॥

ধরতেজে দহে চিত বিরহ অনল,

হায় হায় মরি মরি,

কোথা মম প্রাণেশ্বরী,

একবার হেরি, এস হই গো শীতল

হায় রে ! করাল কাল কেমন বিচার,

ছিঁড়িলি রে ! প্রেমিকের প্রেম-কণ্ঠ-হার।

দহে যাছে বিরহ দুর্বার ॥

৩। নীতিমঞ্জরী। প্রথমখণ্ড। জীম-হিমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। এই প্রকারের

কবিতার সহিত আমাদের পাঠকবর্গের
অপরিচয় নাই। সুতরাং আমাদের নূতন
পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ফল কথা এ-
খানি না লিখিত হইলে দোষ ছিল না।

৪। সুপিস্তিরোপাখ্যান। মহাভার-
তান্তর্গত প্রস্তাৱ বিশেষ। তৃতীয় শরৎ
শনী গুপ্তা কর্তৃক সংকলিত। আমরা এই
কুসুম পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ
করিলাম। প্রমুখকর্তী বাঙ্গলা লেখার রীতি
শিখিয়াছেন, বোধ হয় সমুচিত শিক্ষা
লাভ করিলে তিনি যশস্বিনী হইতে পা-
রিবেন। কুলমহিলাদিগের পক্ষে সা-
হিত্য সমাজে যশোলাভ করা বস্তু ই-
দানীং নিতান্ত সহজ। কারণ সহৃদয় ব্যক্তি
মাত্রই তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিয়া
পারেন।

৫। কুসুম। সচিত্র মাসিকপত্র ও
সমালোচন। শ্রীঅন্নপ্রসাদ মৈত্র দ্বারা
সম্পাদিত। বাঁহারা এই পত্রিকাখানি
প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁ-
হারা আপনাদিগকে অবশ্যই বাঙ্গলা
সাহিত্যের মুহূর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন।
নহিলে অনর্থক এই ক্লেশ স্বীকার কেন?
কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের
কোন রূপ উপকার দর্শিবে—আমাদিগের
মনে মুহূর্ত্তের তরেও এমন আশা স্থান পা-
ইতেছে না। ইহার প্রথম প্রবন্ধের নাম
কুসুম, অর্থাৎ কুসুম নামক পত্রিকা অবত-
রণিকা। ২৬ টি পংক্তিতেই এই প্রবন্ধটি

পারিসমাপ্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ভ্রমরের
মুখবন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছিল, ইহারও
মুখবন্ধে সেই ভঙ্গির কদম্বা অনুকরণে
লিখিত হইয়াছে,—“কুসুম! তুমি আ-
বাল বন্ধু ননিতা হিন্দু মুসলমান ইংরেজ
মানব রাক্ষস দেবতা সকল শ্রেণী
লোকেরই আদরের—ধন—”তার প-
রের প্রবন্ধের নাম দুর্গা দর্শন। এইটি
৫৪ পংক্তিতে পারিসমাপ্ত। আমাদিগের
শারীরিক বল নামক তৃতীয় প্রবন্ধও ঐরূপ।
তার পরে কুসুম নামে একটি কবিতা;
কবিতার পর দুর্ভাগিনী বিমলা নামে এক
উপন্যাস। উপন্যাসের পর মূল্যপ্রাপ্তির
জন্য তাগিদ, তাগিদের পর বিজ্ঞাপন,
সুতরাং মাসিক পত্র ও সমালোচনের
সকলই ইহাতে আছে। নাই কেবল,—
থাক তাহা আর বলিয়া প্রয়োজন নাই।

৬। ওলাউচার নিদান ও চিকিৎসা
বিষয়ে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব হস্পিটালসমু-
হের ইন্স্পেক্টর জেনারেল শ্রীযুক্ত জন্
মরে এন্ড ডি মহোদয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষের
ভ্রমোদর্শনের ফল। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের
অনুজ্ঞায় শ্রীযুক্ত কানাইলাল দে রায়বাহাদু-
রের দ্বারা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত। আমরা
চিকিৎসা ব্যবসায়ী নহি, সুতরাং এই পু-
স্তকের গুণাণ্ডণ পরীক্ষা আমাদিগের দ্বারা
অসম্ভব। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে এই
পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উহা সর্ব্বাংশে
প্রয়োজনের উপযোগী হইয়াছে।

লোকরঞ্জন ।

মনুষ্যসমাজে সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রশংসা কিসে?—না, মনুষ্যের চিত্তরঞ্জে । যিনি লোকানুরঞ্জে পড়ে, তিনি পুরুষের মধ্যে পুরুষ, প্রীতিপ্রদ, প্রীতিভাজন, প্রশংসনীয় । আর, যিনি লোকরঞ্জে অপড়ে, তিনি যারপরনাই সাধু, যার পর নাই সরল এবং যতদূর সম্ভব মহানুভাব হইলেও সাধারণের অপ্রিয় ও অপ্রশংসনীয় । সকল লোকেই সমস্পর্কিত প্রিয়বান্ধিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে,—তুমি যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যেরই মনস্থিতি জগাইতে না পারিলে, দশ জনে যাঁহা ভাল বাসে তাঁহা সম্পাদন করিয়া দশজনের মধ্যে গণনীয় ও দশজনের আদরের পাত্র হইতে সমর্থ না হইলে, তাঁহা হইলে একীবর্নে তোমার আর প্রয়োজন কি? পুত্রের প্রতি পিতার এই উপদেশ, ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার এই উপদেশ, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই উপদেশ, এবং যে যাহাকে উপদেশ দিতে পারে, তাহার প্রতিই তাহার এই উপদেশ ।

উল্লিখিতরূপ উপদেশে জগতের কার্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল সর্বত্র ফলিতেছে, তাঁহা অনায়াসেই উল্লিখিত হইতে পারে ।

কারণ, যাঁহার চক্ষু আছে, তিনিই ইহা দেখিতে পারিবেন যে, মনুষ্য যত প্রকারের কার্যে সংলিপ্ত রহিয়াছে, এই লোকরঞ্জনপ্রকৃতিই উত্তাবতের মূলে সর্বপ্রধান প্রবর্তনা । লোকের ধর্ম, কর্ম, দান, ধ্যান, শিক্ষা, সাধনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উৎসাহ, উদ্যম, ক্রেশ-ভোগ, কষ্টস্বীকার, সমস্তই যেন লোকরঞ্জনের জন্য । সাধারণতঃ, বহুলোকের যাহাতে অনুরাগ, তাহাতেই লোকের অনুরাগ, এবং বহুলোকের যাহাতে বিরাগ, তাহাতেই লোকের বিরাগ । অপিচ, যে কার্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল, এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রীত হইল, তাঁহাই কার্য; এবং যে কার্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল না, এবং আকৃষ্ট হইয়াও প্রীতি প্রকাশ করিল না, তাঁহা যত বড় উচ্চশ্রেণীর কার্য হউক না কেন, আপাততঃ তাঁহা অকার্য ।

তুমি যোগী, তুমি কিসের কৃত্ত্ব যোগদান করিতেছ? লোকের নিকট প্রদর্শনের জন্য, না তোমার আত্মার পরিভূতির জন্য? যদি আত্মার পরিভূতির জন্যই তোমার এই যোগব্রত, এই কঠোর তপস্যা, তবে তোমার জন্মধো এঁ তিনক কেন? তোমার কণ্ঠে এঁ মালা,

কপালে ঐ ত্রিপুরক, অস্ত্রে ঐ মৃগায়ী
 রেখা এবং পরিধানে ঐ গৈরিক বস্ত্র
 কেন ? ইহা কি সকলই লোকচক্ষু আক-
 ষণের জন্য নহে ? তুমি নির্জনে আপনাতে
 আপনি নিমজ্জিত হইয়া, আত্মার অভ্য-
 স্তরে ক্ষণকালের তরেও প্রবেশ করিতে
 ভাল বাস না, এবং একমাত্র যাহাতেই
 আত্মার চিরদিগ্গের বিশ্রাম, তুমি তাঁহার
 অমৃতময় আবেশ উপভোগ করিতে কখনও
 অভিলষী হও না ;—অথচ যেই তোমার
 উপর লোকচক্ষু নিপতিত হয়, অমনি তুমি
 ধ্যানে নিরত হইয়া নেত্র নিম্নীলন কর, এবং
 যিনি বাক্যের অগম্য, অচিন্তনীয়, তাঁহাকে
 অতিমুখাবহ বহুবাক্যে বর্ণনা করিতে প্র-
 যত্ন হও । তোমার এই ধ্যান, এই স্তোত্র-
 পাঠ, এবং জিহ্বার এই ব্যায়াম কাহার
 প্রীত্যর্থ ?

তুমি দাতা, দীনপালক, পরদুঃখকা-
 তর, পরোপকারী সাধু, তুমিই বা কি উ-
 দ্দেশ্যে বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অ-
 বিশ্রামধারায় এই দান করিতেছ ? ইহা
 কি লোকমুখে যশোমণির জন্য, না দুঃখীর
 দুঃখ মোচনের জন্য ? যদি দুঃখীর দুঃখ-
 মোচনই তোমার অন্তরের প্রকৃত আ-
 কাঙ্ক্ষা, তবে তোমার দানপরম্পরার
 অগ্র ও পশ্চাৎ উভয়ত্রই এই ঢকানাদ ও
 পটহবাদ্য কেন ? যখন কেহ দেখে না,
 ও কেহ শুনে না, তখন তোমার হৃদয় পা-
 য়াণ হইতেও কঠিন ;—তখন তুমি অকু-
 ঠিতপ্রাণে অশ্রুধারাকুল অনাথা বিধবার

সর্বস্ব অপহরণ কর, পিড়হীন বালকের
 মুখের আস কাড়িয়া লও, অস্থিমাংসার
 ক্ষুধিত দুঃখীকে দূর দূর বলিয়া স্বয়ং পঞ্চ-
 দশ বাঞ্ছনে পরিতৃপ্ত হইতে উপবিষ্ট হও,
 এবং শীতবাত্তে কম্পিত অতিদীন ভিখা-
 রীকে দ্বারদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়া
 সুগন্ধিবাসিত স্বকোমল শয্যায় সুখসুপ্তি
 সম্ভোগ কর । অথচ, যখন সহস্র চক্ষু
 তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে, সহস্র র-
 সনা তোমার গুণানুকীর্ণনে ব্যাপ্ত হয়,
 এবং সহস্র বাহু তোমার আশীর্বাদে না-
 চিয়া উঠে, তখন তুমি ধ্বজপতাকা উড়াইয়া
 এবং লোককোলাহলে দশদিক্ নিনাদিত
 করিয়া, দান কর আর পরদুঃখে পরিতাপ
 কর, এবং পরদুঃখে পরিতাপ কর আর
 দান কর ।

আর তুমি কবি, কল্পনার প্রিয়সেবক,
 দেবী কমলাসনার চির উপাসক । বস
 দেখি, তুমিও কাহার প্রীতিতে সর্বত্র এই-
 রূপ আকুলতা প্রদর্শন করিতেছ ? ক-
 হার পদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া
 মুখে দুঃখে সর্বদা এইরূপ গাইতেছ ?
 তুমিও কি যোগী এবং তাপস, দাতা এবং
 পরোপকারীর ন্যায় লৌকিক যশেরই
 কাজাল নহ ? যদি কল্পনার বিভ্রমবি-
 লাস এবং ভারতীর জ্যোতির্ময় রূপরা-
 শিতেই তোমার হৃদয় ডুবিয়া থাকিত, তবে
 কি তুমি কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া এবং
 আপনার উচ্চতর পরিত্যাগ করিয়া ইতর
 লোকের দ্বারে দ্বারে নানাবিধ কুৎসিত

পট লইয়া সূতা করিতে, এবং অজ্ঞানতি-
মিরারিত অনিশ্চিত লোকের চিত্তবিনো-
দনের জন্য ভাষার নিরাবিল পবিত্রদেহে
কলঙ্কের কামিমা তুলিয়া দিতে ? যখন
প্রকৃতি, সৌন্দর্যময়ী কনিকবিকাশে ছা-
সিয়া ছাসিয়া, এবং নিবিড়কক্ষ জলদমালার
ইতস্ততঃ পরিচালনে অঞ্চল নোলাইয়া, সেই
ভোমা ভুবনমোহিনী মূর্তিতে প্রকাশিত হন,
হে প্রেমিক ! তোমার চক্ষু তখন পা-
র্ষ্ব-কতিলাভ-গণনার অঙ্কপাতে নিবিষ্ট
থাকে ; আবার যখন প্রকৃতি নৈশসমীর-
ণের গভীরনিঃশ্বাসে মানবজাতির দুষ্কৃতির
জন্য শোকাভুরার মত বিলাপ করেন,
তোমার কর্ণ তখনও তৎপ্রতি বধির রহিয়া
নিষ্কৃষ্টজনভোগা নিষ্কৃষ্ট সুখের আশ্বাসই
অবগণ করিতে রহে । অথচ যেই ভূমি লো-
কবহুল সভাস্থলে প্রবেশ কর, তোমার
চক্ষু প্রকৃতির প্রেমে অজ্ঞান বাপ্পবারি
নিমোচন করে, তোমার হৃদয় কল্পনার
প্রমোদস্পর্শে উছলিয়া উঠে ।

বক্তৃতঃ, এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে,
লোকজগতের অধিকাংশ ক্রিয়াই লোক-
মোহনের এইরূপ প্রক্রিয়া মাত্র অথবা
প্রাণশূন্য ক্রিয়ার প্রাণপ্রীতিকর সাদৃশ্য
প্রদর্শন । কারণ, প্রকৃত ক্রিয়ায় তোমার
যে আনন্দ নাই, ক্রিয়ার প্রদর্শনে তাহার
শতগুণ আনন্দ, এবং অন্ধকারে তো-
মার যে উৎসাহ নাই, লোকদৃষ্টির আ-
লোকে তাহার শতগুণ উৎসাহ । লোকে
যখন চালায়, তখন তুমি চল, এবং লোকে

যখন না চালায়, তখন তুমি নির্জীবের মত
পড়িয়া রহ । শুধু উহাই নহে,—লোকে
যাহা ভালবাসে, অতি অপ্রিয় বস্তু হইলেও,
তাচাই তুমি ভালবাসিতে চেষ্টা কর,
এবং লোকে যাহা ভালবাসে না, অতি
প্রিয়বস্তু হইলেও তাহাতে তুমি ঘৃণা প্র-
কাশ করিতে যত্নবীল হও । যেন লো-
কের উপাসনাতেই তোমার দীক্ষা, এবং
লৌকিক প্রতিষ্ঠাতেই তোমার আশার
পূর্ণতৃপ্তি এবং পরাৎপর সুখ ।

অতঃপর সহজেই এই জিজ্ঞাসা উপ-
স্থিত হয় যে, পৃথিবীতে শিক্ত ও অনি-
শিক্ত, বহুদর্শী ও অদূরদর্শী, সকলেই যদি
লোকরঞ্জনের অনুকূল ক্রিয়াকলাপ লইয়া
এইরূপ ব্যাপৃত, তবে কি লোকরঞ্জনই মান-
বজীবনের একমাত্র কর্তব্য ও একমাত্র ব্রত ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদেরিগের প্রথম
বক্তব্য এই যে, যত্নসহ যতই কেমন চেষ্টা না
করুক, যতই কেন আকুল না হউক,
সর্বতঃসিদ্ধ লোকরঞ্জন আকাশকুসুমের
নাগ অলীক পদার্থ ; উহা স্বভাবতঃই অ-
সাধ্য ও অসম্ভব । যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়া-
ছেন,—নামো যুনির্ঘসা মতং ন ভিন্নং,—
আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি, নামো
জনে যস্য মতি ন ভিন্না । সুতরাং, যে
কার্য্য একজনের মনে পরমা তৃপ্তি ; সেই
কার্য্যই আর এক জনের মনে যৎপরো-
নাস্তি অতৃপ্তি, এবং যে কার্য্য একজনের
মুখে যশ, সেই কার্য্যই আবার আর এক-
জনের মুখে অযশ ।

তুমি যাহাকে প্রেমিক বলিয়া আদর কর, আমি তাহাকে ত্রৈলোক্য বলিয়া উপহাস করি; এবং আমি যাহাকে প্রিয়বদ বলিয়া প্রশংসা করি, তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাকে চট্টকার বলিয়া ঘৃণা করেন। যিনি আমার বিবেচনায় একজন সমাজসংস্কারক সাধু পুরুষ, তোমার বিবেচনায় তিনি ধর্মজোহী, এবং যিনি তোমার বিবেচনায় একজন পরমভক্ত পূজাব্যক্তি, আমার বিবেচনায় তিনি একটি ক্রীড়াময় কাষ্ঠপুতুল। ঐ যে বুঝা, বহুবিধ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত এবং সূতাত্ত্বনদৃশ ক্ষম্ম-অশ্বরে অর্ক-আহত হইয়া, কেবলই হাসিতেছে আর বিলাসভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে, এবং যিনি যে কোন প্রসঙ্গে যে কোন চিত্তাগর্ত কথার উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই গোল্ডস্মিথের খরগহিলের ন্যায় অসামাজিক হাস্য উড়াইয়া দিয়া, আপনার আমোদ-শীলতা ও ইচ্ছিতনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে, ইহাকেই কি তোমরা অসিভীয়া প্রভৃতি তরলমতি যুবতীদিগের ন্যায় সুরমিক বলিয়া অভ্যর্থনা কর? রসগ্রাহী বিজ্ঞসমাজে ইনি একটি অন্তঃসারশূন্য অকালকুষ্মাণ্ড, কিংবা তাহা হইতেও অপকৃষ্ট। আর ঐ যে বহুপ্রতিষ্ঠাশ্রিত, পদানত, বিনীত পুরুষ, সকলের নিকটেই বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া, সকলের সকল কথাই অবনতমুখে অনুমোদন করিতেছেন,—সত্যের অপলাপ কিংবা অসত্যের প্রশংসা, ইত্যাদি কিছুই প্রতি দৃকপাত না করিয়া, কিংবা

চিত্তের অবজ্ঞাজনক অধীরতার দৃকপাত করিবার অবসর না পাইয়া, যে যাহা বলিতেছে তাহাই মুখভঙ্গিদ্বারা মানিয়া লইতেছেন, এবং পরিশেষে, পরস্পর মত-ভেদদর্শনে কিংবাক্তবাবিশ্রুত হইয়া, ইহার ও উহার মুখপানে অতিকাতরনয়নে চাহিতেছেন, ইহাকেই কি তোমরা সামাজিক বলিয়া সংবর্জন কর? প্রকৃত সামাজিক-দিগের চক্ষে ইনি একটি মস্তিষ্কশূন্য মাংস-পিণ্ড, অথবা গিঁড়ীভূতভণ্ডা।

বল এখন লোকরঞ্জন কি? এবং কিরূপে একই কার্যের অনুরোধে কিংবা নীতির একই পথাবলম্বনে মনুষ্য যুগপৎ সকলশ্রেণি লোকের মনোরঞ্জন করিবে? যে গ্রীকজাতি আঙ্গি সক্রটিসের চিরস্মরণীয় নামে জগতে এত সম্মানিত, সেই গ্রীকজাতিই বিধাবিভক্ত হইয়া সক্রটিসকে এক-হস্তে দেবতার মত পূজা করিয়াছে, এবং তাঁহাকে অনুর ও অপদেবতা হইতেও অধম বিবেচনায় আর এক হস্তে নিম্নপ্রয়োগ করিয়া তাঁহার প্রশংসাহার করিয়াছে। যখন নেজারথের সেই লোকবৎসল মহাযোগী চোর ও দস্যুর ন্যায় কুশকাষ্ঠে বিলম্বিত হন, তখন একদিকে লোকে শিরে করাঘাত করিয়া, হাহা কার করিয়া কান্দিয়াছে, আর একদিকে বিক্রপের বিকটহাস্য হাহাঃশব্দে সমুখিত হইয়াছে। স্টুয়ার্ট আর ক্রমওয়েসকে লইয়া ঐতিহাসিকেরা এই তিন শত বৎসর বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এবং বোধ হয়

আরও তিন সহস্র বৎসর বিবাদ করিবেন।
যাঁহারা ক্রমওয়েলকে রাজদ্রোহী পামণ্ড
বলেত, ফুর্ট তাঁহাদিগের চক্ষে কমনীয়-
তার প্রত্নবগ্নরূপ; এতৎ যাঁহারা ফুর্ট-
টকে প্রজ্ঞাপীড়ক পাণ্ডিত্য বলেন, ক্রমও-
য়েল তাঁহাদিগের চক্ষে ধর্মের অবতর, অ-
থবা সাক্ষাৎ ধর্মপুরুষ। এসকল দেখিয়া
শুনিয়া, এতৎ জগতীর প্রতি যুগের ইতিহাস
অথবা সমাজের অহরহঃ পরিলক্ষিত প্র-
তিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ পর্যা-
লোচনা করিয়া, কে আর লোকরঞ্জনে
কৃতার্থ হইবার আশা করিতে পারে?
এবং আশা করিবার কারণ থাকিলেও,
লোকরঞ্জনের জন্যে লোকরঞ্জনকে মনুষ্য
কোন সাহসে আর প্রতিভাময় মনস্বিজ-
নের উচিতবস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করে?

লোকাভিরাম রামচন্দ্র লোকরঞ্জনব্রতে
ব্রতী হইয়া অষ্টাবক্র যুনির নিকট বলিয়া-
ছিলেন যে, লোকের আরাধনার নিমিত্ত
শ্রদ্ধা, দয়া, এবং সর্বপ্রকার সুখসম্ভোগ
অথবা জ্ঞানকীকেও যদি তাঁহার পরিত্যাগ
করিতে হয়, তথাপি তাঁহার মনে দুঃখলে-
শসঙ্কারণের সম্ভাবনা নাই *। কিন্তু আমা-
দিগের বোধ হয়, শ্রদ্ধা, দয়া, জীবনের সুখ-
সামগ্ৰী কিংবা প্রাণাধিকা ভাষ্যাকে প-
রিত্যাগ করিতে পারিলেও লোকে লোক-
রঞ্জনব্রতে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃতকার্য হইতে
সমর্থ হয় না। শ্রদ্ধা আর দয়া, সুখ অথবা
শ্রদ্ধাঃ দয়াঃ তথা। সৌখ্যঃ যদিবা জ্ঞানকীমপি
আরাধনার লোকস্য মুক্ততো নাষ্টি মে ব্যথা।

সুখময়ী প্রাণসম্ভরণী একান্ত প্রিয়পদার্থ
হইলেও সর্বপ্রকার অপরিহার্য নহে। অতি-
মানদীপ্ত মহানুভাব মনুষ্যেরা অনেক সময়ে
এবং অনেক স্থলেই সুখ ও শান্তির এসকল
উপকরণ অনাগ্রাসে পরিত্যাগ করিয়া ক-
র্তব্যের কঠোর অনুশাসন পালন করেন,
এবং দুঃখ ও যন্ত্রণার তপ্তকটাহে অস্বাদ-
দনে আপ দিয়া পড়েন। যদি মনুষ্য,
মমতার এই সমস্ত স্বকোমল বন্ধন হইতে
মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই, লোকের
আরাধনার পূর্ণমাত্রায় হইতে পারিত,
তাঁহা হইলে লোকরঞ্জনের কথা প্রসঙ্গে এই
রূপ শঙ্কিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু
হায়! এসকল অতি কঠোর ত্যাগস্বীকা-
রেও লোকরঞ্জনের সুখপ্রদানে ইচ্ছাসিক্ত
সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যকে লোকরঞ্জনের
জন্য ইহা অপেক্ষাও গুরুতর, যে ভয়ঙ্কর
ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা চিত্রা ক-
রিলে চিত্র আপনা হইতেই ভয়ে অবসর
হইয়া পড়ে। যাঁহারা সকল তত্ত্বেরই আ-
মূল দর্শন করিতে যত্নপর হন, তাঁহারা অ-
ব্যাহত বুঝিয়াছেন যে, আমরা এতদূরে আ-
ত্মিক স্বাভাব্যকেই লক্ষ্য করিতেছি। কা-
রণ, লোকরঞ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া দীক্ষিত
হইলে আত্মার স্বাভাব্যত্যাগেই ব্রতদক্ষিণা।

মনুষ্যের স্বাভাব্য যে কি এক ম-
হানুভাব বস্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই তাহা
অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য
এই বহিঃস্থ জড়প্রকৃতির অনন্ত বৈভব ও
অনন্ত মহিমা দর্শনেই মোহিত ও বিম্বয়ে-

অভিভূত রহে, অথচ তাহার আপনারই অভ্যাসের অনন্তের পূর্ণ আভা বিরূপ আশ্চর্য্যভাবে নিহিত রহিয়াছে, তৎপ্রণিধানের ক্ষণকালের জন্যও তাহার চিত্তনিবেশ হইয়া উঠে না। সে মেঘমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা, সমুদ্রের অসীমবিস্তার, নদীর আবর্ত, সূর্য্যচন্দ্রের উদয় ও লগ্ন, এবং মৌরজগতের অস্বিক্ষণীয় মাহাত্ম্য চিন্তা করিয়াই আপনার কল্পিত ক্ষুদ্রতায় আপনিসমুচিত রহে ;—অথচ তাহার অন্তরস্থিত আশা যে অভূত গিরিশৃঙ্গেরও বহু উর্দ্ধে উড্ডীন হয়, তাহার হৃদয়ের বিস্তার যে সমুদ্রবিস্তারকেও লজ্জা দেয়, তাহার তৃষ্ণার আবর্ত যে নদীর ভয়াবহ আবর্তকেও উপহাস করে, এবং তাহার মন যে অনন্ত কোটি সূর্য্যচন্দ্র এবং অনন্ত কোটি মৌরজগৎকেও অবহেলায় গ্রাস করিতে পারে, বহির্বা্যাপারমুগ্ধ মনুষ্য তাহা ধ্যানপর হইয়া ভাবিয়া দেখে না। ফলতঃ এই সৃষ্ট জগতে মনুষ্যের আত্মা হইতে কিছুই উচ্চতর নহে, কিছুই রহস্তর নহে, এবং কিছুই প্রকৃত মহিমায় অধিকতর মহিমাস্বিত নহে। মনুষ্য সৃষ্টির মুকুটমণি এবং স্রষ্টার প্রতিকৃতি। তাহার নিকট সিংহাসন ও তৃণশয্যা উভয়ই সমান ; এবং সে মানে কি অপমানে, আলোকে কি অন্ধকারে প্রাসাদে কি পর্ণকূটরে যে ভাবে অথবা যেখানেই অবস্থান করুক, তাহার নাম মনুষ্য, এবং সে তাহার আত্মার অভূত গৌরবেই চির-গৌরবান্বিত। অখিল

ব্রহ্মাণ্ডও যদি তাহার প্রতি নির্দয় ও তাহার বিরুদ্ধচারী হয়, সে একাকী এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরই বিরুদ্ধে অমুক্ত দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে আপনি ‘অহং’ অর্থাৎ ‘আমি’ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে ; এবং যদি স্বায় তাহার অনুকূল ও সত্য তাহার সহায় হয়, সে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের সমবেত ইচ্ছার প্রতিকূলে একমাত্র আপনার ইচ্ছাকেই একটি শক্তিরূপে প্রয়োগ করিতে স্মৃত ও সামর্থ্য রাখে। মনুষ্যের এমন যে অলৌকিক সম্পদ, এমন যে দেবদত্ত স্বাতন্ত্র্য, লোকরঞ্জনের অতিসামান্য নটনৈপুণ্য রক্ষার জন্য ইহাকেও তাহার বিসর্জন করিতে হয় ! কেননা, আপনার আত্মাকে বলি স্বরূপ অর্পণ না করিলে কেহই প্রাণশঃ লোকের অনুরঞ্জে একপাদভূমি অগ্রসর হইতে পারে না। জিহ্বা লোকরঞ্জনের জন্য অসত্যভাষিনী, দৃষ্টি লোকরঞ্জনের জন্য অমৃতানুবাদিনী, প্রবৃত্তি লোকরঞ্জনের জন্য বিপণ্যগামিনী, এবং মনুষ্যের চিন্তাস্রোতও লোকরঞ্জনের জন্য নিম্নতলবাহিনী। কাহারও স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদীপ্তপাবকলিখার ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছিল, লোকরঞ্জনলালসা তাহা নিভাইয়া ফেলিয়াছে ; কাহারও কচি ও চিত্র দিমার্জির নির্ধারণের ন্যায় নির্মল ছিল, লোকরঞ্জনলালসায় তাহা ক্রমে ক্রমে পয়ঃপ্রণালীর অম্পূর্ণা পক্ষ হইতেও আদিল হইয়াছে। পণ্ডিত লোকরঞ্জনের জন্য মূর্খের ন্যায়

ব্যবহার করিতেছে; এবং যে একদিন সিংহের ন্যায় প্রতাপশালী ছিল, সে আজি লোকরঞ্জনের জন্য, নিজ পুরুষকার পরিহার করিয়া, শৃংগালের চাতুরী অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ।

সংসারে কপট বিনয়, কপট প্রণয়, এবং কাপট্যের আরও শত সহস্র প্রকারের অভিনয় কেন? তাহা কি লোকরঞ্জনেরই অনুরোধে নহে? অনেকে শিক্ষাবলে স্বর্গবাসেরও উপযুক্ত হইয়া নিরয়নিবাসী কীটের ন্যায় দ্বিকৃত জীবন যাপন করিতেছেন; অনেকে আপনার দেহ, প্রাণ, মন ও মনস্বিতা লোকের বিকৃত প্ররুতির সাময়িক প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া, ইচ্ছাশূন্য তৃণের স্তায়, কোথায় কোন্ দিকে জ্ঞানেন না, ভাসিয়া যাইতেছেন । অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদিগের এই অধঃপাতের মূলেও কি লোকরঞ্জনকা-মনাই কারণ রূপে প্রতীয়মান হইবে না?

তবে কি লোকরঞ্জন পাপ? এই প্রশ্নের আন্দোলন ও মীমাংসার জন্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা ।

লোকরঞ্জনপ্ররুতির ছয়টি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । যথা, লোকভয়, লোকলজ্জা, যশঃস্পৃহা, দয়া ও জীতি, এবং লোকপরায়ণতা ভক্তিনিষ্ঠা । আমরা ভয়জন্য লোকরঞ্জনকে পাপ অথবা পাপ হইতেও অবজ্ঞাজনক জ্ঞান করি, এবং যিনি বিষয়বিপত্তির শঙ্কায়, কিংবা কোনরূপ স্বার্থনাশ, সাময়িক অনিষ্ট,

কি সমর্থ ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ক্রোধভয়ে কর্তব্যের সরল পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, লোকচক্ষুর দৃষ্টির পথে অতি জড়সড় ভাবে, কোনরূপে, কক্ষতলে প্রাণটিমাত্র লইয়া অবস্থান করেন, আমরা তাদৃশ ক্ষৌণ্ণপ্রাণ, নিশ্শেষ্ত মনুষ্যকে, মনুষ্যের গণনায়, স্বতঃপ্ররুত পাপীরও বহুনিম্নে রাখি । ইচ্ছাকৃত পাপ, অতি বড় গর্হিত পাপ হইলেও, তাহার অনুরূপে মনের নিরঙ্কুশ গতি এবং আত্মার স্বাধীনতা আছে । বিধাতা মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় জীবকেই এই আংশিক বিধাতৃ-শক্তি এবং ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদান করেন নাই । পশুপক্ষীর জন্য যে রেখা নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার সেই রেখাতেই সত্য বিচরণ করিতেছে এবং সেই রেখাতেই চিরদিন বিচরণ করিবে । তাহাদিগের সহিত পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই, এবং প্রকৃতির বিদ্রোহাচরণেও তাহাদিগের কোনরূপ অধিকার ও ক্ষমতা নাই । এই সম্পর্ক মনুষ্যের, এবং এই রোমহর্ষণ অধিকার ও ক্ষমতাও একমাত্র মনুষ্যের । সুতরাং মনুষ্যের পাপেও মনুষ্যাত্মার পরিচয় হয় । অনিচ্ছাকৃত পাপ অথবা অনিচ্ছায় লোকানুরঞ্জনের আরম্ভেই পশুপক্ষীর মত সেই অধ্যাত্মস্বাধীনতা জলাঞ্জলি, এবং একান্ত ঘৃণাকর আত্মবিসর্জন; ইহা অপেক্ষা অবমাননা আর কি? ফলতঃ যাহারা আপনার ইচ্ছায় কি আপনার প্রয়োজনে, কোন নীচরুতি অবলম্বন করে, তাহার এক শ্রে-

নির লোক, এবং যাহারা পরের ইচ্ছার কি পরের প্রয়োজনে, অথবা পরকীর শাসনে নীচতা কি নিবৃত্তি পণের আশ্রয় লয়, তাহারা আর এক শ্রেণির লোক। আমরাদিগের চক্ষে এই ক্রকুটিভঙ্গি ভীত শোষোক্ত শ্রেণির মনুষ্যরাই অধিকতর নিম্নাঙ্গ। একথা সত্য যে, ইহাদিগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু অনিষ্ট, কিংবা লোকসমাজের বিশেষ কোন অকলাগ হয় না; এবং ইহাও সত্য যে, ইহাদিগের মতি থাকিলেও ইহারা শাসনভয়ে তাহাতে প্রাণশঃ প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করে না। বরং ইহারা অনেক সময়ে সাধুর সান্নিধ্যে সাধু, এবং শিষ্টের সান্নিধ্যে শিষ্টবেশ পরিগ্রহ করিয়া সংস্কারেরও অনুকূল্য করে। কিন্তু তথাপি, যখনই মনে হয় যে, ইহাদিগের স্মৃতি ও কুমতি, উন্নতি ও অবনতি, সময়েই মূলভেদে ভয়, চিন্তা তখনই স্বগত বিবৃত্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

কুত্বে কিংবা কুসুমকোমল বস্ত্রপুটে যেমন কীট, তেমনই মনুষ্য-জন্মে ভয়। মনুষ্যের জন্মে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, যাহা কিছু সুদৃশ্য ও সুসৌরভ-বুদ্ভ, ভয় তৎসমুদয়ই চক্ষুণের পর চক্ষুণ করিয়া উৎসাহকে একবারে অসার, অকর্মণ্য এবং অসম্ভব করিয়া ফেলে, এবং যৌবনে জরা ও বসন্তে শীত সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতি-কেই একবারে বিকৃত করিয়া তুলে। ঈশ্বরকে ভয় কর, এই নীতি পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন কথা। যখন ইহা প্রথম প্রচারিত

হয়, মনুষ্যজাতি তখন শিশু। তখন মনুষ্য বজ্রবিদ্রাভে ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পাইত না, মেঘে তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করিত না, এবং ঋটিকার তৈরদনাদে তাঁহার স্রমধুর উপদেশ শুনিতে সমর্থ হইত না। এইক্ষণকার পূর্ণবিকশিত পরমার্থ-বিদ্যা ঈশ্বরকে ভয় করিতে বলে না; প্রীতি করিতে বলে। ঈশ্বরকে ভয় করাও যদি দোষ এবং মনুষ্যাত্মার বিকাশের পথে অন্তরায়, তবে কি মনুষ্য মনুষ্যকে ভয় করিবে, এবং মনুষ্যের ভয়ে অধীর, আকুল ও উৎকণ্ঠ রহিয়া লোকরঞ্জনের জন্য একে আর হইবে? রাজা রামচন্দ্র প্রজার বিরাগ-ভয়ে, কি প্রজারঞ্জন কার্য্যই রাজার পরম ধর্ম্ম এই বিবেচনায়, পবিত্রহৃদয়া জানকীকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াও অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাদৃশ তেজোরাশিতে ভয় কি স্বার্থচিন্তার প্রবেশসম্ভাবনা? অল্প। যাহারা নিদিষ্টচিত্তে রাম-চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাহাদিগের এইরূপ ধারণা যে রামচন্দ্র রাজাকে মর্কটোতা-বেই প্রজাবর্গের ইচ্ছামৌল বলিয়া জানিতেন, এবং প্রতিনিধি যেরূপ প্রভুর আজ্ঞাপালনে বাধ্য, তিনিও আপনাকে সেইরূপ প্রজার ইচ্ছাপালনে বাধ্য জ্ঞান করিতেন। সুতরাং তাঁহার এই কার্য্যে কর্তব্যবুদ্ধিরই প্রণোদনা কি প্রশংসা। কিন্তু যদি ইহা না হইয়া, ভয়ে তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন,—সীতাকে গৃহে রাখিলে প্রজা তাঁ-

হার প্রতি অনন্তরট হইবে, এবং রাজ্যে
রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটবে, যদি এই দুর্ভাবনার অ-
ধীন হইয়াই তিনি সেই প্রীতির প্রতিমা
এবং মূর্তিমতী পবিত্রতাকে, কঠোরগর্ভা-
বস্থার ব্যাঘ্রভঙ্গকের মুখে বিসর্জন দিয়া
থাকেন, তাহা হইলে ইহলোকেও তাঁহার
ক্ষমা নাই, এবং লোকান্তরেও তাঁহার
স্মরণ নাই।

লোকলজ্জা ঠিক ভয় নহে, অথবা
লোকের প্রতি দয়াও নহে, অথচ উহাতে
ভয় ও দয়া এই উভয়েরই স্বেচ্ছা আছে।
উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভয় ও দয়ার মধ্যস্থিত
এক বিচিত্র ভাব, এবং এই ভাবের বশ-
বর্তী হইয়া অনেকেই অনেক সময়ে লোক-
বিনোদনে বাধ্য হন। নিতান্ত ঘৃণিতচরিত্র
ব্যক্তিও যদি আলাপ করিবার জন্য নিকটে
আনিয়া উপস্থিত হয়, তত্বেলোকেরা মুখের
উপরই তাহাকে তিরস্কার না করিয়া মনের
ভাব গোপন করেন; এবং সে যে বিষয়ে
আলাপ করিতে ভালবাসে, তাহার স-
হিত তদনুরূপ কোন বিষয়ে আলাপ ক-
রিয়া ক্ষণকালের জন্য তদীয় মনোরঞ্জে
যত্নশীল হন। ইহারই নাম লোকলজ্জা।
মনুষ্যের চক্ষুতে কি এক মোহিনী শক্তি
আছে, উহা যাহার উপর নিপতিত হয়,
তিনিই, অন্ততঃ তমূহূর্তের জন্য, আপনা
হইতে একটুকু স্মলিত হন। কৌরব-
কুল-কলঙ্ক ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের উপর যে-
রূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, বোধহয় ঐ-
রূপ সরলস্বভাব ও ধর্মপরায়ণ জাতির

উপর কোনদিনও কোন রাজবংশ তেমন
অত্যাচার করেন নাই। দ্রৌপদীর ন্যায়
লক্ষলোকপূজিতা, রাজস্বয়ম্ভজে অভি-
ষিক্তা, রাজরাজেশ্বরীকে প্রকাশ্য সভায়
নিগৃহীত হইতে দেওয়া একপ্রকারে অপ-
মানের পরাকাষ্ঠা। কেহ কল্পনাও কা-
হাকে এইরূপ অপমান করিতে সাহস
পায় না। পাণ্ডবগণ এই অত্যাচার, অপ-
মান ও অকথা নিগ্রাহের প্রতিশোধ দিয়া
সর্বংশেই পুরুষের মত কাঁসা করিয়া ছি-
লেন, সন্দেহ নাই। বৈরনির্ঘাতন আর
যে ভাবে এবং যে অর্থেই কেন পাতক
হউক না, পাণ্ডবকৃত বৈরনির্ঘাতনকে
কেহই পাতক বলিয়া গণনা করিতে পা-
রিতেন না। কিন্তু যেই পাণ্ডবগণ কু-
কক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির
সম্মুখীন হইলেন, তখনই তাঁহারা তাঁ-
হাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞলিপুটে পুনঃ
পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,
এবং সত্যের আংশিক অপলাপ ক-
রিয়া স্বকৃত কার্যসমূহকে প্রকারান্তরে
পাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহাও
লোকলজ্জা। লোকলজ্জার আরও কত
উদাহরণ আমরা দিগের চক্ষুর উপরেই নিরন্তর
ভাসমান রহিয়াছে। আমরা জানি যে, শু-
কজনসান্নিধ্যে প্রিয়সম্মিলনে এবং প্রণয়ের
রনপূর্ণ পবিত্র কথোপকথনে কিছুমাত্র দোষ
নাই। বরং তাহাতে প্রীতি অধিকতর নির্মল
হয়, এবং চিত্ত পঙ্কম্পর্শশূন্য নির্মলপ্রমের
সেই অনির্বচনীয়স্বাদ অনুভব করিতে

পায়। কিন্তু আমরা লজ্জায় ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকি। আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি যে, সম্পর্কভেদে পরিহাস, এবং সমাজের আরও পাঁচ প্রকারের আচারব্যবহার নিত্য অর্থশূন্য। কিন্তু লজ্জার শাসনে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কি ভাবে, না দয়ায় ? ইহার প্রকৃত কারণ লজ্জা। লজ্জা পরিচ্ছদাদিবিষয়ে আমাদিগের স্বাধীনতা অপহরণ করে, আমোদ প্রমোদের প্রকারবিষয়ে আমাদিগকে পরের অধীন করিয়া রাখে, এবং আরও বহুবিধ লৌকিক কার্যে আমাদিগকে সর্বতোভাবে পরমুখপ্রেক্ষী করিয়া তুলে। এই লজ্জাধীন লোকরঞ্জন সাধারণতঃ পাপ নহে, কারণ ইহার সহিত বিবেকের সকল সময়েই বিরোধ ঘটে না। কিন্তু যখন ইহা বিবেককেও অতিক্রম করে, এবং আত্মার স্বাভাবিক ক্ষুধা ও বিনাশ করিয়া ফেলে, তখন যে ইহাকে পাপ বলিয়া নির্দেশ করিব, তাহাতে আবার বিচার ও বিতর্ক কি ?

প্রভুত্ব, ক্ষমতা, সম্মান, এবং অনন্য-সাধারণ সামর্থ্য প্রভৃতি লৌকিক সম্পদের জন্য যে লালসা তাহারই অপর নাম যশঃস্পৃহা। কেননা, যশে সর্বত্রই প্রভুত্বের বিস্তার, ক্ষমতার অনিবার্য রূপ এবং সম্মান ও সামর্থ্যের অবশ্যস্বাবিনী পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। যশস্বী গ্রাডফোর্ড রাজা না হইয়াও আজি ইংলণ্ডের রাজা।

ইংলণ্ড তাঁহার কথায় উল্লিখিত হয়, তাঁহার ইচ্ছিতে উপবিষ্ট রহে। যশস্বী গ্যারিবল্ডী ইটালীর কোন এক লুকায়িত প্রদেশে কৃষিপরিদর্শন প্রভৃতি সামান্য কার্যে ভ্রম্যচ্ছাদিত বহির মত লুকায়িত রহিয়াছেন। অথচ সমগ্র ইটালী প্রাতঃসময়ে তাঁহার নাম লইয়া উদ্দেশে তাঁহাকে অভিবাদন করে, এবং সেখানে যে সময়ে জনসাধারণের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়, তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব সেখানেই সেই সময়ে প্রাতঃসূর্যের কিরণরাশির মত ছাঁইয়া পড়ে। যশস্বীগণের অগ্রগণ্য রয়েলজী, রমিও, ভল্টেরার, লুথর ও মিলাংগন, ডুবাল ও গ্যালিলিও, এবং কেপ্লার ও কলম্বস বহুদিন হয়, লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদিগের অমল-যশোমণ্ডিত অবিনশ্বরজীবন অদ্যাপি সহস্রাব্দে মানবজীবনে প্রতিভাত ও প্রবাহিত হইতেছে। ঐদৃশী যশঃস্পৃহা হইতে যে লোকানুৎকৃষ্ট মতি হয়, এবং লোকের মুখে কীর্তির কলধনি প্রবণে বাসনা জন্মে, তাহাও কি পাপ ? মানবজাতির অতীত ইতিহাস এবং মনুষ্যের হৃদয় ধীরে ধীরে, যুগ্মমোহনস্বরে, অতিশয়কণ্ঠে উত্তর করিতেছে,—না।

বস্তুতঃ, যে যশঃস্পৃহা, প্রভুত্বমদিয়ার ন্যায় দীনস্বয় দুর্জল মনুষ্যকেও, অন্ততঃ মুহূর্ত্তকালের জন্য, এক অতিমায়ুষ বল প্রদান করে ; যাহার বংশীনাদ-বিনিমিত্ত মধুর আশ্রানে উদ্ভাদিত হইয়া, ভীক বী-

রের প্রভাবে গর্জিয়া উঠে, যোদ্ধা স্বদেশ
ও স্বজাতির কল্যাণসাধনে যত্ন করাল-
গ্রাসসামুদ্রিধোও অকম্পা অবিচলিত পদে
অগ্রসর হয় ; যে যশঃস্পৃহা জ্ঞানের অনুস-
ন্ধানে এবং কাব্যাদি সুকুমার বিদ্যার অনু-
শীলনে উগ্র উদ্দীপনা, পুরুষকারের প্রমত্ত-
লীলারঞ্জে চিরপ্রবর্তনা ; যাহার জয়-বৈ-
জয়ন্তী সাগরবক্ষে ও অস্ত্রিশৃঙ্গে সমান
দোহুলামানা, এবং লোকেব হিতসম্পাদনেও
যাহার সকল সময়েই অসামান্য উত্তেজনা,
সেই যশঃস্পৃহাকে ঘৃণা করা মনুষ্যের
পক্ষে নিতাস্থই কঠিন । কিন্তু কঠিন কথা
হইলেও বলিতে হইবে যে, যশঃস্পৃহা ন্যায়-
পরতার ন্যায় নির্মূল নহে, নিঃস্বার্থ অনু-
রাগের ন্যায় সূদৃশ্য নহে, অভিমানসম্বলিত
আসক্তির ন্যায় পুরুষের প্রীতিপ্রদ নহে,
এবং মনুষ্যের ধর্মপথেও যথার্থ সহায়
নহে । যাঁহারা যশঃস্পৃহায় অতিমাত্র বাঁকুল,
তাঁহারা জগতে প্রায়ই সংকারণের অনুষ্ঠান
দ্বারা লোকরঞ্জন করেন, তাঁহারা কখনও
বা ঐ বাঁকুলতার মনুষ্যত্বের উচ্চতর গ্রা-
মেও আরোহণ করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য-
বশতঃ তাঁহারা সুরশ ও কুয়শের পাথক্য
না বুঝিয়া, অনেক সময়ে লোকপদবীর
অযোগ্য, অপাত্র, অপদার্থের নিকটেও
শ্রদ্ধা প্রার্থী হন ; এবং যে কোন উপায়ে
উপার্জিত যশঃই যে মনুষ্যের সর্বস্ব নহে
ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেহ বা
ক্রমশঃ নাবিতে নাবিতে, পরিশেষে এক-
বারে অধঃপাতে যান । ন্যায়পরতা ও

অনুরাগ, অথবা প্রকৃত অভিমান মনুষ্যকে
কখনই অধঃপাতের দিকে নিতে পারে না ।

দয়া আর প্রীতিতে যে লোকরঞ্জন,
তাহা আর এক পদার্থ । তাহা মেঘান্ত
সূর্য্য কি শুভকাবনত্র বনপাদপের সেই
এক বাধুর্যের ন্যায় অনেক সময়েই মনো-
হর, অনেক সময়েই প্রশংসনীয় ; এবং য-
খন মনোহর ও প্রশংসনীয় নহে, তখনও
প্রায়শঃই সহনীয় ও ক্ষমাযোগ্য । বালাকি
কি বশিষ্ঠের ন্যায় জ্ঞানী ও ব্রহ্ম, সুকুমার-
যতি শিশুর নিকটে শিশু সাজিয়া ক্রীড়া
করেন, দুঃখান্তর ন্যায় বীর তপোবনবাসিনী
পরলা কামিনীদিগের মনোরঞ্জননের জন্য
সারল্যে মিশিয়া নানা রূপ আশ্রয় করেন,
মেরুদ্রে ও জীনার বিজ্রতা যজ্ঞফিন
ও তাঁহার নর্যনহচরীদিগের নিকটে মৃদু মৃদু
হাসিয়া মৃতা শিক্ষা করেন, এবং শঙ্করা-
চার্য্য কি নিয়ুটন প্রমোদ পরিহাসে পাঁচ-
জনকে প্রফুল্ল করিবার জন্য করমুণ্ড অক্ষ-
মালা কি করের লেখনী পরিত্যাগ ক-
রেন ;—এ সকল দেখিতে সুন্দর । তো-
মার হৃদয় শোকদুঃখে আচ্ছন্ন, তোমার
প্রতিবেশীর গৃহে শুভকার্যের শুভউৎসব ।
তুমি যদি দয়ায় কি প্রীতিতে আপনার
শোকদুঃখ কিছু কাল বিস্মৃত হইয়া তা-
হার সেই উৎসবে আনন্দধারা ঢালিতে
পার, তাহাও সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য ।
পিয়ুরিটান সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা যে নী-
তিই কেন প্রচার না করুন, যাঁহারা নাম
লইয়া তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের সৃষ্টি, সেই

তপঃসাগরময় ধীর স্বয়ং অনাক্রপ ছিলেন । তিনি যে হাসে, তাহার সহিত হাসিতে জানিতেন ; যে কাঁদে, তাহার সহিত কাঁদিতে পারিতেন ; এবং কোটি লোকের মন্দল চিন্তার ডুবিয়া রহিয়াও পার্শ্বস্থ প্রিয়-ব্যক্তিদিগের সান্নিধ্য হর্ষবিষাদের ভাবনা ভাবিতে অবসর পাইতেন । দয়ার এমনই রীতি, এবং প্রীতিরই এমনই গতি ।

আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধনামা থিরোডোর পারকার পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিত, বীরের মধ্যে বীর, এবং পরমার্থনিষ্ঠ সাধু-সমাজে পরমসাধু বলিয়া সর্বত্রই অসাধারণ পূজা পাইতেন । তাঁহার জ্ঞান-ভূষণ প্রাচীন জ্ঞানদিগের তত্ত্বসমূহকে পঞ্চবিংশতি ভাষায় শোষণ করিয়াও অতৃপ্ত রহিত । ইতিহাসে ও দর্শনে এবং মূললিত সাহিত্যশাস্ত্রে তৎকালের কোন ব্যক্তিকে তাহার সমকক্ষ ছিলেন কি না, সন্দেহ । কর্তব্যপরাধীনতার তিনি বদ্ধ হইতেও কঠোর এবং পরিত্র হইতেও অটল ছিলেন । গ্রন্থাদি লইয়া পরিশ্রমে তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি অধ্যয়নে নিরন্তর অষ্টাদশ ঘটিকা নিবিষ্ট রহিলেও অণুমাত্র কাতরতা অনুভব করিতেন না । ইহার উপর আবার তিনি এমন বাগী, এমন মূললেখক ছিলেন যে, যে কোন বিষয় তিনি স্পর্শ করিতেন, তাহাই তাঁহার শক্তির প্রভাবে সুবর্ণের মায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিত । কিন্তু আপনাকে আপনি অবস্থান করিবার এ সকল সুখসামগ্রী স-

ব্বেও তাঁহার দয়া আর তাঁহার প্রীতি লোকানুরঞ্জে ও পরচিত্তবিনোদনে শারদ-শশীর জ্যোৎস্না এবং নিদাঘকালীন সান্ধা সমীরণের ন্যায় ক্রীড়া করিত ; এবং যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই তাঁহার মধুর হাসো, মধুর বাব-হারে, মধুমাখা কথোপকথনে এবং মধু হইতেও মিষ্টতর সরস আস্থানে মোহিত হইয়া, প্রথমদর্শন অবধিই আপনাকে তাঁহার জ্ঞানে তাঁহার ছায়ায় পড়িয়া থাকিত । নগরের বালকরন্দ, আপনাদিগের বাল-জ্ঞান-মূলভ মুখদুঃখের কাহিনী তাঁহার নিকট কহিতে পারিলেই আশ্বাসে অবশ হইত ; সরলস্বভাব যুবকযুবতীর মনের মর্মানবেদনা এবং অননুভূতপূর্ব আনন্দের উজ্জ্বল প্রকাশ করিবার জন্য, যেন আর স্থান না পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিত ; এবং চিন্তার কররেখায় চিহ্নিত চিরজীবন-দগ্ধ রুদ্ধও তাঁহার নিকটে আসিতে পারিলেই অপার শান্তি লাভ করিত । লোকের মনোরঞ্জে এইরূপ ক্ষমতা সামান্য শক্তি নহে ; এবং যিনি নাগের লৌহবস্ত্র হইতে স্প্ললিত না হইয়া এইরূপে লোকরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন । তবে কথা এই, এই দুই কুল রক্ষা করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া ইহ জগতে করজনের সাধ্যায়ত্ত ?

লোকের প্রতি অথবা লোকসমষ্টি-স্বরূপ মানবজাতির প্রতি হৃদয় ভক্তিবশতঃ যে লোকরঞ্জন, তাহা পাপ কিংবা

পাপের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট হওয়া
দূরে থাকুক, তাহাই পুণ্যের প্রাণ। তা-
দৃশী-লোকপরিচরিতাকে লোকসেবাত্রত
বলিলেই বোধ হয় অধিকতর সংগত হয়।
ভক্তিতে তাহার আরম্ভ, বিবেক ও প্রীতির
পরিমিশ্রণে তাহার পুষ্টি এবং ভক্তনার
তাহার শেষ। তাহাতে পূর্ণমাত্রায় আ-
ত্মোৎসর্গ হয়, অথচ আত্মার স্বাভাবিকতা ও
স্বাধীনতা অগুণমাত্রায়ও স্পৃষ্ট কি বিনষ্ট
হয় না, এবং লোকরঞ্জনর জন্য হিতকর
ও প্রীতিকর উভয়বিধ কার্যই সর্বপ্রযত্নে

অনুষ্ঠিত হয়, অথচ লোকসংস্কার, লোকভয়
অথবা লৌকিককল্যাণসম্পূর্ণ হাদি কিছুই অন্তঃ-
করণে স্থান পায় না। ধন্য তাঁহার, যাঁহার
এইরূপ লোকরঞ্জনরূপে জীবনের একমাত্র
ত্রত করিতে পারেন। ধন্য তাঁহার, যাঁহার
মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া রহিয়াও আপনার
মনুষ্যত্বকে সর্বতোভাবে অক্ষত রাখিতে
সমর্থ হন। তাঁহার অবনত হইয়াও উচ্ছিন্ন,
এবং উচ্ছিন্ন হইয়াও অবনত। তাঁহারাই
মহাত্মা, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য, এবং তাঁ-
হারাই মানুষী-শক্তির সেবক ও সহায়।

চন্দ্রগ্রহণ।

(১)

নিদ্রিতা জগতী গভীরা রজনী ;
নির্ঝাত নিম্পন্দ প্রকৃতি নীরব।
সহসা জাগিয়া শুনি হুলুধনি।
ঘোর নটা রোলে শঙ্ক ঘটারব।
তাসহ.মিশিয়া উচ্চ হরিধনি,
রহিয়া রহিয়া হতেছে ঘন।
শয্যা পরিহারি উঠি অনুমানি,
ভাবিবি কি হেতু উৎসব হেন ?
নিরানন্দ বঙ্গ আনন্দ কেন ?

(২)

পলাসী-প্রাঙ্গণে চির রাত্ৰমুখে,
বঙ্গের সৌভাগ্য-শশী কবলিত।
ভাসি অশ্রুণীরে সিংহলাভিমুখে

গিয়াছে শ্রীমন্ত জনগের মত।

পুন কি সে শশী হইল উদয় ?

পুন কি শ্রীমন্ত আসিল দেশে ?

নহিলে এ বঙ্গ কেন হর্ষময় ?

মৃত প্রায় বঙ্গ জর্জরিত বিষে ;

সে বিষ হরিল—চেতাইল কি সে ?

(৩)

সহসা বাহিরে করিবি গমন,

গ্রহণের কথা পড়িল মনে।

রাত্ৰ মুখে চাঁদে করিবি দর্শন,

কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে সঘনে।

নীচ হস্তে দেখি মহত লাঞ্জন,

বিষাদে রজনী হয়েছে মলিন।

কিন্তু বঙ্গবাসী হরষে মগন !

বজ্র কি মহত্ব হয়েছে বিলীন !
কায় বঙ্গবাসী এতই কি হীন ?

(৪)

ধন্য ! নিশাপতি তুমিই মহান !
আপনি বিপদে হইয়া পতিত ;
পারের করিছ মঙ্গল বিধান ;
বজ্র পুণরাশি করিছ সঞ্চিত ।
বুঝি নু বুঝি নু বুঝি নু কারণ,
রুখা নিন্দা করি বঙ্গবাসীগণে ।
শশীক-শিবার্থ ধন বিতরণ
করিছে ভিখারী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণে ।
কর 'মুক্তি' বাঞ্ছা কর কারোমনে ।

• • (৫)

নিম্বার্থ হৃদয়ে যদি পরহিত
এরূপে নিয়ত পার করিবার ;
হইবে জগতে যশ বিঘোষিত ;
বজ্রের সৌভাগ্য ফিরিবে আবার ।
তোমাদের পুণ্যে বঙ্গ-সুখ-শশী
দুঃখ-রাত্ত মুক্ত হউক ভরিত ;
আঘাত করিলা পুণ্য তীক্ষ্ম অসী
রাত্ত-দম্বা-শির কর দ্বিখণ্ডিত ;
ধরম-বীরত্ব হউক ধ্বনিত ।

(৬)

অই দেখ রাত্ত চণ্ডাল তঙ্কর
পরাত্ত হইয়ে, করিছে প্রস্থান ।
রাত্তমুক্ত-শশী পুন স্নিগ্ধকর
কৌমদী জগতে করিতেছে দান ।
দেও হরি ধনি, কর ছলুরব ;
ঘোর রোলে কর শঙ্খ ঘটা নাদ ।
রাত্তমুক্ত হলো রজনীবাঙ্গব,
যামিনী সতীর ঘুচিল বিষাদ ।
মহতের জয়ে কার না আত্মদ ?

(৭)

হে শশী, তুমিত মুক্তি পাইলে ;
বিপদ হইতে পাইলে উদ্ধার ।
পুনশ্চ জগতে সুখা বরষিলে,
নিশিসহ সুখে হাসিলে আবার ।
কিন্তু এ বজ্রের সুখ-শশধর,
যে বিষাদ-রাত্ত করিল গরাস ;
গত হলো কত মাস সম্বৎসর,
আর না সে শশী হইল প্রকাশ !
এ গ্রহণস্থিতি রবে বার মাস ?

শ্রীজ—

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ । *

উনবিংশ শতাব্দী (The Nineteenth Century) নামক একখানি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র, অল্প দিনসময় হইল লণ্ডন হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে । সুপ্রসিদ্ধ লেখক জেমস্ নোলস্ ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন ; রাজকবি টেনিসন্ ইহার আগমনী গাইয়াছেন ; গ্লাডস্টোন ও গ্রাণ্টডফ্, কার্ডিনাল ম্যানিং ও ম্যাথিউ আরনোও প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ এবং লেখক চূড়ামণিগণ ইহার নেতা হইয়াছেন । আমরা ভরসা করি যে, “পাব্লিক” ও “সাময়িক” সমালোচন দ্বয়ের প্রতিযোগী “উনবিংশ শতাব্দী” অচিরে উহাদিগের সমকক্ষ হইবে ।

সারজন লুবকের নাম বোধ হয় অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন । ইনি ইংলণ্ডের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক, বক্তা এবং পার্লামেন্টের সভ্য । “উনবিংশ শতাব্দীর” প্রথম সংখ্যার সারলুবক, ইংলণ্ডের উপনিবেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন । উক্ত প্রবন্ধই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয় ।

ইংলণ্ডের বর্তমান কোন সুপ্রসিদ্ধ

বাগ্মী বলিয়াছেন যে, “আমরা আমাদের দায়িত্ব নিশ্চয় হইয়া, অধীশতা, বিজিত রাজ্যসমূহের প্রতি যে নীতির অনুসরণ করি, অতুলশক্তিবৈভাবে প্রমত্ত হইয়া যেভাবে তাহাদিগকে ক্রীড়নকের ন্যায় ব্যবহার করি,—সময়ে সময়ে তাহা অন্ধ স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ।” এই মর্যাদাসিক আঘাতে জর্জরিত হইয়া, জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক অপনয়নার্থ লুবক, ইংলণ্ডীয় অনুদূট রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন ; এবং যে নীতিমূলক অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূর রাজ্যসমূহ শাসন করিতেছেন, তিনি তাহার সারবত্তা দেখাইতে যত্নপর হইয়াছেন । আমরা অন্যকার এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অন্যান্য উপনিবেশের সহিত তুলনা করিলে, ভারতে অনুষ্ঠিত ইংরাজ রাজনীতি সর্বথা উদার নহে ।

ভারতবর্ষকে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ বলা যাইতে পারে কি না, প্রস্তাবের প্রারম্ভেই আমাদের কাছে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে । কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিকে আমরা যে ভাবে ইংল-

তীয় উপনিবেশ বলিয়া নির্দেশ করি, ভারতবর্ষকেও কি তাহাই বলিব ? আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে যে সকল ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই ইয়ুরোপীয়নিগের অগমন কালে, জনমানব সমাগমশূন্য বিজন অরণ্যানী অগণ্য অসভ্য আদিম অধিবাসিনিগের সংখ্যা এত হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্তমান লোক সংখ্যা গ্রহণ করিলে, উহার সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় হইবার যোগ্য । এই সকল স্থানে বিদেশীয় লোকের সংখ্যাই অধিক, অথবা বিদেশীনেরাই এখন এই সকল স্থানের প্রকৃত এবং স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে । গবর্ণমেন্ট, এমিগ্রেশন প্রথার অনুমোদন এবং প্রবর্তন করিয়াই এই সকল স্থানে অধিবাসীর সমাবেশ করিয়াছেন । গবর্ণমেন্টই এই সকল রাজ্যের বীজবপন এবং উহাতে জন সেচন করিয়াছেন । বাস্তবিক এই সকল রাজ্য গবর্ণমেন্টকর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এখন কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া জনপ্রাণীহীন নির্জন প্রদেশে বহুজনসমাকীর্ণ গ্রাম নগর চহর প্রতিষ্ঠা করা বহু ব্যয় এবং প্রগাঢ় অধ্যবসায় সাপেক্ষ । আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতে স্বল্প সময়ে যুগসাপ্য, অভাবনীয় যে সকল পরিবর্তন

সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে সহস্রা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস হয় না । এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা উল্লিখিত রাজ্যসমূহকে উপনিবেশ বলিয়া নির্দেশ করি, তাহা হইলে সে অর্থে ভারতবর্ষকে কখনও ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ বলিতে পারি না । এখানে ইংরেজ বসন্তুর কোকিল । পঁচ, দশ, উর্দ্ধ সংখ্যা পনের বৎসর এখানে অবস্থান করিয়াই ইংরাজ স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । স্থায়ী ইংরাজ এখানে একজনও দৃষ্ট হয় না । এদেশকে স্বদেশ বলেন, শ্বেতশরীরে এমন একটি লোকও এখানে বিদ্যমান নাই । তবে ভারতকেও কি উপনিবেশ বলিয়া নির্দেশ করিব ?

উপনিবেশ নিচয়ের সাহায্যার্থ ১৮৫৯ অব্দ হইতে ১৮৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড সর্ব্বশুদ্ধ ৪১০০০০০০০ এক চল্লিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ সা-কল্যে প্রতিবৎসর ৪১০০০০০০ চারি কোটি দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে । তাহার পর

১৮৭০ সালে ২৭৪৫৯৮০০ টাকা

১৮৭১ ,, ২২২৮০০৪০ ,,

১৮৭২ ,, ১৯১১০০৭০ ,,

১৮৭৩ ,, ১৮১৭৪৭১০ ,,

ব্যয় করিয়াছেন । কিন্তু ইহার মধ্যে ইংলণ্ড যে ভারতবর্ষের জন্য একটি মুদ্রাও নিজ কোষাগার হইতে প্রদান করিয়াছেন, এমন দৃষ্ট হয় না । সারলুবকও এই সমস্ত অর্প হইতে ভারতের জন্য কিছু ব্যয়

হইয়াছে কি না, তাহার উল্লেখ করিতে পারেন না। বিগত ২৪ শে জুলাইর 'ইংলিশম্যান' নামক সংবাদপত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড সাধারণ ধনাগার হইতে ভারতবর্ষের উপকারার্থে অপব্যয় একটি পরমাণু ব্যয় করিলেন না। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, ১৮৬৭, ১৮৬৮ এবং ১৮৬৯ অব্দে প্রতি বৎসর ইংলণ্ড ভারতবর্ষের হিসাবে গড়ে ৬৭৫০০০০০ ছয় কোটি পাঁচতর লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন *। ১৮৬৯ সালের পর হইতে ইংলণ্ড, ভারতসংক্রান্ত ব্যয়-নির্বাহার্থে প্রতি বৎসর কত টাকা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিশ্বাসজনক প্রমাণ অপব্যয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি না। কিন্তু প্রতিবর্ষেই যে উহা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। সংবাদ পত্রের জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলে, ইংলণ্ড হোম গবর্নমেন্টের ব্যয়ের নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১০০০০০০০০ তের কোটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত টাকা নির্ধারিত সময়ে নিঃশেষিত হয় না। উদ্ধৃত অর্থ ইংলণ্ডে গচ্ছিত থাকে।

সারলুবক বলেন যে উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের দেওয়ানী আদালতে আপীল

* Indian Politics by George Cheyne ; First edition, page 451, 'These sums include the money spent on colonies,

করিতে পারে। সেখানে প্রীভিকাউন্সিল রহিয়াছে, তাহার ব্যয় কোন উপনিবেশকেই প্রদান করিতে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সহিত ইংলণ্ড নিজ ব্যয়ে যে সকল সৌহার্দ্য সংস্থাপন করিয়াছেন ; ভিন্ন ভিন্ন রাজসভার ইংলণ্ড নিজ ব্যয়ে যে সমস্ত এক্সেপ্ট, রেসিডেন্ট কিংবা কন্সল নিযুক্ত রাখিয়াছেন, উপনিবেশগুলি বিনা ব্যয়ে তাহার ফলভোগ করিতেছে। ইংলণ্ডীয় উপনিবেশিক অফিসের (The Colonial Office) ব্যয় কোন উপনিবেশকেই প্রদান করিতে হয় না। এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সকল কথা কতদূর যথার্থ।

সার লুবক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন, চীনদেশে যে ইংলণ্ডীয় রাজদূত আছেন, তাঁহার ব্যয় ভারতবর্ষ হইতে নির্বাহিত হইয়া থাকে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, পারস্য, জাপানের এবং এডেন প্রভৃতি স্থলে যে সমস্ত এক্সেপ্ট কিংবা কন্সল নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের ব্যয়ভার ইংলণ্ডকে, না ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয় ? সময়ে সময়ে আফ্রিকা কিংবা আসিয়ার কোন রাজা ইংলণ্ডে গমন করিলে, তাঁহার সমানার্থে যে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা ভারতের ক্ষেপে নিষ্কপ করা ন্যায় শাস্ত্রের কোন সূত্রানুযায়ী, বলিতে পারি না। আর আফ্রিকার অসভ্যদিগের সহিত ইংলণ্ডীয় সংগ্রামের ব্যয় ভারতই বা ভারতবর্ষ কেন বহন করে, তাহা

কে বলিবে ? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উল্লিখিত বর্ষত্রয়ের প্রতি মাসে ইংলণ্ড, ভারতবর্ষের ৫০০০০০০ পঞ্চাশলক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন, এবং এই টাকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। অন্যান্য উপনিবেশ হইতে কিছুই প্রেরিত হয় না এবং ভারতবর্ষ বাগের টাকা প্রদান করে না, এ কথা কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। সম্বাদ পত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়, এবার হোম গবর্নমেন্টে ধরচের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে এক খণ্ড বস্ত্রের নোকা ভাড়া এবং পাখের ২০০০ দুই সহস্র টাকা লাগিয়াছে ! •

ভারতবর্ষ, চীন দেশস্থ ইংরাজ কন্সলের বার বহন করে ; এখন দেখা যাউক অন্যান্য উপনিবেশ, ভিন্ন দেশের ব্যয় ভার গ্রহণে কতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৮৭৪ সালে দেশীয় লোকদিগের প্রার্থনানুসারে এবং অষ্ট্রেলিয়ার আবদ্ধ ইংলণ্ড, ফিজী দ্বীপপুঞ্জের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ফিজী দ্বীপ নিতান্ত ক্ষুদ্রকাঙ্গ, এবং দুর্বল শরীর, স্বকীয় ভারবহনে সমর্থ হইল না। সুতরাং ইংলিশ পার্লামেন্ট ১৮৭১ সালে ৪০০০০০ চারি লক্ষ এবং ১৮৭৬ সালে ৩১০০০০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ইংলণ্ডের ধনাগার হইতে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অষ্ট্রেলিয়া, চারি প্রধান উপনিবেশে বিভক্ত। লর্ড কারনারভন, উহার জন্য এই উপনিবেশ চতুষ্টয়ের প্রত্যেক হইতে প্রতিবর্ষে

৪০০০০ চব্বিশ সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাঠক, বিশ্বাস করিনে ? নিউজিল্যান্ডের প্রধান কর্মসচিব উত্তর দিয়াছেন যে “ মুক্তহস্ত হওয়া কোন গবর্নমেন্টেরই কর্ম নহে, ” “ ফিজী দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের অধীন হওয়াতে নিউজিল্যান্ডের অনেক লাভ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের লাভের নিকট নিউজিল্যান্ডের লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর * । ”

এখন আয়লণ্ড সম্বন্ধে গুণীকৃত কথা বলা আবশ্যিক। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে আইরিশ সভা আছেন। সুতরাং আয়লণ্ডের আত্মশুদ্ধিক শাসনের ভার শুধু ইংরাজের হস্তে নহে। আয়লণ্ড সহযোগিতাবে ইংলণ্ডীয় সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। সুতরাং ভারতবর্ষ এবং আয়লণ্ডের অবস্থা সর্ব্বাংশে বিভিন্ন। ১৮২২ সালে আয়লণ্ডের ফসলের সাতিশতা ক্ষতি হওয়াতে আয়লণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পার্লামেন্টে, সাধারণ কোষাগার উন্মুক্ত করিয়া আয়লণ্ডের সাহায্যার্থ ৩০০০০০ ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই উত্তর রাজ্য একত্র সম্মিলিত এবং উভয়ের আগ্রহ এক ধনাগারে গচ্ছিত থাকে। সুতরাং একের ক্ষতি হইলে, অন্যের তাহা পূরণ করিতেই হইবে। এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইংলণ্ড উক্ত টাকা ব্যতীত আরও ২৬০০০০০ ছাব্বিশ লক্ষ টাকা টাদা করিয়া দিয়াছি-

* The Nineteenth Century no. 1. vol. 1, p. 41-42.

লেন। তাহার পর ১৮৪৫ সালে উক্ত কারণে পুনর্বার তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এবার উহা ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত প্রবল থাকে। এডিনবরা রিভিউ অনুসারে, সমগ্রদেশব্যাপি দুর্ভিক্ষ দমনের এমন মহৎ চেষ্টা আর ভূমণ্ডলে কস্মিন কালেও হয় নাই। এবার ইংলণ্ড চাঁদা করিয়া ৩৬০০০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা বাতীত গবর্ণমেন্টে ২৫০০০০০০ নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধার দিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গবর্ণমেন্টে প্রতিদিন ত্রিশ লক্ষ লোকের আহার যোগাইয়াছেন। ইংলণ্ড প্রথমে আশা করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ধনাগার হইতে যে টাকা প্রদত্ত হইল, আয়লও তাহা একদিন পরিশোধ করিবে। কিন্তু ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত আইরিসদিগের কন্ঠের শব্দ হইল না। সুতরাং আরার সেই সালে ৪৫০০০০০০ চারি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আয়লশুলক এক কালীন প্রদান করেন। * এই সমস্ত অলোকবিস্তৃতদয়ার কার্যে জগৎ ভরিয়া ইংলণ্ডের স্তুতি হইয়াছে; এবং ইংলণ্ড এই খ্যাতি লাভের উপযুক্ত কার্যও করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ১৭৭০ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার তৃতীয়ংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহা

* The Nineteenth Century no, 1, vol. I. p. 46.

হউক, সে সময়ে ইংরাজ বঙ্গদেশের নূতন অধিপতি; সুতরাং এই সকল স্রোতের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না।

তাহার পর উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। এবারও কি বলিব যে, সহস্র সহস্র লোকের অকাল, ও অনাহারমৃত্যুর জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে নিন্দনীয় নহেন? সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিল, চতুর্দিকের হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ হইল; পিতা, পুত্র বিসর্জন করিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল; মাতা মারার দৃশ্যদাবন্ধন ছিন্ন করিয়া, শিশু পুত্রকন্যা পরিভাগ পূর্বক স্বীয় জীবন রক্ষার সচেষ্ট হইল; বৃদ্ধ পিতা মাতা অনন্ত শযায় শয়ন করিল; বালক-বালিকা, যুবকবৃদ্ধ কাক, কুকুর ও শূণ্যালের আহারীয় হইল; ক্ষেত্রের শস্য, বৃক্ষের পত্র, মাঠের তৃণ,—অগ্নি মূলা—দুস্ত্রাপ্য হইল; —তখনও কি বলিব যে এই অদৃষ্টের অশ্রুতপূর্ব ভয়াবহ, শোচনীয় ঘটনার জন্য ব্রিটিশগবর্ণমেন্টে নিতান্ত নিগ্রহনীয় নহেন? যে ইংরাজ জাতি আইরিস দুর্ভিক্ষের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিলেন, স্বর্ণ সিংহাসনারূঢ়া মহারাজ্ঞী হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কারাবাসী পর্যন্ত ব্যবতীয় লোকের ব্যয় সঙ্কোচিত করিয়া, আইরিস জাতির সাহায্যের জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন; সেই ইংরাজ জাতি—উড়িষ্যার হৃদয়ভেদী আতর্জনাদ, মুমূর্ষুর কাতর-চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন্ প্রাণে বধিরপ্রায় নিকন্তর রহিলেন? * উড়িষ্যা

বহুদূরস্থ ” এই যৎসামান্য উত্তরে ইংরাজ জাতির মস্তকহইতে যুগচেষ্টায় অনপনের, দুর্স্বার্থ কলঙ্ক কখনও অপনীত হইবে না । সমস্ত সভাজগৎকর্তৃক ভূমি তিরস্কৃত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের শিক্ষা লাভ হইল, কিন্তু ইংলণ্ডের চেতনা হইল না । বেহারের দুর্ভিক্ষ আসিল । ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টে এক মুদ্রার স্থলে শত মুদ্রা বার করিয়া উহার শমতার পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন ; পরিণামে ঐ চেষ্টার ফলও ফলিল । কিন্তু অগণিতসংখ্যক মুদ্রার অনর্থক ব্যয়ের নিমিত্ত কেহই দায়ী হইলেন না ! পরিণামে মাদ্রাজ এবং বোম্বাইর বর্তমান দুর্ভিক্ষে দুচারি জন ইংরাজের দয়া হইয়া থাকিলেও গবর্ণমেন্টে নীরব । কোন দিনও শুনিতে পাইলাম না যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট স্বকীয় কুবেরের ভাণ্ডারহইতে ভারতবর্ষের উপকারার্থ, উদ্ধারার্থ একটি কপর্দকও প্রেরণ করিলেন । বরং যখন দৈবদুর্ভিক্ষপাকে মলিল ও অনিলাড়ম্বরে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালকবলিত হইল ; যখন মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে, অম্পাহারে জীবন বিসর্জন করিতে লাগিল ; যখন গবর্ণমেন্ট রাজ্যের ব্যয়সাধন করিয়া প্রজার জীবনরক্ষার সচেষ্ট হইবেন বলিয়া সকলে অলীক আশার মোহমত্তে মুগ্ধ হইতেছিল ; তখন লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত্ব করিয়া, বিশাল আড়ম্বরে, সমগ্রভারতে

বিজয়ভেরী বিজয়দ্রুমুত্তি নিনাদিত করিয়া, ইন্দুপ্রস্থের পূর্ণাক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একচক্রবর্ত্তি সংঘোষিত হইল । জীর্ণ-ঐশ্ব-অশ্বিনপ্রান্তে দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থিরা, বাধিপ-রিক্রিষ্টা ভারত, শীর্ণবাহু উত্তোলন করিয়া “ মাতঙ্গয়তু, জয়তু ” বলিয়া ভারতেশ্বরীকে আশীর্বাদ করিল * ।

সার লুবক বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যয় নির্বাহার্থ ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই প্রদান করিতে হয় না । ইংলণ্ড নানা বিষয়ে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে বহু উপকৃত হইয়াও ভারতবর্ষ অত্যাশ্রিত উপনিবেশের ন্যায় কিছুমাত্র আনুকূলা করে না । ইংলণ্ডীয় কোন কৃষক কি করপ্রদাতা, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়া একটি পরসারও স্বতঃ সাহায্য প্রাপ্ত হয়-

* গবর্ণমেন্টে বসিতে পারেন যে, বর্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য ইংলণ্ড লোম খুলিয়া ভারতবর্ষকে অনেক টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । কিন্তু উপনিবেশের জন্য লোন খোলা ইংলণ্ড এই প্রথম কিম্বা তৃতীয় করেন নাই । সার লুবক যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ১৮১৫ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ৭৮৯০০০০০ মাত্ৰ কোটি আট লক্ষ নব্বই সহস্র টাকা উপনিবেশগুলিকে প্রদান করিয়াছেন । এই তালিকার ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই ।

না ; কিম্বা সেই কারণে রাজকোষে এক পরমাণু নূন রাজস্ব প্রদান করে না । সার লুবকের এই উক্তি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ ভারতবর্ষ নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ; ইংলণ্ড হোমচার্জ যে টাকা ব্যয় করেন, ভারতবর্ষ তাহার সাহায্য করে না ; অগত তাহা হইতে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয় । দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ বিজিত দেশ ; ইংরাজের অধীন । কিন্তু ইংলণ্ডের ধনাগারে রাজস্বস্বরূপ এক পরমাণু দিয়া থাকে না । প্রথম উক্তি যে নিতান্ত অযুক্ত, অগ্রাহ্য এবং অবজ্ঞের তাহা বলা বাহুল্য । প্রতি বৎসর অঙ্গুষ্ঠাধারে কোটি কোটি টাকা প্রদান করিয়াও যদি কিছু মাত্র না দেওয়ার অপযশের ভাগী হওয়া যায়, তাহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমরা ইহার উত্তরে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট বলিয়াছি । যে তিন বৎসরের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড প্রতিমাসে ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । এবং এই সমস্ত অর্থ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে । যদিও এই অর্থের কিয়দংশ ভারতবর্ষের স্থানীয় ব্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে; তথাপি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষের জন্য ব্যয়িত টাকা ইংলণ্ড নিজ হইতে কদাপি প্রদান করেন নাই । নিঃস্বার্থ উপকার ইংলণ্ড, অন্যান্য উপনিবেশের প্রতি করিতেছেন ; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নহে ।

দ্বিতীয় উক্তি বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত লিখিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ অন্যান্য বিজিত দেশের ন্যায়, ইংলণ্ডের ধনাগারে রাজস্ব প্রদান করে না । ইংলণ্ডীয় লোক, ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না । ভারতবর্ষ শাসনের মূলমন্ত্র এই যে, ' ভারতবর্ষের টাকা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই ব্যয়িত হইবে । ' ১ আমরা নিতান্ত নিশ্চিত হইলাম যে, এই মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াও সার লুবক, ভারতবর্ষ কর দেয় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । প্রাচীন গ্রীশ-রোম প্রভৃতি রাজ্য সকল অধীনস্থ উপনিবেশ নিচয় হইতে কর গ্রহণ করিত । কিন্তু যে সময়ে ঐ সকল কর গৃহীত এবং প্রদত্ত হইত, সে সময় বহুকাল হইল অতীত হইয়াছে । তখন ইংরাজ হুককোটের বাস করিতেন, বস্কন পরিধান করিতেন, এবং তীরধনুদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । এখন আর সে দিন নাই । উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল । যদি রোমগ্রীশ এবং বর্তমান ইংলণ্ড; খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বসময় আর উনবিংশ শতাব্দীতে কোন প্রভেদ না থাকে, তবে বর্তমান কালের সভ্যতা, ভাষা, ন্যাতা আর পুরা কালের মূর্খতা, বনাতা, ও স্থিরতা প্রভেদ কি ? কিন্তু রাজকুলললামভূতাভিকটোরিয়ার এমন অভিলাষ নহে যে, ভা-

রতবর্ষ, ইংলণ্ডকে কর প্রদান করে। দ্বিপ-
ক্ষাংশে প্রকরণে আদিষ্ট হইয়াছে, “যদি
কোন স্থলে এমন বোধ হয় যে, ভারত-
বর্ষের অগ্নির টাকা ভারতবর্ষের ন্যায্য-
বায় ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে ব্যয়িত হই-
য়াছে, তাহা হইলে অডিটর উক্ত বিষয়
বিশদ করিয়া উল্লেখ করিবেন ; ভারত
বর্ষের টাকা শুধু ভারতবর্ষ শাসনের নিমি-
ত্বেই ব্যয় হইবে।” ভারতবর্ষের টাকা কি
প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে, তাহার এই
স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের এই
ঊদ্যোগ ভারত কখনও ভুলিবে না, ভারত-
বাসী এ বিষয়ে ইংলণ্ডের এই স্বার্থশূন্যতা
স্মরণ করিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে।

‘স্বতঃ’ কিম্বা ‘সাক্ষাৎ সবন্ধে’
এই কথাটি ব্যবহার করিয়া সার লুক
সাধারণের চক্ষে মুক্তি মুক্তি ধুলি নিক্ষেপ
করিয়াছেন। আমরা এই মাত্র বলিতে
পারি যে, ভারতবর্ষ লাভ করিয়া ইংরেজ
যে রূপ সহস্র প্রকারে উপকৃত হইয়াছেন,
ইংলণ্ডের আর সকলগুলি উপনিবেশ একত্র
করিলেও তাহার সমান হইবে না। ভা-
রতবর্ষীয়দিগের নিকট ইংলণ্ড সম্বৎসরে
২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটি টাকার
পণ্য বিক্রয় করেন, এবং প্রতিবর্ষে যার
পর নাই অল্প মূল্যে ৩০০০০০০০০ ত্রিশ
কোটি টাকার ভারতবর্ষীয় জব্যজাত ক্রয়
করিয়া থাকেন। ১ এখন দেখা যাউক,

আজ যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তবহি-
ভূত হয়, এই ত্রিশ কোটি টাকার বাণিজ্য
জব্য, বিশেষতঃ এত অল্প মূল্যে, ইংলণ্ড
কোথায় পাইবেন? আর প্রতি বৎসর
ভারতবর্ষ যে পঁচিশ কোটি টাকার ইংল-
ণ্ডীয় জব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে এই
সমস্ত জব্য ইংলণ্ড কোথায় চালাইবেন?
এমন অবস্থা উপস্থিত হইলে, মানচেস্টার,
লিভারপুল, গ্লাসগো এবং জেদুশ অপরা
পর সমস্ত স্থান একেবারে উৎসন্ন যাইবে;
এবং নেপোলিয়ন কর্তৃক সম্যক অভিহিত
এই বণিক জাতির গৌরব চিরকালের
তরে অন্তিমিত হইবে। ভারতবর্ষে আজি
কালি কৌশলচালিত কয়েকটি তত্ত্ব বা-
বহৃত হইতেছে; এই সকল তত্ত্ব মানচে-
স্টারের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ভারতবর্ষ
যদি আপনার বস্ত্র আপনি বয়ন করিতে
আরম্ভ করিল, তাহা হইলে বিলাতি তত্ত্ব-
বায়ের উপায় কি? সুতরাং তুলার শুল্ক
উঠাইয়া দাও। এই শুল্ক থাকিতে ভারত-
বর্ষের দুইটি লাভ আছে। প্রথমতঃ, উ-
হাতে ভারতের কএক কোটি টাকা আয়
হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ যে রূপ নির্ধন
দেশ, তাহাতে এই কয়েক কোটি টাকা
তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মহাত্মা
লর্ডনর্থক্রক এই কারণ বশতঃই সেবার তু-
লার শুল্ক রহিত করেন নাই। সে দিন তুলা
ব্যবসায়ী একজন বিলাতি বণিক লজ্জা
দূরে পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে বলিলেন
যে ‘ভারতবর্ষের আয় কম হউক, তাহাতে

আমাদের কি ? আমাদের ইচ্ছানুরূপ, লাভ না হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে তজ্জনা অবশ্য দায়ী ! ” দ্বিতীয়তঃ, এই শুল্ক থাকিতে বিলাতীয় বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে । সহসা হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগেরই ক্ষতি ; যে কাপড় দুই টাকা মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারিত, এই শুল্ক থাকিতে তাহা তিন টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে হয় । কিন্তু একটুকু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই শুল্ক দ্বারা ভারতের যথেষ্ট লাভ হইতেছে । উহা বর্তমান থাকিতে, বিলাতীয় বস্ত্র সমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে । দেশীয় লোকের যত্নে এখন বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের কতিপয় স্থানে বস্ত্র বয়ন যন্ত্র সংস্থাপিত, হইয়াছে । বলা বাহুল্য, এই সমুদায় স্থানে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, সমষ্টিতে তাহার খরচ অনেক অধিক পড়িয়া থাকে । যদি এই শুল্ক উঠিয়া যাইয়া বিলাতি কাপড় আরও স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে দেশীয় বস্ত্র বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । ভারতবর্ষ পরমুখপ্রেক্ষী । স্বল্পমূল্য বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়লও বাসী গণ সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,

যে, যত দিন পর্যন্ত ইংলণ্ড বাণিজ্য বিষয়ে আয়লওকে স্বাধীনতা প্রদান না করেন, ততদিন তাহার ইংলণ্ডের কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবেন না ।

আজি মানচেষ্টারের ইচ্ছা স্বাধীন-বাণিজ্য প্রচার । মানুষা জৈশ্বরম্ভে স্বাধীন জীব ; সুতরাং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া সে যাহা লাভ করিবে, তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ কেন ? স্বাধীনতা প্রার্থনীয় ; তাই বলিয়া নিজীব মেষপালের মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের স্বাধীনতা প্রদান সমিটীন বুদ্ধির কার্য্য নহে । স্বাধীন বাণিজ্য প্রচারের জন্য মানচেষ্টার আজি কালি এত ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানচেষ্টারই এই উদার নীতি স্বত্র পাদন-লিত করিতে ক্রটি করেন নাই । উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়লও যত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীতে কোন যুগে কোন সভ্যদেশ এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে নাই । এই উক্তি যে অযথাচিত্রিত নহে, যাহারা ঐ সময়ের আইরিস ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইহা সবিশেষ অবগত আছেন । উপস্থিত প্রস্তাবের সহিত আয়লওর তদানীন্তন অবস্থার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, সুতরাং আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না । কেবল একটি মাত্র কথা উল্লেখ করিব । ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ দূরে থাকুক, বাণিজ্যের জন্য আইরিসগণ, লিনেন ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য

ইংলণ্ডেও প্রেরণ করিতে পারিত না । স্বাধীনবাণিজ্যের জন্য আরলও এই সময় অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চিরস্বার্থী মানচেষ্টার এবং প্লাসগো প্রভৃতি তাহাতে সঙ্গত হইল না । আজ স্বাধীনবাণিজ্য প্রচারের জন্য শুদ্ধ, শালু, নিরীহ ভদ্রলোকের ন্যায় মানচেষ্টার এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সে সময় আইরিস দিগের প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিত না ! * কিন্তু আরলও ত আর ভারতবর্ষ নহে । হেনরি ক্লড এবং হেনরি গ্রেটান আরলওর প্রাতঃস্মরণীয় নাম । ইহাদিগের প্রযত্ন অবশেষে আরলও এমন ভূমূল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং জাতীয় সৌহার্দ এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংলও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । অচিরে স্বাধীনবাণিজ্য আরলওর স্বহস্ত সংস্থাপিত হইল । যে সমস্ত উপায় আলোচনা করিয়া আরলও ইংলওর নিকট হইতে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে, তাহা তৎসাময়িক আরলওর ইতিহাসে অপারনীয় । এখন দেখা বাইতেছে যে, বকব্রতী, বস্ত্রবিক্রেতা মাফেষ্ঠারের অন্ধ স্বার্থপরতা এই নূতন নহে † ।

* The Leader of Public Opinion in Ireland by Lecky, pp. 81 83,

† প্রবন্ধের এই অংশ লিখিত হইলে কটারের তাড়িত বার্তাবহে জ্ঞাত হওয়া গেল যে, পালিগামেন্টে অতি শীঘ্রই তুলার শুল্ক রহিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়া-

ইংলও আরতনে অতি ক্ষুদ্র স্থান । কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্থলে লোকের এত ঘন সমাবেশ যে, অধিকাংশকেই রাজকীয় পদের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষয়াস্তুরে মনোনিবেশ করিতে হয় । গবর্ণমেন্টে এত চাকুরী কোথা হইতে যোগাইবেন ? কিন্তু এই চাকুরীর অভাবই ইংলওর গৌরবের প্রভাব । ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় গবর্ণমেন্টের মুখপ্রেক্ষী হইলে ইংরাজ জাতি আজিও সভা জগতের অপস্তুন পদবীতে বিচরণ করিতেন । চাকুরীর আশায় বঞ্চিত হইয়া অধিকাংশ লোকেই স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন করে । সুতরাং শিল্প শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন এবং বাণিজ্যের ভূয়সী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে । কেবল বাণিজ্যের প্রভাবেই ইংলওর এত সম্মান, এত গৌরব, এবং এত প্রতাপ । কোশল প্রয়োগ পূর্বক বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই তদুপযোগি জব্যাসামগ্রীর প্রয়োজন হয় । কিন্তু ইংলও তাহা উৎপন্ন হয় না, যাহা হয় তাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে বাণিজ্য কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না । সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে জব্যাসামগ্রী আনয়ন করিতে হয় । আবার ইংলও যে পরিমাণে বাণিজ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে,

ছেন ! এই নিদারুণ সংবাদে আমরা একান্ত স্তম্ভিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছি । এতৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলিবার বাসনা রহিল ।

তাহা ক্রয় করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক তথায় নাই। সুতরাং এই সকল পণ্যক্রয় বিক্রয়াদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিতে হয়। বিগত আমেরিকার গৃহ-বিনাদের সময় তথায় ইংলণ্ডীয় শিল্পক্রান্ত জ্বা সমূহের বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায় এবং সেখান হইতে ইংলণ্ডে তুলার আমদানী সাতিশয় হ্রাস হইয়া পড়ে। শুধু এই তুলার অভাবেই সহস্র সহস্র ইংরাজ-পরিবার একবারে উৎসন্ন গিয়াছিল। যদি ভারতবর্ষীয় জ্বাসামগ্রী ইংলণ্ডের হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায় এবং ইংলণ্ডের শিল্পক্রান্ত জ্বা ভারতবর্ষ গ্রহণ না করে, তাহা হইলে ইংরাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা এক্ষণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডের অধীনে থাকিতে ইংরাজের 'স্বক' কোন উপকার হইতেছে না, এমন কথা মুখে আনিও না।

স্বাধীনভাবে যাহারা জীবিকানির্ব্বাহের উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও বহু সংখ্যক লোক চাকুরীর প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এত চাকুরী ইংলণ্ডে নাই, সুতরাং ভিন্ন দেশে ইহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু সকলেই আপনীর প্রয়োগ অন্বেষণ করে। ভিন্ন স্বাধীন দেশ; স্থানীয় লোক পরিভাগ করিয়া কেন ইংরেজকে চাকুরী প্রদান করিবে? সুতরাং যেখানে দেশীয় লোকের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, সেই

স্থানেই বিষয় কর্ত্তের অন্বেষণ করিতে হয়। উপনিবেশ ভিন্ন এমন স্থান আর কোথাও নাই। ইংলণ্ডে থাকিয়া যাহাদের দৈনিক অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, তাহারা উপনিবেশে আগমন করে; এবং যথেষ্ট সঞ্চিত করিতে পারিলেই পুনর্বার স্বদেশে প্রস্থান করে। কোন্ কোন্ উপনিবেশ এইরূপে ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোকদিগকে চাকুরী প্রদান করিয়া থাকে, এখন তাহার আলোচনা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

কানেডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংলণ্ডীয় উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরিক শাসনের ভার ইংরাজের হস্তে নহে। ঐ সকল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পার্লামেন্টে সংস্থাপিত আছে। সুতরাং তত্ত্বস্থানীয় সমস্ত রাজকীয় পদের বিয়োগ প্রয়োগের ভার স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছে। তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে আপনাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া, রাজকার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের হস্তে কেবল গবর্নর মাত্র নিযুক্ত করিবার ভার রাখিয়াছে। এই সকল গবর্নর আবার স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং এই সকল স্থানে রাজসংজ্ঞা ধারণ এবং গবর্নর নিয়োগ ব্যতীত ইংলণ্ডের অন্য কোন ক্ষমতা নিতান্ত বি-

হল ।* বলা বাহুল্য যে, ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোক, এই সমস্ত উপনিবেশে অতি অল্প চাকুরীই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তবে ইহার কোথায় যায় ? যেখানে দেশীয় লোকদিগের কোন বিষয়ে আপত্তি নাই, রাজকীয় কর্ম-চারীনিয়োগপক্ষে বাঙনিষ্পত্তি করিবার কোন ক্ষমতা নাই ; থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য, এমন কোন স্থান বর্তমান আছে কি না ?

আছে : সে এই হতভাগ্য ভারতবর্ষ । যে সময়, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানী হইয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক পরিশেষে গবর্ণর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার কথা বলিব না । যে সময়, ছুরি কাঁচী বিক্রয় করিতে আসিয়া ইংরাজ নবাব হইয়া দেশে প্রতিগমন করিতেম, সে সময়ের কথা বলিব না ; তখনও বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের উর্বরা ক্ষেত্রে যুজ্ঞাপ্রসূনী রক্ষণবিশেষ উপর হইয়া থাকে ; একটুকু বল প্রয়োগ পূর্বক আলোড়ন করিলেই কোষ পরিপূর্ণ করা যায় । লর্ড করণওয়ালিশ, গবর্ণমেন্টের চাকুরী হইতে দেশীয়দিগকে একবারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন । তাঁহার সময় দেশীয়েরা অতি উপযুক্ত হইলে পঁচিশ টাকা বেতনে দারোগার পদ পাইতে পারিত । করণওয়ালিশের কথাই বা কেন বলি ? বর্তমান সময় দেখ । রাজাশাসন সংক্রান্ত

সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম ইংরাজের হস্তে । দেশীয় লোকের তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা, বিড়ম্বনা মাত্র । দেশীয় লোক, প্রধান প্রধান কার্য স্বচাকুরীপে নিষ্বাহ করিতে আজিও সম্যক শিক্ষা লাভ করে নাই ! ভারতহিতৈষী শ্রুতেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, শতবর্ষ ইংরাজের অধীনে থাকিয়া, ইংরাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ইংরাজীশিক্ষা ইউরোপের সভ্যতা অভ্যাস করিয়াও যদি ভারতবর্ষীয় লোক রাজ্যশাসন শিক্ষা করিতে পারিল না, তবে এ অপরাধ কাহার ? এ রহস্যের মর্যোদ্ভেদ কে করিবে ? গবর্ণমেন্টের কার্য প্রণালীতে অবশ্যই কোন বিশেষ দোষ আছে ; তাহা না হইলে সভ্যতম জাতির অধীনে থাকিয়া, — শ্রেষ্ঠতম শাসনপ্রণালীর অনুবর্তী হইয়া — স্বক্ষমবুদ্ধি, প্রতিভাশালী ভারতবর্ষীয় লোক আশ্রয়শাসন শিক্ষা করিতে পারিল না কেন ? যদি কখনও গবর্ণমেন্ট উদারতার বশবর্তী হইয়া কোন প্রসন্নভাগ্য দেশীয়কে উচ্চপদে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে অমনি পবিত্রকাতর সিবিল মণ্ডলীর মস্তকে বজ্রসম্পাত হয় । বিজাতীয় আগন্তকের সমাগমে স্বজাতীর লাভের ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া বিকট চীৎকার অরম্ভ করেন । গবর্ণমেন্টে সাহসী হইকে, তাঁহাদিগকে নীরব করিতে পারিতেন ; কিন্তু তত দূর সাহস নাই ; শত্রুদ্বাং আদরে, মিষ্টবাক্যে গাড়ে হস্ত প্রলেপ করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত করিয়া রাখেন ।

আবার দেখ, এই সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া কি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইতেছে ! কএক মাস অতীত হইল, ভারতবন্ধু ফেটসম্যান যে সকল তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে কাহার না প্রভাৱ হইবে যে, ইংরাজ এদেশের অর্থ লোভেবৎ আহরণ করিতেছে ? রাজকর্মচারীগণ, পৃথিবীর কোন দেশেও এত অধিক পরিমাণে বেতন পাইয়া থাকেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষতিতে কাহার শোক ? দেশীর লোকের হাহাকার কে শ্রবণ করিবে ? দেশীর লোকের স্বাভাবিক স্বভেদে কে আস্থা প্রদর্শন করিবে ? যত পার গ্রহণ কর, মাটির দিকে ফিরিয়া চাহিও না। ব্যয় অধিক হইতেছে বিবেচনা হয়, কএক জন দপ্তরীর বেতন কমাইয়া দাও। অপবা দিল্লী কাসেজ উঠাইয়া দাও। কিন্তু কোন ক্রমেই যাহারা সহস্র সহস্র টাকা বেতন পাইতেছেন, তাহাদিগের একটি পয়সাও কমাইও না ! ইংলণ্ডের উদারতা এবং স্বার্থরাহিতা এমনই প্রশস্ত ! মৃত্যুর প্রতি অগুমাত্রও অনুরাগ থাকে ত বলিও না—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনে থাকাতে ইংরাজের “ স্বতঃ ” কোন উপকার হইতেছে না।

রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান পদ, অলৌকিক, অপার্থিব বেতন সংযুক্ত হইয়া ইংরাজের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, আবার ফেটসেক্রেটারী কর্তৃক নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হওয়াতে উচ্চপদপ্রবেশের এক-

মাত্র দ্বারম্বরূপ সিভিল সার্ভিস, দেশীয়দিগের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে দৃঢ় অর্জলিত হইয়াছে। কিন্তু কে বলিবে যে তাহার হৃদয়ে ককণা নাই ? কে বলিবে, তিনি প্রজার লাভালাভ বুঝেন না ? কে বলিবে তাহার হৃদয় পাষণ্ড—যখন দেখিলেন, যে নবদেখার পরিগণনীর কএক জন ইংরাজপুত্র একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক-মের সময় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইল (!) —যখন দেখিলেন যে, ইহাদিগের আর উপায়ান্তর নাই, একবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া এরূপ বয়সে ইহারা কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হইবে না,—দয়ার শরীর, অমনি হৃদয়-উদ্বেগ-সংকুচিত হইয়া উঠিল। যাও তোমরা, উনবিংশ বৎসর পর্যন্ত এ পরীক্ষার সীমা নির্দিষ্ট হইল, তখনও যদি কৃতকার্য না হও, তবে অন্য চেষ্টা করিবার যথেষ্ট সময় থাকিবে ; আর যদি কৃতকার্য হও, তবে হে অপোগণ্ড, অজ্ঞাত শ্মশ্রু ইংরাজশিশু, ভারতের রাজ্য ভার গ্রহণ কর। দেশীয় লোকেরা যে সকল আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে কণপাত করিবার, কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। বিংশতি কোটি লোকের উদ্ধার, গণদম্ব ক্রন্দন, আবাহন, সম্বোধন ভারতের হর্তা কর্তা বিধাতার প্রশস্ত কণে প্রবেশ করিল না। দয়ার মহত্ত্ব, উদারতার নিঃস্বার্থতার যাহার হৃদয় নিরন্ত বিগলিত

হইতেছে, যিনি ভারতের মুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত শাস্তি, সভ্যতার নিমিত্ত অবিরত চিন্তাস্থিত রহিয়াছেন,—তাঁহার গদ্যাদ্য-দ্বয়ে বিংশতি কোটি লোকের যুগপৎ প্রশংসা স্থান পাইল না !!!

এই নব প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে কেবল ভারতবর্ষীয় দিগেরই ইচ্ছা এবং স্বার্থের বিকল্প তাহা নহে; ইহা প্রবর্তিত হওয়াতে স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড দূরে থাকুক, অক্সফোর্ড ও কাম্ব্রিজ ভিন্ন ইংলণ্ডীয় অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও সমূহ অনিষ্ট সাধিত হইবে। এসম্বন্ধে গত ২৪শে জুন তারিখের অধিবেশনে ডাক্তার প্রোফেসর পার্লিয়ামেণ্টে যে একটি কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যে সময় ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন গবর্ণমেণ্টে প্রতিজ্ঞিত হইয়াছিলেন যে “উপযুক্ত হইলে রাজ্যের (গ্রেট ব্রিটনের) সকল স্থানের সকলেই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন; প্রবর্তিত নিয়ম গুলি কোন রূপে কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিবে না।” কিন্তু এই নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হওয়াতে স্কটল্যান্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আয়ারল্যান্ড কুইন্স কলেজনিচয় এবং লণ্ডন ও যফঃস্বলে এই প্রকার যে সকল কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সে গুলি কার্যতঃ বহিঃক্ষিপ্ত হইবে। কেননা এত অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরি-ভাগ করিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা কার্যার্থী দিগের

পক্ষে সবিশেষ অপকার জনক। নূতন নিয়ম অনুসারে দুইটি প্রধান প্রকার প্রচলন হইবে। প্রথম কার্যার্থীর বয়স ১৯ বৎসরের অনধিক হওয়া আবশ্যিক; দ্বিতীয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সিভিল সার্ভিস কমিসনর দিগের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়বিশেষে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হইবে। কার্যার্থীর বয়স ২১ হইতে ১৯ বৎসরে পরিবর্তিত করা সম্বন্ধে স্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষ জজ, কোমিসলের মেম্বর, গবর্ণর ও সিভিল সার্ভিস কমিসনর হইতে প্রধান প্রধান ১১০ জন উপযুক্ত লোকের মত চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৯৫ জন বয়স স্থান করার বিকল্পে এবং শুধু ১৫ জন মাত্র তাহার সপক্ষে মত প্রদান করেন *। সিভিল সার্ভিস কমিসনরগণও ইহার বিকল্পে মত দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব প্রথানুসারেই কার্য সুন্দররূপ চলিতেছে। লর্ড সালিসবরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নূতন প্রকার পক্ষপাতী; এ কথাও সম্পূর্ণ যথার্থ নহে।

* এই ১১০ জনের মধ্যে ৪১ জন পূর্ব নিয়ম, অর্থাৎ ২১ বৎসর স্থির রাখার জন্য, মত দিয়াছিলেন; ৪১ জন ২১ হইতে ২২ বৎসরে বৃদ্ধি করিবার জন্য ১৩ জন, ২০ বৎসর করিবার জন্য মত প্রদান করেন। কেবল ১৫ জন, মাত্র সালিসবরী প্রবর্তিত ১৯ বৎসরের অভিপ্রায় দিয়া-ছিলেন।

সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাহার মধ্যে শুধু অক্সফোর্ড বরষা নূন করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, অবশিষ্ট ময়টি কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। কেন যে অক্সফোর্ড যত দিয়াছেন, তাহা প্লেফেরার প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা বাস্তব ভয়ে তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিব না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোকের স্বার্থ, সুবিধা এবং ইচ্ছা লর্ডসালিসবরীর মনে একবারও উদ্ভিত হইল না। স্কটলণ্ড, আয়ারল্যান্ডের অসুবিধাও কোন ফলদায়ক হইল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেক্রেটারীর এমনই অথও প্রতাপ, অথবা যাহাদিগের মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করা তাহার পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় যাহাদিগের প্রতাপ এমনই অলঙ্ঘ্য যে, লর্ডসালিসবরী কাহারও কথায় কণপাত করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। অপর সেক্রেটারী লর্ড জর্জ হামিল্টন, প্লেফেরারকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অব্যবহিতচিত্ততা পরিচায়ক এবং কৌতুকজনক। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে এই নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন!! সুাবকতার সীমা কতদূর, তাহা মানব সমাজে আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। সিবিল সার্ভিস সম্বন্ধে আজিকালি এদেশে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি জনপদে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা সংস্থা-

পিত হইতেছে, প্রতি সংবাদ পত্র, দেশীয় প্রতিশ্রুশিক্ষিত যুবক ইহার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; সুতরাং আমরা এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না।

সিবিল সার্ভিস সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকল্পের অতি বিস্তৃতিদোষ পরিহারবাসনায় তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল। বিলাতে কুপারস্ হিল কালেক্স সংস্থাপিত হইয়াছে, বায়, ভারতবর্ষের। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সমস্ত প্রধান পদ ঐ কালেক্সের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রতি বৎসর যত লোক উত্তীর্ণ হইতেছে, ভারতবর্ষে তত কার্য নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট চাকুরী দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অথচ ক্লার্ক এবং কলিকাতা কালেক্স হইতে গবর্ণমেন্ট চাকুরী প্রদানের প্রতিশ্রুতি উঠাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন। এদেশের কালেক্সে দেশীয় লোক উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং তাহার কার্য প্রাপ্ত হইলে কুপারস্ হিলের উপায় কি? ভারতসম্বন্ধে এমনই সুবিচার! আমরা সুখী হইলাম, বঙ্গদেশের বর্তমান লেফটেনেন্ট গবর্নর, কুপারস্ হিলের প্রতি তীব্রমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, কি সিবিল সার্ভিস, কি ইঞ্জিনিয়ারিং, কি ডাক্তারি, কি পোস্টাফিস, কি জঙ্গল বিভাগ, কি রেলওয়ে, কি শিক্ষা বিভাগ,—সকল বিভাগেই দেশীয় লোকের উচ্চ

আশা স্থাপন করা যথা । বর্তমান সময়ে গবর্ণমেন্টের কিছু সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভারতের অদৃষ্ট পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সৃষ্টি কার্যতঃ কতদূর ফলদায়ক হইবে বলা যায় না ।

দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা ভারতীয় ইংরাজ ইতিহাসের কলঙ্কময় পরিচ্ছেদ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়া, কেহ এমন বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা ইংরাজবিদ্বেষী অথবা ইংরাজ ভারতের যে শত সহস্র উপকার সংসাধন করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছি । ইংরাজ ইতিহাসে অকলঙ্ক, উজ্জ্বলতর এক পরিচ্ছেদও রহিয়াছে; তাহা অতি বিস্মৃত এবং সম্যক প্রশস্ত । যদি সে ভাগের পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিতাম, তাহা হইলে প্রবন্ধের প্রতি পংক্তি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিতাম ; অভিধান তন্ন তন্ন করিয়া, প্রতিমুখকর মনোহর শব্দ সংগ্রহ করিয়া, স্তুতি গীত গাইতাম ; এবং শাসনের অধীনে থাকিয়া জাতি-কুল-ধন-মান রক্ষা করিয়া শান্তি-মুখ ভোগ করিতেছি, লেখক পাঠকে একত্র সম্মিলিত হইয়া জলদগন্তীরম্বরে যুগপৎ তাহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইতাম । কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারি না । ভারত হৃদয়ের দক্ষাংশ আমরা শ্যামলদুর্বাদলপরিণোভিত করিয়া রঞ্জিত করিতে পারি না ; সে অন্ধকারে শারদ চন্দ্রমার মধুর প্রফুল্ল

হাসি আঁকিতে পারি না । বুদ্ধি দিয়াছ, জ্ঞান দিয়াছ, শান্তি দিয়াছ, সভ্যতা দিয়াছ, আরও দিতে হইবে । ভারত যদি অন্ধ থাকিত, তবে ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইত । কিন্তু চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিয়াছ, ভারত কেমন করিয়া নীরব থাকিবে ? সেই জনাই আরও চায় ; সেই জনাই জিজ্ঞাসা করে—আজিও ভারতশাসনে এই সকল কলঙ্ক কেন ? আজিও কেন রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্যে দেশীয় লোকনিযুক্ত হয় না ? আজিও কেন বর্ণবৈচিত্র্য পরিহার হইল না ?

এই সকল প্রশ্নের এই কি উত্তর—ভারত-বর্ষ জনশূন্য গহন অরণ্য ছিল না, ভারতে মানুষ বাস করিত । মানুষ ছিল; কিন্তু তাহার আফ্রিকার কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিতকেশ, সমতল-নাসিক, উন্নত চিবুক, শূলবিলম্বি-অধরযুক্ত নিগ্রো কিংবা আমেরিকার উৎকট নাম, বিকটমূর্তি, রঞ্জিতদেহ, মনুষ্যভোজী প্রস্তুত ছিল না । তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা ধনে মানে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সাহসে উদ্যমে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, আচারে ব্যবহারে, সৌজন্যে আতিথেয় একদা সমগ্র ভূমণ্ডলে সর্বজনপূজ্য ও সর্বাঙ্গগণ্য ছিল । তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা জ্যোতিষে গণিতে, কাব্যে নাটকে, সঙ্গীতে সৌহার্দে, সামাজিকতায় চিকিৎসাবিদ্যায় জগতের শিক্ষাদাতা ও দীক্ষাগুরু ছিল ।—অপরাধ এই যে, অপ্রমিত শৌর্যবীৰ্য্য সহকারে তাহারা সময়ে স-

ময়ে দুর্জয়, দুর্জয়া ইংরাজসৈন্যগণকে ক্ষুদ্র
মেষপালের ন্যায় * দলে দলে বি-
তাড়িত ও বিপর্যস্ত করিয়াছে ।—আমরা
যদি বলগারিয়া কিম্বা হার্জিগোবিনি-
য়াতে বাস করিতাম, তাহা হইলে এই স-
কল কারণে বিশ্বাস করিতাম : কিন্তু উন্নত
উন্নতিশীল শতাব্দীর উন্নততম জাতির অ-
ধীনে অবস্থিতি করিয়া কিরূপে এই সকল
অকিঞ্চিৎকর কারণে বিশ্বাস করিব ?
ইংলণ্ড ! যে সাম্রাজ্যের উন্নত রাজমুকুট
মস্তকে ধারণ করিয়া আজ জগতে এত ম-
হিমাম্বিত, এত আদৃত, এত সম্মানিত, এবং
এত যশস্বী হইয়াছে ; যে রাজ্য হস্তচ্যুত
হইলে এক মুহূর্তেই তোমার সমস্ত রাজ-

* অবিশ্বাস হয়, কে সাহেবরুত
সিপাহীনিদ্রোহের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড
৪১৯ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ ।

গর্জ, রাজমহত্ব ছার খার হইয়া, স্পেন,
পোর্টুগাল, ইংলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতির সম-
তলনিরাজী হয় ; সে মহা সাম্রাজ্যের
হৃদয়ে ব্যথা দিও না ; জগতে অতুল্য, সে
অমূল্য মহানিধি কোহিনুরকলঙ্কলাঞ্ছিত
করিও না ।

ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান, হিন্দুর আবাস
ভূমি ; আমরা কুগ্রাহের কোপদৃষ্টিতে বি-
শ্বাস করি । অদৃষ্টচক্রের স্ফাভাবিক আ-
বর্তনে আজি ভারতে কোন কুগ্রাহের বি-
ষদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে ; শনৈশ্চরের
নির্মম নিষ্পীড়নে ভারত জর্জরিত হই-
তেছে ; কিন্তু নিরাশ হইও না, শনির কূট-
মন্ত্রপ্রভাব শীঘ্রই তিরোহিত হইবে ; ভা-
রতভাগো সুরগুরু ব্রহ্মপতির শুভমন্ত্রণা
স্থান পাইবে !!

শ্রীভঃ—

রণরঘুর প্রলাপ ।

৫

চেষ্টা ;—তিন জন ।

শেষ রাত্রি ; এখন গাঢ় নিদ্রার সময় ।
এখন দুষ্কপোষা শিশুর স্তন্য মনে থাকে
না, প্রসূতীর সন্তান মনে থাকে না, এক-
প্রাণ দম্পতি পরস্পরকে ভুলিয়া যায়—
এমন সময়ে ঘরে আঙণ লাগিলে একবা-
রেই সর্বনাশ ! এইরূপে মশঙ্কে অগ্নির

দিকে অগ্রসর হইতেছি, আর যত চটপট
শব্দ জাগ্রতিগোচর হইতেছে, ততই অন্তরের
ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতেছে । উৎকণ্ঠায়
দৌড়িলাম ।

আমি পৌছিয়া দেখি, অগ্নি অন্ধকা-
রকে বিজয় করিয়া ভীষণ-স্বননে রিরাট-

মূর্তির গরিমা দেখাইতেছে । উল্লে, অ-
গ্নির অনীল অমৃতজিহবার স্পর্শ অতিক্রম
করিয়া, সুপে সুপে উদ্যমান ধূমপুঞ্জ
আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে ; আর সেই
নিবিড় ধূমচ্ছাল বিচ্ছিন্ন করিয়া উল্কাকারে
ক্ষুণ্ণিঙ্গের পর ক্ষুণ্ণিঙ্গ অবিরাম গতিতে
দূরশীলো উঠিয়া দূরস্থিত গৃহের চূড়ায়
গিয়া পড়িতেছে । • দূরে, নিকটে, সকল
গৃহই ক্রমে ভস্মীভূত হইতেছে । গ্রামে
ইচ্ছকরচিত গৃহ নাই বলিলেই হয়, ঘন ব-
সতি, তাহার প্রাণ সমস্তই তৃণাচ্ছাদিত
মাটির ঘর । স্তুপোপ্তিত সকলেই হতবুদ্ধি,
অধিকাংশই নিকদ্যম ; কেহ হাহাকার
করিতেছে ; আর সমুদয়ে মিশিয়া অমানুষ
এক কোলাহল উঠিতেছে । যাহারা উ-
দ্যমশীল, তাহারাও উপকারে আসিতেছে
না ; কেহ অসাধাসাধন করিতে গিয়া আ-
পনারে নিপদগ্রস্ত করিতেছে । কেহ
দৌড়িতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে, কাহা-
রও পরিধের খনিয়া খসিয়া পড়িতেছে ।
বিলুপ্ত গগুড়াগ নরনারীর তৎকালীন বি-
কট পাংশুরণে সেই স্থানকে শ্মশানভাবে
পরিবাস্ত করিতেছে ।

যেখানে এখনও আগুন লাগে নাই,
সেখানে যদি কাহারও কোন উপকার ক-
রিতে পারি এই ভাবিয়া, যে দিকে অগ্নির
বেগ, আমি সেই দিকে দৌড়িলাম । বড়
অধিক দূর যাইতে হইল না ।

একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে—আগুন
এখনও এত দূর আইসে নাই—অনেক স্ত্রী

পুরুষ দাঁড়াইয়া, অথচ সকলেই চঞ্চল ।
আর, লেপ কাঁথা, সিন্দুক পেটরা, বসন-
কোসন, কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি কলসী,
শিল ঝাঁতা, বঁটি কাটারী,—সংক্ষেপে
বলি, ধনধান্যপূর্ণ বঙ্গদেশের মুখ্যধাম প-
ল্লীগ্রামে সার গৃহস্থের যাহা কিছু আছে
সমুদয় সেই পুষ্করিণীতটে রাশীকৃত ।—
রক্তলোলুপ রাজার, রক্ষকরূপী সর্বভক্ষ
রাজকর্মচারীর, বিচার-বিজয়ী ধর্মাবতা-
রের, অর্থি-বন্ধুরূপী রাজানুমোদিত প্রবঞ্চ-
কের, বিজাতীয়শিক্ষাপ্রবীণ সজাতীয় চি-
কিৎসকের, দুর্ভিক্ষের, মহামারির, লিবারপু-
লের, মানচেষ্টরের, কুইনাইনের ভুক্তাব-
শিষ্ট যাহা কিছু আছে, এই পুষ্করিণীর
তীরে সমুদয়ের প্রদর্শন হইয়াছিল । তখন
অশ্রমোচনেন্দ্র সময় নাই, অথবা নেত্রে
আর অশ্রুই নাই, সেই জন্য তখন কাঁদা হ-
ইল না ; প্রাণ একবার কাঁদিয়া উঠিলেও
আমি কাঁদিলাম না ।

আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র
একজন বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল ‘সাবিত্রি ! মা,
ঐ দেখ গোয়ালের চালে আগুন পড়ল ।
কি হবে ? গোক—’

আর বুঝিতে পারিলাম না ; কথা
কহিতে কহিতে বৃদ্ধ অগ্নির দিকে যথাসক্তি
দৌড়িতে লাগিল ।

তাহার পশ্চাতে রমণীকণ্ঠ রজততন্ত্রে
অমৃততরঙ্গ—সভয়, কাতর, সকম্প ; “বাবা
তুমি যেও না ; বাবা, আমি যাই, তুমি
—” । রমণীও দৌড়িতেছে ।

আমার কর্তব্য কি, মন তাহা বলিয়া দিল। রক্ত ও তরুণীর পশ্চাতে আমিও দৌড়িলাম।

গোশ্বহের নীৰস্বান জুলিয়া উঠিল, রক্ত গৃহমধ্যে; একটি গাভী বেগে বাহিরে আসিল, কিন্তু চকিত হইয়া আবার গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রীও সেই জ্বলন্ত হতাশনে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। একটি নবপ্রসূত বৎস ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে তাহার প্রসূতী; আর সেই গাভীর রজ্জু ধরিয়া রক্ত যেমন বাহিরে আসিতেছেন, আরও দুই তিনটি গাভী সলস্ফে বাহিরে আসিতে গিয়া রক্তকে ধরাশায়ী করিল, একটা তাঁহার উপর পাড়াইয়া গেল, এবং তিনি যে রজ্জু ধরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পায়ে জড়িয়া যাওয়াতে তিনি তদবস্থায় সবলে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।

রক্তকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিতেছি, এমন সময়ে গোশ্বহাভ্যন্তর হইতে “বাবা গো!” এই চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একখান জ্বলন্ত চাল গৃহের সম্মুখ ভাগ ব্যাপিয়া ভীষণ শব্দে পড়িল। রক্ত তখন মূচ্ছিত, তাঁহার সর্বাঙ্গে কধির বহির্গত হইতেছে, তথাপি তাঁহাকে টানিয়া একটু দূরে রাখিয়া সেই আগুনের উপর দিয়া সলস্ফে গৃহ মধ্যে পড়িলাম। সাবিত্রীও মূচ্ছাগত। গো সেবার নিষিক্ত কতকগুলি রুহং মৃৎপাত্র ছিল, পদাঘাতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলাম;

এবং দ্বার দিয়া আগুনের উপর সেই গুল্ম ফেলিয়া দিলাম। সাবিত্রীকে কোঁড় তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ সাবধানে অগচ হ্রিতে বাহির হইলাম। যেখানে রক্তকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, সাবিত্রীকেও তথায় লইয়া আসিলাম, পিতৃপার্শ্বে তাঁহাকেও রাখিলাম। পিতা ও দুহিতা উভয়েই মৃতকল্প।

সমস্ত দিন আমি অনাহারী, সমস্ত দি-বারাত্রি প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সর্বাঙ্গ যেন ঝলসিয়া গিয়াছে, পায়ের স্থানে স্থানে ফোঁস্কা উঠিয়াছে, জ্বালা করিতেছে, আমি ক্লান্ত এবং কাতর হইলাম। সৌভাগ্য, যে আরও পূর্বে এরূপ হয় নাই। দুইটি জীবন রক্ষার নিমিত্ত হইরাছি ভাবিয়া অন্তরে সুখ হইল, এবং পার্শ্বে মান সৌন্দর্য্য ও সম্মুখে, অদূরে সেই সূন্দর ও ভয়ঙ্করের সমাবেশ—সেইভীষণরাক্রম অনলের ক্রমশঃ মন্দীভূতভাবে চিত্তে শান্তি উপস্থিত হইল। নিশ্চেষ্ট রূপে সেই স্থানে বসিয়া সাহায্য ও সুর্যোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

নির্বাণ অগ্নির তাপশান্তি জন্য একজন যুবা পুরুষ এক কলস জল ঐ দিক দিয়া লইয়া যাইতেছিল। যুবার পদধর কর্দমসিক্ত, সর্বাঙ্গে অক্ষারসংস্পর্শজনিত কালিমা; যুবক অতিশয় অন্তঃকণ্ঠ। তাহার নিটক একটু জল চাহিলাম, প্রথমে যেন শুনিতে পাইল না, বার বার ডাকিয়া তাঁহাকে বলিলাম, তখন কলসহস্তে সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিল।

যুবক আমাকে বলিল “তুমি কে ? কোথায় আসিয়াছ ? পূর্বে তোমাকে দেখিয়াছি বলিয়া ত বোধ হইতেছে না । তুমি কাহাদের কুটুম্ব ? ”

আমি উত্তর দিলাম যে ক্ষুধাপিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে, আগে তুমি নিবারণ করি ; তত্ত্বির আর দুই জন মৃচ্ছাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, ইহাদের মুখে একটু জল দিই ; তাহার পরে পরিচয় দিলে কি চলিবে না ?

যুবক আমার কথায় আশ্চর্য হইয়া গেল ; কিন্তু কলস ভূমিতে রাখিয়া যেখানে সাবিত্রী ও তাঁহার পিতা শয়ান ছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইল । আমি তাহার অনুমতির আর অপেক্ষা না করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিলাম ; পরে সাবিত্রীর মুখে ও তাঁহার পিতার মুখে জল সেক করিলাম ।

যুবক বলিল “এ যে মথুর ঘোষাল ; এমন অবস্থায় কেন ? ইহার কন্যাকেই বা এখানে কে আনিল ? ” কথায় এই মাত্র বলিল বটে, কিন্তু আকৃষ্টিতে যুবক আমাকে বিরক্ত করিল । আমি কথা কহিলাম না ।

যেন অর্ধচেতনে, সাবিত্রী বুকের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন, সমগ্র পরিধেয় একটু সারিয়া সুরিয়া লইলেন । বুঝিলাম, তাঁহার সংজ্ঞার পুনঃ সঞ্চার হইতেছে, আমার বড় হর্ষ হইল । সাবিত্রীর যে মেহভঙ্গ হইবে না, এমন ভাবনা আমার কখনই হয় নাই, তথাপি আশ্লাদ

হইল, আশ্চর্য্যমতে ক্ষুধার, তৃষ্ণার, আতুনের জ্বালা যেন সব নিবিয়া গেল । যখন পরের কথা ভাবি তখন আপনাকে আশ্রয় পাইয়া বলিয়া মনে হয় ; পরের বেলার অবহেলার সকল কার্যেরই কারণ স্থির করিয়া ফেলি । আমি কিন্তু আমার হৃদয়ের পরিচয় তখন পাইলাম না ; আমার আশ্লাদ হইল, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সে আশ্রয়ের কারণ আছে কি না, থাকিলে সে কারণ কি—তাহা ভাবিলাম না, ভাবিলেও স্থির করিতে পারিতাম না ।

মুদিতনয়নে অতি মৃদুস্বরে, সাবিত্রী ডাকিলেন—“বাবা” —।

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি কহিলাম, ভয় নাই, তোমার পিতা এইখানেই আছেন, একটু পরেই স্নান হইবেন । সাবিত্রী আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; আমার স্বর সাবিত্রীর অপরিচিত, আমিও অপরিচিত ।

সাবিত্রী ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া বসিলেন, পিতার দিকে সম্মুখ দৃষ্টিপাতি করিলেন, আমাকে দেখিয়া একটু ত্রস্ত হইলেন, আর সেই যুবককে যখন সম্মুখ দেখিলেন তখন যেন অধিকতর কাতর হইলেন ।

গোষ্ঠের ভূপতিত চাল আশ্রয় আশ্রয় নিবিয়া গেল । আমরা যেখানে ছিলাম, তথায় অন্ধকার হইল । সাবিত্রীর পূর্ব্বে কণের কাতরতা মনে করিয়া তাঁহার পিতাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের বাটীতে পৌছাইয়া দেওয়া যাউক, যুবকের নিকট

এই প্রস্তাব করিলাম। সাবিদ্রীও আমাঙ্গির সাহায্য করিলেন, তিন জনে মিলিয়া রন্ধকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। রন্ধের সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু অতিশয় কাতর।

সাবিদ্রী সমীপে আমি একটি যাচঞা করিলাম—এই আমার প্রথম যাচঞা। আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত, কিছু আহারীয় চাহিলাম। উৎসুকভাবে, অথচ সসঙ্কোচে গৃহে যাহা ছিল সাবিদ্রী আমাকে খাইতে দিলেন। ‘কৃতজ্ঞতা’ আমার তৎকালীন মনোভাবের প্রচুর সংজ্ঞা নহে।

একটা কথা বলা হয় নাই। অগ্নির বেগ সাবিদ্রীদের গোশালা পর্য্যন্ত আসিয়াই প্রশান্ত হয়। ইহাদের ঘর পোড়েনাই, ইহাদের পাড়ার কাহারও পোড়েনাই।

সাবিদ্রী কমেট লজ্জা পরিহার করিয়া আমাকে জানাইলেন যে তাঁহাদের বহুতর গৃহসামগ্রী সেই পুষ্করিণীর ধারে রহিয়াছে। আমাদের সঙ্গী যুবক সাবিদ্রীর সঙ্গে গিয়া তৎসমুদয় দেখিয়া লইতে এবং বহিরা আনিতে চাহিলেন। সাবিদ্রী কথা কহিলেন না। আমি তখন যুবককে তাঁহার পিতার নিকট কিয়ৎকালের নিমিত্ত থাকিতে অনুরোধ করিলাম। যুবক সম্মত হইল, একটু হাসিল, হাসিবার সময়ে তাহার কুঞ্চিত অধরপ্রান্তে ঈষৎ ঘৃণা যেন ফুটিতে ফুটিতে রহিয়া গেল। আমি তাহা গ্রাহ্য করিলাম না।

সাবিদ্রী আমার সঙ্গে পুষ্করিণীর তীরে গেলেন। আমি একে একে সকল সামগ্রী বহিয়া আনিলাম। যতক্ষণে কিছু পড়িয়া ছিল; ততক্ষণ সাবিদ্রী সেই কাতর পিতাকে যুবকের হস্তে রাখিয়া, স্বয়ং পুষ্করিণী তটে রহিলেন। পৃথিবীর সকল সামগ্রী হইতে সাবিদ্রী পিতাকে অধিকতর ভাল বাসেন তাহা আমি সহজেই বুঝিতে পারিলাম; সাবিদ্রী কাঁদিতে ছিলেন, তাহাও আমি দেখিলাম। তথাপি সাবিদ্রী পিতৃপার্শ্বে না রহিয়া, সেই পুষ্করিণীর তীরেই ছিলেন।

শেষবারে সাবিদ্রী আমার সঙ্গে বাটীতে প্রভাগমন করিলেন। সমস্ত সামগ্রী বাটী আসিয়াছে জানিয়া, যুবক আবার তেমনি হাসিয়া, বিনা বাক্যব্যয়ে তথা হইতে চলিয়া গেল।

সাবিদ্রী গৃহমধ্যে পিতার চরণোপান্তে গিয়া বসিলেন। রোয়াকে একটা বাধুর ছিল, আমি বাহুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া শুইলাম। তখন রাত্রি প্রভাত হইতেছে; আমার নিদ্রা আসিল না, চিন্তা আসিল। বাহ্য জগতের অস্তিত্ব ভুলাইয়া চিন্তা আমাকে অভিভূত করিল। সে চিন্তার অবস্থায় আমি নিদ্রিত কি জাগরিত অন্যে তাহা বলিতে পারিত না।

সাবিদ্রী যুবতী, সাবিদ্রী নন্দরী, সাবিদ্রী বিধবা।

শ্রীরংরঘু ঘোষামাণী।

দেবোপাখ্যান ।

(গ্রীস ও ভারতবর্ষ ।)

নবম প্রস্তাব ।

সাধারণ সমালোচনা ।



পণ্ডিতবর বকল গ্রীকসভ্যতার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে যাইয়া, গ্রীক দেবদেবী-সমূহকে হিন্দুদিগের দেবদেবী হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গ্রীক কবির কবিত্ব এত স্বাভাবিক, দেবগণের আকার প্রকার এবং স্বভাব-বর্ণনার কল্পনা এমন হৃদয়গ্রাহিণী যে হিন্দুদিগের ভরস্কর দেবগণ এবং হিন্দু কবিদিগের অসম্ভব কল্পনা তাহার সতিত উপমের নহে। মনুষ্যের মনোবৃত্তি নিচয় এবং দেবচরিত্র এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, মানবগণ যে দেবগণের অনুকৃতি তাহা বুঝিতে আর দিলম্ব হয় না। তিনি বলেন, “ প্রোমোকেস অপ্রসাদ ডায়োনাস, সৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়লালসা ভিনসেস, অহঙ্কার জুনোতে, এবং সর্বগুণ-সম্পন্নতা মিনর্ভার চিত্রিত হইয়াছে। জুপিটার সুরেশ্বর, সুরসিক এবং সংস্কার রাজা। অন্যান্য দেবগণ সকলেই প্রয়োজন, সাধনের উপযোগী, এজন্য নৈপট্য নাবিক; ভলকান কৰ্মকারক এবং

পোলো বীণাবাদক, কবি এবং রাখাল; কাম ক্রীড়াশক্ত অস্থিরমতি বালক; মার্কিয়ুরি বিশ্বাসী দূত আবার সামান্য তপস্কর। ”

আর্য্যকবি দেবগণকে বাহ্যজগতে এত সংশ্লিষ্ট রাখেন নাই, তাঁহারা মানবগণ হইতে অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ইচ্ছাময়, সুতরাং কবি তাঁহাদিগকে সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় বর্ণন করেন নাই। তিনি যে সকল দেবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, সে সমস্তে দুর্বলতা নিতান্ত অল্প আছে। মহাগর্ভাশীল মানবের সামান্য মনোবৃত্তির বর্ণনার দেবের সৃষ্টি, আর্য্যকবির নিকটে নিতান্ত উপহাসজনক বোধ হইয়াছিল। তাঁহার দেবগণ সমস্ত গুণের পূর্ণতা ও সম্পন্নতা, কিন্তু সর্বদাই দোষ-বিবর্জিত। মনুষ্যবুদ্ধি দেবচরিত্রের উচ্চতা নিরীক্ষণে অসমর্থ মনুষ্যের কল্পনাও এত দূর উদ্ভীর্ণমান হইতে সমর্থ হয় না। তাঁহার বর্ণিত দেব

“তুগেন পর্কতং হস্তং শক্ৰোপাতা চ দৈবতঃ

কীটেন সিংহঃ শার্দূলঃ মশাকেন গজঃ তথা।
শিশুনাচ মহাবীরঃ মহাস্তঃ ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ,
মৃষিকেন চ মার্জারঃ মণ্ডুকেন ভুক্ষজমঃ ।
এবং জন্তেন জনকঃ ভক্ষ্যগৈব চ ভক্ষকঃ
বহিনাচ জনঃ নমঃ বহিঃ শুকতুণেন চ ।
পীতাঃ সপ্তসমুদ্রাশ্চ দ্বিজেনৈকেন জহুনা
পাতুর্গতিবিচিত্রাচ দুজেরা ভুবনজয়ে । ”*

প্রত্যেকের শক্তি অনন্ত । দেবের
এইরূপ ক্ষমতা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া
যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহারা, সকলই
বলিতে পারেন । একজন দেবতা ইচ্ছা
করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, ইচ্ছা
হইলে শরীর দুই, তিন অথবা বহুভাগে
বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে উপ-
স্থিত হইতে পারেন ; যাঁহারা এ সমস্ত অ-
স্বাভাবিক কবিকল্পনা বলিয়া অবজ্ঞা
করেন, তাঁহারা যে কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয়প-
রায়ণ, পাপপথপ্রদর্শক গ্রীক দেবদেবী-
গণকে সমধিক প্রশংসা করিবেন, তাহাতে
আর বিচিত্র কি ?

সহস্রদশ হিন্দু পাঠক যখন অভিনিবেশ
সহকারে আপনাদিগের দেবচরিত্র পাঠ
করেন, তখন

“একোইপি সন্মাহাদেব ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নিগুণোইপি নিরঞ্জনঃ ।
একঃ সন্ স ত্রিধা চৈব ত্রিধাচ বহুধাপুনঃ
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সংপ্র-
বর্ততে । ”†

* ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ।

† কোর্ম পুরাণ, ৪র্থ অধ্যায় ।

এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া পুলকিত হন,
আপনাদিগের দেবোপাখ্যান সারগার্ড ও
দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত দেখিয়া অতুল
আনন্দ উপভোগ করেন । দেবসংখ্যা
রক্ষি হওয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে
সক্ষম হইলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের
প্রকৃতিগত গুণনিচয় অন্য জাতীয় সোফের
বোধগম্য হওয়া শ্রুষ্টির্ন । প্রত্যেকে প্র-
কৃতি ও পুরুষ, স্বতরাং প্রত্যেকেই দুই
ভাগে বিভক্ত ; মহা, রক্ষঃ, তমঃ গুণের
আধার বলিয়া কার্য্যভেদে প্রত্যেকেই তিন
ভাগে বিভক্ত ; আদ্য জীবগণের পর-
মাত্মাস্বরূপ হওয়ার প্রত্যেকেই বহুধা বি-
ভক্ত । যে যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া আ-
র্য্যগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা
সামান্য কবির কাব্য হইতে অত্যাচ্চ সাং-
খ্যাদর্শন পর্য্যন্ত সকল স্থলেই সুস্পষ্ট বর্ণিত
আছে । দেবগণের এতদূর মহত্ব ও ক্ষ-
মতা যে, যাঁহার হৃদয়ে একবার তাঁহাদের
নাম ও মূর্তি প্রবেশ করিয়াছে তাঁহা আর
বিনাশ নাই ।

“নচ দুর্জাসমঃ শাপো বজ্রক্যাপি শচীপতেঃ
হন্তুঃ সমর্থোহি সখে ! হৃদগতে মধুসূদনে*

যিরস্ গ্রীসের শ্রেষ্ঠ দেব । তিনি
অনাদি, অনন্ত, মঙ্গলময় । কিন্তু তাঁহা
ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রমিথিয়স্ স্বর্গহইতে অগ্নি
অপহরণ করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন ক-
রিল । প্রমিথিয়স্ একজন সামান্য ম-
নুষ্য । যিরসের আপন দুহিতা সেই চৌ-

* গাকড পুরাণ ২৩৪ ।

হোম সহায়তা করিলেন ।- যিস্ তাহাকে শাস্তি প্রদান মানসে প্যাণ্ডোরাকে প্রেরণ করিলেন । কেবল তাহাকে নয় তাহার সহিত সমস্ত মানবজাতিকে কষ্টদিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন । মনুষ্যের জন্য কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি ! কৌতুকের বিষয় এই যে, অগ্নি নির্ক্ষণ করিয়া ফেলিতে, অথবা উদ্ভাবিত উপায় দ্বারা প্রমিথিয়স্কে শাস্তি দিতে পারিলেন না । পরিশেষে দয়া, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার চরমসীমা প্রদর্শন করিতে, সজীবানুস্থায় প্রমিথিয়সের ক্ষু-পিণ্ড বিদারণার্থ এক গৃধ্রীকে নিয়োগ করিয়া, আপনি উহাকে এক পক্ষতে বঁ-দিয়া রাখিলেন । কি চমৎকার ক্ষমাশীলতা !

ভারতীয় দেবোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, একবার অগ্নি কোন কারণে আপনা হইতে বিদ্রুত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদাত হন, তাহাতে দেবগণ অনেক অনু-ন্নয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে লোকহিতার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন ।

অশ্বরের অত্যাচারে পৃথিবী অধঃপাতে যাওয়ার উপক্রম হইল । যেমন প্রত্যেকের শরীর হইতে তিল পরিমাণ পরমাণু প্রদান করিয়া, দেবগণ গ্রীসে প্যাণ্ডোরার স্রষ্টি করেন, ভারতের দেবগণও তাহাই করিলেন । কিন্তু গ্রীসের প্যাণ্ডোরা পৃথিবীকে দুঃখময় ও পাপপূর্ণ করিতে প্রেরিতা হন, ভারতের তিলোত্তমা সৌন্দর্য্য-যুগ্ম অশ্বর বিনাশ করিয়া ভূমণ্ডলে শাস্তি ও সুখ প্রদানে উপস্থিত হন, এই প্রভেদ ।

গ্রীককবি, মেনিলসের হেলেনকে পারিসের করে সমর্পণ করিলেন । ট্রয় নি-নাশের পর, মেনিলস স্বীয় ভাৰ্য্যাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই রাখিতে পারিলেন না । ডিউফেনিয়স্ হেলেনকে বিবাহ করিলেন, আবার একিলেস্ যুদ্ধের পর পুনর্জীবন লাভ করিয়া হেলেনের স্বামী হইলেন । ট্রয়েলসের জীবনসর্বস্ব ক্রেসিদা আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল । দেবগণ ডায়োমেডের সহায় হইয়া তাঁহার হস্তে ক্রেসিদাকে সমর্পণ করিলেন । এইরূপে একের পত্নী অপরের হস্তে সমর্পণ করা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী পরি-বর্জন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর তথাবিধ প্র-ত্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রীক দেবগণের নি-তাকর্ম্ম ছিল । কিন্তু ভারতীয় দেবগণের তদ্রূপ নহে । তাঁহারা চিরকালই ন্যায়ের বন্ধু । রাবণ রামের সীতা অপহরণ ক-রিয়া, সতীর অবমাননার প্রয়াস পাওয়ায় সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল । এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নহি ।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন গ্রীসের দেবদেবীগণ নরদেহ ও নরপ্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়ার সহানুভূতি প্রদর্শনে অধিকতর সমর্থ । সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির প্রাণিগণ-মধ্যে সহানুভূতি থাকিতে পারে না । হি-ন্দুদিগের দেবদেবীগণ মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট নহেন । সুতরাং ইহা সম্ভবপর যে মানবগণ উপাস্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে ভয়ে বিহ্বল

থাকিবে, উপাসনার উদ্দেশ্যও তজ্জনাই-সংশিদ্ধ হইবে না। দেবমানব একপ্রকার প্রণয় সংস্থাপিত না হইলে, আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে না। কবিগণ এতদ্ব্যতীত যিস্মকে এবং অন্যান্য দেবগণকে মানবপ্রিয় এবং দেবী-গণকে মানবপ্রিয় করিয়াছেন।

আরিস্তোতল নামক গ্রীসের প্রসিদ্ধ নৈসর্গিক প্লেটোর মনোবিজ্ঞানের ভাব-বিষয় (philosophy) সমালোচনায় দৃষ্টান্তরূপ বলিয়াছেন, “যেমন কেহ কেহ (গ্রীক পৌত্তলিকগণ) এমন নির্বোধ যে, তাহার নরদেহবিশিষ্ট দেবমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করে, মরণশীল অমর নির্মাণ করিয়া আরাধনা করে, অর্থাৎ যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহা কিছুই হইতে পারে না (Non entities) তাহার উপাসনা করে।” বাস্তবিক একথা যথার্থ বোধ হয়। যে ব্যক্তি আমার নায় দুইহস্ত, দুইপদ, প্রকৃতি ও শরীরবিশিষ্ট, যাহার মুখ দুঃখ ভালবাসা সকলই আমার মত, তাহার প্রতি ভক্তি কত হইবে? যে আমার মত অমজ্জীবি, কলহপ্রিয় ও দুর্বলপ্রকৃতি যে মানসিক কুপ্রবৃত্তিনিচয় শাসন করিয়া মহাজনের নায় হইতেও অসমর্থ, তাহার প্রতি কেন প্রীতির সঞ্চার হইবে? আমি মরণশীল, আমার মত শরীরবিশিষ্ট প্রাণী কেন অমর হইবে? তাহার যত কেন শক্তি থাকুক না, সে দেবতা নয়। তাহার বল ও পরাক্রম তাহাকে কুকর্ম সাধনে সক্ষম করে, তাহার

ক্ষমতা কুকর্মেরই অধিক উপযোগিনী সৃষ্টিাদি মহৎকার্য সাধনে তাহার কিছুমাত্র সাধ্য নাই। যাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছি, যাহাকে কুকর্মের সঙ্গী পাঠিতেছি, যে কুকর্মসাধনে সহায়তা করিতেছে, তাহার অপরিজ্ঞাত কার্যের জন্য শাস্তি প্রদান করিতেছে; যে ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া বি-ষাক্ত-বচনে হুলস্থলে চাতুর্যে ক্রীড়াতা প্রভৃতি মহাপাপ সাধনে কুণ্ঠিত হইতেছে না, সুরমা নগরী, সুদৃশ্য পলাশাশা, মনো-হর উদ্যানসমূহ অনাগাসে বিনষ্ট করিতেছে, একের সহধর্মিণী অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতেছে, সে দেবতা নয়, তাহার প্রতি কেন ভক্তি হইবে? অভিসারিণী দেবী, অন্ধকারপ্রিয় দেব, উভয়ই ঘৃণনীয়। আলোকরূপ দেবগণ কুকর্মসাধনে অন্ধ-কারপ্রিয়! কি চমৎকার কল্পনা! কে ইচ্ছা করিয়া কুম্ভসর্পের সহিত ক্রীড়া করিবে, যিস্মপ্রভুর আরাধনা ও মহানুভূতি প্রার্থনা করিবে? যদি ক্ষমতার পূজা করিতে হয়, গ্রীক যেমন একদিন সেকেন্দরকে, কার্থেজবাসী যেমন হানিবলকে, রোমান যেমন সিজারকে, ফরান্সি যেমন নেপোলিয়নকে অথবা শিক যেমন রণজিৎসিংহকে অর্চনা করিয়াছে, কোন্ গুণে যিস্ম তদ-পেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিবেন? তাহার নোষ প্রদর্শনে অথবা দোষ জন্য নিন্দা করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবে না।

এই মত সমর্থনের জন্য আমরা যাহা উপস্থাপন করিব তাহা তত কার্যকর এবং গ্রীক-

জির বাচ্চালি বাবুগণের বিশ্বাসজনক না হইত পারে, এই বিবেচনায় গ্রীকপণ্ডিতগণের এবং ইংলণ্ডের দুই একজন ভাষাবিদ প্রসিদ্ধ লেখকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ।

প্রসিদ্ধ আর্থাভ্যাসির দেবোপাখ্যান-লেখক জর্জ কক্স, এম্. এ, তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন “ যদি গ্রীসের দেবোপাখ্যান অনুযায়ী ধর্ম সাধারণের অন্তঃকরণে এত অনিষ্ট সঞ্চিত না করিত, তবে হয়ত সকলে তাহাতে হাসা করিয়া তাচ্ছল্য প্রদর্শন অথবা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতই করিতেন না । কিন্তু যখন দেখা গেল যে ইহাতে ভরানক নৈতিক অনিষ্ট সঞ্চিত হইতেছে, তখন সকলে প্রকাশ্য অবজ্ঞার সহিত তাহা পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না । বোধ হয় এই জন্যই জিনোফেনিস্, প্রোতাগোরাস্, এলেকজাগোরাস্, হিরাক্লিটস্ পিণ্ডার ও প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেবোপাখ্যান প্রচলিত উপাসনার বিরুদ্ধে তারম্বরে বক্তৃতা করিয়াছেন । যখন ইয়ুডি পাইডেস্ স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, যদি দেবতারা সং হইলেন তবে কবিদিগের বর্ণিত গল্প সকল নিতান্ত ঘৃণ্য ও অমূলক । আর যদি কবিগণ যাহা বলেন দেবতারা সেই সমস্ত কাৰ্য্যই করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কখনও দেবতা নহেন ” * তখন অনেকে তাঁহার মত সমর্থন করিল । প্লেটো বলিতেন যিগস্

* আর্থা দেবোপাখ্যান ৩৫৩ পৃ

ও হিরো দেবদেবীর অনুপযুক্ত * তিনি বীরোপাসনা সম্বন্ধে বলেন “ যিসিগস্কে পোসির এবং পিরিথোরস্কে যিগস্কে সন্তান বলিয়া আমরা কখনও বিশ্বাস করিব না অথবা কাহাকে একথা উল্লেখ করিতে দিব না, এবং অন্য কেহ যে দেবপুত্র হইয়া কবির রথ্য বর্ণনানুরূপ ব্যভিচার দোষে দূষিত এবং নানারূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত একথাই আমরা প্রত্যয় যাইব না । হয় তাহারা দেবপুত্রই নয়, না হয় কখনও উল্লিখিত রূপ কুকর্ম করে নাই এই দুই কথার একটি স্বীকার করিতে সকলকে বাধ্য করিব । ” † কক্স সাহেব অন্য একস্থলে যিগস্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “ যিনি সমস্ত উত্তমতা ও পবিত্রতার অত্যাচ শেখর এবং আদর্শস্বরূপ হইবেন, গ্রীসের দেবোপাখ্যানে তিনি অদম্য ইন্দ্রিয়পরতা ও ব্যভিচারের জীবিত প্রতিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন । ” ‡

এক্ষণে যেমন মুলর বংশীয় জর্মন পণ্ডিতগণ, এবং গ্যাড্‌স্টোন, কক্স প্রভৃতি শুলেখক সকল রূপক বাখ্যা করিয়া দেবতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন, গ্রীসের পণ্ডিতগণও তদ্রূপ করিয়াছিলেন । কিন্তু দেবোপাখ্যানে জাতীয় বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, দেবনিন্দাপরাধে সক্রটিসের প্রাণদণ্ড হইল, এলেকজাগোরাস্ দেশ হইতে ব-

* গ্রোট রুত গ্রীসের ইতিহাস ।

† এই প্রথম পুস্তক ৫৮৮ পৃ ।

‡ আর্থা দেবোপাখ্যান ৪৫৭ পৃ ।

হিস্ত ও বিদূরিত হইলেন। কিন্তু ইপি-
কিয়ুরস্ বহু শিষ্যের সমভিবাহারে দীর্ঘ-
কাল জীবিত থাকিয়া অক্ষত শরীরে ভি-
নস্ ও বাকসের মান রক্ষি করিলেন। *

ভারতে সেক্ষণ হয় নাই। ভারতের
ইপিকিয়ুরস, চার্বাক রাক্স নামে অভি-
হিত হন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিনাশ করিতে
রুতসঙ্কপ হন; চার্বাক নিষ্কৃতি লাভ
করিতে পারেন না। তাঁহার বধনিবরণ
ও নিগ্রহ এদেশের অনেকেই জ্ঞাত আ-
ছেন সুতরাং বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

আর উক্ত না করিলেও একথা
সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পারিবেন যে,
ইয়ুরোপীয় বর্তমান শতাব্দীর লেখক-
গণ মধ্যে অনেকে এবং এদেশীয় কোন
কোন যুবক যেমন গ্রীসের দেবোপাখ্যা-
নের পক্ষপাতী, গ্রীকপণ্ডিতগণ তাঁহাদের
অদেশীয় দেবোপাখ্যানের তত পক্ষপাতী
ছিলেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে,
যে বিষয় পৌত্তলিকগণও অবজ্ঞা করিয়া
গিয়াছেন, খৃষ্টশিষ্যগণ তাহাতে কল্পনার
কুসুমবিকাশ দেখিতে পান এবং ঈশ্বরো-
চিত দৈবীশক্তি সন্দর্শনে পুলকিত হন।
আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে দেশে
পর্বতপ্রমাণ গ্রন্থ নিচর বিদ্যমান রহি-
য়াছে, অষ্টাদশ মূলপুরাণ ও সেই পরি-
মাণে উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ম-
নুসংহিতা প্রভৃতি বর্তমান আছে এবং স-
র্বোপরি মনুষ্যশক্তির অগম্য বেদচতুষ্টয়

* গ্রোটকৃত ইতিহাস ৫৪৮ পৃ।

বিরাজ করিতেছে, ইংরাজী ভাষায় শি-
ক্ষিত ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ইংরাজের সমস্তে
দীক্ষিত দেশীয় যুবকগণ সেই আৰ্য্যদেবো-
পাখ্যানের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও
অক্লান্তচিত্তে, দুইপাত ইলিয়ড পাঠ করিয়াই,
গ্রীসের দেবগণের উৎকর্ষ প্রদর্শনে ও প্র-
শংসাকীর্ণনে মুক্তকণ্ঠ এবং যত্নশীল। তাঁ-
হাদিগকে আমরা নিম্নোক্ত কতিপয় ইয়ু-
রোপীর পণ্ডিতের মত পাঠ করিতে অনু-
রোধ করি। এতদ্বারা তাঁহারা অন্যান্য
দেবোপাখ্যান হইতে আৰ্য্য দেবোপাখ্যা-
নের যে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া-
ছেন তাহা সম্যক বোধগম্য হইবেক।

গ্রোট সাহেব বলেন “গ্রীকদিগের
দেবোপাখ্যান বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট ও নানা
চিত্রে অনুরঞ্জিত। ইহাতে অনেক দেব-
দেবী এবং মানবমানবী আছে; তাহাদের
চরিত্রও ভিন্ন ভিন্ন। মনুষ্যদিগের প্র-
ত্যেক দোষ ও প্রত্যেক গুণ শরীর ধারণ
করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; মহৎ ও ক্ষুদ্র,
কোমলাঙ্গ ও দৃঢ়কার, নিঃস্বার্থ সাহসী
পুরুষ এবং বিলাসপ্রিয় লম্পট, সকলেই
দেবতা। † কি উপহাসের কথা! আবার
আৰ্য্য দেবোপাখ্যান সম্বন্ধে কল্প সাহেব
লিখেন “বৈদিক কবিগণের এই সহজ
বাক্যাবলীদ্বারা একথা স্পষ্ট উল্লঙ্ঘন হই-
তেছে যে যিনি আমাদের পিতা, আমা-
দের শিক্ষক, এবং বিচারক, তিনিই সর্ব-
শক্তিমান অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমেশ্বর,

† গ্রোটের ইতিহাস ৫৪৮ পৃষ্ঠা।

এই বিশ্বাস প্রাচীন আৰ্যভূমি হইতেই
প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে । বাহ্য জগতে তাঁ-
হারা যত কিছু দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন,
এবং হৃদয়ের সহজজ্ঞানবারা যাহা অ-
নবরত উপলব্ধি করিয়াছেন, তদ্বারা
তাঁহারা এই দৃঢ় বিশ্বাসের পথে নীত হ-
ইয়াছিলেন । * ”

এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক-
রিতে হইলে, ভট্ট মোক্ষমূলর প্রণীত
“ চিপস্ ফ্রম্ জর্জন্ ওয়ার্ক সপ ” নামক
পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড, রাজমন্ত্রী গ্লাড-
ষ্টোনের ভাষাবিষয়ক বক্তৃতা এবং এ-
সিরাটিক্ রিমানেন্স নামক গ্রন্থে সর উ-
ইলিয়াম্ জোন্সের বক্তৃতা পাঠ করিতে
হইবে ।

ভারতবর্ষে যেমন দেবত্রয়ের বর্ণনা
আছে, গ্রীসের দেবোপাখ্যানেও সেইরূপ
তিনটি দেবতার উল্লেখ আছে । কিন্তু উ-
ভয়ে কত প্রভেদ ! ভারতের পার্বতী,
লক্ষ্মী, সরস্বতী কেমন অতুল্য !—সতী ও
সরলা, উপকারিণী ও সুখবিধারিণী । কিন্তু
গ্রীসের হিরি প্রভৃতির প্রকৃতি তাহার স-
ম্পূর্ণ বিপরীত । ভারতের কৈলাস অতি
পবিত্র স্থান, শাস্তিনিকেতন ও যোগসা-
ধনের উপযুক্ত স্থান । গ্রীসের অলিম্পস্
যিহাদের বিলাসগৃহ প্রমোদাগার এবং
কলহের রঙ্গভূমি । ভারতে গুণের অর্চনা,
গ্রীসে রূপের সম্মান । হিন্দুদিগের প্রা-
র্থনার উদ্দেশ্য মুক্তি, গ্রীকদিগের ঐহিক

ও দৈহিক সুখ । ভারতের দেবীগণের নিকট
প্রার্থনা, মাতার নিকট বালকের প্রার্থনার
মত, কিন্তু গ্রীসে পরীক্ষাধনের ন্যায় ।

ভারতের দেবোপাখ্যানে ভিনস্ এ-
ডোনিস্ স্থান লাভ করিতে পারে নাই,
এবং উহা মার্চের কলঙ্কেও কলঙ্কিত হয়
নাই । ফলতঃ গ্রীসের দেবোপাখ্যানে
সামান্য মনোহরতার খেলা এত অধিক
যে, উচ্চ বিষয়ের জন্য স্থান অতি অল্পই
আছে । ভারতের দেবোপাসনায় কিঞ্চিৎ
ভয়ের ভাগ থাকার সামান্য রুত্বনিচয়
উৎসাহ পাঠিতে পারে নাই ।

গ্রীসের দেবগণের সহিত নির্ভিকহ-
দয়ে প্রণয় সংস্থাপনে অদজ্ঞা উৎপাদন ক-
রিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সম্মান ও ভয় সু-
গম্ভীর উপস্থিত থাকার, সেরূপ হইতে পারে
নাই । একজন বলদৃশ্য উদ্ধত যুবাপুরুষ
গ্রীসের দেবোপাখ্যান ভাল বলিলেও
সাহিত্যচিন্তা রূপ তাহা বলিবেন না । দেবে
ও মানবে প্রভেদ না থাকার সমস্ত, অ-
নর্থ উৎপাদিত হইয়াছে ; এই জন্যই গ্রী-
সের দেবোপাখ্যান অস্পষ্টতার মধ্যেই
রূপ হইয়া পড়িল । কিন্তু যখন গ্রীস
জরায়ুগর্ভেও সংস্থিত হয় নাই, সেই স-
ময়ের পূর্বে হইতে ভারতের দেবোপাখ্যান
গঠিত হইয়াছে এবং আজি পর্যন্তও স্থির-
ভাবে বর্তমান রহিয়াছে । আৰ্য্য দেবো-
পাখ্যানের দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই প্রচুর
প্রমাণ । ইহাতে, এক মাত্র ঈশ্বরোপাসনা,
সাকার ও নিরাকার উভয় জ্ঞানই লাভ

হয় । এজন্যই এপর্যন্ত ইহার আদরের
হানত। হয় নাই, এবং লোকের বিশ্বাসের
এত দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও যে, যাবৎ এই
পৃথিবী আপনকক্ষে ঘূর্ণায়মান থাকিরা,

প্রকৃতির নিয়মে চন্দ্রস্বর্ষাকর্তৃক আনো-
কিত হইবে তত দিন ইহা বিলুপ্ত হইয়া
যাইবে না, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ
নাই ।

দশম প্রস্তাব ।

উপসংহার ।

একদা একটি বালক চিত্র দেখিতে
দেখিতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া, তাহার রক্ত
পিতামহকে দেখাইল একজন ক্ষীণদেহ
বাধ কেমন কৌশলে একটি ভয়ানক সিং-
হকে বধ করিতেছে । রক্ত হাসিয়া বলি-
লেন, মনুষ্যেরা চিত্র করিতে জানে, তাই
নিজের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, নিজের
বল বিক্রমপ্রদর্শনের জন্য সিংহ শিকার
চিত্রিত করিয়াছে । কিন্তু সিংহ যদি ঐ
রূপ ছবি আঁকিতে জানিত, তবে দেখিতে,
একটি শিশুসিংহও অক্ষুণ্ণচিত্তে শত শত
মনুষ্যের প্রাণ বধ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে
সজোড়ে পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, এইরূপ
অনেক চিত্র চিত্রিত হইত । ভারতবা-
সিগণের পক্ষেও এক্ষণ ঠিক তাহাই হ-
ইয়াছে । বুদ্ধিবিক্রমকেশরী আখ্যায়িকার
কীৰ্ত্তিকলাপ সকল দেশীয় লেখকগণের
বধা হইয়াছে । ভারতের ইতিহাস নাই,
সেই বহুায়ত চিত্রফলকে পূর্বতন আখ্য-
ায়িকার জ্ঞানগৌরবপ্রভৃতিও সবিস্তারি অ-

নুরঞ্জিত হয় নাই ; সুতরাং বিদেশীয়
গণ ইচ্ছামত চিত্র রচনা করিয়া, স্ব স্ব দে-
শের গৌরব রক্ষা এবং ভারতের গৌরব
হানি করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন ।
অন্যের কথা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য বিদ্যা-
ভিমानी সাহেবীপ্রিয় দুই চারিজন বাস্তা-
লিও “ ভারতের প্রকৃত অশ্রুত নাই, ইহা
কেবল ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র আদেশ সমূহের একটি
সাধারণ নাম মাত্র,” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে
চীৎকার করিয়া থাকেন । যে দেশে জৈ-
দূশ নরাকারের অবস্থান, বিধাতা সে দে-
শের কপালে কেন না দুঃখ লিখিবেন ?

একেত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত, তা-
হাতে তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার উপ-
যুক্ত ইতিহাসও বর্তমান নাই, সুতরাং এ-
দেশের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে অনেকের
ভ্রম জন্মিবে বিচিত্র কি ? যে দুই চারি
খানি পুরাতত্ত্ব দেখা যায়, তাহাও অপর
জাতীর লোকেরা বিশ্বাস করে না । ভা-
রতের প্রকৃত ইতিহাসই উপন্যাস ; কিন্তু

অন্যে তাহা নিতান্ত বিকল্পনা অথবা অ-
তুল্য দোষে দূষিত বলিয়া অনাদর এবং
উপেক্ষা করে। যদি প্রতিপক্ষ না গা-
কিল, যুক্তি কেহই খণ্ডন করিতে প্রয়াস না
পাইল, তবে আর লিখিতে বাধ্য কি ?
এইজন্যই বকল তাঁহার সভাতার ইতি-
হাসি ভারতীয় সভাতা উষাকালীন কুজ-
কটিকার ন্যায় সহজজই উড়াইয়া দিলেন।
দেবোপাখ্যানও নিতান্ত অবজ্ঞের এবং
অশ্রদ্ধের বলিয়া সকলের প্রতিতি জখাই-
লেন, তাহাতে কেহই কিছু কহিল না।

তিনি গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই দুই দে-
শের প্রাকৃতিক অবস্থা ও অবস্থান ইহাতে
আরম্ভ করিয়া সভাতার চরমসীমা পর্য্যন্ত
সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং
সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ, অথচ এতবড়
এবং এত প্রাচীন আদিম সভা দেশটিকে
তিন কথার সমালোচনা করিয়া গ্রীসের
প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি তিনি
অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় না হউক, কথঞ্চিৎ
পরিমাণেও সংস্কৃত অবগত থাকিতেন,
এবং ঐ ভাষার প্রধান প্রধান কতিপয়
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, তবে বোধ হয়
তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের কখনও ঐদৃশ ভ্রম-
প্রমাদ সংঘটিত হইত না। অনুবাদ, রঞ্জিন-
কাচসদৃশ উহার মধ্যদিয়া প্রকৃত কি-
ছুই দৃষ্ট হয় না। যে বর্ণের কাচ, দৃষ্ট
বস্তুও সেই বর্ণের প্রতিভ হয়। তা-
হাতে আবার সংস্কৃতের প্রধান প্রধান
গ্রন্থ সকল এখনও অনুবাদিত হয় নাই।

বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং গণিতের শত শত
গ্রন্থ আজিও অনুবাদিত রহিয়াছে। অথচ
দুই পৃষ্ঠা অনুবাদ পাঠ করিয়া সকলেই
সমালোচক হইয়া উঠে। গ্রীকগ্রন্থস-
মূহ যেমন ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে,
সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সকল সেরূপ হইলে
কখনও এরূপ সমালোচনা দেখিতে হইত
না। অনেকেই ভারতের সভাতা ও পাণ্ডি-
তোর বিষয় অপেক্ষাকৃত উত্তম রূপ অবগত
হইতেন। তাহা'না হওয়াতেই, অনেক
ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ভ্রমাক্ষকারে পাদ চা-
রণা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনু-
গামী এদেশীয় যুবকগণও অনেকেই লজ্জা-
জনক ভ্রমরূপে নিপতিত হইয়াছেন।

বকল সাহেব সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছিলেন
বলিয়াই স্বরচিত সভাতার ইতিহাসে, সহস্র
সহস্র গ্রন্থের নামে লেখ করা সত্ত্বেও এ-
কথানি সংস্কৃত মূলগ্রন্থের নাম করিতে
পারেন নাই; এজন্যই নিরপেক্ষ সমালো-
চনা হয় নাই। আরও একটি কারণ ছিল।
বসোয়েট্ ফ্রান্সের সভাতার ইতিহাস
লিখিতে আরম্ভ করিয়া সাহস্কারে নির্দেশ
করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীর সভাতা
জানিতে ইচ্ছা করে, সে ফ্রান্সের সভাতার
ইতিহাস অধ্যয়ন করুক। বকলের মনেও
কার্য্যে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। তিনিও
ইংলণ্ডকে সমস্ত পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ
জ্ঞান করিয়া, তাঁহার সভাতায় সমস্ত পৃথি-
বীর সভাতা লীন করিয়াছেন। এই একটি
উদ্দেশ্য সর্বদা দৃষ্টিপথে বিরাজমান থা-

কাতেই তিনি পক্ষপাতস্পর্শশূন্য হইতে পারেন নাই। বসোয়েট প্রাচীন সভ্য-
জাতি সমূহের ইতিহাস প্রকটনে প্রয়াস
পান নাই; তিনি ভারতবর্ষ, মিসর ও পারস্য
প্রভৃতির আদিম সভ্যতাকে সমধিক নিন্দা
করিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উৎকর্ষ প্রদর্শনে
সঙ্কোচ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই জন্যই ঐ
সকল দেশের নামও উল্লেখ করেন নাই।
এজন্য বকল বলেন “তিনি (বসোয়েট)
পারস্যদেশবাসিদিগের কথা প্রায় কিছুই
বলেন নাই; মিসরীয়দিগের বিষয় আরও
অল্প বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সিন্ধুনদ ও গ-
ঙ্গানদীর মধ্যবর্ত্তি প্রদেশস্থ পূর্বোক্ত জাতি-
সমূহ হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ অধিবাসিগণের—
যাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র আলেকজেন্দ্রিয়ার
বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলস্বরূপ,—যাঁহাদের অ-
তিশুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের স্বত্র সকল ইয়ুরোপীয়
ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত উদ্যমের পুরোবর্ত্তি এবং
যাঁহাদের অত্যাৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত অত্যাচ্ছ
বৈজ্ঞানিকত্বের অনুসন্ধানসমূহ, যে সময়
ইহুদিগণ সকল প্রকার পাপে কলঙ্কিত
হইয়া এক ভ্রাম্যমান দগ্ধাব্যবসায়ি জাতির
ন্যায় পৃথিবীর স্থানে স্থানে বিচরণ করি-
য়াছিল, যখন সকলের বিকক্ষেই তাহারা
হস্তোত্তোলন করিত এবং সকলের হস্তই
তাহাদের বিকক্ষে উত্তোলিত হইত, তাহাঁর
সমসাময়িক,—সেই আৰ্য্য জাতির নামো-
ল্লেখও করেন নাই*।” কিন্তু বকল
যখন গ্রীসের সহিত ভারতের তুলনা ক-

* সভ্যতার ইতিহাস, দ্বিতীয় পুস্তক।

রিয়াছেন, তখন অপর তাঁহার একপ ভাব
ছিল না। তখন বলেন, “ভারতবর্ষ গ্রী-
সপ্রধান দেশ; প্রকৃতি অতিশয় ভয়ঙ্কর।
পৃথিবীর মধ্যে অত্যাচ্ছ পর্ব্বতশ্রেণী, সুরভৎ
নদনদীনিচয়, বিস্তীর্ণ মরুভূমিসমূহ, বহু-
মত বনরাজী, তরঙ্গায়িত সমুদ্র প্রভৃতি অ-
বস্থিত থাকায়, ভারতবর্ষ প্রকৃতির ভয়ঙ্করী
সমৃতি হইয়াছেন। সমুদ্রগগনও প্রকৃতিভয়ে
ভীত হইয়া জড়োপাসনায় নিরত হই-
য়াছে। এই জন্যই ভারতে এত কুসং-
স্কার। আমরা তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকে,
দেবচরিত্রে, দেবমন্দিরের আকৃতিতে সর্ব-
ত্রই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই। এই-
রূপে তাহাদের কল্পনাশক্তি জ্ঞানের
মীমা অতিক্রম করায়, তাহাদের সকলই
অস্বাভাবিক ও অলীক হইয়াছে। কিন্তু
গ্রীসে তাদৃশ কিছুই নাই। গ্রীস প্রকৃতির
মধ্যবিত্ত। সমৃতি। সেখানে কবির কল্পনা
জ্ঞানের অধীন থাকায়, সকলই স্বাভাবিক
হইয়াছে। এই জন্যই গ্রীসে অন্যান্য দেশের
পূর্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রের
আবির্ভাব দেখিতে পাই; এবং এই জন্যই
দেবমূর্ত্তি সকলও অতি সহজ স্বতঃসিদ্ধ ক-
ল্পনার ফল অর্থাৎ মনুষ্যের ন্যায় শরীর-
ধারী। সুতরাং গ্রীসের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসং-
বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইল।†”

ভারতবর্ষ গ্রীস হইতে অত্যান চলিশ-
গুণে বৃহৎ। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে স-
র্বত্রই ভয়ঙ্কর তাহা নহে। যেমন একদিকে

† সভ্যতার ইতিহাস, প্রথম পুস্তক।

অত্রভূমি হিমালয়ের অনন্তভূমিরমাণ্ডিত ভী-
 বণ দৃশ্য, তেমনই আবার অন্যদিকে,
 নন্দনাতটে হরিৎ শসাশোভিত প্রাকৃতিক
 শোভাসম্বিত ক্ষেত্র সমুদায় বিরাজমান;
 যেমন সিন্ধু দেশের মরুভূমি দৃষ্টে অশ্রু-
 রণে দাক্ষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তেমনই
 আবার বঙ্গদেশের রংগীর নিকৃষ্টবন
 শ্যামলশসাপূর্ণ ক্ষেত্রনিচয়, আনন্দপরিপূরিত
 দিলাসভবন এবং স্বচ্ছ সরোবরের মধু-
 রিমা অবলোকন করিলে, হৃদয় উৎসাহে
 ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে
 দেশে অরণ্যে সিংহবাঘাদি বিচরণ করে
 সে দেশের কৃষ্ণবনে কোকিল, শ্যামা,
 বুলবুলের অভাব নাই। ভারতে ভগ-
 ন্নর গ্রীষ্ম আছে, মনোহর গ্রীষ্ম আছে,
 এবং মধ্যমাদ্য গ্রীষ্মও বর্তমান আছে;
 ভারত প্রকৃতির ক্রীড়ানিকেতন, সমস্ত পৃ-
 থিবীর অনুকৃতি। যদি বিমোসিয়া প্র-
 ভৃতি নগরীনিচয় গ্রীষ্মের মধ্যবর্তি থাকি-
 রাও সমস্ত দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি-
 বিশিষ্ট হইতে পারিল, ভারতের অন্তর্ভূত
 প্রদেশ সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হ-
 ইবে বিচিত্র কি? একরূপ হইলে হয়ত কোন
 অংশ অধিক কুসংস্কারজড়িত এবং কোন
 স্থল অল্প কুসংস্কারযুক্ত হইতে পারিত,
 কোন স্থলে নিরাকার উপাসনা হইত,
 কোথাও না সাকার উপাসনা হইত অথবা
 কোন প্রদেশে গ্রীষ্মের ন্যায় ধর্ম প্রচলিত
 থাকিত পারিত। গ্রীষ্মের জন্মের বহু
 পূর্বে দাক্ষিণাত্য সভ্য হইয়াছে, তাৎকা-

লিক তাম্রমসাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ ক-
 রিয়াছিল, তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ,
 কিন্তু সে সমস্ত প্রদেশেও বিভিন্ন প্রকার
 ধর্ম প্রচলিত হয় মাই। সমগ্র ভারতবর্ষে
 একরূপ দেবোপাসনা প্রচলিত থাকায় এ-
 কথার স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, মাত্র দেশের
 প্রাকৃতিক অবস্থানে ধর্মের পরিবর্তন বা
 ঐক্যতা হয় না, অন্যান্য কারণেও অনেক
 কার্য সম্পন্ন করে। যে বিজ্ঞান অবলম্বন
 করিয়া আর্থাবর্তে পৌরাণিক ধর্ম প্রব-
 র্তিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞান অনুসরণে দা-
 ক্ষিণাত্যেও পুরাণপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ব্যবস্থাপিত
 হইয়াছিল। ইহা বাহ্যজগতে প্রকৃতির হস্ত
 সন্দর্শনের ফল না হইয়া বরং শত শত বৎ-
 সরের মানসিক চিন্তার ফল বলিতে হ-
 ইবে। নতুন সমস্ত স্বভাবজ হইলে যে
 দেশে স্থানভেদে কাব্যে কাব্যে এত প্র-
 ভেদ সে দেশে দেবোপাসনাও প্রদেশ
 বিশেষে নিশ্চয় ইভিন্ন ভিন্ন হইত।

এক্ষণে স্থানের সমাবেশ দেখিতে
 হইবে। ভারতের দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে
 অবস্থিত, কিন্তু উত্তরাংশ বিশেষতঃ
 প্রদেশে প্রথমতঃ আর্ধ্যসভ্যতাবিস্তার হ-
 ইয়াছে সেই সকল স্থল সমগ্রমণ্ডলেই অ-
 বস্থিত। সমস্ত আর্ধ্যবর্ত, তদ্ব্যবস্থা সভা-
 তার দালশায়া ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষ প্রদেশ
 সমগ্রমণ্ডলমধ্যবর্তি। কাশ্মীর দেশ গ্রীষ্মের
 সহিত এক অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীরও
 গ্রীষ্মের জ্যেষ্ঠ, শ্রুতরাং চতুর্দিকে শৈল-
 মালা পরিবেষ্টিত, অন্যান্য প্রদেশহইতে

বিযুক্ত কাশ্মীর রাজ্যে, প্রচলিত দেবোপা-
খ্যানইহাতে স্বতন্ত্র প্রণালীর, সম্ভবতঃ গ্রী-
সের একরূপ ধর্ম প্রবর্তিত হইতে পারিত ।
কাশ্মীর ও গ্রীসইহাতে অনেক রূহ, প্রকাণ্ড
পর্বতনিচয় মাত্র মেণ্ডলের ভয়ঙ্কর দৃশ্য ।
লোকে মাত্র পর্বতেই উপাসনা করিতে
পারিত । তাহা না হইয়া যখন ভারতের
নক্ষত্র প্রভিষ্ঠিতপ্রণা প্রচলিত হইয়াছে,
তখন সূর্য্যের অবস্থান, অনুযায়ী স্থানের
সমাবেশও যে ভারতের ধর্ম পরিবর্তন
করে নাই একথা স্বীকার করিতে হইবে ।

সভাতার তুলনা করিতে স্বকীয় ইতি-
হাসের প্রথম পুস্তকে সকল যে গ্রীসের
বিজ্ঞানপ্রভৃতি শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান ও
শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, যদি
তিনি ভারতের জ্ঞানোন্নতির বিষয় অবগত
থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপন মত
জাস্তিপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করিতেন ।
ভারতীয় জ্ঞানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকে
অনেক কথা লিখিয়াছেন, এক্ষণে তদ্বি-
ষয়ের বাস্তবতা বর্ণনার প্রস্তুত হইলে আ-
মাদের বর্ণনার বিষয় অতিক্রম করিয়া
দূরে যাউতে হয় । কিন্তু বর্ণনার বিষয়ের
সহিত সভাতার সম্বন্ধ অতি সন্নিহিত ব-
লিয়া দুই একটি কথা উল্লেখ না করিয়া
থাকিতে পারিলাম না । জ্যোতিষ, গ-
ণিত, পদার্থতত্ত্ব, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি
শাস্ত্র সমুদয়কে ভারতের 'সম্ভান বলিয়া
অনেকেই নির্দেশ করিয়াছেন; যাহারা সে
সকল সবিশুষ্কৃত অবগত হইতে ইচ্ছা

করেন তাঁহারা 'বঙ্গদর্শনে' 'আর্য্যজা-
তির মহিমা' নামক প্রবন্ধ পাঠ করি-
বেন । এক্ষণে এতদধীনদিগের মধ্যে
যে সমস্ত বাস্তবানিসাহেব তাহাতে অ-
নান্য প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রবো-
ধের জন্য দুই একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের
মত উদ্ধৃত করিতেছি । সাহেবের নাম-
সংযোগ না দেখিলে বাহারা বিশ্বাস ক-
রেন না কেবল, তাঁহাদের জন্যই উদ্ধৃত
করিতেছি ।

আসিরাটিক সোসাইটির তৎকালিক
সভাপতি সংস্কৃতভাষাবিশারদ প্রসিদ্ধ
পণ্ডিত তাঁহার স্বজাতীয় ভাষা ইংরাজীতে
যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই ।
'যাহা হইতে পিথাগোরসের শিলাগণ
অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অ-
নুমিত হয়, ভারতের এবং আসিয়ার প্রসিদ্ধ
ও সম্মাননীয় অপরাপর প্রদেশের প্রা-
কৃতিক বিজ্ঞানের সেই অংশের বিষয়
স্থানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি । মিসিরো ব-
লেন যে ইউরোপের প্রাচীন পণ্ডিতগণ
কেদ্রাভিমুখ বল ও মাদ্যাকর্ষণের সাধারণ
নিয়মের কিছু কিছু অবগত ছিলেন, কিন্তু
তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান
নাই । সুতরাং অপর নিউটনের অক্ষয়-
কৌত্তি কিরীট হইতে একটি পত্রও ছিন্ন না
করিয়া একথা সাহস পূর্বক নির্দেশ ক-
রিতে পারি যে তাঁহার সমস্ত পরমার্থতত্ত্ব
এবং বিজ্ঞানের একাংশ বেদের মধ্যে
এবং সফি (পারস্যবাসী) দিগের প্রমুখও

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাও নির্দেশ করিতে পারি যে তিনি কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রবিমুখ বলের কারণ স্বরূপ যে অতি ক্ষমশক্তি প্রত্যেক জড় পদার্থে নিহিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা, আলোকের নির্গমন প্রতিফলন ও কিরণরেখাগুলির প্রতিগমন ও ভঙ্গ হওয়ার বিষয়; বিদ্যুতের ধর্ম, তাপের বিষয়, ইন্ধিরদ্বারা বোধ হওয়া, এবং বল ও গতির বিষয় সমস্তই পাঞ্চভৌতিক কার্য বলিয়া হিন্দুগণ নবিস্তার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। বেদেও জড় পদার্থের সাধারণ আকর্ষক এক বলের উল্লেখ আছে, তাহারা (হিন্দুরা) সূর্যকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন; একদা সূর্যের নাম আদিতা (আকর্ষক) * তিনি আরও বলেন যে ‘ পিপাগোরাসের মনোবিজ্ঞান এবং জিনোর পদার্থতত্ত্ব ভারতের সাংখ্য দর্শনের অনুরূপ । ’ † তিনি বলেন ‘ সুবিজ্ঞ দেবিস্থানের গুণ্ডকার বলেন ‘ পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এবং পারস্যাদিকৃত অনেক প্রদেশে একই কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কালিদ্ভিমেস্ তাঁহার পিতৃব্য সমীপে ভারতের যে সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু প্রদর্শন করেন তন্মধ্যে এক প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্রের গুণ্ড ছিল, (ন্যায় দ-

র্শন) ব্রহ্মাণেরা অনুসন্ধিৎসু গ্রীকজাতিকে সেই শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ’ এই মুসলমান লেখক ইহা অনুমান করেন যে-এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আরিস্তটল তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও ন্যায় শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি আরও বলেন যে প্লেটো ও ইপিক্যার্মস্ বেদান্তদর্শন অবলম্বন করিয়া আপন আপন ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ’ *

একদা পাঠক গ্রীসের বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিবেন।

এই দীর্ঘ সমালোচনার সকলেই দেখিবেন ভারতের দেবোপাখ্যান প্রণেতৃবর্গের প্রতি কি অবিচার করা হইয়া থাকে। যিনি ইংরেজ গ্রন্থকারগণের মস্ত্রে দীক্ষিত, হয়ত তাঁহার মনে হইবে প্রস্তাব লেখক চেষ্টা করিয়া পক্ষপাত করিয়াছে, অন্যায় রূপে ভারতীয় দেবগণের প্রাধান্য সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছে। আমার সংস্কৃতজ্ঞ গোড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে করিবেন ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করায় ইংরাজ লেখকগণের সম্মান ও গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত বর্ণন করিতে সাহসী হয় নাই। যেই যাহা মনে করেন, যাহারা দুই দেশের দেবরূপ সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা করিবেন, একপ ভরসা হয় যে, তাঁহাদের মত আমাদের মত হইতে বড় বিভিন্ন হইবে না। তবে মনুষ্যের ক'চ ভিন্ন ভিন্ন; প্রকৃতিও স্বতন্ত্র

* এসিরাটিক রিসার্চেস্ চতুর্থ পুস্তক

১৭৭ পৃ।

† এ।

* এসিরাটিক রিসার্চেস্ ১৭৬ পৃ ইত্যাদি।

স্বতন্ত্র, সুতরাং কোন কোন স্থলে প্রভেদ
হওয়া আশ্চর্য্য নহে ।

যে সমস্ত বাঙ্গালি বাবু ডা'ম ই-
য়ার দুর্গাকালী বলিয়া নাহেবের নাম
জড়ী করেন, এবং গ্রীসের দেবোপা-
খ্যান অনেক ভাল বলিয়া নির্দেশ করেন,
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা এই যে তাহারা
কি দেখিয়া গ্রীসের দেবদেবীর পক্ষ-
পাতী ? যদি যিগসের ও ভিনসের বাভি-
চার, হিরির ও তাহার সঙ্গিনী আদির
ক্রোধ ঈশা ও কোটিল, হার্মেসের প্রতা-
রণা চৌধারী ও শঠতা প্রভৃতি প্রশংস-

নীর গুণ বলিয়া তাহারা গ্রীক দেবদেবীর
পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহাদের বস্তুগত
ও অভিভাবকগণের কর্তব্য যে মধ্যে
মধ্যে তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি
রাখেন । এরূপ বাবুদের জন্য বাকস্
ইপিকিউরস্ আছে, এদেশেও চার্কাকের
প্রশস্ত পণ আছে । ইরারোহ ভারতের
দেবোপাখ্যানশৈল্য অরোহণ করিয়া শীর্ষ
দেশে কি আছে, তাহা তাহাদের দেখিয়া
আদর্শক নাই ।

সমাপ্ত ।

শ্রী ব্রজনাথ বিশ্বাস ।

অবেক্ষণশক্তি ।

পাঠক, বড় বিপদে পড়িয়াছি । নানা
কারণে কিছু দিন বাঙ্গলসম্পাদকের কিছু
মাত্র অবকাশ ছিল না ; এই হেতু
কএক সংখ্যা বাঙ্গল প্রকাশে বিলম্ব হয় ।
আপনারাও 'অনবকাশের' ওজর গ্রাহ্য
করিবেন না ; সুতরাং সম্পাদক লে-
খকদিগের নিকটে প্রবন্ধ চান । করি
কি লেখনী হস্তে কাগজ সম্মুখে লইয়া ভা-
বিত্তে ভাবিত্তে একটি বিষয় নির্ণয় করি-
লাম ; কিন্তু কি নামে বিষয়টির নাম-
করণ করি, তাই ভাবিয়াই অস্থির ।
'দৃশ্', 'লুচ্' ও 'ঈক্ষ্' তিনটি ধাতু
লইয়া একে একে উপসর্গ গুলি যোগ ক-

রিয়া দেখিলাম, কিছুতেই ইংরেজী শব্দ-
টির প্রতিশব্দ পাইলাম না । অবশেষে
যেটি নির্বাচন পূর্ব্বক উপরে স্থাপিত ক-
রিয়াছি, তাহাও মনোমত হয় নাই । তবে
ইংরেজী উপসর্গের সহিত বাঙ্গলা উপসর্গ-
টির মিল আছে, এইমাত্র । এস্থলে একটি
গম্ভীর মনে পড়িল । গত দুর্ভিক্ষ হইতে
গবর্ণমেণ্টে ফাটিক্টিক্ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ
করিয়াছেন । কোন স্থানের কালেক্টর
একজন বাঙ্গলানবিশ ডেপুটী কালেক্টরের
প্রতি ইহা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিবেন,
মনে করিয়া, পাছে উক্ত কর্মচারী এই শ-
ব্দের অর্থ না বুঝেন, এই সন্দেহ করিয়া,

সেরেসাদারকে কহিলেন, উহা বাঙ্গালার অনুবাদ করিয়া দেও। সেরেসাদারের মহা বিপদ, দিশাহারা হইয়া তিনি উচ্চারণ সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া লিখিলেন ‘স্থিতি স্থাপক।’ সাংহেব সন্তুষ্ট হইলেন, ভাবিলেন সেরেসাদার বেশ বাঙ্গলা জানেন। কিন্তু পাঠক আমার অনুবাদটি কি আপনাদের নিকট তদ্রূপ ‘পাশ’ হইবে? যাহউক, সংপ্রতি মূল প্রস্তাব আরম্ভ করা যাউক।

শ্রীমতী মিস্‌ নাইটিংগেলের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তিনি কহিয়াছেন, ‘চিকিৎসালয়ে যে সকল ধাত্রী আছে, তাহাদের অন্যান্য গুণ সত্ত্বেও একটি প্রধান দোষের জন্য রোগীদিগের তত সুবিধা হয় না। সে দোষটি অবশ্যকণের অভাব, এ দোষটি শুদ্ধ ধাত্রীদিগের নহে; প্রায় লোক যাত্রেই। যদি লোক যাত্রেই এই শক্তিসম্পন্ন হইত, তবে পৃথিবীতে উন্নতি বিষয়ে এতদিন সুগাম্যর উপস্থিত হইত। কেহ বলেন, অভিজ্ঞতাব্যারা লোকে জানী হয়, অর্থাৎ কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ চেকিয়া শিখে, আবার কেহ বা চেকিয়া শিখে। কিন্তু আমরা বলি এমত নিরবস্থির ত্রমশূন্য নহে। কারণ, ‘দেখা’ ‘চেকা’ দূরে থাকুক, অনেকে পদে পদে ‘চেকিয়াও’ যে অজ্ঞ সেই অজ্ঞই থাকে। যাহাদের চরিত্রে স্বাভাবিক দোষ থাকে, কোনরূপ অভিজ্ঞতাই তাহাদিগকে জানী করিতে পারে না। যদি তাহা

হইত, তবে প্রথম চার্লস ভূপতি রাজাচ্যুত ও হিন্‌শির হইতেন না। বোরনন পরিবার কোন কালে জানী হইল না; তাহা হইলে আজিও ফরাসের সিংহাসনে তাহারা বিরাজ করিত। কুলদ্বার জয়চন্দ্র ঘোষিয়ান মহম্মদকে বৈরনির্ঘাতন যান্‌মে আহ্বান করাতে ভারতরাজা স্বেচ্ছকবলিত হইল; তাহাতে যদি হিন্দুদিগের জ্ঞানোদয় হইত তবে কি পলাসীর অভিনয় হইত? ঐতিহাসিক প্রমাণেরই বা প্রয়োজন কি? আমরা সর্বদাই দেখিতে পাাই অনেক লোক চিরকালই নিরুদ্বিতা প্রদর্শন করেন। অনেকে দালাকালে বরং একটুকু জ্ঞানের ক্ষুধা দেখান, যত বড় হইল নিরুদ্বিতা তত বর্জিত হইতে থাকে। অবশ্যকশক্তিসম্পন্ন লোকই স্বতন্ত্র—বাল্য ও বার্দ্ধিকের সহিত উক্ত শক্তির কোন সম্পর্ক নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন প্রথম কঙ্গন হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কত? কিন্তু তখন তিনি অস্ত্রীর অনেক রুদ্ধ ও সমরাতিক্রম সৈন্যদলকে পরাভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেনানী উল্‌ফ্‌ কেমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া সমরক্ষেত্রে শারিত হইয়াছিলেন! অগচ্‌ মৃত্যু সময়ে তদীয় বয়ঃক্রম এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে বালক-সেনানী বলিলেও হয়; কিন্তু তদানীন্তন বয়োবৃদ্ধ সেনানীরাও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উলিয়ম পিট অপরিণত বয়সে পার্লামেন্টে স-

ভাঙে তদীয় বিক্রপকারিদিগকে কেমন প্রবীণোচিত উত্তর দিয়াছিলেন! বালক— ফাঙ্কশন এক গাছি সূত্র লইয়া খেলাইতে খেলাইতে নিশ্চল-নক্ষত্রপটলের পরস্পর ব্যবধান পরিমাণ করিয়াছিলেন এবং বায়ুর অবস্থা-নির্ণয় করিয়া কতই প্রাজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই অবৈক্ষণশক্তি অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ হু লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ অবৈক্ষণ-বিশিষ্ট বালক অনেক বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষা যে প্রবীণ তাহার আর ভুল নাই।

জ্ঞানকে ঈশ্বরদত্ত গুণ বলিলে অসঙ্গত হয় না। অবৈক্ষণই জ্ঞানের প্রসূতি ও ধাত্রী। এই অবৈক্ষণশক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায় অভ্যাসে পরিবর্দ্ধিত হয়। মিস্ নাইটিংগেল যাহুর বার্ট হুডিনের নাম উল্লেখ করিয়া কহেন ‘সে অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য বিখ্যাত হইলেও, অবৈক্ষণশক্তির পরিচালনার নিমিত্ত স্বীয় পুত্রকে যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত প্রাজ্ঞোচিত।’ সে পদ্ধতিটি এই;—হুডিন স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে কোন বিপণীর নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে তদ্ব্যবস্থা সর্বত্র প্রতি মনোযোগ পূর্বক দৃষ্টি করিতে বলিত। পরে পিতাপুত্র সেই দৃষ্ট বস্তুগুলির একটি তালিকা লিখিত। এইরূপে উক্ত বালকের অবৈক্ষণশক্তি

এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, সে এক বার কোন দোকানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তদ্ব্যবস্থা ৬০। ৭০টি বস্তুর আকৃতিস্থিতি প্রভৃতির যথাযথ বর্ণন করিতে পারিত। ইহার ‘দিব্যচক্ষু’ বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিয়া অর্থোপার্জন করিত। বালক হুডিন এরূপ আশ্চর্য শক্তি লাভ করিয়া ছিল যে, কোন গৃহে প্রবেশ করিয়া মাত্র তাহার চক্ষুস্থল সম্পূর্ণরূপে বন্ধন করিয়া ফেলিলেও, সে, গৃহস্থিত সমুদয় ব্যক্তি ও সকল সামগ্রীর সূক্ষ্ম বর্ণন করিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতে পারিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে, সে শিরা ও ধমনী সংযোগে সমুদায় বস্তু দেখিতে পায়।

পাঠক মহাশয়দিগকে হুডিন ঘরের ন্যায় যাহুর হইবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই না; কিন্তু অবৈক্ষণশক্তির পরিচালনা বিষয়ে তাহার নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। এই শক্তির কত যে মহৎফল তাহা বলা যায় না। প্রাত্যহিক ব্যাপারে ইহার অভাবজনিত কুফল সর্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রভু অবৈক্ষণশক্তি বিরহিত হইলে ভূতোর দ্বারা আশানুরূপ কার্য পান না; কোন বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে গেলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়; একটি সামান্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন হইল কোন বিদ্যালয়ের, একটি বালক সমপাঠীর একখান পুস্তক

অপহরণ করিয়াছিল, উক্ত পুস্তকের যে যে স্থানে অধিকারির নাম লেখা ছিল, তাহা তুলিয়া ছিল, পুস্তকের মলাটে পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ছিল, কিন্তু অধিকারী গভঃসমষ্টির গায়ে পেম্পিল দিয়া যে স্বীর নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল, অবৈক্ষণীয় বশতঃ তাহা দেখিতে পারা নাই ; হতরাং চুরির কএক দিন পরে বিদ্যালয়ে পুস্তক খানি লইয়া আসামাত্র ধরা পড়িল। পাঠক অনেক সময় শুনিয়া থাকিবেন, হতব্যক্তির কোন বস্তু পরিধান পূর্বক পুলিশ কর্তৃক হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

ইতিহাস মন্বন করিলে এই অবৈক্ষণ শক্তির এত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায় যে, তৎসমুদয় উল্লেখ করিতে গেলে এই একই প্রবন্ধে অনেক সংখ্যা বাক্যের কলেবর পূর্ণ হইতে পারে। বালক বেঞ্জামিন ফ্রান্সলিন ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তাড়িতাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন ; নিউটন আতা কলের পতন অবলোকনে মাধ্যাকর্ষণ ও শিশুদিগকে মাদানবুধুদ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বর্ণবিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র বখন লিখিয়াছিলেন—

‘কাঙ্ক্ষীপুর বর্জমান ছয় মানের পণ।

ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥’

অথবা ভারতবর্ষে রেলওয়ের কথা হইলে একজন আধুনিক কবিওলালা যখন গাইয়াছিল—

‘লোকে একদিনে কলকাতা হ’তে সদা
যাবে কালী।’

তখন লোকে উহা কবিকল্পনা ব-
লিয়া ভাবিয়াছিল মাত্র ; কিন্তু রেল-
ওয়ে তাহা সত্য ঘটনা বলিয়া প্রমাণ ক-
রিয়াছে। অবৈক্ষণপ্রভাবে একটি সা-
মান্য ঘটনা দেখিয়া ড্রেমস্ ওয়াট এই
রহৎ কাণ্ডের আবিষ্কার করেন। কে-
লিতে চা সিন্দ্র হইতেছিল, তখন পাত্রম-
ধ্যস্থ কক্বাপ্পপ্রভাবে আবরণটি উন্মিত
হইতেছে দেখিয়া ওয়াটের অন্তঃকরণে
বাষ্পের শক্তির ভাব প্রথম উদ্ভিত হইল,
এবং তাহারই ফল বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয়
শকট প্রভৃতি *। এই যে ঘটিকায়জুটিতে
টক্ টক্ করিয়া দোলকটি ইতস্ততঃ নড়ি-
তেছে, ইহাও অবৈক্ষণের ফল। পাইসা
নগরীর একটি গির্জাতে একজন ফরাশ
সন্ধ্যা সময়ে ঝাড় লঠন জ্বালিয়া দিতে-
ছিল, একটি শিকে হস্ত লাগিয়া ইত-
স্ততঃ হুলিতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া
গালিলিওর মনে হইল, যদি কোন ক্রমে
একপা ভাবে একটি বস্তু দোলাইয়া দে-
ওয়া যায় যে, তাহা বাধা না পাইলে
চির দিন হুলিতে পারে তবেই তদ্বারা
সময় নিরূপণ করা যায়। এই সিদ্ধান্ত

* এই স্থলে পাঠককে কিংনিলীকৃত

‘মেডাম হাই লেডী হোয়াই’ গ্রন্থের
ভূকম্প প্রস্তাবটি ; ও বুনফোর্ডকৃত প্রা-
কৃত ভূগোলের উপক্রমণিকাটি পাঠ করিতে
অনুরোধ করি।

হইতেই ঘটিকায়ত্তর স্রষ্টি । সামুদ্রিক মানচিত্র ও সামুদ্রিক স্রোত অনেক করিয়া কলসস নৃতন মহাবীপের সম্বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । পুনশ্চ যখন কলসসের সঙ্গিগণ তাক্ত ও কিণ্ড প্রায় হইয়া হতাশচিত্তে তদীর প্রাণ সংহার করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তখনও তিনি এই শক্তির প্রভাবে একটি সামুদ্রিক ভূগ ও কএকটি পক্ষী দেখাইয়া কহিয়াছিলেন ভূমি অধিক দূর নহে । কলসসের নামের উল্লেখ করাতে একটি গম্পা মনে পড়িল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না * । কলসসের বিদ্রোহিণী বলিয়া ফিরিতেন, আমেরিকা আবিষ্কারে তাহার অধিক গুণপনা কি প্রকাশ পাইয়াছে ? উহা অনেকেরই পারিত, অথচ পূর্বে অনেকেরই কলসসের কথাকে উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন † । একদা কোন স্থানে কলসসের কএক জন দ্রোষ্টা একত্রিত হইয়া ঐরূপ বিক্রম করিতেছেন, তখন কলসস একটি অণু সোজাভাবে বসাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ‘আপনারা এক আঘাতে এটি ভগ্ন করুন’ সকলেই অকৃতকার্য হইলেন : তখন কলসস অণুটিকে ঈষৎ হেলাইয়া বসাইয়া অল্প আঘাতেই ভগ্ন করিলেন । তখন সকলেই হাসিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন ‘ওরূপ করিলে

* চেষ্টা মিসেলেনিতে দ্রষ্টব্য ।

† প্রেক্ষটের ইতিহাস দ্রষ্টব্য ।

আমরাও পারিতাম্’ তখন কলসস গর্বি-তভাবে উত্তর করিলেন ‘মহাশয়গণ, হাস্য ও করতালি প্রদান করা সহজ বটে ; কিন্তু এই বুদ্ধিটুকু পূর্বে আপনাদের কাহারও ঘটে আসে নাই’ । তখন সকলেই লজ্জার মশুক অবনত করিলেন ।

আনিমিনিয়ার যুবরাজ স্বাধীন পক্ষীর সহিত স্বীয় অনুস্মার তুলনা করিয়া দুঃখিত হৃদয়ে বসিয়া আছেন । ‘সুখ-নিকেতন’ হইতে প্রস্থান করিতে এতদিন কোন যত্নই করেন নাই, এই ভাবিয়া আপনাকে শিকর দিতেছেন ; এমন সময়ে একটি দাসী একটা কাচপাত্র ভাঙ্গিয়া দুঃখ করিতেছিল, সহসা বলিয়া উঠিল ‘বাহা গিয়াছে তাহা যখন আর পাওয়া যাইবে না, তখন গতানুশোচনার ফল কি?’ যুবরাজ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, ‘আমি কি অন্ধ ! এই সহজ সত্যটুকু আমি অগ্রে বুঝিতে পারি নাই !’ * আর একটি গম্পা আছে । কোন সময়ে এক জন প্রবলপ্রতাপ নৃপতি কোন দূর দেশ জয় করিবার জন্য সমরসজ্জা করিতেছিলেন, তদৃষ্টে তদীর একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন ‘এদেশ জয় হইলে কি করিবেন?’ রাজা বলিলেন ‘আর এক দেশ জয় করিব ।’ বন্ধু ‘সেটি অধিকৃত হইলে?’ রাজা ‘অপর একদেশ ।’ বন্ধু ‘তার পর?’ রাজা ‘এইরূপে ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিব ।’ বন্ধু

* অঙ্গন কৃত রানেলাস দেখ ।

কহিলেন 'এখনই যদি ভাবেন যে, ভূমণ্ডল অধিকৃত হইয়াছে, তবে ত অর্থনাশ, শারীরিক কষ্ট, মানসিক ক্লেশ ও অনিশ্চিত জয়পরাজয়ের চিন্তা ভোমিতে হয় না। সুতরাং সুখে কাল কাটাতে পারেন।' রাজা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, 'এই ক্ষম দর্শনটি আমার এত দিন হয় নাই। আমি যথার্থই অন্ধ।' ফলতঃ রাসেলাস ও এই নৃপতির ন্যায় আমরা সকলেই অন্ধ! অবৈজ্ঞানিকতার অপরিচালনাই এই অন্ধতার মূল।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল জেনার নামে একজন অতি সামান্য ডাক্তর মাড্রি নামক স্থানে চিকিৎসা করিতেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে বহু গবেষণা দ্বারা তদীয় অবৈজ্ঞানিকতা ইতিপূর্বেই বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল। তখন ইংলণ্ডে বসন্ত রোগের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রতি দিন বালোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। এমন কি অনেক পরিবার সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদা ডরসেটনার-বাসিনী এক জন গোপিনী জেনারের নিকট কোন রোগ দেখাইতে আসিলে, জেনার তা-

হাকে বলিলেন সাবধান বসন্ত রোগে যেন আক্রান্ত না হও। তাহাতে উক্ত গোপিনী কহিল, কিছু দিন হইল আমার 'গোবসন্ত' হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বসন্তে আমার ভয় নাই। একপু কথায় অনেক চিকিৎসকই ইত্যাদি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করেন নাই। জেনার গোপিনী প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র স্বরূপ-পুস্তকে লিখিয়া মইলেন, এবং ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিলেন যে, গোবীজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বসন্ত রোগের প্রায়ই ভয় থাকে না। সেই হইতে গোমহুর্গাধানের প্রচলন হইয়া কত লোকেরই প্রাণরক্ষা হইয়াছে! এবং অবৈজ্ঞানিকতায় জেনারের নামও লোকহিতৈষি বলিয়া চিরস্মরণীয় থাকিবে*। আর প্রস্তাব দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। উপসংহার কালে এইমাত্র বসিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, পণ্ডিত ও মুখে যে প্রভেদ, তাহার কারণ একজন অবৈজ্ঞানিক, অপর জন তাহা নহে।

স্মৃতি—

* গোমহুর্গাধান নামক চটি পুস্তকে দেখ।